প্রথম সংস্করণ : ১৯৬০

সেলিং এজেন্টস্ :
ভারতী ভবন (ডিস্ট্রিবিউটার্স)
গোবিন্দ মিত্র রোড, পাটনা-৪

ভারতী ভবন, পাটনা-১ দ্বারা প্রকাশিত এবং
তপন প্রিন্টিং প্রেস, পাটনা-৪ হইতে মুদ্রিত

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমার সাহিত্য-সাধনার উত্তমাংশ আপনাকে সমর্পণ করি। কিন্তু আমার সাধনা ফলবতী হওয়ার পূর্বেই আপনি পরলোকে চলিয়া গেলেন। অতএব আজ এই গ্রন্থ দ্বারা আপনার পুণ্যস্মৃতিরই তর্পণ করিতেছি।

—নগেন্দ্র

প্রাকথন

প্রস্তুত গ্রন্থখানি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কর্তৃক (হিন্দী ভাষায়) বিরচিত 'রস-সিদ্ধান্ত' বইটির বাংলা অনুবাদ। ডক্টর নগেন্দ্রের রস-সিদ্ধান্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা সাহিত্য সিদ্ধান্তবিদ্যার একটি বিখ্যাত বই। ডক্টর শ্রীমান্ ইন্দ্রনাথ চৌধুরী বইটিকে বাংলায় অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। অনুবাদ সরল, সহজ, যথাসম্ভব স্বাধীন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে আমার জ্ঞান ভাসা ভাসা। সত্য কথা বলিতে কি, এ বিদ্যায় আমি বিশেষ অজ্ঞ। অনধিকারী হইয়াও আমি যে বইটির প্রশংসা করিতেছি তাহার কারণ বইটি আমার ভালো লাগিয়াছে, এবং আমার ধারণা অনেকেরই ভালো লাগিবে। সেই অনেকের মধ্যে সাহিত্যশাস্ত্রীরা অবশ্যই থাকিবেন বলিয়া মনে করি।

বস্তু বিষয় এবং ভাষার মতো ছাপা কাগজ ও বাঁধাই চমৎকার।

নিবেদন

আধুনিক ভারতীয় ভাষায়—বিশেষ করিয়া হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠীতে—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়নের অতীব প্রসার ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের নানা প্রস্থান ভেদের মধ্যে রসপ্রস্থান সর্বাধিক প্রাচীন, ব্যাপক ও জনপ্রিয় সিদ্ধান্তরূপে পরিগণিত। এই রসপ্রস্থান ও তাহার নানা তত্ত্ব লইয়া আধুনিক ভারতীয় মনীষীগণ সুচিন্তিত গবেষণামূলক কার্য্যে লিপ্ত আছেন। সংস্কৃত বিদ্বদ্‌বর্গ একদা যে রসতত্ত্ব লইয়া গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং নানা মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, বর্তমানে তাহারই আবিষ্কার এবং বিদেশী কাব্যশাস্ত্র অথবা সৌন্দর্যশাস্ত্র ও রসাস্বাদের নূতনতর আদর্শ ও নূতনতর রুচি—এই সমস্ত বিষয়ের সাহায্যে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিবেচনার দিকে একটি বিশেষ আকর্ষণ দেখা দিয়াছে। এই প্রবণতার সার্থক ফলশ্রুতির উল্লেখ করিতে গেলে বর্তমান এই গ্রন্থ 'রস-সিদ্ধান্ত'-এর নাম করিতে হয়।

'রস-সিদ্ধান্ত' সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কৃত অলংকার বিষয়ক একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রখ্যাত সমীক্ষক ডঃ নগেন্দ্র রচিত এই গ্রন্থে তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সারস্বত সাধনার মহান ফলশ্রুতি অভিব্যঞ্জিত। এই গ্রন্থে একদিকে অলঙ্কার শাস্ত্রের সাম্প্রতিক অনুশীলনের সার্থক ফলশ্রুতির চিত্রটি সুচারুরূপে পরিস্ফুট ও অপর দিকে লেখকের সুগভীর পাণ্ডিত্য, মৌলিক সিদ্ধান্ত বিবেচন এবং রস-মীমাংসার ক্ষেত্রে নূতন পথের নির্দেশ প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থে চিরন্তন সাহিত্যজিজ্ঞাসাগুলিকে আধুনিক মানসচৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া লেখক সুগভীর মনীষার পরিচয় দিয়াছেন।

'রস-সিদ্ধান্ত' ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভাষা তত্ত্ববেত্তার দৃষ্টিতে রস শব্দের নানা অর্থের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া লেখক কাব্যরসের অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত অর্থের উদ্ভব ও বিকাশের উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের অনুসারে রসের শাস্ত্রীয় অর্থের বিকাশ ভরত মুনি প্রণীত নাট্য-শাস্ত্রের অনেক কাল পূর্বে হইয়া গিয়াছিল। এই শাস্ত্রীয় অর্থের ব্যাখ্যার পূর্বে এই গ্রন্থে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রস-সম্প্রদায়ের ধারা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা নিবদ্ধ হইয়াছে ও ইহা বলা হইয়াছে যে, কাব্যশাস্ত্র ভারতীয় সৌন্দর্য-দর্শনের ভিত্তি, যাহার উপর সৌন্দর্যানুভূতির দুই যোজক তত্ত্বের স্থাপনা হইয়াছে। একটি প্রীতি অর্থাৎ আনন্দ ও অপরটি বিস্ময়। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের রস ও অলঙ্কার প্রস্থান ক্রমশঃ প্রীতি ও বিস্ময়েরই শাস্ত্রীয় বিকাশ। এই দুই প্রস্থানের মধ্যে রস প্রস্থান কালক্রমে, প্রভাব ও প্রসারের দিক দিয়া সর্বাধিক মহত্বপূর্ণ ও ইহাকেই ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের আধারশিলা বলা যাইতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ নগেন্দ্র কাব্যরসের তিনটি শাস্ত্রীয় অর্থ প্রকট করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই তিনটি অর্থ প্রকাশ করিয়া লেখক মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে কাব্যপাঠ ও অভিনয় দর্শন হইতে উদ্ভূত আস্বাদ্যমান চিত্তবৃত্তির আনন্দময় অনুভূতিকেই আলঙ্কারিক ভাষায় রস বলে। লেখকের অনুসারে ইহা রসের বিষয়ীগত (subjective) অর্থ। ইহা ছাড়া কাব্যরসের আরও দুইটি অর্থ আছে। একটি বিষয়গত (objective) অর্থ, যাহার অনুসারে রস ভাবাশ্রিত কাব্য সৌন্দর্য ও অন্যটি আনন্দপরক অর্থ যেখানে ইহা বলা হইয়াছে যে, কাব্যপাঠ হইতে উদ্বুদ্ধ—ব্যক্তি—সংসর্গ হইতে মুক্ত-বিশুদ্ধ ভাবের মাধ্যমে আত্মা বিশ্রান্তিময়ী বা আনন্দময়ী চেতনার নামই রস। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, চিত্তের সমীকৃত অবস্থার আস্বাদের নাম রস। এই তিনটি অর্থ হইতে দুইটি তথ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—এক, কাব্যরসে ভাবতত্ত্বের প্রাধান্য অনিবার্য। দ্বিতীয়তঃ, কলা-তত্ত্বের বা শব্দ অর্থের কল্পনাত্মক প্রয়োগের মহত্ত্বও কম নয়। কলা অথবা কল্পনা তত্ত্বের অভাবে ভাবের রসরূপে পরিণতি সম্ভবপর হয় না। এই প্রসঙ্গে আমাদের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে এই পরিণতি তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন কবি প্রজ্ঞা অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব কবিগত কল্পনার দ্বারা ভাবের পুনঃসৃজন করিতে সমর্থ হয়। অতএব কাব্যরসে কেবল ভাবেরই প্রাধান্য, ইহা ডঃ নগেন্দ্রের মতে ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পুনরায় এই অধ্যায়ে লেখক রসস্বরূপের আলোচনা করিয়াছেন ও আস্বাদ্যমান রস সম্বন্ধে নিজস্ব মৌলিক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আত্ম-সাক্ষাৎকার রূপ আনন্দময় কাব্যাস্বাদকে লেখক রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই আনন্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গ্রন্থকার হিন্দী, বাংলা ও বিদেশী মনীষীদের নানা মন্তব্যের বিস্তৃত বিবেচনা করিয়াছেন ও অবশেষে ইহা বলিয়াছেন যে, রসানুভূতি অথবা রসানন্দ সংবেদন ছাড়া আর কিছুই না, কিন্তু এই সংবেদন স্থূল ও প্রত্যক্ষ না হইয়া সূক্ষ্ম ও প্রতিবিম্বময় হয়। কিন্তু আবার এই সংবেদনে বৌদ্ধিক সংবেদনের অতি-সূক্ষ্মতাও থাকে না বরং স্থূল ও সূক্ষ্ম সংবেদনের মধ্যবর্তী হইয়া স্মৃতির কল্পনাত্মক অনুভবরূপে আনন্দের কারণ হয়।

এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে রসকে আনন্দময় সংবেদনরূপে স্বীকার করিয়া লইলেও মনে একটা সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, অপরের দুঃখের বর্ণনা বা অভিনয় কি প্রকারে আনন্দদায়ক হইতে পারে। করুণ রসের আস্বাদ সম্বন্ধে ডঃ নগেন্দ্র আলোচনা করিয়া রসের সম্পূর্ণ ও নিখুঁত পরিচয়টি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। রস সর্বাবস্থাতেই আনন্দময় এবং লেখকের মতে করুণ রসের আস্বাদও আনন্দদায়ক। তাঁহার মূল কথাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) কাব্যের শোক প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় না হইয়া কল্পনাত্মক অনুভাবের বিষয়। অতএব শোকের অভিভূতি কল্পনার প্রভাবে কমিয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

(খ) আস্বাদনকালে কাব্যের শোক ব্যক্তিগত না থাকিয়া সাধারণীকৃত হইয়া যায় এবং সেইজন্য পরিপূর্ণ রসচর্বনাকালে মমত্বজনিত কুণ্ঠা ও নিরাশা হইতে মুক্ত

সহৃদয়চিত্তে এমন একটি তন্ময়ীভাব আসে যে, তাহার ফলে তাহার চিত্ত বিমল হইয়া পড়ে এবং তিনি লৌকিক জীবন ও জগতের সমস্ত সম্পর্কজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া বৈশদ্যময় চিত্তের আস্বাদ করিতে করিতে বিভোর হইয়া যান।

(গ) করুণ কাব্যে করুণা প্রায় মহান্ ব্যক্তিদের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং তাহাদের গৌরব-চরিত্র তাহাদের ব্যক্তিগত দুঃখের জ্বালা নষ্ট করিয়া সহৃদয়কে গহনতর জীবন সত্যের সহিত পরিচয় করায়। সেই পরিচয় করুণার দুঃখকে নষ্ট করিয়া দেয়।

(ঘ) অবশেষে, ভাব (content) ও রচনারীতির (form) সাযুজ্যগত একতা করুণা প্রভৃতি নানা বিবিধ ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত করে। এই কলাত্মক ঐক্যের দরুণ কাব্যপাঠজনিত আমাদের সংবেদন আনন্দদায়ক হইয়া যায়।

করুণ রসের আস্বাদ সম্বন্ধে এই মতামত নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে ডঃ নগেন্দ্র নাট্যশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ রসসূত্র— "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ রসনিষ্পত্তি"র সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারদের মতবাদের উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাব্য অধ্যয়ন করিয়া ও নাটক দেখিয়া সহৃদয় যে রসের আস্বাদ করেন তাহার মূল স্থিতি তাহার হৃদয়ে অর্থাৎ রস আত্মানন্দরূপ যদ্যপি ইহার আস্বাদ তখনই সম্ভব যখন কবি নিজ অনুভূতিকে সহৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য স্বয়ং নিজ অনুভূতির আস্বাদ করিয়াছেন। নাটকে নট-নটী প্রসঙ্গেও এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে। অতএব রচনাকালে কবি এবং অভিনয়ের সময় নট (যদিও তাহার সত্তা অত্যন্ত গৌণ) আপন হৃদয়স্থিত রসের আস্বাদন করেন এবং তাহাদের এই রসাস্বাদন সহৃদয়ের হৃদয়ে বাসনারূপে স্থিত স্থায়ী ভাবকে জাগৃত করিয়া রস দশায় পরিণত করিতে অনিবার্যরূপে সাহায্য প্রদান করে। কাব্যশিল্পের যে ক্রিয়া এই রস অথবা আনন্দের সৃষ্টি করে আলংকারিকগণ তাহার নাম দিয়াছেন ব্যঞ্জনা। এই ব্যাপারের বলে সহৃদয়রূপে কবি, নট-নটী ও সহৃদয় স্বয়ং রজস্তমোরিক্ত হইয়া সত্ত্বগুণযুক্ত, স্বচ্ছ ও বিশদ চিত্তে পরিপূর্ণ আত্মচৈতন্যময় রসের আস্বাদ করেন। অতএব সহৃদয় চিত্তগত স্থায়ী ভাবকে ব্যঞ্জনা শক্তি আস্বাদনীয় আনন্দময় আত্মচৈতন্যরূপে প্রকাশিত করে এবং এই কারণে ডঃ নগেন্দ্র অভিনব গুপ্তের মতকে স্বীকার করিয়া সংযোগের অর্থ করিয়াছেন ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ ও রসকে সহৃদয়নিষ্ঠ মানিয়া অভিব্যক্তিকে নিষ্পত্তির অর্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যদিও এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে রসের অভিব্যক্তি হয় কি সঞ্চার (communication) হয়। উত্তরে লেখক বলেন যে, রসের অভিব্যক্তি হয়, সঞ্চার হয় না কারণ কবি, সহৃদয় প্রত্যেকে নিজস্ব আনন্দময়ী অনুভূতির আস্বাদ গ্রহণ করেন। অভিনব গুপ্তের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিলেও লেখক এই সিদ্ধান্তের দুর্বলতা প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন নাই।

পুনরায় এই অধ্যায়ে রস-নিষ্পত্তির মূল প্রসঙ্গ সাধারণীকরণের আলোচনায় লেখক মৌলিকরূপে নিজস্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণীকরণের ফলে কাব্যবর্ণিত ব্যক্তি ও ঘটনাপুঞ্জের সহিত সহৃদয় তাদাত্ম্য করিতে সমর্থ হন। লেখক প্রাচীন

ও নবীন ভারতীয় মনীষীদের মতবাদের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়া শেষে ইহা বলিয়াছেন যে, কবির নিজস্ব অনুভূতির সাধারণীকরণ হয় অর্থাৎ কবি যখন নিজস্ব অনুভূতির অভিব্যক্তি করিয়া সকলের হৃদয়ে সমান অনুভূতি জাগাইতে পারেন তখন আমরা বলি কবিচিত্তে সাধারণীকরণের শক্তি বিদ্যমান। এইরূপে কবি অনুভূতির সহিত সহৃদয়ের সাধারণীকরণ হয় অর্থাৎ সমস্ত স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব সাধারণীকৃত হইয়া সকল সহৃদয়ের নিকট উপভোগযোগ্য হইয়া উঠে। কিন্তু সব সময় কবি অনুভূতির সহিত সহৃদয়ের সাধারণীকরণ সম্ভবপর হয় না। তাহার কারণ সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তের দুইটি উপবন্ধ আছে।

প্রথম, ভাষার ভাবময় প্রয়োগকরণে যদি কবি অসমর্থ হন তাহা হইলে সাধারণীকরণ সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়, কাব্যবস্তু চিরন্তন আবেদন শক্তি হইতে বিচ্যুত হইলে অর্থাৎ যদি কবি স্বকাব্য দ্বারা মানব-সুলভ সহানুভূতি জাগাইতে সমর্থ না হন তাহা হইলে সাধারণীকরণে কবি সমর্থ হইতে পারেন না।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভাব ও রসসংখ্যার বিবেচনা হইয়াছে। ভরত-নিরূপিত আটটি স্থায়ী ও তেত্রিশটি সঞ্চারী ভাবের সহিত পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকদের ভাব-বিবেচনার তুলনা করিয়া লেখক ভাবের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। লেখকের অনুসারে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের স্থায়ী সঞ্চারীভাবের বর্গীকরণ ও সংখ্যা নির্ধারণ যেমন একদিকে শাশ্বত ও অটুট নয়, তেমন অপরদিকে নিতান্ত অমনোবৈজ্ঞানিক, অনর্গল ও স্বকপোলকল্পিতও নয়। সেই হেতু রসের সংখ্যা নির্ধারণও সম্ভবপর নয়। বলিতে গেলে রস সংখ্যার বিবেচন রসতত্ত্বের কোন মৌলিক প্রশ্ন নয়, কারণ বেশির ভাগ সংস্কৃত কাব্যবেত্তাগণ একদিকে রসের একত্ব ও অন্যদিকে রসের নানাত্বকে মানিয়া লইয়াছেন। এই নানাত্বের প্রশ্ন লইয়া লেখক পরম্পরাগত নয় রস ও শান্ত এবং বাৎসল্য ছাড়া আরও অনেক রসের বিবেচনা করিয়াছেন এবং শেষে বলিয়াছেন যে, মানব-জীবনের আধারভূত মনোবেগের সংখ্যা দশ কিম্বা একাদশ এবং ইহারাই রসরূপে পরিণত হইয়া যায়। এই রূপে ভরত-প্রতিপাদিত নয় রস ও শান্ত, বাৎসল্য এবং ভক্তি মিলিয়া রসের সংখ্যা একাদশ মানা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'রসের পরস্পর সম্বন্ধ', 'অঙ্গীরস', 'রস-ভঙ্গ' এবং 'রসাভাসের' বিবেচনা হইয়াছে। ভরত মুনির সময়ে পরস্পর নানারসের বিরোধ কিংবা অবিরোধের প্রশ্ন ছিল না, কারণ ভরতের দৃষ্টি বিষয়গত অথবা বস্তুনিষ্ঠ রসের উপর কেন্দ্রিত ছিল। ধ্বনিযুগে রসকে বিষয়িগত মানিয়া লওয়ার দরুণ নানারসের পরস্পর বিরোধের প্রশ্নটি উঠিল। ওই যুগে রসের কাব্যগত ও সহৃদয়গত স্থিতির সুন্দর মূল্যায়ন করা হইয়াছিল, পরিণামে কাব্য-বর্ণিত নানা রসের মধ্যে মিত্র-অমিত্রের কল্পনা কারও নিতান্ত অযৌক্তিক মনে হয় নাই। ইহার দ্বারা কাব্য-নির্মিত-প্রক্রিয়া ও কাব্যাস্বাদ প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট বিবেচন সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কৃত আচার্যরা এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে অঙ্গীরস, রসবিঘ্ন রসাভাসের বিবেচন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শেক্সপীয়রের নাটকেও হাস্য, করুণ ও শৃঙ্গারের যুগপৎ বিবক্ষা রসাস্বাদনে বাধক কেন হয় না ইহার উত্তর ডঃ নগেন্দ্রের মতে সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রের রস-পরিহার প্রসঙ্গে বিবেচিত 'বাধ্যত্বেন কথনম্' প্রভৃতি মীমাংসায় পাওয়া যায়। রস-বিঘ্ন বিবেচনা প্রসঙ্গে কবি এবং সহৃদয়ের দৃষ্টিতে ইহার পৃথক-পৃথক নির্ধারণ উপস্থিত করিয়া লেখক শেষে উপযুক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাস্তব দৃষ্টিতে দুইটি কারণে রসানুভূতিতে বাধাসৃষ্টি হয়—অভিব্যক্তির বিফলতা এবং অনুভূতির বিফলতা। প্রথমটি কবির দোষ এবং অন্যটি সহৃদয়ের। অতএব ব্যবহারিক দৃষ্টিতে রস-বিঘ্নের বিষয়গত এবং বিষয়ীগত—দুই দৃষ্টিতে সমীক্ষা হওয়া উচিত। রসাভাস সম্বন্ধে লেখক একটি অত্যন্ত চমৎকার কথা বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি আর নীতির দ্বন্দ্ব হইতে জীবনের বিকাশ হয়—প্রকৃতি নীতির নিকট হইতে সংযম এবং নীতি প্রকৃতির নিকট হইতে সংগতি লাভ করে। ভারতীয় রস-সিদ্ধান্ত এই দুইয়ের সমন্বয়কে স্বীকার করিয়া চলে এবং ইহাদের বিরোধকে কাব্যাস্বাদে বাধা হিসাবে গ্রহণ করে।

এইরূপে রসতত্ত্বের সর্বাঙ্গীণ বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার রস-সিদ্ধান্তের শক্তি ও সীমার অত্যন্ত বিস্তৃত সমীক্ষা করিয়াছেন। প্রথমে অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি, বক্রোক্তি প্রত্যেকটি কাব্য-প্রস্থানের সহিত রস-প্রস্থানের তুলনা করিয়া রসের শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ করা হইয়াছে। তদনন্তর, পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রে প্রচলিত ক্লাসিসিজিম্, রোমান্টিসিজম্, আদর্শবাদ, বাস্তববাদ প্রভৃতি বস্তুপ্রধান এবং এক্সপ্রেশানিজিম্, ইম্প্রেশনিজিম্ প্রভৃতি রূপ প্রধান-মতবাদগুলির সহিত সাম্য ও বৈষম্যমূলক গভীর আলোচনা করা হইয়াছে এবং ইহা বলা হইয়াছে যে কাব্যবস্তু ও রচনারীতির তাত্ত্বিক আলোচনায় ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্র হইতে কোন প্রকারেই হীন বা অনুপাদেয় নয় বরং তুলনামূলক দৃষ্টিতে অধিক গহণ, গভীর ও উদাত্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। রস-সিদ্ধান্ত এই গৌরবের মূল কারণ। পরিশেষে লেখক মনোবৈজ্ঞানিক, শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক তথ্যরাশির সাহায্যে রস-সিদ্ধান্তের অযৌক্তিক দোষগুলির ন্যায়সঙ্গতভাবে নিরাকরণ করিয়াছেন ও উহাকে বিশাল মানবতার চিরন্তন ভাবভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে যতদিন পর্যন্ত মানব-জীবনে মানবতা অপেক্ষা মহত্তর সত্যের এবং সাহিত্যে মানব-সংবেদনার অপেক্ষা রমণীয় সত্যের উদ্ভাবনা না হয়, ততদিন পর্যন্ত রস-সিদ্ধান্তের অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক, প্রভাবযুক্ত ও মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কল্পনাই সম্ভবপর হইবে না। এইরূপে 'রস-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থ দ্বারা ডঃ নগেন্দ্র সুচিন্তিত, অভিনব এবং নবীন বিচারপদ্ধতির উপস্থাপনা করিয়া রস-মীমাংসার ক্ষেত্রে নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছেন ও ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি ও উহাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ অনুবাদ কালে সর্বাধিক বড় সমস্যা ছিল বিষয়ের গভীরতা ও ডঃ নগেন্দ্রের তত্ত্বাভিনিবেশী প্রতিভা, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষাকে বাংলায় সহজ ও সরলভাবে রূপান্তরিত করা ও মূল গ্রন্থের ভাবধারাটিকে বাংলা ভাষার নিজস্ব

প্রয়োগের আশ্রয়ে সাজাইয়া দুই কূল রক্ষা করা। এই ব্যাপারে অধ্যাপক ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও ভাষার দোষ-ত্রুটির আলোচনা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়া আমার প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি ও সৌহার্দ্দের পরিচয় দিয়াছেন ও আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমার পিতৃদেব দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী গ্রন্থ অনুবাদ কালে রস বিষয়ক নানা গূঢ় বিষয়ের আলোচনা করিয়া বিষয়ের অনুকূল অনুবাদের ভাষা যোগাইতে সাহায্য করিয়াছেন। ডঃ নগেন্দ্র তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতির বঙ্গানুবাদের জন্য সম্মতি প্রদান করিয়া আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন। সর্বশেষে, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারতী ভবন, পাটনার ব্যবস্থাপক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত মোহিত মোহন বসু মহাশয় আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

হিন্দী হইতে বাংলায় এই ধরণের নিগূঢ় বিষয়-যুক্ত গ্রন্থের অনুবাদে যে অসুবিধা আছে—তাহা স্মরণ করিয়াও আমি এই দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। ইহার দোষ-ত্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ভবিষ্যতে তাহা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিবার ও সংশোধন করিবার সুযোগ পাইব।

গ্রন্থকারের নিবেদন

মূল যোজনা অনুসারে 'রস-সিদ্ধান্ত' 'ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ, যাহা দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রকাশনের প্রায় নয় বৎসর পরে প্রকাশিত হইতেছে। নানা কারণবশতঃ ইহাকে আমি আমার সাহিত্য-সাধনার পরিণতি বলিয়া স্বীকার করি। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কাব্যের মনন ও চিন্তনের ফলে আমার মনে যে সকল অন্তঃসংস্কার প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার সংহতি রস-সিদ্ধান্তেই সম্ভবপর ছিল। অতএব রস-সিদ্ধান্তের উপলব্ধি আমি মুখ্যত 'সাধুকাব্য-নিষেবণ'এর দ্বারাই করিয়াছি—শাস্ত্রের অনুচিন্তনের দ্বারা উহার মাত্র পুষ্টি হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যখন সমাপ্তপ্রায় তখন আমি অনুভব করিলাম যে এবার শাস্ত্র-চর্চা ছাড়িয়া আধুনিক কাব্যের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং এইরূপে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া যাওয়া উচিত যেখান হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের কার্যসূচি প্রস্তুত করিবার সময় স্বভাবতই এই কথা মনে হইল যে বর্তমান কাব্য-সৃজনের উপযুক্ত আধার-তত্ত্বগুলির—যথা চিত্রকল্প প্রতীক যোজনা, প্রভাব-ছবি প্রভৃতির যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য ভারতীয় অলঙ্কার সিদ্ধান্তের অনুস্থাপনা বোধ হয় উপাদেয় হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের প্রয়াস করিলে ঐতিহ্য নবজীবন এবং প্রয়োগ স্থির আধার-ভিত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে—আর একবার উক্ত গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার লোভ উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্ত্রের সাধনভূমি নিশ্চিত খুবই কঠিন, কিন্তু এখন মন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে—এখানে শ্রমও সুখদায়ক।

নগেন্দ্র

অনুক্রমণিকা

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

■ ■ ■

প্রথম অধ্যায়

(ক) রস শব্দের অর্থ-বিকাশ

(খ) রস-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত

(ক) রস শব্দের অর্থ-বিকাশ

ভারতীয় সৌন্দর্য্য-কল্পনা

ভারতীয় সৌন্দর্য-দর্শনের মূল আধার কাব্যশাস্ত্র। যদিও দর্শনশাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া আনন্দবাদী আগমশাস্ত্র গ্রন্থে, আত্ম-তত্ত্ব বিশ্লেষণের অন্তর্গত সৌন্দর্যানুভূতির বিষয়ে প্রচুর উল্লেখ আছে, তবুও সৌন্দর্যের আস্বাদ ও স্বরূপের সম্যক্ আলোচনা কাব্যশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য-চেতনা একটি মিশ্র মানসক্রিয়া। ইহার যোজক তত্ত্ব দুইটি। প্রথম, প্রীতি অর্থাৎ আনন্দ এবং দ্বিতীয়, বিস্ময়। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র এই চেতনা ও তত্ত্বের সহিত প্রথম হইতেই পরিচিত। ইহার দুইটি প্রতিনিধি সিদ্ধান্ত রস ও অলঙ্কার ক্রমশঃ প্রীতি এবং বিস্ময়েরই শাস্ত্রীয় বিকাশ। সৌন্দর্যের আস্বাদে যে প্রীতি তত্ত্বের প্রাধান্য নিহিত আছে তাহা রস-সিদ্ধান্তে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হইয়াছে, এবং অন্যদিকে বিস্ময়তত্ত্বের প্রাধান্য বক্রোক্তি এবং অতিশয়োক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে অলঙ্কারবাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই দুইটির মধ্যে রস সিদ্ধান্ত কেবল কালক্রমের দিক দিয়াই নহে, প্রভাব ও প্রসারের দিক দিয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে রসই ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ।

রস শব্দের অর্থ-বিকাশ

রস ভারতীয় বাঙ্ময়ের একটি প্রাচীনতম শব্দ। সামান্য ব্যবহারে ইহার প্রয়োগ চারিটি অর্থে হয়: (১) পদার্থের রস—অম্ল, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি, (২) আয়ুর্বেদের রস, (৩) সাহিত্য-রস, এবং ইহারই সমগোত্রীয় (৪) মোক্ষ অথবা ভক্তি রস। প্রাকৃতিক অথবা পার্থিব রস বলিতে আমরা বুঝি পদার্থ অর্থাৎ বনস্পতি প্রভৃতিকে নিষ্পেষিত করিয়া বাহির করা তরল বস্তু, যাহার কোন-না-কোনও আস্বাদ থাকে। এই প্রসঙ্গে রসের প্রয়োগ পদার্থ সার এবং আস্বাদ দুই অর্থে হয়। পদার্থের সারও (অথবা সার-ভূত তরল বস্তুও) রস এবং তাহার আস্বাদও রস। পরবর্তীকালে এই দুইটি অর্থ স্বতন্ত্ররূপে বিকাশ লাভ করে। আয়ুর্বেদে রসের অর্থ হইতেছে পারদ—ইহা প্রাকৃতিক রসেরই অর্থ-বিকাশ। ইহাতে পদার্থ-সারের অর্থ উদ্দিষ্ট তো আছেই, কিন্তু উহাতে আস্বাদের নহে বরং গুণের (শক্তি) অর্থই অভিপ্রেত হয়। পদার্থ রস যেখানে আস্বাদ-প্রধান, আয়ুর্বেদের রস সেখানে শক্তি-প্রধান। আয়ুর্বেদে রসের আরও একটি অর্থ আছে, দেহের ধাতু—অর্থাৎ শরীরের অন্তর্ভূত গ্রন্থিসমূহ হইতে নিঃসৃত রস যাহার উপর

শরীরের বিকাশ নির্ভর করে। এখানেও শক্তি (গুণ) অর্থেরই প্রাধান্য বিদ্যমান। তৃতীয় প্রয়োগটি হইতেছে, সাহিত্য রস, যেখানে রসের অর্থ (অ) কাব্য-সৌন্দর্য, অথবা (আ) কাব্যাস্বাদ—এবং কাব্যানন্দও। মোক্ষ রস অথবা আত্ম-রস ব্রহ্মানন্দ অথবা আত্মানন্দের সূচক, ভক্তি রসের অর্থও, সিদ্ধান্ততঃ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ ইহাই। রসের উল্লিখিত এই সব অর্থে আস্বাদের অন্তর্ভাব স্পষ্টতঃ বিদ্যমান যদিও গ্রহণ করার মাধ্যম বিভিন্ন। কাহারও জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা অথবা সূক্ষ্মেন্দ্রিয় মন, মস্তিষ্ক অথবা আত্মা। দ্রবত্ব এবং সার অথবা প্রাণতত্ত্বেরও অন্তর্নিবেশ প্রায় কোনও-না-কোনও রূপে সর্বত্র প্রাপ্ত হয়।

রস শব্দের প্রথম অর্থটি—অর্থাৎ পদার্থের সারভূত তরল বস্তু—বেদে স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। বৈদিক যুগে বনস্পতি হইতে বাহির করা রসের প্রচুর প্রয়োগ হইত। মানব সভ্যতার সেই আদি যুগে ইহা স্বাভাবিকই ছিল, যথা—

মহে যৎপিত্র ঈ রসং দিবে করবৎসরৎ....।

—ঋগ্. ১.৭১.৫

—যেই সময় যজমান মহান্ ও পালক দেবতাকে হব্যরূপে রস প্রদান করে। ইহা ব্যতীত দুগ্ধ ও জল অর্থেও রস শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়, যথা—

যো নো রসং দিপ্সতি পিত্বো অগ্নে যো অশ্বানাং
যো গবাং যস্তনূনাম্।

—ঋগ্. ৭.১০৪.১০

—হে অগ্নি! যে আমাদের অন্নের সার বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা প্রকট করে এবং যে অশ্ব, গাভী এবং সন্তানের সারতত্ত্বকে নষ্ট করিবার ইচ্ছা প্রকট করে·····।

কিন্তু এগুলির অপেক্ষা অধিক মহত্ত্বপূর্ণ হইতেছে, সোমরসের অর্থে রসের প্রয়োগ। ঋগ্বেদে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিতভাবে সোমরসের স্তবগান করা হইয়াছে। যথা—

তং গোভির্বৃষণং রসং মদায় দেববীতয়ে।
সুতং ভরায় সং সৃজ।

—ঋগ্. ৯.৬.৬

—দেবতাদের প্রসন্ন করিবার জন্য মথিত ও অভীষ্টবর্ষক সোমরসের সহিত গব্য মিশ্রিত কর।

সোমো অর্বতি ধর্ণসির্দধান ইন্দ্রিয়ং রসম্।
সুবীরো অভিশস্তিপাঃ।

ঋগ্. ৯.২৩.৫

—সংসারকে যে ধারণ করে সেই সোম ইন্দ্রিয়পোষক রসকে ধারণ করিয়া উত্তম বীরত্ব এবং হিংসা হইতে রক্ষা পায়।

এই সব প্রয়োগ হইতে ইহা স্পষ্ট হয় যে রসের মূল অর্থ সম্ভবতঃ দ্রবরূপী বনস্পতি সারই ছিল। এই তরল বস্তু নিশ্চয়ই আস্বাদ-বিশিষ্ট হইত। অতএব আস্বাদের অর্থ রূপেই রসের অর্থ বিকাশ স্বভাবতঃই ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত আমরা সহজেই গ্রহণ

করিতে পারি। আর্যদের নিকট সোম নামক ঔষধির রস আস্বাদ ও গুণের জন্য বিশেষ প্রিয় ছিল, অতএব সোমরসের অর্থে রসের প্রয়োগ হওয়াতে রস আরও বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইল। সোমরসের আস্বাদ ছিল অপূর্ব, কারণ তাহাতে সেই সব গুণ বিদ্যমান ছিল যাহা শরীর আর মনে স্ফূর্তি, শক্তি ও উন্মাদনা সঞ্চার করিত আর উহা পান করিলে শরীরে একটি বিচিত্র আহ্লাদ সঞ্চারিত হইত। অতএব সোমরসের সংসর্গে আসিয়া রস ক্রমশঃ শক্তি, উন্মাদনা এবং সর্বশেষে আহ্লাদরূপে বিকশিত হইল। এই আহ্লাদ শব্দের অর্থটিও ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া অবশেষে জীবনের আহ্লাদ হইতে আত্মার আহ্লাদরূপে পরিণতি লাভ করিল। বৈদিক কালেই ইহা আত্মানন্দের বাচক হইয়া যায়, অথর্ববেদে এই অর্থ বিকাশের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ংভূ রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চ নোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোরাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্।

—অথর্ব. ১০.৫.৪৪

—অকাম, ধীর, অমৃত স্বয়ংভূ ব্রহ্ম স্বরসে আপনি তৃপ্ত থাকেন। তিনি কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন, সেই ধীর অজর সদা-তরুণ আত্মাকে যিনি জানেন তিনি মৃত্যু হইতে ত্রস্ত হন না।

ইহার পরে উপনিষৎ কালের সূচনা। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উপনিষৎ কালকে বেদান্ত-কাল অথবা বৈদিককালের শেষ চরণও বলা হয়। বেদে যেখানে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—আত্ম-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-তত্ত্ব, তথা অনুভূতি এবং তর্কের প্রাধান্য, উপনিষদের প্রবৃত্তি সেখানে একান্ত অন্তর্মুখী। অতএব স্বাভাবিকভাবেই এই যুগে রসের অর্থেও সূক্ষ্মতত্ত্বের সমাবেশ ঘটে। উপনিষদে রসের প্রয়োগ দ্রব্যের অর্থে ততখানি হয় নাই যতখানি দ্রব্যের পোষক শক্তি ও আস্বাদ-দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উর্জা ও আহ্লাদের অর্থ-রূপে হইয়াছে। এই সম্বন্ধে অনেক উদাহরণও পাওয়া যায়। যথা—

ঔষধীভ্যোহন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ
স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২.১ (ক)

—ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য আর বীর্য হইতে পুরুষ অর্থাৎ শরীরের সৃষ্টি।

এই স্থানে রসের অর্থ কেবল দ্রব্য নয়, বরং দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত দেহ ধাতু ও শক্তি প্রভৃতি অর্থেও ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ এই স্থলে প্রাকৃতিক রসের অপেক্ষা আয়ুর্বেদীয় রসের (দেহগত) বিবক্ষাই অধিক। দ্রব্য এবং দ্রব্যঘটিত উর্জা প্রভৃতি হইতে সূক্ষ্মতর প্রয়োগও—তন্মাত্রা অর্থে পাওয়া যায়: এই প্রয়োগও বৈদিক। উপনিষদে ইহার স্পষ্ট ব্যবহার আছে:

যেন রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে, এতদ্বৈতৎ॥

—কঠ. ৪.৩

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং মৈথুনের জ্ঞান (অথবা অনুভব), সেই আত্মার জন্যই হয়। যদি সে না থাকে? তবে (আর) কিছু কি অবশেষ থাকে?

বাহ্য-দৃষ্টিতে রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়ের নাম রস, এবং তত্ত্ব-দৃষ্টিতে এই রস তন্মাত্রা-রূপী। এই স্থান হইতেই এই শব্দ, গুণ, দ্রব্য প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া সাংখ্য, বৈশেষিকাদি দর্শনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এই সমস্ত শাস্ত্রে ইহার সূক্ষ্ম ও গহন বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। আত্মার ভৌতিক অভিব্যক্তিতেই তন্মাত্রাগুলি প্রকাশ লাভ করে: শান্ত আত্মা এই সব হইতে মুক্ত হইয়া যায়:

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধ—
বচ্চ যৎ। —কঠ. ৩.১৫

কিন্তু ভৌতিক অর্থে সেই পরমতত্ত্ব অ-রস, পারমার্থিক অর্থে উহা সর্বরস:

মনোময়ঃ প্রাণ শরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প
আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধ সর্বরসঃ....

—ছান্দোগ্য. ৩.২

সেই ব্রহ্ম জ্যোতি মনোময়, প্রাণ শরীর যুক্ত, প্রকাশরূপী, সত্যসঙ্কল্পময়, ও আকাশ তাঁহার আত্মা। তিনি সর্বকর্ম-সমর্থ, পূর্ণকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরসযুক্ত....।

রসের অর্থ-বিকাশ প্রসঙ্গে উল্লিখিত উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ের (অথবা এইরূপ অন্য-গুলিরও) বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই স্থলে রসের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অর্থের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে, অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে রস ভৌতিক অর্থের সীমানা পার হইয়া আধ্যাত্মিক অর্থের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে। সেই পরমতত্ত্ব অ-রসও এবং সর্ব রসও। 'অ-রসে' রসের ভৌতিক অর্থই অন্তর্লীন আছে, আর 'সর্বরসে' আছে আধ্যাত্মিক অর্থ। কারণ ভৌতিক অর্থে তাহা রস হইতে হীন এবং আধ্যাত্মিক অর্থে তাহা রসময় হইতে পারে। লক্ষণা শক্তির দ্বারা এইরূপ অর্থান্তর সংক্রমণ সহজেই সিদ্ধ হইয়া যায়। রসের এই আধ্যাত্মিক অর্থ উপনিষদের নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ শ্লোকে আরও স্পষ্ট:

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২.৭

—উহা রস-রূপী। এই কারণে রসকে পাইয়া বা কোন স্থান হইতে লাভ করিয়া, মানব আনন্দমগ্ন হইয়া যায়।

রস শব্দের অর্থ-বিকাশের এই ধারা এখানে আসিয়া একটি লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইতে সমর্থ হয়। উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে রসের কোন সম্পূর্ণ নূতন অর্থের উদ্ভাবনা হয় নাই। একই অর্থ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে। রসের মূল অর্থ ছিল অম্লরস—বনস্পতির রস অর্থাৎ 'দ্রব্য' রূপী রস। 'দ্রব্য' হইতে তাহা ক্রমশঃ দ্রব্যের 'আস্বাদের' সূচক হইয়া যায়, তারপর বিশিষ্ট আস্বাদযুক্ত সোমরসের অর্থে পরিণত হয়। সোমরসে আস্বাদ ভিন্ন অন্য গুণেরও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল—উর্জা, স্ফূর্তি, মত্ততা প্রভৃতি। অতএব রসের পরিধিতে,

ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসারে, আস্বাদ ভিন্ন উর্জা ও তন্ময়তা প্রভৃতি গুণেরও সমাবেশ হয়। সামান্য অন্নরস কেবলমাত্র আস্বাদ বিশিষ্টই ছিল, অপর দিকে সোমরসে আস্বাদ ভিন্ন একটি বিশেষ প্রকারের তন্ময়তা এবং আহ্লাদও পাওয়া যাইত। অর্থাৎ সোমরসের আস্বাদে প্রকারান্তরে মানসিক তত্ত্বের বিশেষরূপে সমাবেশ হইয়া গিয়াছিল। বিচার-তর্কের ক্ষেত্রে আস্বাদই 'রস'। এই রসই তন্মাত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ব্রহ্মরস অথবা আত্মরস রূপে পরিণত হইয়া যায়। এই প্রকার রসের অর্থ অন্নরস অথবা পদার্থ-রস হইতে ব্রহ্মরস পর্যন্ত সমস্ত কিছুই বৈদিক সাহিত্যের পরিধির মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে :

রসো গন্ধরসে স্বাদে তিক্তাদৌ বিষরাগয়োঃ
শৃঙ্গারাদ্রৌ দ্রবে বীর্যে দেহধাত্বম্বুপারদে।

—বিশ্বকোষ

রসের উল্লিখিত অর্থগুলির মধ্যে 'শৃঙ্গারাদ্রৌ' অর্থাৎ 'কাব্যরস' ভিন্ন প্রায় অপর সকল অর্থের উদ্ভাবনা সেই যুগে হইয়াছিল (প্রায় বলিতে পারদ প্রভৃতি রসের পরবর্তী অর্থগুলিকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে যদিও পারদরূপে রসের প্রয়োগ দেহ-ধাতু প্রভৃতি অর্থেরই বিকাশমাত্র)। কাব্যরসের শাস্ত্রীয় অর্থে রসের স্পষ্ট প্রয়োগ বৈদিক বাঙ্ময়তে পাওয়া যায় না। ডঃ শঙ্করণের ইহাই মত দ্রষ্টব্য—দি থিয়োরীজ্ অব রস এণ্ড ধ্বনি—সাম আস্পেক্টস্ অব সং. অলং. পৃ. ৫)। আমরাও বিচার বিবেচনা করিয়া অন্ততঃপক্ষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। কিন্তু ঋগ্বেদেরই নানা মন্ত্রে এই সঙ্কেত পাওয়া যায় যে অলক্ষ্যরূপে লক্ষণা ঋষিদের চিরবন্দিতা 'বাক্' শক্তির জন্যও রসের অর্থ প্রসার করিতে লাগিয়াছিল। বাণীর জন্য 'পিব্' ধাতু এবং 'স্বাদু', 'মধু' প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ ইহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। স্বয়ং ডঃ শঙ্করণ কর্তৃক উদ্ধৃত ঋগ্বেদের কয়েকটি শ্লোক আমাদের মন্তব্যটিকে বিশেষভাবে সমর্থন করে :

পিবত্বস্য গির্বণঃ। —ঋগ্. ৮.১.২৬

হে গীত-রসিক দেব! তুমি এই গীত-রস পান করো।

বচঃ স্বাদো স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্।

—ঋগ্. ১.১১৪ ৬

রুদ্রকে প্রসন্ন করিবার জন্য সাধু অপেক্ষা সাধু বচন (গান)..

মধ্ব উষু মধুযুবা রুদ্রা সিষক্তি পিপ্যুষী....

—ঋগ্. ৫.৭৩.৮

—মধুপ্রেমী রুদ্রগণ! মধুবর্ষিণী বাক্ তোমাদিগের জন্য প্রস্তুত···

বাচো মধু পৃথিবি! দেহি মহ্যম্।

—ঋগ্. ১২.১.১৬

—হে পৃথিবী! আমাকে বাণীর মধু প্রদান করো।

বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধুসন্দৃশঃ।

পূর্বার্ধ ঋগ্ ১০.২৪.৬

—এই স্থলে বাণীর জন্য কেবল 'মধুমতী' নয় বরং 'মধুসদৃশ' বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বাণীর চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিগণ সম্পূর্ণভাবে পরিচিত ছিলেন— তাঁহারা অনেক স্থলে ভাবে বিভোর হইয়া বাণীর মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলিতে প্রযুক্ত 'পিব্' ধাতু এবং স্বাদু ও মধুর প্রভৃতি বিশেষণ হইতে ইহাই স্পষ্ট হয় যে বৈদিক ঋষিগণ এই চমৎকারিতার 'মধুর পেয়রস' রূপে কল্পনা করিতেন। এবং সোমরসের প্রতি অবাধ আকর্ষণ রহিবার জন্য এই মধু-বিম্বটি বোধ হয় তাঁহাদের প্রিয়ও ছিল। আমার এই ধারণা যে প্রথমতঃ বাণীর চমৎকারিত্বের জন্য 'আস্বাদ' শব্দ এবং পরে আস্বাদ্য 'রস' শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগের বীজ সম্ভবতঃ এই স্থানেই পাওয়া যায়। ঋষিগণ বাণীর আস্বাদ গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহারা বাণীর মধুর ও স্বাদু রূপের কল্পনাও করিতেন, অর্থাৎ বাণী তাঁহাদের মধুর পেয় অথবা 'রস' রূপে কাম্য ছিল।

ডঃ শঙ্করণের গ্রন্থে উদ্ধৃত ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহ আমাদের অনুমানকে সত্যে পরিণত করিয়া দেয়:

যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্।
সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা।
......তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরম্।

—ঋগ্. ৯.৬৭. ৩১-৩২

—যে পবমান ঋক্‌রূপে ঋষিদের দ্বারা উৎপাদিত রসের অধ্যয়ন করে, সে পবিত্র এবং স্বাদু অন্নের আনন্দ লাভ করে..... ...তাহার জন্য সরস্বতী দুগ্ধাদি দোহন করেন।

এই স্থলে রসের প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ঋক্ অর্থাৎ বাণীর রসের জন্য করা হইয়াছে। এইরূপে বৈদিক কালেই রস শব্দের প্রয়োগ বাণী অথবা শব্দ এবং অর্থ রূপে সূচিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাও ব্যবহারিক প্রয়োগ মাত্র ছিল, শাস্ত্রীয় নহে।

ইহার পর রামায়ণ মহাভারতের কাল। বাল্মীকি রামায়ণ প্রচলিত সংস্করণ-গুলিতে বালকাণ্ডের চতুর্থ স্বর্গে নবরসের অত্যন্ত স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়,

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্বদ্ধং, তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥ ৮ ॥
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভিশ্চসংযুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম ॥ ৯ ॥

—রামায়ণ, নিঃ সা. প্রে.

কিন্তু বালকাণ্ডের উল্লিখিত অংশ অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কোনও প্রামাণিক সংস্করণে এই শ্লোক দৃষ্ট হয় না। ব্লুমফীল্ড ও মনিয়র ওলিয়েম্‌স সাহেবের মতানুসারে রামায়ণ ও মহাভারতে রস শব্দের অর্থে কোনও উল্লেখনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। রামায়ণে রসের প্রয়োগ জীবন-রস (অমৃত), পেয়

প্রভৃতি সাধারণ অর্থে হইয়াছে। মহাভারতেও জল, সুরা, পেয়, গন্ধ প্রভৃতির সমশব্দ-রূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, কেবল দুই-একটি প্রয়োগ কিঞ্চিৎ নূতন। যেমন, কাম ও স্নেহের অর্থে রস শব্দের প্রয়োগ। মহাভারতের কালের পরে (ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রচনা পর্য্যন্ত) সূত্রকাল উপস্থিত হয়: ইহা মূল. দর্শন-সূত্রের রচনা এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের প্রথম আবির্ভাবের যুগ। এই যুগটি বৈয়াকরণ পাণিনি এবং তাহার প্রাচীন ভাষ্যকারদের যুগ। এই যুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং বাৎসায়নের কামসূত্রের রচনা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থে রস শব্দের বিশেষ কোনও অর্থ বিকাশ হয় নাই। দর্শন সূত্রগ্রন্থে তন্মাত্রার অর্থ রূপে ও অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রব্যাদি রূপেই ইহার প্রয়োগ হইয়াছে।

শাস্ত্রীয় অর্থের আবির্ভাব—আমাদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে সহায়ক একটি গ্রন্থ এই যুগে পাওয়া যায়—কামসূত্র। বাৎসায়নের নামে প্রচলিত কামসূত্রের যে সংস্করণটি জয়মঙ্গলা টীকাসহ বর্তমানে পাওয়া যায় তাহাতে রস শব্দের ব্যবহার প্রায় রতি, কাম-শক্তি প্রভৃতি অর্থে হইয়াছে:

রসো রতি: প্রীতির্ভাবো রাগো বেগঃ সমাপ্তিরিতি
রতিপর্য্যায়ঃ।

—কামসূত্র ২. ১. ৬৫

শাস্ত্রাণাং বিষয়স্তাবদ্যাবন্মন্দরসা নরা:।

—কামসূত্র ২. ২. ৩২

এক স্থানে শাস্ত্রীয় অর্থেও রসের স্পষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়।

তদিষ্টভাবলীলানুবর্তনম্।

—কামসূত্র ৬. ২. ৩৫

এই সম্বন্ধে জয়মঙ্গলার মন্তব্য হইতেছে:

নায়কস্য শৃঙ্গারাদিষু য ইষ্টো রসো ভাবঃ
স্থায়িসঞ্চারিসাত্ত্বিকেষু, লীলাচেষ্টিতানি তেষামনুবর্তনম্।

—অর্থাৎ এই স্থলে রস এবং ভাব বলিতে শৃঙ্গারাদি রস ও স্থায়ী সঞ্চারী ভাবই বুঝায়।

উল্লিখিত সূত্র বিশেষের রচনা প্রাচীন কিনা, তাহা বাৎস্যায়নকৃত মূলসূত্রগুলির অন্যতম কিনা, ইহা বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু বাৎস্যায়নেরই যুগে অথবা উহার কাছা-কাছি সময়ে রস শব্দের শাস্ত্রীয় বিকাশ হইয়াছিল, এইরূপ অনুমানের স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ পণ্ডিতেরাই মনে করেন যে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের রচনা বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে হইয়াছিল। এই যুগটি সূত্র-কাল নামে প্রচলিত এবং খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার বিস্তার কাল। এইকালেই সূত্র রীতির পূর্ণ প্রসার হয়। কাম সূত্রের রচনা ইহার পূর্বার্ধে এবং ভরত-সূত্রের রচনা বোধ হয় ইহার উত্তরার্ধে হইয়াছিল।

ভরত-সূত্রে প্রতিপাদিত রস সিদ্ধান্ত এতই পরিপূর্ণ এবং স্বয়ং ভরত তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যদের উল্লেখ ও আনুবংশ্য শ্লোকে তাঁহাদের মন্তব্যের প্রয়োগ এতই ব্যাপকভাবে করিয়াছেন যে রসের শাস্ত্রীয় ধারাকে ভরত হইতে প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে স্বীকার করা অনিবার্য হইয়া ওঠে। এইরূপে রস শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থের আবির্ভাবকাল কামসূত্রের রচনা কালের অনুবর্তী বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়। এই দুই শতাব্দীতে শাস্ত্রীয় অর্থের এইরূপ বিকাশ হইয়াছিল যে ভরতকে অথবা ভরত নামধারী সূত্রকারকে রসের পূর্ণ বিস্তারের ব্যাপারে কোনও কষ্ট করিতে হয় নাই।

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক বিবেচনার উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে:

১. প্রারম্ভে রসের প্রয়োগ বনস্পতি হইতে নিষ্কাশিত বিভিন্ন তরল বস্তু রূপে করা হইত এবং এই সকল বস্তুর স্বীয় আস্বাদ আর গুণ বিদ্যমান ছিল।

২. 'দ্রব্যের জন্ত গুণ আর গুণের জন্য দ্রব্যবাচক শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগের' নিয়মানুসারে লক্ষণার দ্বারা আস্বাদ এবং উর্জ্জা প্রভৃতির অর্থ রূপে রসের বিকাশ হয়।

৩. সোমরসের ব্যাপক প্রচার হওয়ায় দরুণ রস শব্দের অর্থে আনন্দ, উন্মাদনা, তন্ময়তা, 'চমৎকারিতা' প্রভৃতি অর্থের সংযোজনা হয়। প্রত্যেকটি 'রস' অথবা উহার 'আস্বাদ' আনন্দপ্রদ হয় না, কিন্তু সোমরসের প্রভাবে রস আনন্দ এবং তন্ময়তা—চমৎকারিতাদির বাচক হইয়া যায়।

৪. লক্ষণার ব্যাপার ইহার পরেও চলিতে থাকে এবং রসের প্রয়োগ একদিকে বাণীর চমৎকারিতার (ঋক্ হইতে আহৃত রসাদি) জন্য হইতে থাকে এবং অন্যদিকে—

৫. ইহার অর্থ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আত্মানন্দ অথবা ব্রহ্মানন্দ রূপে প্রকাশ লাভ করে।

৬. 'বাণীর রস' কাব্যরসেরই সমানার্থক। যদিও বেদে কবি ও কাব্য শব্দেরও প্রয়োগ আছে, কিন্তু এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ বেদে বর্তমান পারিভাষিক প্রয়োগ হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। কাব্য শব্দের অপেক্ষা বাক্ শব্দটি বর্তমানে রসের যে অর্থ তাহার অনেকটা নিকটবর্তী। অতএব বাক্ রসকে কাব্য রসের বাচক মানিয়া লওয়া সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত।

৭. কিন্তু উল্লিখিত প্রয়োগটি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অর্থেই প্রযুক্ত। রসের পারিভাষিক অথবা শাস্ত্রীয় প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না।

৮. অতএব রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তীযুগে ভারতের নাট্য-সূত্রের রচনার অনেক পূর্বে—কামসূত্রের প্রভাবের ফলস্বরূপ আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের মধ্যে সম্ভবতঃ রসের শাস্ত্রীয় অর্থের বিকাশ হইয়াছিল। এই যুগে ভরতের পূর্ববর্তী আচার্যগণ (যাঁহাদের মত ভরত বিস্তারিতভাবে আনুবংশ্য শ্লোকগুলিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন) রস শাস্ত্রের পরম্পরা নির্ধারণে ব্যাপৃত ছিলেন।

(খ) রস-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত

রস-সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম নাট্যশাস্ত্র। এই গ্রন্থ ভরত-মুনির রচনারূপে প্রসিদ্ধ। ইহাতে নাটক-প্রসঙ্গে রসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে বর্তমানে যে রূপে সমগ্র নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি পাওয়া যায় তাহা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বের রচনা হইতে পারে না। কিন্তু ইহা যে বহু পরবর্তীকালের রচনা তাহাও নয়। কারণ, নাট্যশাস্ত্রের যে সংস্করণের পরম-মাহেশ্বর অভিনব গুপ্ত অষ্টম-নবম খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ টীকা অভিনব ভারতী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই সংস্করণের প্রায় অনুরূপ। কিন্তু এই কথাটি শুধুমাত্র নাট্যশাস্ত্রের বর্তমান সংস্করণ সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। যে মনিষিবর্গ ইহাকে ষষ্ঠ শতকের কিছু পূর্ব বা পরবর্তী কালের রচনা মনে করেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে এই নাট্যশাস্ত্রের ভিত্তি স্বরূপ একটি লঘু সংস্করণও প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিল—বর্তমানে মূল এবং তাহার বিস্তারের মধ্যে প্রভেদ বাহির করা অত্যন্ত কঠিন, যদিও প্রভেদের প্রচুর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা সূত্রাকারে ভরত কর্তৃক রচিত হইয়াছিল—কালিদাস এই রূপের সহিতই পরিচিত ছিলেন। অতএব ইহা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই লঘুতর সংস্করণে প্রায় সমস্ত মৌলিক নাট্যাঙ্গের বিবেচনা ছিল। রসের বিবেচ্য বস্তু ও রচনাশৈলীর[1] পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হয় যে রসের বিবেচনা ইহাতে নিশ্চয়ই অন্তর্নিহিত ছিল। আমাদের সার-বক্তব্য, মূল ভরত সূত্রে রস সিদ্ধান্তের বিস্তৃত শাস্ত্রীয় বিবেচনা ছিল এবং মূল ভরত সূত্র খৃষ্টের জন্মের দুই-এক শতক পূর্বে বা পরে নিশ্চিতরূপে রচিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বের কোন রস বিচারগ্রন্থ পাওয়া যায় না। এখানে আমরা অপ্রাপ্তির কথা বলিতেছি, অনস্তিত্বের কথা নয়—কারণ ভরতের পূর্বে রস-সিদ্ধান্তের প্রকাশ ঘটিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ করা যায় না। প্রথমতঃ ভরত-সূত্রের (মূল সূত্রেরও) রস-প্রতিপাদন এতই ব্যাপক ও পূর্ণ যে ইহার পশ্চাতে একটি বিস্তৃত বিচারধারার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করিতে আমরা বাধ্য হই। দ্বিতীয়তঃ, নাট্যশাস্ত্রের সর্বত্র উদ্ধৃত আনুবংশ্য শ্লোকগুলি এই অনুমানের অকাট্য প্রমাণ রূপে দেখা দেয়। ভরতের অনেক কাল পূর্ব হইতেই শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমে রস সিদ্ধান্তের প্রচার চলিয়া আসিতেছিল। অভিনব গুপ্তের যুক্তি অনুসারে পূর্বাচার্যগণ লক্ষণরূপে এই শ্লোকগুলির কথা বলিয়াছিলেন এবং ভরতমুনি নিজের বিচারকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য এই পরম্পরা হইতে প্রাপ্ত শ্লোক-

১. বস্তুতঃ সূত্র শৈলীর প্রয়োগ এই প্রসঙ্গেই সর্বাধিক স্পষ্ট।

গুলিকে যথাস্থানে নিবদ্ধ করিয়াছেন—

তা এতাং স্বার্থ একপ্রঘট্টকতয়া পূর্বাচার্যৈর্লক্ষণত্বেন পঠিতাঃ।
মুনিনা তু সুখসংগ্রহায় যথাস্থানং নিবেশিতাঃ।

—অভিনবভারতী অ. ৬

রাজশেখরের প্রসিদ্ধ উক্তিতেও ভরত ব্যতীত নন্দিকেশ্বরের উল্লেখ আছে। তাঁহার মতানুসারে ভরত প্রধানতঃ রূপকের কথা বলিয়াছেন এবং নন্দিকেশ্বর রসের, অর্থাৎ ভরতের অপেক্ষা নন্দিকেশ্বরের রস সিদ্ধান্তের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ছিল।

আনুবংশ শ্লোকগুলি ছাড়া নাট্যশাস্ত্রে এমন আরও দুইটি প্রমাণ আছে যেগুলির দ্বারা পূর্ব ধারার অনুসন্ধান ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যায়—১. কামসূত্রের প্রচুর উক্তি এবং ২. অথর্ববেদ হইতে রস গ্রহণের কল্পনা : রসানাথর্বণাদপি। ১. ১৭। বাৎস্যায়ণের নামে কামসূত্রের যে সংস্করণটি প্রচলিত তাহাতে রসের শাস্ত্রীয় অর্থের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থ পৃঃ ৯) কিন্তু যদিও ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় তথাপি কামসূত্রে শৃঙ্গার রসের পরিপাকের সমস্ত উপকরণ—রস-সিদ্ধান্তের সমস্ত শাস্ত্রীয় অবয়ব অভ্রান্তরূপে পাওয়া যায়, ইহাতে আপত্তি করা যায় না। এই গ্রন্থে রসের আলম্বন নায়ক-নায়িকার নানা প্রভেদ, উদ্দীপনের সম্পূর্ণ সামগ্রী সখী-দূতী ইত্যাদির নানা রূপ, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাবাদির প্রত্যক্ষ বিচার আছে, স্থায়ী আর সঞ্চারীর উল্লেখও প্রকারান্তরে করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে নাট্যাদি কলার বিকাশ নাগরিক জীবনের বিলাস-উপকরণ রূপে স্বীকার করিয়া লওয়াই সঙ্গত, এবং এই তর্ক অনুসারে নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল কামসূত্রের পরে মানিয়া লইতে হয়। অতএব ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না যে কামসূত্র, সম্ভবতঃ বাৎস্যায়নেরই কামসূত্র, ভারতীয় নাট্য-সাহিত্য এবং নাট্যশাস্ত্রের প্রমুখ ভিত্তিস্বরূপ এবং রস ও রসাঙ্গের কল্পনা এই স্থান হইতেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ রূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। স্বয়ং ভরত কামসূত্রকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—

বৈশিকশাস্ত্রকারৈশ্চ দশাবস্থাহভিহিতঃ।
তাশ্চ সামান্যাভিনয়ে বক্ষ্যামঃ।

—হিন্দী অ. ভা. পৃ. ৫৬০

অর্থাৎ কামশাস্ত্রের আচার্যগণ দশ অবস্থার কথা বলিয়াছেন। সামান্য অভিনয় প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করা হইবে।

অন্যদিকে অভিনব গুপ্তের উদ্ধরণও এই তথ্যের প্রমাণ। অনেক মনীষীগণ নাট্যকে "কামজবর্গের'' ব্যসনের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতেন। অভিযোগ খণ্ডন করিয়া অভিনব গুপ্ত লিখিয়াছেন—

এতেন 'কামজো দশকো গণাঃ' ইতি বর্জনীয়ত্বেন নাট্যস্যানুপাদেয়তেতি
যৎ কেচিদাশঙ্কিরে, তদম্যুক্তীকৃতম্।

—অর্থাৎ ইহার দ্বারা 'কামজোদশকো গণঃ' এই মনুস্মৃতির বচনের জন্য বর্জনীয় নাট্যশাস্ত্রের অনুপাদেয়তা সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের

সন্দেহের অবসান হয়।

—(হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃঃ ৩৯)

পূর্বে আমরা বলিয়াছি ভারতীয় সৌন্দর্যশাস্ত্রের দুইটি প্রধান অঙ্গ বর্তমান: রস এবং অলঙ্কার। ইহাদের মধ্যে ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্রের এবং কামসূত্র রসের ভিত্তিস্বরূপ। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কামসূত্রের ভিত্তি কি? আমাদের ধারণা—অথর্ববেদ। অথর্ববেদের ঋষিগণ লৌকিক জীবনের সিদ্ধিগুলিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অথর্ববেদে যেখানে নানাপ্রকারের ভৌতিক বাধার নিরাকরণের কামনা ও ব্যবস্থা আছে সেখানে গ্রন্থের পরিধির মধ্যে একজন অথবা নানা প্রেমিকার প্রেম লাভ করিবার আশায়, তাহাদের প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপকরণ সংগ্রহের জন্য, সপত্নী এবং সপত্নীগণের বিরোধকে শেষ করিবার উদ্দেশ্যে, অভিসারাদির সুবিধা পাওয়ার এবং দাম্পত্য জীবনকে সুখী করিবার জন্য নানা অভিচার মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] কদাচ এই মন্ত্রগুলিকে কামসূত্রের উদ্গম-স্রোত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বেদবিদ্যার প্রসিদ্ধ আচার্য বেবরের মন্তব্যানুসারে আমাদের এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে ধার্মিক স্তোত্র ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে প্রেরণা পাইয়াছে এবং ঐহিক শৃঙ্গারমূলক কবিতাগুলি অথর্ববেদ হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত করিয়াছে।[২] যদি এই তর্কের কোন সারবত্তা থাকে তাহা হইলে রসশাস্ত্রের সম্বন্ধ কামসূত্রের মাধ্যমে অথর্ববেদের সহিত সহজেই সংস্থাপিত করা যায়। অথর্ববেদের শৃঙ্গার মূলক অভিচার মন্ত্রগুলি > কামসূত্র > রসশাস্ত্র। এই-রূপে নিম্নলিখিত নাট্যশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ শ্লোকের রহস্যের উদ্ভেদ হইয়া যায়:

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎসামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি॥

—নাট্যশাস্ত্র ১.১৭

অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্র নামক এই পঞ্চম বেদে পাঠ্যতত্ত্ব (বস্তুতত্ত্ব) ঋগ্বেদ হইতে, সংগীত (গীত, নৃত্যাদি) সামবেদ হইতে, অভিনয় যজুর্বেদ হইতে, এবং রসতত্ত্ব অথর্ববেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে।[৩]

ডঃ শঙ্করণ এবং তাঁহার সরণি অবলম্বনকারী পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত বাল্মীকির সহিত রস সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন এবং আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্তকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করিয়া ক্রৌঞ্চবধ সম্বন্ধিত শ্লোক

১. দ্রষ্টব্য অথর্ববেদ, ১.৩৪, ২.৩০, ২.৩৬, ৩.২৫, ৪.৫

২. ক্ল্যাসিকল সংস্কৃত লিটারেচর (হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া সিরিজ) ১৯৪৩: কীথ, পৃঃ ২৭

৩. অভিনব গুপ্তের ব্যাখ্যা ইহা হইতে কিছু ভিন্ন। তাঁহার মতের সারাংশ এই যে অথর্ববেদোক্ত কর্মে বিভাব, অনুভাব ব্যভিচারী ভাবগুলির একত্র সমাহরণ হওয়াতে তাহাই রস সামগ্রীর উৎস হইয়া পড়িয়াছে: দ্রষ্টব্য, হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃঃ ৯৮। কিন্তু অভিনব গুপ্তের এই তর্ক খুব বেশী সঙ্গত মনে হয় না, ইহার তুলনায় বেবর প্রভৃতির প্রমাণ বলিষ্ঠ। পূর্বোক্ত আনুমানিক তর্কই (কোন অপেক্ষাকৃত অধিক প্রামাণিক তর্কের অভাবে) অধিক গ্রহণযোগ্য।

গুলিতে রসসিদ্ধান্তের মূলবীজ অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বাল্মীকির দুইটি শ্লোক উল্লেখনীয়ঃ

১. পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্ততন্ত্রীলয়-সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

—রামায়ণ (বা. কা.) ২৩.৬

২. সমাক্ষরৈশ্চতুর্ভির্যঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা।
সোঽনুব্যাহরণাদ্ ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥

—রামায়ণ (বা. কা.) ২. ৪২

অর্থাৎ

১. শোকার্ত আমার মন হইতে পাদবদ্ধ, সমান অক্ষরযুক্ত তন্ত্রীলয়-যুক্ত যে শ্লোকটি উদ্গীর্ণ হইয়াছে, তাহা অন্য প্রকার হইতে পারে না (মিথ্যা হইতে পারে না)।

২. সমান অক্ষর ও চারপদযুক্ত যেই শোকের বাঙ্ময় অভিব্যক্তি মহর্ষি করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে (মুনি ও তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা) বারংবার কথিত হওয়াতে শ্লোকে (ছন্দে) পরিণত হইয়া যায়।

এইগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে 'অন্যথা'র অর্থ মিথ্যাই। ডঃ শঙ্করণ এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'শোকের প্রেরণার দরুণ ঋষির উদ্গীথ পাদবদ্ধ, সমাক্ষর, এবং তন্ত্রীলয়যুক্ত হইতে পারিয়াছিল অন্যথা সম্ভব ছিল না',— এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গানুকূল নহে। এইরূপে দ্বিতীয় শ্লোকে ভাব ও কবিতার অথবা রস ও ছন্দের মৌলিক সম্বন্ধের অস্ফুট সংকেতমাত্র বিদ্যমান আছে,—আর অধিক কিছু নাই। বস্তুতঃ শোক ও শ্লোকের সমীকরণ বিষয়ে কালিদাসকেই শ্রেয়াংশ দিতে হয়।

...শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ।

—রঘুবংশ ১৪.৭০

এখানে শ্লোকের অর্থ নিশ্চিতরূপে কাব্যছন্দ। আনন্দবর্ধনের সম্মুখেও সেই সময় কালিদাসের এই সূক্তি বিদ্যমান ছিল যখন তিনি রস—(ধ্বনি-) সিদ্ধান্তের স্থাপনার জন্য আদি কবির প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চারিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোক শ্লোকত্বমাগতঃ॥

ধ্বন্যালোক ১.৫

—অর্থাৎ কাব্যের আত্মা সেই (প্রতীয়মান) অর্থ (রস)। ইহার সাহায্যে প্রাচীন কালে ক্রৌঞ্চ (পক্ষী) দ্বন্দ্ব-বিয়োগ-জনিত আদি কবির শোক শ্লোকরূপে (কাব্যে) পরিণত হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে লোচন-টীকায় অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন ঃ

স এব তথাভূত-বিভাব-তদুৎথাক্রন্দাদ্যনুভাবচর্বণয়া হৃদয়সংবাদতন্ময়ীভবন-ক্রমা-

দাস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং চিত্তদ্রুতিস-মাস্বাদ্যসারাংপ্রতিপন্নো রস পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবচ্ চিত্তবৃত্তি নিষ্যন্দ-স্বভাববাগ্বিলা-পাদিবচ্চ সময়ানপেক্ষত্বেপি চিত্তবৃত্তিব্যঞ্জকত্বাদিতি নয়েনাকৃতকতয়ৈবাবেশবশাৎ-সমুচিতশব্দচ্ছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ। ধ্বন্যালোক, চৌখম্বা সীঃ, ১৯৯৭ বি পৃঃ ৮৬--ইহার সারাংশ এই যে বাল্মীকির হৃদয়ে বাসনারূপে বিদ্যমান শোক নামক স্থায়ীভাব এই দৃশ্য হইতে রস সামগ্রী লাভ করিল। মৃত পক্ষী আলম্বন, জীবিত পক্ষী আশ্রয় এবং তাহা হইতে জাত ক্রন্দন অনুভাবাদিরূপে বিদ্যমান ছিল। ইহার চর্বণার দ্বারা মুনির শোক পক্ষীর শোকের সহিত তন্ময় হইয়া গেল। এই মনঃ-স্থিতি লৌকিক শোক হইতে ভিন্ন—ইহার আস্বাদন চিত্তের দ্রুতিরূপেই সম্ভবপর। পরিপূর্ণ কুম্ভ হইতে জল যেমন উচ্ছলিত হইয়া পড়ে—অথবা ভাববিভোর হইলে পরে চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ যেমন বিলাপ প্রলাপে ব্যক্ত হইতে থাকে, তেমনই শোক-ভাবে অধিক ভারাক্রান্ত হইবার পর সমুচিত ছন্দও বৃত্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির শোক শ্লোকে পরিণত হইল।

এই উদ্ধরণগুলি হইতে কি বুঝা যায়?

১. রস কাব্যের প্রাণতত্ত্বঃ রসানুভূতির মধ্য দিয়াই কাব্যের জন্ম। অতএব রসসিদ্ধান্তের বীজ বাল্মীকি রামায়ণেই পাওয়া যায়। আনন্দবর্ধন ও তাঁহার চেয়েও অধিক অভিনব গুপ্ত বাল্মীকিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া রস ধ্বনিবাদের স্থাপনায় প্রযত্নশীল হইয়াছিলেন।

এখান পর্যন্ত সবই ঠিক।

২. কিন্তু রস-শাস্ত্র অর্থাৎ রসের শাস্ত্রীয় বিবেচনার সংকেত বাল্মীকিতে আছে, ইহা মানিয়া লওয়া কঠিন। কালিদাসের ছন্দ ও আনন্দবর্ধনের কারিকা—উভয়ের মধ্যে কোনটাতেই—রসের 'অর্থ' অথবা 'অনুভব' (স এবার্থঃ) রূপ—অর্থাৎ স্থায়ীভাবের পরিণতি রূপ 'রমণীয় অর্থ' অথবা 'অনুভব' রূপ ছাড়া রসের শাস্ত্রীয় বিবেচনার অন্য কোন সঙ্কেত নাই। পরবর্তী শাস্ত্র-বিবেচনার ভিত্তিতেই অভিনব গুপ্ত বাল্মীকির ছন্দের রস-শাস্ত্রের শব্দাবলীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে রামায়ণে সবগুলি রসের বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ জাতীয় জীবনের মহাকাব্য হওয়াতে স্বভাবতঃ রামায়ণে নানা পরিস্থিতির এবং তাহা হইতে উৎপন্ন মানব মনোদশার নানা চিত্র বিদ্যমান। অতএব সমস্ত রসভাবাদির প্রভূত সামগ্রী সেখানে সহজেই পাওয়া যায়। মহাভারতের বিষয়েও ইহাই সত্য। কেবল মহাভারতই বা কেন, ঋগ্‌বেদাদিতে, ব্রাহ্মণগ্রন্থেও সংযোগ-বিয়োগ, শান্ত, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয়ানকাদির অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন রসের শাস্ত্রীয় বিবেচনার, রস বর্ণনার নহে। এমনিও ভারতীয় ঐতিহ্য রামায়ণ মহাভারতকে ইতিহাসরূপেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। উহাতে রসের অপেক্ষা কথাবস্তু ও নেতার প্রাধান্যকে স্বীকার করা হইয়াছে—এই দুইটি তত্ত্বানু-সারে এই গ্রন্থদ্বয় ভারতীয় নাট্যসাহিত্য ও কাব্যের আশ্রিত। অপর দিকে নাটকে

রসেরই প্রাধান্য। রামায়ণ ও মহাভারতের সম্বন্ধ মূলতঃ ধর্ম ও নীতির সহিত ছিল এবং নাটকের আমোদ-প্রমোদের সহিত। অতএব রামায়ণ-মহাভারত এবং নাটকের মধ্যে উদ্দেশ্যের প্রভেদ প্রারম্ভ হইতে বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষের উন্নতির সময়ে মৌর্য-গুপ্তযুগের সভ্যসমাজ ধর্মবৃত্তির পরিপোষণের জন্য, নীতি-জ্ঞানের জন্য রামায়ণ-মহাভারতের কথা শুনিত এবং আমোদ-বৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য, রসের জন্য উহাদের অথবা অন্য কাহিনীর উপরে আশ্রিত নাটক পরিদর্শন করিত। কেবল দৃশ্য-কাব্যের ক্ষেত্রের বাহিরে শ্রব্য—কাব্যের পরিধির ভিতরে কতিপয় রসময় প্রেম কাহিনী বিদ্যমান ছিল, সেই যুগের রসিকবর্গের মধ্যে সেই সকল কাহিনীর প্রচারও ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা পতঞ্জলির মহাভাষ্যানুসরণে বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা এবং ভৈমরথী প্রভৃতি কতিপয় প্রেমকাহিনীর রচনাকাল ভরতের পূর্বে স্বীকার করিয়াছেন।[১] আমাদের এই ধারণা যে, সেই যুগে একদিকে রামায়ণ-মহাভারতাদি ইতিহাস-কাব্য ছিল এবং উহাদের উপরে আশ্রিত নীতিকাহিনী অথবা উহাদের প্রেরক সারবান্ বাঙ্‌ময় ও বেদাদি বিদ্যমান ছিল, এবং অপর দিকে নাটক, প্রণয়কথাদির দ্বারা সমৃদ্ধ ললিত বাঙ্‌ময়ও উপলব্ধ ছিল যাহাদের উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন ছিল। প্রথমবর্গের পোষক ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র এবং অন্যবর্গের কামশাস্ত্র প্রভৃতি। এই দ্বিতীয় বর্গের ললিত বাঙ্‌ময়ই রসের মূল স্রোত। প্রথমে রস বলিতে প্রায় শৃঙ্গারকেই লক্ষ্য করা হইত এবং আমোদ-প্রমোদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। নাট্যশাস্ত্র ইহার প্রমাণ—'তথাচ, যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যমুজ্জ্বলং দর্শনীয়ং বা ভবতি তচ্ছৃংগারেণোপমীয়তে।'' পরবর্তী কালে আচার্যগণ যখন রস সিদ্ধান্তের বিস্তার করিলেন তখন তাহার ক্ষেত্র নাটককে ছাপাইয়া সম্পূর্ণ ললিত বাঙ্‌ময় পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল এবং উহার পরিধিতে রতি ছাড়াও অন্য সমস্ত ভাববৃত্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত হইল। এই পরিস্থিতিতে উহার মান আমোদ-প্রমোদ অথবা মনোরঞ্জন হইতে উপরে উঠিয়া আত্মানন্দের সমকক্ষ হইয়া পড়িল। কিন্তু রসের এই অর্থবিস্তার ভারতীয় প্রবৃত্তি অনুসারে পরবর্তীকালে ঘটিয়াছিল। ভারতীয় চিন্তাধারার ইহাই সহজাত প্রবৃত্তি যে প্রত্যেকটি জীবন-বৃত্তির উন্নয়ন সাধন করিয়া সে সন্তুষ্ট হয়। এই প্রবৃত্তি অনুসারে কাম ও অর্থ ক্রমশঃ ধর্ম ও মোক্ষের তুল্য পরমপুরুষার্থরূপে গৃহীত হইল এবং জীবনের আমোদ-প্রমোদে আত্মানন্দের আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল।

সারার্থ এই যে ভরতের পূর্বে রস সিদ্ধান্তের ধারা নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। ভরত পর্যন্ত পৌঁছাইতে তাহার অন্ততঃপক্ষে দুই শতাব্দী সময় নিশ্চয় লাগিয়াছিল। ভরত-পূর্বযুগের কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভরতেরই প্রমাণ অবলম্বনে তাঁহারই গ্রন্থে উদ্ধৃত আনুবংশ্য শ্লোকগুলির অনুসারে ইহা সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে যে ভরতের বহু কাল পূর্ব হইতেই এই রসধারা প্রবর্তিত ছিল। এই রসধারার সহিত নীতিধর্মবিষয়ক রামায়ণ-মহাভারতের অপেক্ষা আমোদ প্রধান প্রেমাখ্যান ও কামসূত্রাদির সম্বন্ধ অধিক ঘনিষ্ঠতর ছিল। এর ফলে শাস্ত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে

১. ক্লাসিকাল সংস্কৃত লিটরেচার ; কীথ, পৃঃ ১৪

মনে হয় যে, কামসূত্রই ইহার ভিত্তিস্বরূপ। স্বয়ং কামসূত্রও ভিত্তিহীন নয়। বর্ণ—বিষয় ও মূল প্রবৃত্তি অনুসারে বিচার করিলে ইহার প্রেরণা স্রোত অথর্ব বেদাদির শৃঙ্গার প্রসযুক্ত মন্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এইরূপে অনুমান করা যায় যে রসধারা অথর্ব বেদের শৃঙ্গার প্রধান বিষয়ক (অভিচার) মন্ত্র হইতে আবির্ভূত হইয়া লৌকিক প্রেমকাহিনী, কামসূত্র ও নাট্যকলা হইতে সম্বর্ধনাপ্রাপ্ত হইয়া, ভরতের পূর্ববর্তী আচার্যদের সৃষ্টি-বাণীতে খৃষ্টের জন্মের পূর্বে নিশ্চিতরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তথাপি, এই সব থাকা সত্ত্বেও, রস-সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম উপলব্ধ গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রই। এই প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন উপলব্ধ প্যাঠের আলোচনা করা আমাদের অভীষ্ট নয়। অধিকাংশ পণ্ডিতগণের ইহাই মত যে অধুনা যেরূপে নাট্যশাস্ত্র উপলব্ধ তাহা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের রচনা নয়। মূল ভরত সূত্রের অনুসরণ করিয়া চার পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত লেখকগণের দ্বারা ইহার স্বরূপ বিস্তার হইয়াছিল এবং এই পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বোধ হয় কোহলের বিশেষ স্থান ছিল—

শেষং প্রস্তারতন্ত্রেণ কোহলঃ কথয়িষ্যতি। নাট্যশাস্ত্র, ৩৮।১৮।

কোহল নামধারী প্রাচীন নাট্যাচার্যের অস্তিত্ব অসন্দিগ্ধ। নাট্যশাস্ত্র প্রসঙ্গে তাঁহার নামের প্রামাণিত ভাবে দামোদর গুপ্ত, অভিনব গুপ্ত, হেমচন্দ্র, শিঙ্গগোপাল প্রভৃতি মণীষীগণ উল্লেখ করিয়াছেন।[১] নাট্যশাস্ত্রে শাণ্ডিল্য বাৎস্য দত্তিল প্রভৃতি অন্য আচার্যদের (ভরত পুত্র) নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বাস্তবিক-দৃষ্টিতে, রস-সিদ্ধান্তের সহিত কাহার কতখানি সম্বন্ধ ছিল তাহা বলা কঠিন। এই সম্পর্কে ভরতের উল্লিখিত উদাহরণেও (যাহার উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রের একেবারে শেষে করা হইয়াছে) কেবলমাত্র ইহাই সঙ্কেতরূপে বলা হইয়াছে যে কোহল প্রভৃতি সকলের সম্বন্ধ রসের অপেক্ষা বোধহয় অভিনয়ের সহিত অধিক ছিল। অতএব খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভরত ছাড়া অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থকারের উল্লেখ রস-সিদ্ধান্তের ইতিহাসে হয় নাই।

নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত সংস্করণের ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়ে রস ভাবাদির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুনিবৃন্দ, 'মুনিদের মুনি' ভরতকে রস এবং ভাব সম্বন্ধ পাঁচটি প্রশ্ন করেন এবং তিনি তাহার উত্তরে রস ভাবাদির স্বরূপ, পরস্পর-সম্বন্ধ এবং ভেদাদির সম্বন্ধে বিস্তারপূর্বক বিচার করেন। রসের বর্ণনা ও বিবেচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হইয়াছে এবং সঞ্চারী ও সাত্ত্বিকভাবের নিরূপণ সপ্তম অধ্যায়ে আছে। অন্য অধ্যায়ে রসের অবশিষ্ট সামগ্রীগুলির—নায়িকার অঙ্গজ, সহজ ও অযত্নজ অলঙ্কার, কামদশা ও অবস্থানুসারে নায়িকার বাসকজ্জার আটটি ভেদ, প্রকৃতি অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপে নায়ক-নায়িকা ভেদও দূতী প্রসঙ্গের চর্চা করা হইয়াছে। অধিকন্তু, সঙ্গীত, আহার্য, অভিনয় (অলঙ্কারাদির প্রয়োগ) বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ ইত্যাদি প্রসঙ্গে রসের উল্লেখ করা হইয়াছে : এই সমস্ত বিভিন্ন রসের অনুসারে স্বরবিধান, বাদ্যযন্ত্র, বেশভূষা প্রভৃতির প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। এইরূপে নাট্যশাস্ত্রে প্রায় সম্পূর্ণ রসসামগ্রী

১. ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্র (ব. উ.), পৃঃ ৩০

যথাস্থানে বিচারিত হইয়াছে। ভরতের বিবেচনা বিশদ। তাঁহার বর্ণনা সর্বত্র পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

রস সামগ্রীর প্রাচুর্যের অনুরূপ রসের প্রাধান্যের কথাও নানাপ্রসঙ্গে নানাভাবে নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

১. ভরত স্পষ্টভাবে নাটককেই বাঙ্ময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মনে করেন এই নাটকের প্রাণ রস। কোন নাট্যাঙ্গই রস ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারে না—

তত্র রসানেব তাবদাদাবভিব্যাখ্যাস্যামঃ।
ন হি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে॥

এখানে ভরত বলিয়াছেন যে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম তিনি রসের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ রস ব্যতিরেকে অন্য কোন (নাট্যাঙ্গরূপ) অর্থ আসিতে পারে না। (নাট্যশাস্ত্র অঃ ৬, কারিকা ৩১এর পরবর্তী গদ্যভাগ)।

২. নাট্যসিদ্ধির জন্য ভরত সূত্রধার ও প্রেক্ষক উভয়ের জন্যই ভাব ও রসের আশ্রয়কে প্রধান বলিয়াছেন :—

(ক) এবং রসানাং ভাবানাং ব্যবস্থানমিহ স্মৃতম্।
য এবমেতাঞ্জানাতি স গচ্ছেৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥

—নাঃ শাঃ ৭.১২৯

এইরূপে সূত্রধার প্রভৃতির নাটকে রস ও ভাবের ব্যবস্থা করা উচিত। যে ইহা জানে সে উত্তম সিদ্ধিলাভ করে।

(খ) সিদ্ধিস্তু দ্বিবিধা জ্ঞেয়া মানুষী দৈবিকা তথা।
বাঙ্মনঃ কায়সম্ভূতা নানাভাব রসাশ্রয়া॥ —২৭.২

—অর্থাৎ প্রেক্ষক সমাজের বিচারে সিদ্ধি দুই প্রকার : মানবীয় ও দিব্য। এই সিদ্ধি বাণী, মন ও শরীর হইতে প্রাদুর্ভূ'ত হয় এবং নানা ভাব ও রসের উপর আশ্রিত থাকে।

৩. যে সব তত্ত্বের দ্বারা নাটকের শরীর নির্মিত হয় তাহাদের মধ্যে রস-ভাবাদিকে ভরত প্রাধান্য দিয়াছেন।

(ক) ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্ত্তনম্। —১.১০৭

—নাটক সমস্ত ত্রৈলোক্যের ভাবের অনুকীর্তন করে।

(খ) নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥ —১.১.১২

—আমি যে নাট্যের নির্মাণ করিয়াছি তাহাতে নানা প্রকারের ভাব ও বিবিধ প্রকারের অবস্থার বর্ণনা আছে এবং ইহা লোকচরিত্রের অনুকরণ করে।

(গ) (এতত্রসেষু ভাবেষু সর্বকর্মক্রিয়াস্বথ।)
সর্বোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি।

—১.১১৩র পরবর্তী শ্লোক

—এই নাট্য রস, ভাব এবং সর্ব কর্ম ও ক্রিয়ার মাধ্যমে সকলকে উপদেশ দিবে।

৪. নাট্যের চারটি বিশিষ্ট অঙ্গ—পাঠ্য (বিষয়বস্তু), অভিনয়, সঙ্গীত এবং রসের মধ্যে প্রথম তিনটির নিয়ন্তা রসই। নাট্যশাস্ত্রে বিশদভাবে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে নাট্যবস্তু, অভিনয় এবং সঙ্গীতের বিধি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রসানুকূল হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে নাট্যবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণরূপে রসাশ্রয়ী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। নাট্যে প্রযুক্ত কাব্যতত্ত্বকেও 'বহু কৃতরসমার্গম্'[১] হওয়া প্রয়োজন। ভরত অলঙ্কার, লক্ষণ (কাব্যবন্ধ) গুণ ও দোষের বিবেচনা বাচিক অভিনয়ের অঙ্গরূপে করিয়াছেন—আর এই বাচিক অভিনয় রসের সহায়। অতএব কাব্যের এই সকল তত্ত্ব পরম্পরাগত সম্বন্ধানুসারে রসের আশ্রিত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

এবমেতে হ্যলংকারা গুণা দোষাশ্চ কীর্তিতাঃ।
প্রয়োগমেষাং চ পুনর্বক্ষ্যামি রসসংশ্রয়ম্।

—১৬.১০৯ (নির্ণয়সাগর)

—এ পর্যন্ত অলঙ্কার, গুণ, দোষের কথা বলা হইল। এখন রসের আশ্রয়ে ইহাদের প্রয়োগের বিচার করিব। এইরূপে সমস্ত নাট্যশাস্ত্রে, উহার অন্তর্গত নাট্য প্রসঙ্গের বিধি বিধানও বিচারে রস প্রাণধারা রূপে পরিব্যাপ্ত আছে।

৫ নাট্যের উদ্দেশ্য বিচারেও রসের প্রাধান্য আছে—

দুঃখার্ত্তানাঃ শ্রমার্ত্তানাং শোকার্ত্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রান্তিজননম্ কালে নাট্য মেতন্ময়াকৃতম্। —নাঃ শাঃ ১.১১৪

—আমার দ্বারা রচিত এই নাট্য দুঃখে পীড়িত, পরিশ্রান্ত শোকে সন্তপ্ত, নিরুপায় লোকেদের সময়ানুসারে বিশ্রান্তি প্রদান করে।

এখানে বিশ্রান্তির অর্থ ভরত প্রতিপাদিত রস নয়, কিন্তু পরবর্তীযুগে রসের যে সংবিদ্বিশ্রান্তিময় স্বরূপের বিকাশ হইয়াছে তাহার বীজ এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত।

এই সব প্রমাণ অনুসারে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে রসসিদ্ধান্তের সর্বপ্রথম ও স্বতঃসম্পূর্ণ প্রতিপাদন নাট্যশাস্ত্রেই করা হইয়াছে—ভরতের মুখ্য প্রতিপাদ্য নাট্য এবং অভিনব গুপ্তের টিপ্পনী অনুসারে, ভরতের মতে 'তেন রস এবং নাট্যম্।'[২]

ভরতের পরে রস সিদ্ধান্তের লোকপ্রিয়তা আর অধিক থাকে নাই। পরবর্তী আচার্যেরা রসকে মূলরূপে নাট্যেরই উপযুক্ত মানিয়া কাব্যের ক্ষেত্রে অলঙ্কার রীতি গুণাদির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা

---

১. মৃদুললিতপদাঢ্যং গূঢশব্দার্থহীনং
জনপদসুখবোধ্যং যুক্তিমন্নৃত্যযোজ্যম্
বহুকৃত রসমার্গং সন্ধিসন্ধানযুক্তম্
স ভবতি শুভ কাব্যং নাটকপ্রেক্ষকাণাম্॥
—নাঃ শাঃ ১৬.১২৪ (নির্ণয়সাগর প্রেস)

২. হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃঃ ৪২৮

যাইতে পারে : (১) ধ্বনি-পূর্ববর্তী যুগ—প্রারম্ভ হইতে রুদ্রট পর্যন্ত (খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত), (২) ধ্বনি কাল আনন্দবর্ধন হইতে ভোজ-রাজ পর্যন্ত (নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত), (৩) ধ্বনি-পরবর্তী-কাল—মম্মটাদি হইতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত (একাদশ শতকের উত্তরার্ধ হইতে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত)।

ধ্বনি-পূর্ববর্তী কাল

কাব্য শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথম চরণে ভরতের নাট্যশাস্ত্র দ্বারা রস সিদ্ধান্তের ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ হওয়ার পরে একদিকে তাহার বিরোধ আরম্ভ হইয়া যায় এবং অপর দিকে আচার্য্যদের একটি দল রসধারার বিকাস করিতে থাকেন। রস বিরোধী ধারার প্রমুখ আচার্য্য, ভামহ, দণ্ডী, বামন, উদ্ভট ও রুদ্রট। যদিও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের রসের বিরোধিতা ব্যাপারে মাত্রা ভেদ আছে, তথাপি সমগ্র রূপে ইহাদের সকলের দৃষ্টিকোণ রসের প্রতিকূলই ছিল। রসবাদী ধারার আচার্য্যদের মধ্যে ভারতের টীকাকার লোল্লট, শঙ্কুক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা রস-সূত্রাদির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া রস সিদ্ধান্তের বিকাশকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন।

ধ্বনি—পূর্ববর্তীকাল

রস বিরোধী ধারা	রসবাদী ধারা
(ভামহ, দণ্ডী, বামন, উদ্ভট ও রুদ্রট)	(লোল্লট, শঙ্কুক প্রভৃতি ও রুদ্রভট্ট)

রসবিরোধী ধারা—রস সিদ্ধান্তের প্রথম বিরোধী আচার্য্য ছিলেন ভামহ। ইনি ষষ্ঠ শতকের প্রায় নিকটবর্তী কালে শব্দার্থের 'সাহিত্য'-কে কাব্যের সংজ্ঞারূপে স্বীকার করিয়া অলংকারকে উহার প্রাণতত্ত্ব বলিয়াছেন :

ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্।

—কাব্যালঙ্কার ১.১৩

ভামহের কাব্যালঙ্কারে তিনটি স্থলে রসের উল্লেখ আছে :—

১. মহাকাব্য প্রসঙ্গে—

যুক্তং লোকস্বভাবেন রসৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক্।

—কাঃ অঃ ১.১৩

২. রসবদ্, প্রেয়স্, উর্জস্বিন্ অলংকার প্রসঙ্গে—

রসবৎ—রসবদ্ দর্শিতস্পষ্টশৃঙ্গারাদিরসং যথা।
দেবী সমাগমদ্ ধর্মমস্করণ্যাতিরোহিতা।

কাঃ অঃ ১.৬

—যেখানে শৃঙ্গারাদি রসের স্পষ্ট ও সাক্ষাৎ বর্ণনা হয়, সেখানে রসবদ্ অলঙ্কার বিদ্যমান থাকে যথা—ধর্মদণ্ড ধারণ করিয়া অতিরোহিত দেবী—প্রকট রূপে উপস্থিত হইলেন।

প্রেয়স্—প্রেয়ো গৃহাগতং কৃষ্ণমবাদীদ্ বিদুরো যথা।
অদ্য যা মম গোবিন্দ জাতা ত্বয়ি গৃহাগতে॥
কালেনৈষা ভবেৎ প্রীতিস্তবৈবাগমনাৎ পুনঃ॥

—কাঃ অঃ ১.৫

প্রেয়স্ অলংকার—স্বগৃহে উপস্থিত কৃষ্ণকে বিদুর যাহা বলিলেন তাহা প্রেয়ঃ, যথা, হে গোবিন্দ, আজ আমার গৃহে আপনার আসার জন্য আমি যে আনন্দ পাইলাম সেইরূপ আনন্দ আপনি পুনরায় আসিলে পাইব।

উর্জস্বিন্—উর্জস্বি কর্ণেন যথা পার্থায় পুনরাগতঃ।
দ্বিঃ সন্দধাতি কিং কর্ণঃ শল্যেত্যহিরপাকৃতঃ॥

—কাঃ অঃ ১.৭

হে শল্য! কর্ণ কি দুইবার বাণ নিক্ষেপ করে—ইহা বলিয়া কর্ণ অর্জুনকে আক্রমণ করিবার জন্য পুনর্বার বিক্ষিপ্ত সর্পকে সরাইয়া দিলেন।

৩. কাব্য-মহাত্ম্য প্রসঙ্গে:

স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং শাস্ত্রমপ্যুপযুংজতে।
প্রথমালীঢমধবঃ পিবন্তি কটু ভেষজম্॥

—কাঃ অঃ ৫.৩

—অর্থাৎ স্বাদু কাব্যরসযুক্ত শাস্ত্রেরও উপযোগিতা আছে। যে প্রথমে মধু সেবন করে সে কটু ঔষধকে সহজেই সেবন করিতে পারে।

উল্লিখিত উদ্ধরণগুলির দ্বারা রসের প্রতি ভামহের উপেক্ষা স্পষ্ট হইয়া পড়ে। অলংকারের মধ্যে তিনি রসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—রস রসবৎ অলংকারের উপকরণ এবং দেববিষয়ক প্রীতি ও উর্জা (উৎসাহ) প্রভৃতি ভাব ক্রমশঃ প্রেয়োহলংকার এবং উর্জস্বী অলংকারের উপকরণ রূপে গৃহীত হইয়াছে। রসবদ্ অলংকার প্রসঙ্গে ভামহ রসের বিশেষ বর্ণনা করেন নাই, কেবল শৃঙ্গার রসের একটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া আলোচনা শেষ করিয়াছেন। শৃঙ্গার রসের উদাহরণটিতেও রসের স্বরূপ বাস্তবিক দৃষ্টিতে প্রস্ফুটিত হয় নাই—সেখানে কেবল বিভাবের বর্ণনা আছে—দেবী (অথবা রাজমহিষী) আলম্বন এবং 'রাজদণ্ডধারণ করিয়া' ও 'অতিরোহিত' আলম্বনের এই দুইটি বিশেষণ উদ্দীপন। বিভাব ব্যতীত রসের অন্য অবয়বের এখানে কোন উল্লেখ নাই। ইহা ছাড়াও আলম্বনের বিষয়েও এখানে সন্দেহ করা যাইতে পারে যে উক্ত আলম্বনটি কি শৃঙ্গারের আলম্বন অথবা দেবতা ও রাজ-বিষয়ক রতির আলম্বন, কারণ ধর্মদণ্ডাদি শৃঙ্গারের আলম্বন হইতে পারে না। এইরূপে প্রকৃতপক্ষে এখানে কেবল ভাবেরই সত্তা বিদ্যমান আছে, রসের নয়। কারণ, এক তো রতিরই স্বরূপ স্পষ্ট হয় নাই, এবং উহার পরিপাকও হয় নাই। এই প্রকারে প্রেয়োহলংকারের উদাহরণেও দেববিষয়ক

প্রীতির রূপ অস্ফুটই থাকিয়া গিয়াছে; ঊর্জস্বীর উদাহরণ অধিক ভাবদীপ্ত কিন্তু উহাতেও উক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ হইয়াছে। এই উদাহরণগুলির বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে কাব্যে বর্ণিত ভাব সমৃদ্ধির প্রতি ভামহের মনে ততখানি শ্রদ্ধাভাব ছিল না যতখানি শব্দার্থের বক্রতার প্রতি ছিল।

ইহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন যে 'স্বাদু কাব্য রসোন্মিশ্রম্' প্রভৃতি তৃতীয় উদ্ধরণে কাব্যরসের অর্থ বিভাবানুভাবব্যভিচারি সংযুক্ত রসই। অথবা ইহাও বলা কঠিন যে এখানে কেবল কাব্যচমৎকারিতার অর্থে রসের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। ভাব-বিভাবের বিধি নিয়মের দ্বারা শাস্ত্রাদির বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য হয় এবং ইহা অলংকার নয় প্রভৃতি শোভা বিধায়ক উপকরণের দ্বারাও হইয়া থাকে। ভামহের দৃষ্টিতে শোভাবিধায়ক উপকরণের প্রাধান্য অধিক, অতএব কাব্যরস বলিতে তাঁহার অভিপ্রায় ভাব-বৈভবই ছিল, শব্দার্থের চমৎকারিতা নয়—এইরূপ কথা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

ইহা ঠিক যে মহাকাব্য প্রসঙ্গে রসকে স্পষ্টরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। মহাকাব্যের জন্য সবগুলি রসের যথাস্থানে পৃথক পৃথক বর্ণনা আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ মহাকাব্য ও নাটকের শরীরগত সাম্য প্রচুর—লোক স্বভাবের বর্ণনা অথবা অনুকরণ দুইটিতেই যথার্থ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং লোক স্বভাবে নানা রসের এবং ভাবের অনুভূতি স্বতঃপ্রমাণিত। এইরূপে প্রবন্ধ কাব্যে রসের আয়োজন অনিবার্য্য। ভামহ রসবর্ণনার উপেক্ষা করিতে পারিতেন এবং করিয়াছিলেনও কিন্তু রসকে বহিষ্কৃত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, ভামহের দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁহার কাব্য সংজ্ঞা হইতে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় যে কাব্য শব্দার্থরূপী, অতএব কাব্যের সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি শব্দার্থের বাহিরে যান নাই। তাঁহার জন্য কাব্য-সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের সমানার্থক। ইহা শব্দার্থের বিবিধ সৌন্দর্য্য-বিবৃতির সংক্ষিপ্ত নাম। রসও ভাবাদি ও শব্দার্থের চমৎকারিত্বের পরিধির মধ্যে আসিয়া যায় এবং ভামহ সেইরূপেই রস ভাবাদিকে গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দার্থের পরিধির বাহিরে যাওয়া ভামহের ইচ্ছা ছিল না। নাটক কেবল শব্দার্থ নয়। সেইজন্য তিনি 'তদভিনেয়ার্থম্' বলিয়া নাটকের বিবেচনাই করেন নাই :

নাটকং দ্বিপদীশম্যারাসকস্কন্ধকাদি যৎ।
উক্তং তদভিনেয়ার্থমুক্তোঽন্যৈস্তস্য বিস্তর ॥

—কাঃ অঃ ১, ২৪

এই প্রকারে কাব্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিকোণ নিশ্চিত রূপে বস্তুগত ছিল—আত্মগত নয়। তাঁহার মতে কাব্য কলা এবং এই কাব্যের মূল লক্ষ্য প্রীতির সহিত কীর্তি লাভ। ইহা সহৃদয়তার অপেক্ষা কৌশলের সঙ্গে অধিক সম্বন্ধযুক্ত। বাস্তবিক দৃষ্টিতে ভামহ প্রীতির (মনঃ প্রসাদ) অপেক্ষা কীর্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন : গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তিনি মাত্র একবার প্রীতির উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু

বার বার অনেকগুলি শ্লোকে কীর্তির উল্লেখ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। অতএব তাঁহার বিচার দৃষ্টিতে রস স্বভাবতঃ গৌণ থাকিয়া গিয়াছে।

দণ্ডীর বিচারদৃষ্টি ভামহের অপেক্ষা অধিক উদার ছিল। সিদ্ধান্তানুসারে ভামহ এবং অন্য ধ্বনি-পূর্ব আচার্য্যদের অনুরূপ তিনিও শব্দার্থকেই কাব্যের মূল সৌন্দর্য্য রূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং অলংকারকে সম্পূর্ণ কাব্য সৌন্দর্য্যের সমানার্থক রূপে গ্রহণ করিয়া রসবদ্ অলংকারের অন্তর্গত রসের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু স্বভাববশতঃ পদলালিত্য-রসিক দণ্ডীর হৃদয়ে রসের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল। ভামহ যেখানে রসবদ্ অলঙ্কার প্রসঙ্গে কেবলমাত্র শৃঙ্গার রসের একটি দুর্বল উদাহরণের উল্লেখ করিয়া রসের আলোচনা শেষ করিয়াছেন, সেখানে দণ্ডী আটটি রসেরই রুচিকর বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে সংক্ষিপ্ত রীতির সরণী অবলম্বন করার জন্য দণ্ডী বিভিন্ন রসের বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারী প্রভৃতির পৃথক বিবেচনা করেন নাই—কেবল স্থায়ী ভাবেরই রস পরিণতির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু স্থায়ী ভাবের রস পরিণতি রস সিদ্ধান্তের মূলাধার এবং যেহেতু দণ্ডী তাঁহার উদাহরণগুলিতে বিভাব অনুভাবাদির অত্যন্ত স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়া রস পরিপাকের বর্ণনা করিয়াছেন সেই জন্য দণ্ডীর রস বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও অপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, শৃঙ্গারমূলক রসবদ্ অলংকার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

মৃতেতি প্রেত্য সংগন্তুং য়য়া মে মরণং মতম্।
সৈবাবন্তী ময়া লব্ধা কথমত্রৈব জন্মনি ॥

—কাঃ দঃ ২.২৮০

প্রাক্‌প্রীতির্দর্শিতা সেয়ং রতি শৃঙ্গারতাং গতা।
রূপবাহুল্য যোগেন তদিদং রসবদ্ বচঃ ॥

—কাঃ দঃ ২.২৮১

(বাসবদত্তার দগ্ধ হইবার খবর পাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিবার পরে সহসা তাহাকে পুনরায় পাইয়া হর্ষবিহ্বল উদয়ন বলিয়া ওঠেন) ঃ—

"বাসবদত্তার মৃত্যুর খবর পাইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি দেহ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম, সেই অবন্তিরাজপুত্রী বাসবদত্তাকে আমি এখানে এই জন্মে কেমন করিয়া ফিরিয়া পাইলাম?"

ইহার পূর্বে প্রেয়োহলংকারের উদাহরণগুলিতে প্রীতি অর্থাৎ অপুষ্ট রতির প্রতিপাদন করা হইয়াছিল, এই উদাহরণে সেই রতিই বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া শৃঙ্গার রসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য এখানে রসবদ্ অলংকার সিদ্ধ হয়।

উক্ত উদাহরণটির বিশ্লেষণ করিলে রস বিবেচনার বিষয়ে কয়েকটি স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় ঃ (১) বিভাবাদি হইতে অপুষ্ট স্থায়ী ভাব কেবল ভাব মাত্র। (২) বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী দ্বারা পরিপুষ্ট স্থায়ী ভাবই রসত্বকে প্রাপ্ত হয়। (৩) দণ্ডী রসের মর্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অবগত ছিলেন—উপরোক্ত শ্লোকে রস সামগ্রী পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান আছে ঃ উদয়ন আশ্রয়, বাসবদত্তা আলম্বন, উদয়নের হর্ষোদ্‌গার অনু-

ভাব ও হর্ষবিস্ময়াদি সঞ্চারী ভাব প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট রতিরূপ স্থায়ীভাব শৃঙ্গার-রসে পরিণত হইয়া যায়। (৪) উল্লিখিত উদাহরণের অনুরূপ দণ্ডীর অন্যান্য উদাহরণ-গুলির দ্বারাও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার দৃষ্টিতে রস সামগ্রীর রীতিগত সংযোজনাই পর্য্যাপ্ত নয়। তাঁহার রসের আস্বাদ্যরূপতারও যথার্থ ধারণা ছিল।

রসবদাদির বিষয় ছাড়া মাধুর্য্যগুণের বিবেচনাতেও এমন কয়েকটি সঙ্কেত আছে যেগুলির দণ্ডীর রস-বিষয়ক দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট হইয়া ওঠে :—

মাধুর্য্যগুণ-বর্ণন :—

মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনেব মধুব্রতাঃ॥

—কাঃ দঃ ১. ৫১

যয়া কয়াচিচ্ছ্রুত্যা যৎসমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপা হি পদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা॥

—কাঃ দঃ ১. ৫২

কামং সর্ব্বোঽপ্যলংকারো রসমর্থে নিষিঞ্চতু।
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং বহিত ভূয়সা॥

—কাঃ দঃ ১. ৬২

কন্যে কামাযমানং মাং ন ত্বং কাময়েস কথম্।
ইতি গ্রাম্যোঽয়মর্থাত্মা বৈরস্যায়ৈব কল্পতে॥

—কাঃ দঃ ১. ৬৩

কামং কন্দর্পচণ্ডালো ময়ি কামাক্ষি নির্দয়ঃ।
ত্বয়ি নির্মৎসরো দিষ্ট্যেত্যগ্রাম্যোঽর্থো রসাবহঃ॥

—কা দঃ ১. ৬৪

অর্থাৎ মধুরের অর্থ হইতেছে রস; শব্দ এবং অর্থ উভয়েই রস বিদ্যমান থাকে ইহার দ্বারা সহৃদয় সেইরূপ আনন্দোমত্ত হইয়া ওঠে যেরূপ মধু দেখিয়া ভ্রমর।

সরস শব্দ—যাহা শুনিয়া সহৃদয়ের চিত্ত নাদ-সাম্যের চমৎকারিতা অনুভব করে, সেই সানুপ্রাস পদাবলীকে রসময়ী বলা হয়।

সরল অর্থ—যদিও সমস্ত অলংকার অর্থের মধ্যে রস ফুটাইয়া তোলে তবুও তাহার জন্য (অর্থের সরসতার জন্য) অগ্রাম্যতাই প্রধানতঃ উত্তরদায়ী হয়। হে কন্যা, আমি কামের দ্বারা পীড়িত, তুমি আমাকে কেন চাও না—এইরূপ গ্রাম্য অর্থ সহৃদয়ের মনকে বিরস করিয়া দেয়। "হে সুনয়ন! চাণ্ডাল কন্দর্প আমার প্রতি নির্দয় কিন্তু ভাগ্যবলে তোমার প্রতি তাহার মনে দ্বেষ ভাব নাই।" এইরূপ অগ্রাম্য অর্থ রসের প্রসার করে।

উল্লিখিত প্রসঙ্গে শব্দ এবং অর্থ উভয়ে রসের স্থিতি স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ দণ্ডী সমস্ত অলঙ্কার বিধানকে রসযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তবুও শব্দের অন্তর্গত শ্রুত্যানুপ্রাসকে এবং অর্থের অন্তর্গত অগ্রাম্যতা অর্থাৎ পরিষ্কৃত ভাবাভি-

ব্যক্তিকে তিনি রসের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত বলিয়াছেন। কাব্যাদর্শের কতিপয় নবীন টীকাকারেরা "রসাবহ"-এর অর্থ "রসব্যঞ্জক" স্বীকার করিয়া ধ্বনি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডীর মন্তব্যগুলির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু ইহা ইতিহাস-সিদ্ধ নয়, কারণ ব্যঞ্জনার প্রশ্ন দণ্ডীর ক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, "রসাবহা পদাসক্তি" এবং "অলঙ্কারের দ্বারা রস নিষেকের" অর্থ কি? এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর সম্ভব: ১. মর্মজ্ঞ দণ্ডীর কবিহৃদয় স্বভাবতঃই এই তথ্যের সহিত পরিচিত ছিল যে শ্রুত্যনুপ্রাস প্রভৃতির দ্বারা সংযুক্ত ললিতপদাবলী শৃঙ্গারাদি রসের আস্বাদনে সহযোগিতা করে অথবা উহার পরিবর্ধন করে এবং এইরূপে অলঙ্কারও প্রসঙ্গানুসারে বিভিন্ন রসের উৎকর্ষ সাধন করে। অর্থাৎ দণ্ডী এখানেও ভরত-সম্মত রসকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা স্বীকার করেন যে উপযুক্ত বর্ণযোজনা এবং শব্দার্থগত চমৎকারিতা রসের সর্বপ্রকার পুষ্টিসাধন করে। কি ভাবে? ব্যঞ্জনার দ্বারা নয়, কারণ দণ্ডী ব্যঞ্জনার সহিত পরিচিত ছিলেন না; বোধহয় গুণের সম্বন্ধানুসারে ইহা হয়। ২. রসের অর্থ উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে ঠিক সেইরূপ নয় যেরূপ রসবদাদির প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে বরং এখানে ইহা ব্যাপকরূপে কাব্য সৌন্দর্য বা/এবং উহার পরিণাম স্বরূপ কাব্যাস্বাদের সমানার্থক বলিয়াই বোধ হয়। এই অর্থগ্রহণ করিলে শ্রুতিমধুর বর্ণযোজনা এবং শব্দার্থগত চমৎকারিতা হইতে উৎপন্ন কাব্যাস্বাদ অথবা সহৃদয়ের মনঃপ্রীতির সমস্যার স্বতঃই সমাধান হইয়া যায়। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতির মতানুসারে কাব্যাস্বাদের জন্য ভাবাদিরূপী মাধ্যম অনিবার্য নয়; ভাবসৌন্দর্যের গুরুত্বকে তাঁহারা অস্বীকার করেন না—করিতে পারেনও না, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি শব্দার্থের কুশল প্রয়োগের প্রতি প্রধানতঃ কেন্দ্রিভূত ছিল। দণ্ডীর মতানুযায়ী অগ্রাম্যতা অর্থগত সৌন্দর্য্য-এর মূলাধার। গ্রাম্যতা ও অগ্রাম্যতার উপর্যুক্ত উদাহরণগুলির বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে রসের সামগ্রী তো উভয় উদাহরণেই বর্তমান আছে—গ্রাম্যতার উদাহরণেও প্রার্থী যুবক আশ্রয়, কন্যা (অভুক্ত যৌবনা কুমারী) আলম্বন, তার অনাহত যৌবন উদ্দীপন হইতে পারে, রতি স্থায়ী ও ঔৎসুক্য ব্যভিচারী ভাব: তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই যে উপর্যুক্ত শ্লোকটি কাব্য মর্মজ্ঞদের মনঃপ্রসাদন করে নাই। কারণ অভিব্যঞ্জনাবাদীরা (রীতি গুণ অলঙ্কার বক্রোক্তিকে যেসকল আচার্যগণ কাব্যের প্রাণ রূপে স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা) বলিবেন যে এখানে ভদ্রতাসম্মত ভাবে ভাবের অভিব্যক্তি হয় নাই—কন্যা শব্দতেও আপত্তি করা যাইতে পারে। ধ্বনিবাদিরা বলিবেন যে এখানে রতির ব্যঞ্জনার অপেক্ষা কথনমাত্র হইয়াছে, সেইজন্য দোষ দেখা দিয়াছে। রসবাদীরাও নিজস্ব সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার অভ্রান্ত উত্তর দিতে পারেন যে এখানে ঔচিত্য-হানি হওয়াতে রসাভাস দেখা দিয়াছে। এই তিনটি দলের মধ্যে দণ্ডী নিশ্চিতভাবে প্রথম দলভুক্ত—অর্থাৎ তাহার মতে কাব্যের প্রাণ হইতেছে "ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী" এবং উপর্যুক্ত শ্লোকে গ্রাম্য অভিব্যক্তির ফলে বিরসভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইসকল মতানুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে উল্লিখিত প্রসঙ্গে বিভাবানুভাব সঞ্চারী দ্বারা পুষ্ট স্থায়ী ভাবের পরিপাক রূপে রসের

বর্ণনা হয় নাই বরং কাব্যসৌন্দর্য বা/এবং পরিণাম স্বরূপ কাব্যাস্বাদ ও কাব্যজাত অন্তশ্চমৎকারিতারই সমানার্থকরূপে রসের বর্ণনা হইয়াছে। আমাদের বিচারে দ্বিতীয় বিকল্পটিই অধিক গ্রহণযোগ্য তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই ভামহের অপেক্ষা দণ্ডী রস-সিদ্ধান্তের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কারণ—

(ক) রসের বর্ণনা তিনি বহু এবং ব্যাপকভাবে রুচিমত উপায়ে করিয়াছেন।

(খ) তাঁহার রস সিদ্ধান্তের জ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্ট : রসসামগ্রী, রস ও ভাবের মধ্যে প্রভেদ, রস পরিপাকের বিধি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নির্ভ্রান্ত।

(গ) তাঁহার দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অধিক অন্তর্মুখী—নিজের রচনায় ও বিবেচনায় ভাব-সৌন্দর্যের প্রতি তিনি অধিক সংবেদনশীল। ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলীতে ইষ্ট বিশেষণ এই তথ্যের আভাস দেয়।

(ঘ) শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে ভামহ অলঙ্কারবাদী অপরদিকে দণ্ডীর আগ্রহ গুণচর্চিত রীতির প্রতি স্পষ্ট দেখা যায়। অতএব তিনি সেই অনুপাতে ভামহের অপেক্ষা রসের অধিক নিকটবর্তী যে অনুপাতে রীতি সিদ্ধান্ত অলঙ্কার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা রসের অধিক নিকটবর্তী।

দণ্ডীর রীতি বিষয়ক ধারণাগুলি আচার্য্য বামনের মৌলিক প্রতিভার আলোকে স্পষ্ট ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। বামনের বিচারদৃষ্টি দণ্ডীর অপেক্ষা অধিক এক-দেশদর্শী এবং সেইজন্য বোধহয় অধিক অভ্রান্ত। রস শব্দের প্রয়োগ কাব্যালঙ্কার-সূত্র কেবল একস্থানে হইয়াছে। অর্থগুণ কান্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া বামন লিখিয়াছেন—

দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ॥ —কাঃ সূঃ বৃঃ ৩. ২. ১৫

দীপ্তা রসা শৃঙ্গারাদয়ো যস্য স দীপ্তরসঃ।

তস্য ভাবো দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ॥

—অর্থাৎ দীপ্তরসত্বই (অর্থগুণ) কান্তি। যার (কাব্যবন্ধ) শৃঙ্গরাদি রস দীপ্ত সেই দীপ্তরস।—তাহার ভাব দীপ্তরসত্বযুক্ত কান্তি (নামক অর্থগুণ)।

সংজ্ঞার পুষ্টির জন্য অমরুকের নিম্নলিখিত শৃঙ্গারের উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে :

প্রেয়ান্ সায়মপাকৃতঃ সশপথং পাদানতঃ কান্তয়া।
দ্বিত্রাণ্যেব পদানি বাসভবনাদ্ যাবন্ন যাত্যুন্মনাঃ॥
তাবৎ প্রত্যুত পাণিসম্পুটগলন্নীবীনিতম্বং ধৃতো।
ধাবিত্বৈব কৃতপ্রণাম কমহো প্রেম্ণো বিচিত্রা গতিঃ॥

—সায়ংকালের সময় শপথপূর্বক পাদলুণ্ঠিত প্রিয়কে (মানিনী) কান্তা দূর করিয়া দিয়াছে। উন্মনা হইয়া সে তখন বাসভবন হইতে বাহির হইতে না হইতে শিথিল নীবীকে হাতে করে ধরিয়া (স্বয়ং নায়িকাই) ত্বরিত আসিয়া প্রণতিপূর্বক তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আহা, প্রেমের কি বিচিত্র মহিমা। ইহার পরে অন্য রসগুলির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে :

এবং রসান্তরেষপ্যুদাহর্য্যম্।

—এইরূপে অন্য রসগুলিতেও (দীপ্তরসত্বের) উদাহরণ বুঝিয়া লওয়া উচিত।
—(হিন্দী কাব্যালঙ্কারসূত্র, পৃঃ ১৫৫-১৫৬)

অর্থগুণ কান্তির এই সংক্ষিপ্ত বিবরণেই বামনকৃত রস-চর্চার সমাপ্তি ঘটে। অন্য অর্থ গুণগুলির বিবেচনা প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে ভাব সৌন্দর্যের কথা বলিবার ছলে রস বিষয়ক সঙ্কেত দেওয়া যাইতে পারিত—'সৌকুমার্য' এবং 'উদারতা'র লক্ষণগুলিতে কিছু আভাসও পাওয়া যায় কিন্তু ইহা ব্যতীত সম্পূর্ণ বিবেচনায় রসের আর কোন উল্লেখ হয় নাই এমন কি "সৌকুমার্য"এর [১] বৈশিষ্ট্য অপারুষ্য এবং "উদারতা"র [২] মূল ভিত্তি অগ্রাম্যতার বিবেচনায় ভাবতত্ত্বের অপেক্ষা উক্তি চারুত্বের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বামন রসবদাদির বর্ণনাও করেন নাই—তাঁহার অলঙ্কার-সূচী বলিতে গেলে সম্পূর্ণ কিন্তু রসবদাদির উল্লেখ সূচীতে নাই। এইরূপে দোষ বর্ণনাতেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ রূপে রসদোষের কোন সঙ্কেত করা হয় নাই। প্রবন্ধ কাব্যের বিষয়ে রসের উপেক্ষা সম্ভব ছিল না, কিন্তু বামন কাব্যভেদের বর্ণনাই করেন নাই; এই সম্পূর্ণ বিষয়ের সম্বন্ধে তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে এইসকল কাব্য ভেদ এতই প্রসিদ্ধ যে ইহাদের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়োজন নাই।[৩] এখানে তিনি কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে মুক্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ এবং প্রবন্ধের বিভিন্ন প্রকারগুলির মধ্যে রূপক সর্বোৎকৃষ্ট ঃ সন্দর্ভেষু দশ-রূপকং শ্রেয়ঃ।

—কাঃ সূঃ বৃঃ ১, ২, ৩০

কস্মাৎ তদাহ—

তদ্ধি, চিত্রং চিত্রপটবদ্ বিশেষসাকল্যাৎ।

—কাঃ সূঃ বৃঃ ১. ২. ৩১

—অর্থাৎ প্রবন্ধ কাব্যের মধ্যে দশরূপকই শ্রেষ্ঠ। ইহা কি রূপ সম্ভব? তাহা চিত্রপটের অনুরূপ সমস্ত গুণের দ্বারা সংযুক্ত হওয়াতে চিত্ররূপ (আশ্চর্যজনক এবং আনন্দদায়ক) হইয়া যায়।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রসের প্রতি বামনের বিচার দৃষ্টিকে সঙ্কুচিতই বলিতে হইবে। দণ্ডী অপেক্ষাকৃত অধিক রসিকমনের পরিচয় দিয়াছিলেন। বামনের মতে কাব্যের শোভা হইতেছে রীতি, রীতির মূল তত্ত্ব হইতেছে গুণ আর কুড়িটি গুণের মধ্যে একটি গুণের শোভা-বিধায়কধর্ম হইতেছে রস—অতএব স্বভাবতঃ রীতিচক্রের মধ্যে রসের স্থান গৌণ। কিন্তু বামনের পক্ষ হইতে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে তিনি রসকে অঙ্গের নহে বরং প্রাণের ধর্ম্ম রূপে স্বীকার করিয়াছেন। গুণ কাব্যের নিত্য-ধর্ম এবং কাব্যাত্মা রীতির প্রাণতত্ত্ব এবং রসের সম্বন্ধ গুণের সহিত, অতএব কাব্যের

১. অপারুষ্যং সৌকুমার্যম্॥ ৩. ২. ১২ যথা 'মৃত' 'যশঃ শেষম্' ইত্যাহুঃ। অপারুষ্যের অপর নাম সৌকুমার্য যেমন 'মৃত'-এর জন্য 'যশঃ শেষ'-এর প্রয়োগ হয়।

২. অগ্রাম্যত্বমুদারতা॥ ৩.২. ১৩ দ্রষ্টব্য হিন্দীকাব্যালঙ্কার সূত্র পৃঃ ১৫৫

৩. হিন্দী কাব্যালঙ্কার সূত্র পৃঃ ৫৯

আত্মার সহিত রসের সম্বন্ধ সহজেই স্থাপিত হইয়া যায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে এই যুক্তি অনুসারে রস বৈদর্ভী রীতির অনিবার্য্য তত্ত্ব হওয়ার জন্য উত্তম কাব্যেরও অনিবার্য তত্ত্ব বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু তবুও কুড়িটি গুণের মধ্যে একটি গুণের অঙ্গ হইবার দরুণ এক্ষেত্রে রসের গৌণতাকে অসিদ্ধ প্রমাণিত করা সম্ভবপর নয়।

ডঃ শঙ্করণ বামনের পক্ষে একটি কথা বলিয়াছেন। বামন রূপককে কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব রূপকের প্রাণরস রসের প্রতি তাঁহার অভিরুচি স্বতঃপ্রমাণিত হয়। আমাদের ধারণায় এই কথার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই, কারণ রস তত্ত্বের জন্য বামন রূপকের স্তবগান করেন নাই বরং এই জন্য করিয়াছিলেন যে তাহা সম্পূর্ণ গুণের দ্বারা সংযুক্ত চিত্রপটের সমান। ইহা ব্যতীত রূপকের অন্তরঙ্গের সহিত তাহার বহিরঙ্গ—রঙ্গ-সজ্জা, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় চমৎকার উপরেও বামনের দৃষ্টি ছিল। অতএব এই উদ্ধরণ অনুসারে রসের প্রাধান্য প্রমাণিত করা যায় না। আমরা পূর্বে বলিয়াছি বামনের দৃষ্টি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ছিল। তিনি সৌন্দর্য্যকে প্রায় বস্তুনিষ্ঠরূপেই স্বীকার করিয়াছেন—শ্রব্য কাব্যে সেই সৌন্দর্য্যের আধার হইতেছে পদরচনা এবং দৃশ্যকাব্যের রঙ্গ-বৈভব, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি নানা গুণ। এইরূপে সিদ্ধান্তের দিক দিয়া কাব্যের অন্তরঙ্গ তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রসের অল্পবিস্তর উৎকর্ষসাধন হইয়াছে কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে প্রত্যক্ষভাবে বামনের রসের প্রতি কোন বিশেষ অনুরাগ ছিল না। এই রসের ব্যাপারে তিনি দণ্ডীর অগ্রবর্তী না হইয়া পশ্চাৎবর্ত্তীই থাকিয়া গিয়াছেন।

উদ্ভট বামনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার তিনটি গ্রন্থের প্রমাণিক উল্লেখ পাওয়া যায় ১। ভরত গ্রন্থের টীকা, ২। ভামহ বিবরণ ও ৩। কাব্যালঙ্কার সংগ্রহ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদের মধ্যে কেবল একটি গ্রন্থই পাওয়া যায়—কাব্যালঙ্কার সংগ্রহ। গ্রন্থগুলির নামের অনুসারে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে উদ্ভটের স্থান রসবাদী ধারা ও রসবিরোধী অলঙ্কারবাদী ধারার মধ্যবর্তী ছিল। কিন্তু প্রথম দুইটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অভাবে এই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, কেবল কাব্যালঙ্কার সংগ্রহকে অবলম্বন করিয়া অল্প কিছু বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে কেবল অলঙ্কারের বর্ণনা আছে ; রসের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রসবদাদি প্রসঙ্গে করা হইয়াছে—

রত্যাদিকানাং ভাবানামনুভাবাদিসূচনৈঃ।
যৎ কাব্যং বধ্যতে সদ্ভিস্তৎপ্রেয়স্বদুদাহৃতম্ ॥

—কাঃ সাঃ সং ৪. ২

রসবৎ—

রসবদ্দর্শিতস্পষ্টশৃঙ্গারাদিরসোদয়ম্। *
স্বশব্দস্থায়িসঞ্চারিবিভাবাভিনয়াস্পদম্ ॥ —কাঃ সাঃ সং ঃ ৪. ৩
শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥

—কাঃ সাঃ সং ৪.৪

চতুর্বর্গৈতয়ো প্রাপ্য পরিহাযৌ ক্রমাদ্যতঃ।
চৈতন্যভেদাদাস্বাদ্যাত্‌স রসস্তাদৃশো মতঃ॥

—কাঃ সাঃ সং ৪.৫

উর্জস্বি—

অনৌচিত্যপ্রবৃত্তানং কামক্রোধাদিকারণাৎ।
ভাবানাং চ রসনাংচ বন্ধ উর্জস্বি কথ্যতে॥

—কাঃ সাঃ সং ৪.৬

সমাহিতম্—

রসভাবতদাভাসবৃত্তেঃ প্রশমবন্ধনম্।
অন্যানুভাবনিঃশুন্যরূপং যত্তৎ সমাহিতম্॥

—কাঃ সাঃ সং ৪.৮

—সং কবি রতি প্রভৃতি ভাব দ্বারা অনুভাবাদির সূচনা করিয়া যে কাব্য রচনা করেন তাহা প্রেয়স্বৎ বলিয়া কথিত হয়। স্বশব্দ, স্থায়ী, সঞ্চারী, বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা যেখানে রসের উদয় স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয় সেখানে রসবদ্ অলঙ্কার বিদ্যমান থাকে। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত নাট্যে এই নয়টি রস কথিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা চতুর্বর্গের প্রাপ্তি ও চতুর্বর্গ বিরোধী ফলের পরিহার সম্ভব এবং যাহা চৈতন্যভেদে (বিভিন্ন মানব-ঘটনার দ্বারা) আস্বাদ্য হয় তাহাকে রস বলা হয়। কাম ক্রোধাদির দরুণ অনুচিত দিশায় প্রবৃত্ত রস ভাবের বর্ণনা উর্জস্বি বলিয়া কথিত হয়। রস, রসাভাস, ভাব ও ভাবাভাসের অস্তিত্বের প্রশমনের বর্ণনা, যাহাতে অন্য রস ভাবাদির অনুভাবেরও কোন অস্তিত্ব নাই, সমাহিত অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

উপরোক্ত কারিকাগুলির দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে রসভাবাদির বর্ণনা উদ্ভট রসবদাদি অলঙ্কারগুলির অন্তর্গত করিয়াছেন এবং এইরূপে উদ্ভট ভরতের স্থানে ভামহের অনুকরণ করিয়াছেন। রতি প্রভৃতি অপুষ্ট ভাবগুলির সূচক অনুভাবের দ্বারা যে কাব্যগত বর্ণনা হয় তাহাকে প্রেয়স্বৎ বলা হয়। কাম ক্রোধাদির জন্য ভাব ও রসের অনুচিত প্রবৃত্তির বর্ণনাকে উর্জস্বি অলঙ্কার বলা হয়। সমাহিত অলঙ্কারে রস, ভাব, রসাভাস ও ভাবাভাসকে প্রশমিত করার উপায় বর্ণিত আছে। রসবদ্ অলঙ্কারে স্বশব্দ, স্থায়ী, সঞ্চারী, বিভাব ও অভিনয়ের (অনুভাব) দ্বারা রসের স্পষ্ট প্রদর্শন ও সাক্ষাৎ বর্ণনার উল্লেখ হয়। উদ্ভট শান্ত রসকে স্বীকার করিয়া নাট্যে নবরসের কথা বলিয়াছেন। রসবদ্ অলঙ্কারের সহিত সম্বন্ধ শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ করিলে আমরা দুইটি তথ্যের সহিত পরিচিত হই। প্রথমতঃ রসের প্রকৃত ক্ষেত্র নাটকই: "নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ" বাক্যের অভিপ্রায় এই যে নবরসের সম্যক্ বিকাশ নাটকেই পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কাব্যে বাচক শব্দের প্রয়োগ এবং বিভাব অনুভাব ব্যভিচারীর দ্বারা রসের সাক্ষাৎ বর্ণনা করা যাইতে পারে কিন্তু এখানে রসের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলা হয় নাই: কাব্যের প্রাণ অলঙ্কার অথবা শব্দার্থের চমৎকারিতা, ইহার অঙ্গরূপে রসের

বর্ণনা কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে।—অর্থাৎ নাট্যে যেখানে রস সাধ্যরূপী সেখানে কাব্যে উহা মাত্র সাধনরূপী। ভামহ প্রভৃতি অলঙ্কারবাদিদের অনুরূপ উদ্ভটের ইহাই মত যে নাটকের প্রাণ রস কিন্তু কাব্যের আধার উক্তি চারুত্ব—রসসামগ্রী অথবা রস পরিপাকের সম্পূর্ণ ব্যাপার উক্তি চারুত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে। ভরত গ্রন্থের টীকায় উদ্ভট রসের বিষয়ে কি বিচার ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন কিন্তু কাব্যালঙ্কার সংগ্রহের ভিত্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে তিনি দেহবাদী আচার্যদের দলভুক্ত ছিলেন—তাঁহার দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ ছিল এবং তাঁহার অনুসারে শব্দার্থগত চমৎকারিতাই কাব্যের মূল তত্ত্ব ও রস নাট্যকলারই বিষয়। নিষ্পত্তির অর্থ উৎপত্তি (উদয়) এবং তাহা আত্মনিষ্ঠ না হইয়া বস্তুনিষ্ঠই। ইহা ঠিক যে ভামহের অপেক্ষা এবং বোধহয় বামনের অপেক্ষাও নাট্যশাস্ত্রের সহিত অধিক সংসর্গের ফলে রসের আস্বাদ্য রূপের সহিত উদ্ভটের অধিক পরিচয় ছিল এবং সেই অনুপাতে রসবদ্ অলঙ্কারের অঙ্গ-রূপে রসকে স্বীকার করিলেও এই দুই পূর্ববর্তী আচার্যদের অপেক্ষা তিনি ভাব-বিভূতিকে অধিক প্রাধান্য দিয়াছিলেন। কিন্তু রসের পোষকতত্ত্বগুলির মধ্যে "স্বশব্দ বাচন'' এর উল্লেখ করিয়া তিনি রসের ব্যাপারে কিছুটা পিছনে সরিয়া গিয়াছেন। "স্বশব্দ বাচন'' কেবল রসের অপুষ্টি সাধকই নয় তার পরিপন্থিও; সেইজন্য রসধ্বনিবাদিরা ইহাকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং উদ্ভটের অভিমতকে প্রবলভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। বোধহয় উদ্ভট ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে নাটকে নানাবিধ রসসামগ্রীর প্রত্যক্ষ নিয়োজনের দ্বারা রসের উৎপত্তি সহজেই সম্ভবপর হয় কিন্তু কাব্যে তদনুরূপ উপকর-ণের অভাবে স্ববাচক শব্দের প্রয়োগ ভিন্ন রস সিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জনার জ্ঞানের অভাবে উদ্ভট ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে কাব্যেও শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা কল্পনা যখন উদ্বুদ্ধ হয় তখন শ্রোতা সম্পূর্ণ রস সামগ্রীর মনশ্চক্ষুতে সাক্ষাৎকার করেন। উদ্ভট নিজের কারিকায় "স্পষ্ট দর্শিত'' এর দ্বৈত প্রয়োগের দ্বারা এই তথ্যটিকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন কিন্তু ব্যঞ্জনার সহিত পরিচয় না থাকার জন্য তাঁকে অবশেষে 'সশব্দ বাচ্যত্ব' এর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ধ্বনিপূর্ব দেহবাদী ধারার শেষ আচার্য ছিলেন রুদ্রট—বস্তুতঃ অলঙ্কারবাদী হওয়া সত্ত্বেও রুদ্রটের রসের প্রতি সেইরূপ অনাদর ভাব ছিল না যাহা ভামহ ও উদ্ভটের মধ্যে দেখা যায়। রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের মূল প্রতিপাদ্য নিঃসন্দেহ অলঙ্কার যাহার অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে ও যথাক্রমে নয়টি অধ্যায় বর্ণনা হইয়াছে। এইরূপে অলংকারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট কিন্তু রসের প্রতিও তাঁহার হৃদয়ে সৌহার্দ্য ছিল। এ বিষয়ে নানা প্রমাণ পাওয়া যায়।

১। বিস্তৃত ভাবে ও মনোনিবেশের সহিত চারটি অধ্যায়ে রসের বর্ণনা ঠিক সেই-রূপ করা হইয়াছে যেমন অন্যান্য রসধ্বনিবাদী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রট কেবল রীতিগত প্রথাকেই গ্রহণ করেন নাই, রসের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও করিয়াছেন।

২। তিনি রসের বর্ণনা স্বতন্ত্রভাবে করিয়াছেন, রসবদাদির অন্তর্গত নয়। রুদ্রট

রসবদাদি অলঙ্কারগুলির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিয়াছেন।

৩। তিনি কাব্যে রসের প্রাধান্য নানাভাবে ঘোষণা করিয়াছেন—

(ক) ননু কাব্যেন ক্রিয়তে সরসানামবগমশ্চতুর্বর্গে।
লঘু মৃদু চ নীরসেভ্যস্তে হি ত্রস্যন্তি শাস্ত্রেভ্যঃ॥

—কাঃ অঃ ১২.১

তসমাত্তৎকর্তব্যং যত্নেন মহীয়সা রসৈর্যুক্তম।

—কাঃ অঃ ১২.২ পূর্বার্ধ।

—সহৃদয় ব্যক্তিগণ নীরস শাস্ত্রকে ভয় করেন। কিন্তু কাব্যের দ্বারা সরল ও মৃদু রীতিতে জীবনের পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অত্যন্ত যত্নপূর্বক কাব্যকে রসের দ্বারা সমৃদ্ধ করা উচিত।

(খ) জ্বলদুজ্জ্বলবাক্প্রসরঃ সরসং কুর্বন্মহাকাবিঃ কাব্যম্।
স্ফুটমাকল্পনমল্পং প্রতনোতি যশঃ পরস্যাপি॥

—কাঃ অঃ ১.৪

—স্ফুট অলঙ্কারের দ্বারা দেদীপ্যমান ও দোষাভাবের ফলে উজ্জ্বল যাঁর বাণী সেই ধনী মহাকবির সরস কাব্য রচনা অন্যদের জন্যও যুগান্তস্থায়ী ও জগদ্ব্যাপী যশের বিস্তার করে।

(গ) জগতি চতুর্বর্গ ইতি খ্যাতির্ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্।
সম্যক্তানভিদধ্যাদ্রসসংমিশ্রান্প্রবন্ধেষু॥

—কাঃ অঃ ১৬.১

—সংসারে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ। প্রবন্ধ কাব্যে রসের সহিত ইহাদের সংযোজন হওয়া উচিত।

(ঘ) এতে রসাঃ রসবতো রময়ন্তি পুংস
সম্যগ্বিভজ্য রচিতাশ্চতুরেন চারু।
যস্মাদিমাননধিগম্য ন সর্বরম্যং
কাব্যং বিধাতুমলমত্র তদাদ্রিয়েত॥ —কাঃ অঃ ১৫.২১

—নিপুণ কবি দ্বারা চারু শৈলীতে বর্ণিত ও সম্যক্রূপে প্রকটিত এই রস রসিক জনের মনঃপ্রসাদন করে। যেহেতু এই জ্ঞান ব্যতীত কবি সর্বতোভাবে রমনীয় কাব্যের রচনা করিতে পারেন না, সেইজন্য ইহার সম্মান করা উচিত।

(ঙ) কাব্যে রীতির প্রয়োগ রস অনুসারে হওয়া উচিত : শৃঙ্গার ও করুণ, ভয়ানক ও অদ্ভুত রসে বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী এবং রৌদ্র রসে লাটীয়া ও গৌড়ীয় রীতির প্রয়োগ হওয়া উচিত। অন্য রসেও এই রীতিগুলির যথোচিত প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

বৈদর্ভীপাঞ্চাল্যৌ প্রেয়সি করুণে ভয়ানকাদ্ভুতযোঃ॥
লাটীয়া গৌড়ীয়ৌ রৌদ্রে কুর্যাদ্ যথৌচিত্যম্। —কাঃ অঃ ১৫,২০

—এই সব প্রমাণগুলির অনুসরণ ও উপরোক্ত উদ্ধরণের বিশ্লেষণ করিলে রসের প্রতি রুদ্রটের অনুরাগ সমগ্ররূপে স্পষ্ট হইয়া যায় কিন্তু অপর দিকে মনে এই সংশয়

জাগিয়া ওঠে যে তাঁকে অলঙ্কারবাদী কেন বলা হইয়াছে। এই সংশয়ের সমাধান কঠিন নয় এবং ইহার নিরাকরণের জন্য বহুতর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে ঃ

১. রুদ্রটের গ্রন্থের নাম কাব্যালঙ্কার যাহা ভামহ প্রভৃতির সরণি অবলম্বনে লিখিত এবং যাহাতে অলঙ্কারের প্রাধান্য স্পষ্ট।

২. গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিতে গিয়া লেখক বিশেষ ভাবে অলঙ্কারেরই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

অস্য হি পৌর্বাপর্যং পর্য্যালোচ্যাচিরেণ নিপুণস্য।
কাব্যমলং কর্তুমলং কর্তরুদারা মতির্ভবতি ॥

—কাঃ অঃ ১.৩

—এই গ্রন্থের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক (পৌর্বাপর্য) পর্য্যালোচনা করিলে কুশল কবির মতি অতি দ্রুত কাব্যকে অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হয়।

৩. অন্য দেহবাদী আচার্য্যদের অপেক্ষা রসের প্রতি অধিক উদারতার পরিচয় দিলেও রসের অপেক্ষা অলঙ্কারের প্রতি রুদ্রটের পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। রসের বিবেচনায় তিনি রসের স্বরূপ, রস নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি কোন সংকেতও করেন নাই। কিন্তু অলঙ্কার প্রসঙ্গে বিবিধ অলঙ্কারের ভেদ প্রভেদের বর্ণনা ছাড়া অলঙ্কারের বর্গীকরণ প্রভৃতি মৌলিক প্রসঙ্গগুলির তিনিই প্রথম গাম্ভীর্য্যপূর্বক আলোচনা করিয়াছেন।

৪. রুদ্রটের কাব্য সংজ্ঞানুসারে তিনি শব্দার্থবাদী ঃ "ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্" শব্দার্থই কাব্য। এবং এইরূপে কাব্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিকোণ প্রকৃত পক্ষে বস্তুনি প্রমাণিত হয়।

৫. কাব্য-লক্ষণ, কাব্যহেতু, কাব্য প্রয়োজন, কাব্যভেদ, অলঙ্কার বর্ণনা প্রভৃতি সকল প্রসঙ্গে রুদ্রটের উপর ভামহের প্রভাব স্পষ্ট—কাব্য ভেদ বিবেচনায় নাট্যের উপেক্ষা করাও এই প্রভাবেরই পরিণাম। রস প্রসঙ্গে তিনি নিশ্চিত ভাবে ভরতের নিকটে ঋণী, কিন্তু মোটের উপর ভামহের প্রভাবই অপেক্ষাকৃত গভীর ও ব্যাপক।

বস্তুতঃ রুদ্রট্ কাব্যের দেহবাদী ও আত্মবাদী ধারার সঙ্গমে অবস্থিত।—তাঁহার কালে কাব্যশাস্ত্রের উপর অলঙ্কারের বন্ধন শিথিল হইতে এবং পুনরায় রসের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিয়াছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে উদ্ভূত রসের ধারা তাঁহার টীকাকারেদের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া খৃষ্টীয় নবম শতকের নিকটবর্তী কাল হইতে নাট্যের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিয়া কাব্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় রসধ্বনি সিদ্ধান্তের ভূমিকা তৈরী হইয়া গিয়াছিল। রুদ্রটেরই সমসাময়িক রুদ্রভট্ট অলঙ্কারবাদী উদ্ভটের "নব নাট্যে রসা স্মৃতাঃ" কে সংশোধিত করিয়া "নব কাব্যে রসাস্মৃতাঃ" রূপে ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছিলেন।

রসবাদী ধারা—অলঙ্কারবাদী ধারার সমান্তরালে অন্য দিকে রসবাদী ধারাও নিরন্তর প্রবাহিত ছিল এবং ভরতের টীকাকারেরা উহার সংবর্দ্ধনায় নিরত ছিলেন। কালক্রমানুসারে এই দলের প্রথম ব্যক্তির নাম হইতেছে লোল্লট। লোল্লটের সম্বন্ধে

সংস্কৃত পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান সূত্র অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে তিনি উদ্ভটের পরবর্তী এবং অভিনবের পূর্ববর্তী ছিলেন এবং বোধ হয় প্রসিদ্ধ কাশ্মিরী দার্শনিক কল্লটের (নবম শতকের মধ্যবর্তী কালে) সমসাময়িক ছিলেন।[১] কাব্যশাস্ত্র ছাড়াও তিনি দর্শনশাস্ত্রেরও পণ্ডিত ছিলেন এবং বোধ হয় কবিতার প্রতি তাঁহার অনুরাগও ছিল।[২] ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ছাড়া তিনি কাব্য-রচনাও করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ দর্শনশাস্ত্রের উপরেও কিছু লিখিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা রচিত শুধু মাত্র দুইটি প্রসঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়—ভরত সূত্রের ব্যাখ্যার অংশ এবং অভিধাবিষয়ক তাঁহার মন্তব্য। নিজস্ব এই ছোট কৃতির মধ্যে লোল্লট ভরত সূত্রের ব্যাখ্যা যেরূপ মনোযোগ সহকারে করিয়াছেন এবং রসকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে নিঃসন্দেহ লোল্লটকে রসবাদী বলা যাইতে পারে। রাজশেখর তাঁহার মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া নির্দ্বিধায় এই মতের পোষকতা করিয়াছেন: অস্তু নাম নিঃসীমার্থসার্থঃ। কিন্তু রসবৎ এব নিবন্ধো যুক্তো ন নীরসস্য' ইতি অপরাজিতিঃ—অর্থাৎ অপরাজিতের পুত্র ভট্টলোল্লটের এই মত যে অর্থরাজি অসীম হইলেও কাব্যে নীরস বিষয়ের স্থানে সরস অর্থের সংযোজন অত্যাবশ্যক (হিন্দি কাঃ মী, পৃঃ ১১০)। ভরতের পরে লোল্লট প্রথম ব্যক্তি, যিনি স্বীয় ব্যাখ্যায় রসের স্বরূপকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভাবের সহিত উহার প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার যুগের অন্য আচার্য্যদের বিপক্ষে রসকে শব্দার্থের অঙ্গ রূপে গ্রহণ করিবার স্থলে মানব ভাবের পরিণতি রূপে গ্রহণ করিয়া রস সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ সাধনে লোল্লট নিশ্চিত রূপে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছেন—তেন স্থায্যেব বিভাবভাবাদিভিরুপচিতো রসঃ।[৩] অধিকন্তু লোল্লট রস সম্বন্ধে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন—

১. বাসনার আবেশের ফলে নটেরও রস ও ভাবানুভূতি সম্ভবপর হয়, অতএব নটকেও রসাস্বাদ কর্তা স্বীকার করিতে হইবে:

রসভাবানামপি বাসনাবশেন নটে সম্ভবাদনুসন্ধিবলাচ্চ··।

—হিন্দি অভিনবভারতী, পৃঃ ৪১৮

২. প্রকৃত পক্ষে রস অনন্ত, কিন্তু নটগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য নাটকে আটটি রস প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত:

....তেনানন্তেহপি পার্ষদপ্রসিদ্ধ্যা এতাবতাং প্রযোজ্যত্বমিতি

যদ্ ভট্টলোল্লটেন নিরূপিতম্....। —হিন্দী অভিনবভারতী, পৃঃ ৫২৯

লোল্লটের পরে ভরতসূত্রের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারের নাম হইতেছে

---

১. Indian Aesthetics (Comparative Aesthetics, Part I)—ডঃ কান্তিচন্দ্র পাণ্ডে, পৃ. ২৮

২. ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্র (প্র. সং.), পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায়: পৃ. ৩১-৩৪

৩. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ. ৪৪৩

শ্রীশঙ্কুক। নামেতে ইঁহাকেও কাশ্মিরী পণ্ডিত বলিয়া অনুমান করা হয়। ডঃ কান্তিচরণ পাণ্ডের মনে করেন যে ইনিও শৈব দর্শনের সহিত জড়িত ছিলেন। কিন্তু ইঁহার চিন্তা-পদ্ধতি, লোল্লটের চিন্তাপদ্ধতির অনুরূপ শৈব দর্শনের অধিক অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। অতএব বলিষ্ঠ প্রমাণের অভাবে কেবলমাত্র প্রাপ্ত উদ্ধরণের অনুসরণে এই দুইজনকে শৈব দার্শনিক রূপে স্বীকার করিতে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ দেখা দেয়। ইহার বিপক্ষে শঙ্কুকের বিষয়ে এই নবীন অনুসন্ধানটি অধিক গ্রাহ্য মনে হয় যে তাঁহার উপর বৌদ্ধ ন্যায়ের প্রভাব ছিল।[১] ইহার আবির্ভাব কাল লোল্লটের কিছু পূর্বে বা পরে—কারণ অভিনব গুপ্ত যেরূপে লোল্লটকে উদ্ভটের ঠিক সেই রূপে শঙ্কুককে লোল্লটের মতের খণ্ডন কর্তা রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ নবম শতকের উত্তরার্ধে কিছু সময় পর্য্যন্ত তিনি লোল্লটের সমকালীন ছিলেন। শঙ্কুকের সম্বন্ধে যতগুলি উদ্ধরণ অভিনব ভারতী গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহাতে শঙ্কুকের রসের প্রতি আগ্রহ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। রসের স্বরূপ, নিষ্পত্তি ও স্থানাদির অনুসন্ধান শঙ্কুক যে রকম উচ্চতর দার্শনিক ভিত্তিতে করিয়াছেন, তাহাতে রস সিদ্ধান্তের তাত্ত্বিক বিকাশের পর্য্যালোচনায় বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। বস্তুতঃ শ্রীশঙ্কুকের দার্শনিক পৃষ্ঠভূমি ভট্ট লোল্লটেরও অপেক্ষা অধিক সুদৃঢ় ও গম্ভীর এবং রসকে শব্দার্থ-ধর্ম্মের নিম্নতর স্থান হইতে বাহির করিয়া "অনুমানাদি" মনের ক্রিয়ারূপে প্রকাশ করাতে রস-সিদ্ধান্তের সুপ্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তাঁহার মূল্যবান অবদান অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। লোল্লটের অনুরূপ শঙ্কুকও রসকে নাট্য রসের অর্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু লোল্লট যেখানে রসকে অনুকার্য্য ও অনুকর্তার মধ্যে সীমিত রাখিয়াছিলেন সেখানে শঙ্কুক রসকে সহৃদয়তার স্তর পর্য্যন্ত উন্নীত করিয়াছেন।

প্রায় এই সময়কার একটি সাংখ্যবাদী টীকার উল্লেখ অভিনব গুপ্ত অভিনব ভারতীতে নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩১ তম কারিকাভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন:

যেন ত্বভ্যধায়ি সুখদুঃখজননশক্তিযুক্তাবিষয়সামগ্রী বাহ্যৈব, সাংখ্যদৃশা সুখ-দুঃখ স্বভাবো রসঃ। তস্যাশ্চ সামগ্র্যাং দলস্থানীয়া বিভাবাঃ, সংস্কারকা অনুভাবব্যভিচারিণঃ। স্থায়িনস্তু তৎসামগ্রীজন্যা আন্তরাঃ সুখদুঃখস্বভাবা ইতি। —এবং যিনি (ব্যাখ্যাকার) ইহা বলিয়াছেন যে সুখদুঃখ সৃষ্টি করিবার শক্তি দ্বারা সংযুক্ত (রসের) বিষয় সামগ্রী বাহ্যই হয় তিনি সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তানুসারে যে (সংসারের সকল পদার্থ ত্রিগুণাত্মক হয় এবং ফলে) রস ও সুখদুঃখাত্মক (মোহাত্মক) হয় এই কথা বলিয়াছেন। এবং সেই সামগ্রীতে (যেমন ব্যঞ্জনাদির পরবর্তী উদাহরণে ডাল রান্নার ব্যাপারে ফোড়ন দিয়া সংস্কার করিলে ভোজ্য রস উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে ঠিক সেইভাবে এখানে) ডাল প্রভৃতির স্থানে বিভাব এবং উহার সংস্কার করিবার জন্য অনুভাব ও ব্যভিচার ভাব বর্তমান থাকে এবং সেই সামগ্রী হইতে আন্তরিক সুখ-দুঃখ (মোহ) রূপী রত্যাদি স্থায়ী ভাব

১. রস গঙ্গাধর কা শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন (ডক্টরেট প্রবন্ধ—শ্রীপ্রেমস্বরূপ গুপ্ত, আলিগড় বি. বি.)

উৎপন্ন হয়।[১]

যদিও অভিনব গুপ্ত পরবর্তী অনুচ্ছেদে ভরত বিরোধী বলিয়া এই মতকে কঠোরতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন, তবুও এই মতের উপস্থাপক সাংখ্যবাদী ব্যাখ্যা-কারদের স্থান রসবাদী ধারারই অন্তর্গত। রসের বস্তুগত উৎপত্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ইঁহাদের আবির্ভাব কাল ধ্বনি সিদ্ধান্তের পূর্বে মানিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না। এই ব্যাখ্যা ইহাও প্রমাণ করে যে একদিকে যেমন অলঙ্কার-বাদীরা শব্দার্থগত চমৎকারিতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করিতেছিলেন সেই রূপই অন্যদিকে রসবাদী আচার্য্যগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে ভরত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা এবং প্রচার করিয়া রসের ভাবাশ্রিত ও "আস্বাদ্য" রসকে দার্শনিক স্তরে উন্নীত করিয়া যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিতেছিলেন।

ধ্বনিপূর্ব রসবাদী ধারার অন্তিম আচার্য্য ছিলেন রুদ্রভট্ট। যদিও কয়েক জন পণ্ডিত ইঁহার আবির্ভাব কাল আনন্দবর্ধনের পরে দশম শতকের প্রারম্ভে স্বীকার করেন তবুও নানা কারণে প্রধান রূপে রুদ্রটের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাম্য এবং ধ্বনির বিষয়ে অজ্ঞানতার জন্য ইঁহাকে ধ্বনিপূর্ব আচার্য্যরূপে গ্রহণ করাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। রুদ্রভট্ট শৃঙ্গার তিলকে রসের বিশেষ করিয়া শৃঙ্গার রসের অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে নব রসের ভাব ও নায়ক নায়িকাভেদের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের বর্ণনা আছে এবং তৃতীয়ে অন্য রসের। এইরূপে রুদ্রভট্টের মূল প্রতিপাদ্য রসই। ইহা ছাড়া প্রত্যক্ষ রূপেও তিনি রসের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছেন :

যামিনীবেন্দুনা মুক্তা নারীব রমণং বিনা।
লক্ষ্মীরিব ঋতে ত্যাগান্নো বাণী ভাতি নীরসা॥ —শৃঃ তিঃ ১.৬

যেরূপে চন্দ্রমা বিনা রাত্রি, পতি বিনা নারী, ত্যাগ বিনা লক্ষ্মী, সেইরূপে রস বিনা কবিতার শোভা হয় না।

ধ্বনিপূর্ববর্তী কবি ও রস—এই যুগের কবিগণ বিশেষ করিয়া নাট্যকার ও প্রবন্ধ কাব্য রচয়িতাগণ সমসাময়িক আলোচকদের এবং তাঁহাদের কাব্যগত ধারণার বিরুদ্ধে রসের সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ শঙ্করণ বলিয়াছেন যে এই কবিদেরও দুইটি শ্রেণী আছে। একদিকে কালিদাস ও ভবভূতির অনুরূপ শুদ্ধ রস-বাদী কবিরা আছেন যাঁহারা অত্যন্ত প্রবলভাবে স্বীয় যুগের অলঙ্কারবাদি আলোচকদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রসের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছেন :

ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে।
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্॥ —মালবিকা. ১.৪

কেবল সিদ্ধান্তের দিক দিয়াই নহে, ব্যবহারের দিক দিয়াও কালিদাসের কাব্য

১. দ্রষ্টব্য, হিন্দী অভিনব ভারতী : পৃ. ৪৬১

রসের সহিত ওতোপ্রোত। রসের যতগুলি ব্যাপক ও পরিষ্কৃত উদাহরণ কালিদাসের দৃশ্য ও শ্রব কাব্যে পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ—তাহাতে শৃঙ্গারের সংযোগ ও বিয়োগ উভয় রূপেরই অপূর্ব প্রকাশ দেখা যায়। বীর ও করুণ রসের উপর তাঁহার সমান অধিকার ছিল এবং শেষ রসগুলিরও যথা প্রসঙ্গ বর্ণনা আছে। রসাবতার ভবভূতির আগ্রহ আরও প্রবল। তিনি চিত্তের বিক্রুতিকে, ব্যাপক দৃষ্টিতে মানব সংবেদনাকে, রসের মূলধর্ম রূপে স্বীকার করিয়া করুণকে একমাত্র রস বলিয়াছেন : একো রসঃ করুণ এব...। নিজের নাটকগুলিতে তিনি অত্যন্ত কৌশলপূর্বক রসের চমৎকারীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে সমস্ত রসের মনোরম বর্ণনা ব্যতীত ভবভূতি কাব্য চিন্তনের ক্ষেত্রেও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত সেই সব কবিদের উল্লেখ করা হয় যাঁহারা রসের প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়াও উহার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই : রস ছাড়াও নিজেদের যুগের শব্দার্থরূপী চমৎকারবাদের প্রতি তাঁহাদের ঝোঁক স্পষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল। এইরূপে তাঁহাদের স্থিতি মধ্যবর্তী। ইহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হইতেছেন ভারবি, বাণ, শ্রীহর্ষ, মাঘ প্রভৃতি কবিগণ।[১]

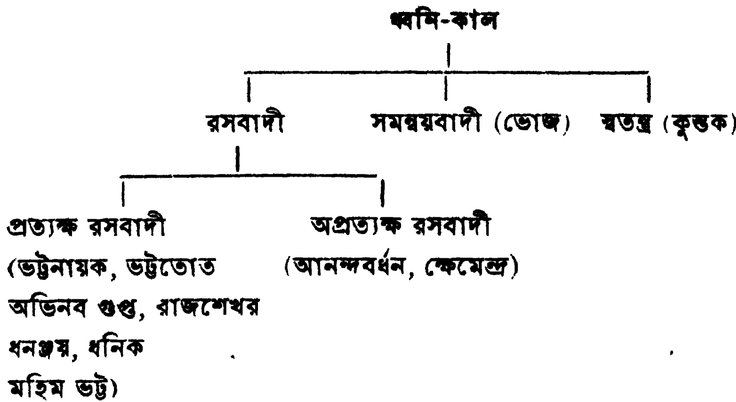
ধ্বনি-কাল (৮৫০— ১০৫০ খৃষ্টাব্দ)

ইহার পরে ধ্বনি-কাল আরম্ভ হয়। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের ঐতিহাসিকদের মতানুসারে ধ্বনি কাল আনন্দবর্ধন হইতে মম্মট পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রসারিত। আনন্দবর্ধন, ভট্টনায়ক, ভট্টতোত, রাজশেখর, কুন্তক, অভিনব গুপ্ত, ধনঞ্জয়, মহিমভট্ট, ক্ষেমেন্দ্র, ভোজরাজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই যুগের লেখক। এই যুগে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের মূলভূত সিদ্ধান্তগুলিকে লইয়া গম্ভীর বিবেচনা ও তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তাহাদের প্রবর্তন ও সুপ্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছিল। ধ্বনি সিদ্ধান্তের আবিষ্কার এবং তাহার আলোকে কাব্যের অন্য সিদ্ধান্তের স্থান নির্দ্ধারণ এই যুগের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান। পূর্ববর্তী যুগের উদ্‌ভাবিত সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা কেবলমাত্র বিশেষ-বিশেষ দৃষ্টিকোণের প্রসার হইয়াছিল কিন্তু এই যুগে বিশেষের স্থানে সার্বভৌম সিদ্ধান্তের অনুসন্ধান ও প্রসারের ব্যাপারে আচার্যদের প্রবণতা স্পষ্ট দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ধ্বনির স্থাপনা রস হইতে ভিন্ন রূপেই হইয়াছিল কিন্তু ব্যবহারে রস ও ধ্বনি অভিন্ন থাকিয়া যায় এবং রস সিদ্ধান্তের সর্বাধিক উৎকর্ষ সাধনা ধ্বনিবাদিরা সম্পন্ন করেন। এই যুগ বস্তুতঃ রস সিদ্ধান্তের স্বর্ণ যুগ। একদিকে যেমন ভট্টনায়ক, ভট্টতোত, অভিনব গুপ্ত, রাজশেখর, ধনঞ্জয় ও মহিমভট্ট প্রত্যক্ষরূপে রস-সিদ্ধান্তকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন সেইরূপ অন্য দিকে আনন্দবর্ধন রসধ্বনি ও ক্ষেমেন্দ্র রসাশ্রিত ঔচিত্যের দ্বারা রসের

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Theories of Rasa and Dhavni, ভাগ ১, পরিচ্ছেদ ৫ (পঞ্চম)।

গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভোজের দৃষ্টিকোণ সমন্বয়বাদী দৃষ্টিকোণ ছিল। তিনি কাব্যে ধ্বনির প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়াছিলেন, অলংকার ও রীতির প্রতিও তাঁহার মনে শ্রদ্ধা ছিল তথাপি রসের প্রতি তাঁহার আগ্রহ অসংদিগ্ধ। কেবলমাত্র কুন্তক একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি রস হইতে ভিন্ন বক্রোক্তি সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার বিরোধ ধ্বনির সঙ্গে যতখানি ছিল ততখানি রসের সহিত ছিল না—বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে শব্দার্থ-বক্রতাকে কাব্যের জীবিতরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাঁহার মনে রসের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।



রসের প্রত্যক্ষ সমর্থক—এই দলের অগ্রণী ভট্টনায়ক—যাঁহার আবির্ভাব-কাল আনন্দবর্ধনের পরে ও অভিনব গুপ্তের পূর্বে দশম শতাব্দীর উত্তরার্ধে, স্বীকার করা যাইতে পারে। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের দুর্ভাগ্য যে আজ ভট্টনায়কের গ্রন্থ "হৃদয় দর্পণ"এর কেবল নাম শেষ থাকিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার অপেক্ষাকৃত মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অভিনব গুপ্ত ও তাঁহার পরবর্তী কাশ্মীরী শৈবাদ্বৈতের অনুসরণকারীদের তর্কের আড়ম্বরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভট্টনায়কও নিশ্চিত শৈব আনন্দবাদী ছিলেন—তাঁহার মতে এই জগতটি একটি নাটকের অনুরূপ যাহার নাট্যপ্রপঞ্চে মানুষ নিত্য রসাস্বাদন করিয়া থাকে :

নমস্ত্রৈলোক্যনির্মাণকবয়ে শম্ভবে যতঃ।
প্রতিক্ষণং জগন্নাট্যপ্রয়োগরসিকো জনঃ॥

—হিন্দী-অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৬

—অর্থাৎ ত্রৈলোক্য (রূপ নাটকের) নির্মাতা মহাকবি শংকরকে নমস্কার; যেহেতু প্রতিক্ষণ সংসারে লোক (তাঁহার বিরচিত) এই জগৎ রূপী নাটকের ব্যবহারে রসাস্বাদের অনুভব করিয়া থাকে।

অভিনব গুপ্তের অনুরূপ ভট্টনায়কও শান্ত রসকে মূল রস স্বীকার করেন :

স্বং স্বং নির্মিত্তমাস্বাদ্য শান্তাদুৎপদ্যতে রসঃ ।

—হিঃ অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫৫

ভট্টনায়ক হৃদয়বান্ আলোচক ছিলেন—তিনি স্বীকার করিতেন যে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা হইতে কাব্যের উদ্ভব হয় :

এতদেবোক্তং হৃদয়দর্পণে—যাবৎপূর্ণো ন চৈতেন
তাবন্নৈব বমত্যমুম্ ।

—ধ্বন্যালোকলোচন, (চৌঃ সং সীঃ) পৃঃ ৮৭

—অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কবিতা রূপে সে তাহা উদ্গীর্ণ করিতে পারে না ।

তিনি কাব্যরসকে যোগাদি দ্বারা প্রাপ্ত রস হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতেন :

বাগ্ধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্ বালতৃষ্ণয়া ।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্ দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ ॥

—ঐ, পৃঃ ৯২

—আপন সহৃদয়রূপী বৎসদের তৃষ্ণাকে শান্ত করিবার জন্য সরস্বতী-রূপীনী ধেনু যে রসের আপনিই প্রস্রবণ করেন, তাহার সমকক্ষতা যোগীদের দ্বারা অনেক কষ্ট সাধনা করিয়া প্রাপ্ত রসও করিতে পারে না । তিনি ব্যঞ্জনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া রসের ভুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া রসের প্রত্যক্ষ সিদ্ধির ব্যাপারে অপূর্ব্ব সাহায্য করিয়াছেন :

তেন যদাহ ভট্টনায়ক :
শব্দপ্রাধান্যমাশ্রিত্য তত্র শাস্ত্রং পৃথগ্বিদুঃ ।
অর্থতত্ত্বেন যুক্তং তু বদন্ত্যাখ্যানমেতয়োঃ ॥
দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপারপ্রাধান্যে কাব্যধীর্ভবেৎ ॥

—অর্থাৎ যেখানে শব্দের প্রাধান্য, তাহা শাস্ত্র; যাহা অর্থতত্ত্বযুক্ত তাহা আখ্যান এবং এই দুইটি গৌণ হইলে পরে যেখানে ব্যাপারের প্রাধান্য দেখা দেয় তাহা কাব্য ।[১]

ভট্টনায়কের মতে কাব্যের প্রাণ রস :

কাব্যে রসয়িতা সর্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্ ।

—ধ্বন্যালোকলোচন, পৃঃ ১২

—কাব্য রসের প্রসার করে—তাহা (পুরাণাদির অনুরূপ) উপদেশও দেয় না এবং শাস্ত্রাদির অনুরূপ বিধিনিষেধও করে না ।

ভট্টনায়ককে সম্বোধন করিয়া অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন যে :
কাব্যে রসচর্বণা তাবৎ জীবিতভূতেতি ভবতোঽপি
অবিবাদোঽস্তি । —ধ্বন্যালোকলোচন, পৃঃ ৩৯

—অর্থাৎ রসচর্বণা কাব্যের প্রাণ, এই কথাটি তিনিও নির্বিবাদে স্বীকার করেন । ভট্টনায়ক সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করিয়া কাব্যাস্বাদের একটি মৌলিক

১. ধ্বন্যালোকলোচন (চৌ. সং সী. ১৯৪০) পৃঃ ৮৭

সমস্তার মর্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং রসের সহৃদয়নিষ্ঠা ও অনুভূতিকে প্রামাণিক মানিয়া রসের নির্ভ্রান্ত শব্দাবলীতে আত্মগত স্বরূপের উদঘাটন করিয়াছেন। একদিকে যেমন লোল্লট প্রভৃতির মতানুসারে রসের স্বরূপ একান্ত বস্তুনিষ্ঠ, তেমনি অপর দিকে অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির মতানুসারে তাহা সর্বথা আত্মনিষ্ঠ। ভট্টনায়ক দুই বিপরীত মতের সমন্বয় করিয়া মধ্যবর্তী মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন এবং কাব্যার্থ ও প্রমাতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহারিক—ভোজ্য-ভোজক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। অভিনব গুপ্তের যুক্তি এবং অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিচার পদ্ধতির গুরুত্ব পূর্ণরূপে স্বীকার করিলেও জীবন এবং কাব্য হইতে বস্তুতত্ত্বকে সমগ্রভাবে নিবারিত করা কঠিনই এবং এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে, ভট্টনায়কের এই রস-ভোগবাদ অধিক ব্যবহারিক একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ভট্টনায়কের সমসাময়িক ভট্টতোতের যোগদান অনেকটা অনুমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার গ্রন্থ কাব্য-কৌতুকের আজ কেবল নামই অবশেষ আছে। অভিনব গুপ্ত ধ্বন্যালোকলোচন ও অভিনব ভারতীতে তাঁহার এই গুরুর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিয়াছেন। অভিনব গুপ্ত ব্যতীত হেমচন্দ্রও নিজের গ্রন্থ কাব্যানুশাসনে প্রতিভা প্রসঙ্গে ভট্টতোতের কয়েকটি ধার্মিক উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এই উক্তিগুলিতে রসের প্রতি ভট্টতোতের আগ্রহ স্পষ্টই বিদ্যমান রহিয়াছে।

অভিনব ভারতীর দুইটি অধ্যায়ে ভট্টতোতের মন্তব্যগুলির বিস্তারিত বর্ণনা আছে: প্রথমে ষষ্ঠ অধ্যায়ে, এবং পরে উনবিংশতি অধ্যায়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভট্টতোত শ্রীশংকুক প্রতিপাদিত রসানুকরণবাদের খণ্ডন করিয়া ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে ভরতের মতানুসারে রত্যাদির পরিপুষ্ট রূপই রস, রত্যাদির অনুকরণ রস নয়। অর্থাৎ নট-নিষ্ঠ রসের স্থিতির সমর্থন না করিয়া তিনি সহৃদয়-নিষ্ঠ রসের প্রতিপাদন করিয়াছেন—রসকে অভিনয় কলা হইতে উচ্চতর আসনে—হৃদয়ের চিত্তবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উনবিংশতি অধ্যায়ে ভট্টতোতের কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা এই তথ্যটির উদঘাটন করা হইয়াছে যে লক্ষণা, গুণ, অলংকার, শব্দশক্তি, বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যতত্ত্বের পারস্পরিক আনুকূল্যে রসের ব্যঞ্জনা কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়:

তথা চোক্তং ভট্টতোতেন—

লক্ষণালঙ্কৃতিগুণা দোষাঃ শব্দপ্রবৃত্তয়ঃ।
বৃত্তিসন্ধ্যংগসংরম্ভ সংহারো যঃ কবেঃ কিল॥
অন্যোন্যস্যানুকূল্যেন সম্ভূয়ৈব সমুত্থিতৈঃ
ঝটিত্যেব রসা যত্র ব্যজ্যন্তে হ্লাদিভিগুর্ণৈঃ
বৃত্তেঃ সরলবক্রৈর্যুক্তৈশ্চূর্ণপদৈরপি।
অশ্লিষ্টদ্বন্দ্বঘটনং ভাবয়া সুপ্রসিদ্ধয়া॥
যচ্চেদ্দৃক্কাব্যমাত্রং সপ্রসভাবানুভাবনম্।

সামান্যাভিনয়ে প্রোক্তং বাচ্যাভিনয়সংজ্ঞয়া ॥
এবং প্রকারং যৎকিঞ্চিদ্বস্তুজাতং (কথাৰ্পিতম্) ।
অন্যূনাধিকসামগ্ৰী পরিপোষোন্মিষদ্রসম্ । —হিঃ অঃ ভাঃ, পৃঃ ৯৪

—সারার্থ এই যে, লক্ষণ, অলঙ্কার, গুণ, দোষ, শব্দ-প্রবৃত্তি, বৃত্তি ও সন্ধ্যঙ্গো যাহা কবিদের জন্য আবশ্যক এবং যাহাদের প্রতি কবিদের আগ্রহ বিদ্যমান থাকে তাহাদের পরস্পরের সাহায্যে এক সঙ্গে সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন । এইরূপ আনন্দদায়ক গুণের দ্বারা যে কাব্যে রস অতি শীঘ্র অভিব্যক্ত হয়, যে কাব্যের রচনা সরল বন্ধনযুক্ত ছন্দে, কোমল ও বিলক্ষণ প্রয়োগের সাহায্যে সুপ্রসিদ্ধ ভাষায় এইরূপ করা হয় যে তাহার সংঘটনা শ্লেষ-রহিত হওয়াতে হৃদয় আনন্দদায়ক বোধ হয়, এইরূপ যত কাব্য বিদ্যমান আছে তাহা রস ও ভাবের অনুভাবক হয় । এই কাব্যের কথন বাচ্যাভিনয়ের সংজ্ঞা হইতে সামান্যাভিনয়ের প্রসঙ্গে করা হইয়াছে । এই রকম সমস্ত বস্তুর যখন ভাষায় বর্ণনা করা হয় এবং তাহাতে এমন সামগ্রীর সমবায়ীকরণ করা হয় যাহা আবশ্যকতা হইতে ন্যূন অথবা অধিক নয় তখন তাহার দ্বারা রসের উন্মেষ হয় ।

উল্লিখিত উক্তিতে রস সাধ্য এবং অন্য কাব্যতত্ত্ব সাধন মাত্র । রসের প্রতি অধিক আগ্রহ থাকার জন্য ভট্টতোত নাটকে গানের প্রয়োগের উপর খুব জোর দিয়াছিলেন, অভিনব গুপ্তের বাক্য ইহার প্রমাণ—"আমাদের গুরু ভট্টতোতের মত যে (নাটকে) রসের আস্বাদন তাহার (গান) দ্বারাই হয় ।"

অপর দিকে প্রতিভা[১] প্রসঙ্গে প্রতিভার প্রেরণাকে কবির প্রধান ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়া আত্মবাদী কাব্য সিদ্ধান্তের সংবর্ধন করা হইয়াছে । রস-সিদ্ধান্তের বিকাশ প্রসঙ্গে ভট্টতোতের সর্বপ্রমুখ অবদান এই যে তিনি স্পষ্টরূপে কবির অনুভবকে রস-চক্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং এইরূপে সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ায় নায়ক ও সহৃদয়ের মধ্যে মাধ্যমরূপে কবিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোহনুভবস্ততঃ ।[২] প্রকৃতপক্ষে সাধারণীকরণের বৃত্ত কবি ভিন্ন পূর্ণ হইতে পারে না । রস-প্রসঙ্গে কবির অনুভূতি উপেক্ষিত হওয়ার জন্য ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি একদিক্ দিয়া অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে । ভট্টতোত এই সম্বন্ধে যথার্থ আভাস ও উপযুক্ত কর্তব্য কর্মের নির্দেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালীন শাস্ত্রীয় ধারার মধ্যে তাহার সম্যক্ প্রবেশ লাভ হয় নাই ।

অভিনব গুপ্ত রস সম্প্রদায়ের সর্বপ্রমুখ আচার্য—তাঁহার সর্বদর্শী প্রতিভা রস-সিদ্ধান্তের ইতিহাসে ক্রান্তি উপস্থিত করিয়াছিল । কাব্য শাস্ত্রের উপর তাঁহার দুইটি

---

১. প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা ।
তদনুপ্রাণনাজীবদ্বর্ণনানিপুণঃ কবিঃ ॥
(হেমচন্দ্র কাব্যানুশাসন, পৃঃ তিনে
কাব্য-কৌতুকের উদ্ধৃতি)

২. ধ্বন্যালোকলোচন (চৌঃ সং. সী. ১৯৪০) পৃঃ ৯২

গ্রন্থ আছে, ধ্বন্যালোকলোচন ও অভিনবভারতী। ধ্বন্যালোকলোচনে আনন্দবর্ধনের ধ্বনি-সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং অভিনব ভারতীতে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য করা হইয়াছে। ইহাতে ভরতের নাট্য-সিদ্ধান্তের গম্ভীর দার্শনিক ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। অভিনব গুপ্ত রসবাদী ছিলেন, অথবা রসধ্বনিবাদী, এই প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে রস ও রসধ্বনিতে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই, তবুও রস সম্প্রদায় ও ধ্বনি সম্প্রদায়ে ব্যবহারিক ভেদ স্পষ্ট বিদ্যমান। বর্তমান আলোচনা শাস্ত্রের বিচারে এই ভেদ অনুভূতি ও কল্পনার আপেক্ষিক প্রাধান্যের ভেদ। উভয় সম্প্রদায় অনুভূতি ও কল্পনাকে অনিবার্যভাবে অন্যোন্যাশ্রিত স্বীকার করে, কিন্তু আপেক্ষিক প্রাধান্যের প্রভেদ উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। আপেক্ষিক প্রাধান্য বা অপ্রাধান্যের মানদণ্ডে বিচার করিলে রসের প্রতি অভিনব গুপ্তের আগ্রহ স্পষ্ট দেখা যায়ঃ

১. তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বস্তুলঙ্কারধ্বনি তু সর্বথা রসং প্রতি পর্যবস্যেতে ইতি বাচ্যাদুৎকৃষ্টৌ তাবিত্যভিপ্রায়েণ ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মেতি সামান্যেনোক্তম্।

অতএব রসই বাস্তবিক দৃষ্টিতে কাব্যের আত্মা; বস্তু ও অলঙ্কার ধ্বনি তখনই কাব্য-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় যখন সেগুলি রসে পর্যবসিত হয়। এই দুইটি ধ্বনিও বাচ্যার্থের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অতএব সামান্যভাবে ধ্বনিক কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে।

—(ধ্বন্যালোকলোচন, চৌঃ সং সীঃ পৃঃ ৮৫)

২. যথোক্তম্—

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তি প্রীতিং চ সাধুকাব্যানিষেবণম্। ইতি॥

তথাপি তত্র প্রীতিরেব প্রধানম্। অন্যথা প্রভুসংমিতেভ্যো বেদাদিভ্যো মিত্রসংমিতেভ্যশ্চেতিহাসাদিভ্যো ব্যুৎপত্তিহেতুভ্যঃ কোহস্য কাব্যরূপস্য ব্যুৎপত্তিহেতোর্জায়াসংমিতত্বলক্ষণো বিশেষ ইতি প্রাধান্যেনানন্দ এবোক্তঃ। চতুর্বর্গব্যুৎপত্তেরপি চানন্দ এব পার্যন্তিকং মুখ্যং ফলম্।

—অর্থাৎ, যেমন বলা হইয়াছে ঃ

সৎকাব্যের আস্বাদনে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও কলায় নিপুণতা, কীর্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। তবুও সেখানে আনন্দেরই প্রাধান্য। নতুবা উপদেশের জন্য প্রভুসম্মিত পদ্ধতির অনুসরণকারী বেদাদি এবং বন্ধুসম্মিত পদ্ধতির অনুযায়ী ইতিহাসাদি হইতে কান্তাসম্মিত রীতির আশ্রয়কারী কাব্যের ভিন্নতা অথবা বৈশিষ্ট্য কোথায়? আনন্দের প্রাধান্যের দ্বারাই এই ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা হইয়াছে। চতুর্বর্গের ব্যুৎপত্তিতেও আনন্দই অন্তিম ও মুখ্য ফল।

(ঐ, পৃঃ ৪০-৪১)

৩. প্রাধান্যাদিতি। রসপর্যবসানাদিত্যর্থঃ। তাবন্মাত্রাবিশ্রান্তাবপি চান্যশব্দবৈলক্ষণ্যকারিত্বেন বস্তুলঙ্কারধ্বনেরপি জীবিতত্বমৌচিত্যাদুক্তমিতি ভাবঃ।

—'রস ও ভাবই প্রাণ', সারার্থ এই যে রস ও ভাবেই চর্বনার পর্যবসান হয়। যদিও কেবল বস্তু ও অলঙ্কারে কাব্যাস্বাদনের বিশ্রান্তি হয় না, তবুও অন্য শব্দ বোধের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যেও কিছু বিলক্ষণতা থাকে। এই ঔচিত্যের জন্য ইহাদেরও কাব্যের প্রাণ বলা হইয়াছে। (ঐ, পৃঃ ৯০)

এই উদ্ধরণগুলির দ্বারা ইহা স্পষ্ট হয় যে ধ্বনিকার যেখানে রসের প্রতি পক্ষপাত করিয়াও বস্তু অলঙ্কার ধ্বনিকে মুক্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে অভিনব গুপ্ত রসের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল হওয়ার জন্য এই দুইটিকে প্রযত্নপূর্বকই স্বীকার করিয়াছেন। মূল লেখক ও ভাষ্যকারের দৃষ্টিকোণে এই প্রভেদ শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে অভিনব গুপ্তের দার্শনিক মত শৈবাদ্বৈত, যাহা পরমতত্ত্বের আনন্দময়ী ও অদ্বৈত স্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শৈবাদ্বৈতের মূলাধার আনন্দতত্ত্ব অদ্বৈতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেইজন্য ইহা অখণ্ড ও অনাদি; তাহার উৎপত্তি হয় না, হয় কেবল অভিব্যক্তি। এইরূপে শৈবাদ্বৈতবাদ অভিব্যক্তিবাদকে আনন্দবাদের সহায়ক সিদ্ধান্ত রূপে আগ্রহের সহিত স্বীকার করে। সেইহেতু অভিনব গুপ্ত রস সিদ্ধান্তের সহায়করূপে ধ্বনি সিদ্ধান্তকে মনোযোগের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মুখ্যতঃ রসবাদীই, ব্যঞ্জনা (ধ্বনি)কেও নিশ্চিত তিনি স্বীয় রস-বিষয়ক ধারণার পুষ্টির জন্য স্বীকার করিয়াছেন। উভয় সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহার আস্থার ইহাই স্পষ্ট কারণ—শিবতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের এই সহজ সম্বন্ধের বর্ণনা তিনি নানাস্থলে করিয়াছেন :

১. সংসারনাট্যজননধাতৃবীজলতাজুষাম্।
জলমূর্তি শিবাং পত্যুঃ সরসাং পর্য্যুপাস্মহে॥

—সংসাররূপী নাট্যের উৎপত্তি ও স্থিতির (ক্রমশঃ) বীজ ও লতাকে যিনি ধারণ ও পোষণ করেন সেই ভগবান শিবের রসময়ী ও মঙ্গলময়ী জলমূর্তির আমরা উপাসনা করি।

২. যাবন্নিজহৃদয়রসবিলসদ্বিকস্বরনির্বারচমৎকারপবিত্রতা ন জাতা ভগবত ইব
তাবচ্ছিক্ষাশতৈরপি বৈচিত্র্যমনাহার্য্যম্।

—অর্থাৎ যখন পর্য্যন্ত ভগবৎ তুল্য (শিবতুল্য) নিজ হৃদয়ে রস হইতে উৎপন্ন সৌন্দর্য্য ও উদ্দাম আনন্দের পবিত্রতা উপস্থিত না হয় তখন পর্য্যন্ত সহস্রবার শিক্ষা দিলেও (অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক) সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।[১]

অন্যত্র, ধ্বন্যালোকের টীকা লোচনের মঙ্গলাচরণে সরস্বতী তত্ত্বের সহিত রসতত্ত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত করা হইয়াছে :

জগদ্গ্রাবপ্রখ্যং নিজরসভরাৎসারয়তি চ।[২]

—পাষাণসদৃশ নীরস জগৎকে যে (সরস্বতী তত্ত্ব) নিজের রস-ভারের দ্বারা সরস ও সারবান্ করিয়া দেয়।

---

১. হিন্দি অভিনব ভারতী : পৃঃ ১২৫

২. ধ্বন্যালোকলোচন (কাশী সং সীঃ চৌখম্বা) পৃঃ ১

নিজের দর্শন গ্রন্থে অভিনব গুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের আলোকে রস তত্ত্বের অপূর্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং অপর দিকে অভিনব ভারতী ও ধ্বন্যালোকলোচনের মূল কারিকাগুলির ব্যাখ্যার সহিত রস-সিদ্ধান্তের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসঙ্গের উপর স্বতন্ত্র ও গম্ভীর বিচার ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহার ব্যাপক প্রভাব ভারতীয় রসশাস্ত্রের উপর অদ্যাবধি অক্ষুন্ন আছে। অভিনব গুপ্ত রস-শাস্ত্র-বিষয়ক নানা ক্রান্তিকারী সিদ্ধান্তের স্থাপনা করিয়াছিলেন যেগুলিকে আজও যথাবৎ গ্রহণ করা হয়:

১. রসের স্বরূপ ও নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে তিনি উৎপত্তিবাদ, অনুকৃতিবাদ ও ভুক্তি-বাদ প্রভৃতি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর অভিব্যক্তিবাদের স্থাপনা করিয়াছেন।[১] তিনি রসের অনুকার্য্যগত ও নটগত স্থিতিকে অস্বীকার করিয়া সহৃদয়গত স্থিতিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং এইরূপ রসের বস্তু নিষ্ঠরূপের খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ ব্যক্তি-নিষ্ঠ অথবা আত্মনিষ্ঠ আস্বাদ রূপের প্রতি-পাদন করিয়াছেন—ভট্ট নায়কের ভোগবাদে দ্বৈত তত্ত্বের অবস্থান নিশ্চিত রূপে বিদ্যমান ছিল, অভিনব গুপ্ত ইহার বিপরীতে, রসের অখণ্ড অদ্বৈত সত্তাকে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন:

অস্মন্মতে তু সংবেদনমেবানন্দঘনমাস্বাদ্যতে।[২]

সাংখ্য মতের দ্বারা প্রভাবিত ভট্ট নায়ক যদিও রসের সুখদুঃখাত্মক স্বরূপের খণ্ডন পূর্বেই করিয়াছিলেন তথাপি অভিনব গুপ্ত শৈবাদ্বৈতের আলোকে ইহার যথা-যথ ভাবে নিরাকরণ করিয়া রসের একান্ত আনন্দময়ী স্বরূপের প্রতিপাদন করিয়াছেন:

অন্যে ত্বাদিশব্দেন শোকাদীনামত্র সংগ্রহঃ। স চ ন যুক্তঃ। সামাজিকানাং হি হর্ষৈকফলং নাট্যং ন শোকাদিফলম্।[৩]

এই দৃষ্টিতে অভিনব গুপ্ত রসাভিব্যক্তির প্রমুখ মাধ্যম রূপে রূপককেই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু প্রবন্ধ কাব্যেও ভাষা, পোষাক প্রভৃতির কল্পনা ও বর্ণনা-চমৎকারিত্বের দ্বারা প্রকটীকৃতরসের স্থিতিকে তিনি সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রবন্ধের উপজীব্য হওয়ার জন্য মুক্তকেও রসের স্থিতি মানিয়া লইয়াছেন কারণ তাহাতে সহৃদয় (পুরুষ) পূর্বাপর উচিত (প্রসঙ্গের কল্পনা করিয়া) "এখানে এই সময় এই রূপে (এই শ্লোকের) বক্তা", ইত্যাদি নানা কথা নিজের দিক হইতে সংযোজিত করিয়া লন:

তদ্রূপসমর্পণয়া তু প্রবন্ধে ভাষাবেষ প্রবৃত্ত্যৌচিত্যাদিকল্পনাৎ। তদুপজীবনেন মুক্তকে। তথা চ তত্র সহৃদয়াঃ পূর্বাপরমুচিতং পরিকল্প্য "ঈদৃগত্র বক্তাস্মিন্নবসরে" ইত্যাদি বহুতরং পীঠবন্ধং রূপং বিদধতে।[৪]

---

১. দ্রষ্টব্য: হিন্দী অভিনব ভারতী, অ: ৬

২. ঐ, পৃ: ৫০৭

৩. ঐ. পৃ: ৫০০

৪. দ্রষ্টব্য: হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃ: ৪৯২

এইরূপে রসবেত্তার দৃষ্টিতে কাব্য-ভেদের শ্রেণী নির্ণয় করা যাইতে পারে : রূপক→প্রবন্ধ→মুক্তক।

২. অভিনব গুপ্তের মতানুসারে যদিও রসের সিদ্ধি বিভাব, অনুভাব অথবা ব্যাভিচারী ভাবের প্রাধান্যের দ্বারাও হইতে পারে, তথাপি ইহার পূর্ণ উৎকর্ষ রসাবয়বের সমান-প্রাধান্যের দ্বারাই সম্ভবপর : কিন্তু সম্প্রাধান্য এবং রসাস্বাদস্যোৎকর্ষঃ।[১]

৩. অভিনব গুপ্ত ভরত এবং নিজের গুরু ভট্টতোতের নিকট হইতে আভাস পাইয়া কবিগত রসের অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে কবিগত রসের এত প্রমাণিক উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যায় না :

কবিগতসাধারণীভূতসংবিন্মূলশ্চ কাব্যপুরস্সরো নটব্যাপারঃ। সৈব চ সংবিৎ পরমার্থ তো রসঃ। সামাজিকস্য তৎ প্রতীত্যা বশীকৃতস্য পশ্চাদপোদ্ধারবুদ্ধ্যা বিভাবাদি প্রতীতিরিতি। তদেবং মূলবীজস্থানীয়ঃ কবিগতো রসঃ।

—সেই কবিগত সাধারণী ভূত রসসংবিন্মূলক কাব্যের দ্বারা নটের কার্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই কবিগত সংবিৎই রস। সেই রসানুভূতির বশীভূত হইয়া (কবিগত রসের দ্বারা প্রভাবিত) সামাজিকের অপোদ্ধার বুদ্ধির সাহায্যে অর্থাৎ অন্বয়-ব্যতিরিকের দ্বারা শেষে বিভাবাদির প্রতীতি জন্মে—সেইজন্য কবিগত রস মূলবীজ রূপে পরিলক্ষিত হয়।[২]

ইহার পরে কবিগত রস ও সামাজিকগত রসের পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য লিখিয়াছেন :

কবির্হি সামাজিকতুল্য এব। তৎ এবোক্তং শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ ইত্যাদি আনন্দবর্ধনাচার্যেণ। ততো বৃক্ষস্থানীয়ং কাব্যম্। তত্র পুষ্পাদিস্থানীযোহ ভিনয়াদিনটব্যাপারঃ। তত্র ফলস্থানীয়ঃ সামাজিকরসাস্বাদঃ। তেন রসময়মেব বিশ্বম্।[৩]

—অর্থাৎ কবি সামাজিকের অনুরূপই। সেইজন্য আনন্দবর্ধনাচার্য বলিয়াছেন যে যদি কবি শৃঙ্গার রসের অনুবর্তী হন তবে সম্পূর্ণ জগৎ রসময় হইয়া যায় এবং তিনি যদি বীতরাগী হন তাহা হইলে সম্পূর্ণ কাব্য নীরস হইয়া যায়, ইত্যাদি—(ধ্বন্যালোক ৩—৪২)। সেই (বীজস্থানীয় কবিগত রস) হইতে বৃক্ষস্থানীয় কাব্য (উৎপন্ন) হয়। তাহাতে পুষ্প স্থানীয় অভিনয়াদিরূপ নটের ব্যাপার সন্নিবিষ্ট থাকে। তাহাতে ফল স্থানীয় সামাজিকের রসাস্বাদ হয়। সেইজন্য জগৎ রসময়ই।

৫. ভরত ঔষধি-ব্যঞ্জনাদির দৃষ্টান্তের সাহায্যে রস পরিপাকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিনব গুপ্ত শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া রস পরিপাক ও আস্বাদ বিষয়ক প্রশ্নগুলির বিশদ বিবেচনা করিয়াছেন। এইরূপে রসের উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধেরও অভিনবভারতীতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভরত কেবল ইহাই

১. দ্রষ্টব্যঃ হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃঃ ৪৯২

২. ঐ, পৃঃ ৫১৫

৩. ঐ, পৃঃ ৫১৫

বলিয়াছেন যে শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত ও বীভৎস হইতে ভয়ানক রসের উৎপত্তি হয় : কেমন করিয়া ?—শৃঙ্গারের অনুকৃতি হাস্য, রৌদ্রের কর্ম করুণ, বীরের কর্ম অদ্ভুত এবং যেখানে বীভৎসের দর্শন হয় সেখানে ভয়ানক রস বিদ্যমান থাকে। অভিনব গুপ্ত বিস্তৃতভাবে শাস্ত্রীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া এই সম্বন্ধের বিশ্লেষণ চারি প্রকারে করিয়াছেন : প্রথম, অনুকৃতি ও আভাসরূপে; দ্বিতীয়, ব্যবস্থিত ফলরূপে; তৃতীয়, অব্যবস্থিত ফলরূপে ও চতুর্থ তুল্যবিভাবত্বের জন্য আক্ষেপরূপে।

৬. লোল্লট প্রতিপাদিত রসের অনন্তভাবের খণ্ডন করিয়া অভিনব গুপ্ত নয়টি রস স্বীকার করিয়াছেন এবং শান্তকে মহারস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শান্ত রসের প্রতি তাঁহার আগ্রহ এত অধিক ছিল যে তিনি বার-বার নাট্য শাস্ত্রের এমন একটি সংস্করণের উল্লেখ করেন যেখানে স্বয়ং ভরত শান্ত রসকে স্বীকার করিয়াছেন। শান্ত রসের সহিত শৃঙ্গার রসের বিবেচনাও অভিনব ভারতীতে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে।

এইরূপে রসের প্রতি অভিনব গুপ্তের আগ্রহের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার রস বিবেচনা ব্যাপক ও গম্ভীর এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী, এই দৃষ্টিতে ভারতীয় রস শাস্ত্রে তাঁহার স্থান প্রশংসার্হ।

রাজশেখরের (যিনি বস্তুতঃ কালক্রমানুসারে অভিনব গুপ্তের পূর্ববর্তী ছিলেন) মুখ্য বিবেচ্য বিষয় কবি শিক্ষা হইলেও তাঁহার বিচার শক্তির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং তাঁহার দৃষ্টিকোণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ছিল। তাঁহার রস-বিবেচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু রসের গুরুত্বের বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্ট :

শব্দার্থৌ তে শরীরং....রস আত্মা.....।

—কাব্য মীমাংসা (হিঃ অঃ) পৃঃ ১৪

নিজের পুত্র কাব্য পুরুষকে সরস্বতী বলিতেছেন যে শব্দ-অর্থ তোমার শরীর.. এবং রস আত্মা। ইহার পরে অর্থব্যাপ্তি নামক প্রসঙ্গে ভট্ট লোল্লটের উদ্ধরণের উল্লেখ করিয়া তিনি পুনরায় রসের গুরুত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন :

রসবত এব নিবন্ধো যুক্তো ন নীরসস্য।

—কাব্য মীমাংসা (হিঃ অনুবাদ) পৃঃ ১১০

রাজশেখরের মতানুসারে রমনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হইলেও প্রকৃতি এবং ভৌতিক জীবনের নানা পদার্থের কেবল বর্ণনা কাব্যের জন্য পর্য্যপ্ত নহে, তাহার জন্য রসানুকূলতা অনিবার্য :

মজ্জনপুষ্পাবচয়নসন্ধ্যাচন্দ্রোদয়াদিবাক্যমিহ।
সরসমপি নাতি বহুলং প্রকৃতরসানন্বিতং রচয়েৎ॥

—কাব্যমীমাংসা (হিঃ অঃ) পৃঃ ১১১

—জলক্রীড়া, পুষ্পাবচয়ন, সন্ধ্যা ও চন্দ্রোদয় প্রভৃতির বর্ণনা সরল হইলেও তাহা অধিক মাত্রায় হওয়া উচিত নয় এবং প্রসঙ্গ ও রসের বিরুদ্ধেও হওয়া উচিত নয়।

যত্ত্ব সরিদদ্রিসাগরপুরতুরগরথাদিবর্ণনে যত্নঃ ।
কবিশক্তিখ্যাতিফলো বিততধিয়াং নো মতঃ স ইহ ॥

।—কাব্যমীমাংসা (হিঃ অনুঃ) পৃঃ ১১১

—কবিগণ নদী, পর্বত, সমুদ্র, নগর, অশ্ব, হস্তী এবং রথ প্রভৃতির বর্ণনায় যে রকম যত্নবান্ তাহা কেবল নিজেদের কাব্যরচনা শক্তির প্রচারের জন্য। মর্মজ্ঞ বিদ্বানেরা এইগুলিকে কোনও গুরুত্ব দেন না।

উপর্যুক্ত আনুবংশ্য শ্লোকের উল্লেখ করিয়া রাজশেখর এই সকল উদ্ধরণের প্রতি নিজের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করিয়াছেন। "আম ইতি যায়াবরীয়ঃ"। অর্থাৎ যায়াবরীয় বলেন ইহা উচিতই। এই প্রসঙ্গে রসের প্রয়োগ শুদ্ধ রসশাস্ত্রীয় অর্থে করা হইয়াছে—বস্তু সৌন্দর্য হইতে ভিন্ন ভাবসৌন্দর্যের অর্থে। ভারতীয় কাব্য প্রাকৃতিক বৈভবে সমুজ্জ্বল কিন্তু তবুও ভারতীয় রসশাস্ত্রে প্রকৃতি আলম্বনের স্থান পায় নাই—রস পরিপাকের জন্য কেবল ক্রিয়াই পর্য্যাপ্ত নহে, প্রতিক্রিয়াও সমানরূপে প্রয়োজনীয়। এই তর্কের অনুসারে প্রতি-ক্রিয়ার শক্তি হইতে বঞ্চিত প্রকৃতি রস-পরিপাকের জন্য পর্য্যাপ্ত প্রমাণিত হইতে পারে না। রাজশেখর নবম অধ্যায়ে ভারতীয় রসশাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলিয়াছেন যে প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যাবলীর বর্ণনা আকর্ষক, কিন্তু মানব-ভাবানুভূতির সংস্পর্শেই তাহাতে রসের সমাগম হয়। সরিৎ, অদ্রি, সাগর, পুর, তুরগ, রথাদির বর্ণনায় কেমন করিয়া মানব-ভাবানুভূতির স্পর্শের দ্বারা রসাগম হয় তিনি উপযুক্ত উদাহরণের দ্বারা তাহা বিবেচনা করিয়াছেন। উদাহরণ, যথা—

তত্র নদীবর্ণনরসবত্তা—

এতাং বিলোক্য তলোদরি ! তাম্রপর্ণী-
মম্ভোনিধৌ বিবৃতশুক্তিপুটোদ্ধৃতানি ।
যস্যাঃ পয়াংসি পরিণাহিষু হারমূর্ত্যা
বামভ্রুবাং পরিণমন্তি পয়োধরেষু ॥

—হে কৃশোদরি, তাম্রপর্ণী নদীকে দেখ, যে নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতেছে, ঝিনুকের মধ্য হইতে যাহার জলকণা বাহির হইতেছে এবং সুন্দরীদের বিশাল স্তন-তটের উপর মুক্তার মালার অনুরূপ শোভা পাইতেছে।

এখানে নদীর বর্ণনা মানব-সৌন্দর্য এবং মানব-লালসার সংস্পর্শে আসিয়া রসময় হইয়াছে।

রাজশেখর জৈন আচার্য পাল্যকীর্তি এবং নিজের পত্নী শ্রীমতী অবন্তিসুন্দরীর মত উদ্ধার করিয়া এই প্রসঙ্গে রসের ঐকান্তিক আত্মনিষ্ঠ অবস্থান সম্বন্ধে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :

১. "বস্তুর রূপ যেমনি হউক না কেন, তাহার রসময়ত্ব কবির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে"—(পাল্যকীর্তি)। ২. কোন বস্তুর স্বরূপ নিশ্চিত নয়, প্রত্যেক বস্তুর স্বভাব অনিশ্চিত—(অবন্তি সুন্দরী)। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র রসের এই কবিগত রূপ

নিশ্চিতভাবে স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পরে রসের সহৃদয়গত রূপের অত্যন্ত প্রসার হওয়ার জন্য কবিগত রূপটি বলিতে গেলে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। রাজশেখর সংস্কৃতের স্বতন্ত্রবুদ্ধি পণ্ডিতগণের মধ্যে অন্যতম। এই পণ্ডিতবর্গ সহৃদয়গত রসের সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই যুগের আর একটি গ্রন্থ দশরূপক রস-সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছে। এই গ্রন্থের মূল নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়, অতএব ইহার মূল লেখক ধনঞ্জয় ও তাঁহার সমসাময়িক বৃত্তিকার ধনিকের রসের প্রতি অনুরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। দশরূপকের চতুর্থ প্রকাশে রসের স্বরূপ, স্থিতি, কাব্য ও রসের সম্বন্ধ, রস-বিরোধ ও তাহার পরিহার, শান্তরস ও নাট্যে তাহার অসিদ্ধি, বিভিন্ন রসের অবয়ব ও মুখ্য ভেদের মনোযোগের সহিত স্পষ্ট রচনাশৈলীতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ধনঞ্জয় ও ধনিকের মতানুসারে কাব্যের অর্থ হইতেছে, ভাব-বিভাবাদি-নিরূপক শব্দার্থ। রসের সহিত কাব্যের ব্যঞ্জক-ব্যঙ্গ সম্বন্ধের স্থানে ভাবক-ভাব্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্তের ধারা হইতে পৃথক ধনঞ্জয়ের উপর লোল্লট, শঙ্কুক ও ভট্টনায়কের প্রভাবই স্পষ্ট। ধ্বনিবাদের খণ্ডন করিয়া তিনি রসকে শব্দার্থের মূল ও একমাত্র "তাৎপর্য" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :

কাব্যশব্দানাং চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং নিরতিশয়সুখা-
স্বাদব্যতিরেকেণ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকয়োঃ প্রয়োজনান্তরানুপলব্ধেঃ
স্বানন্দোদ্‌ভূতিরেব কার্যত্বেনাবধার্য্যতে।

—অর্থাৎ এমন অবস্থায় কাব্যগত শব্দের বিভাবাদি রূপ অর্থের সহিত অন্বয় ব্যতিরেকরূপ সম্বন্ধ হয় (প্রথমটি বর্তমান থাকিলেই অপরটির অস্তিত্ব প্রকাশ পায়)। বিভাবাদির মধ্যেই এই সব কাব্যোৎপন্ন শব্দের নিরতিশয় সুখের আস্বাদ অথবা রসরূপ অলৌকিক আনন্দের চর্বনা পাওয়া যায় না বরং সেই সব শব্দের প্রতিপাদ্যই এই রস। এইরূপ বিভবাদি স্থায়ীভাব ও রসের জন্য কাব্য-প্রযুক্ত শব্দের নিয়োগ ও প্রয়োগ হয়। ইহাদের মধ্যেও বিভাবাদি স্থায়ীভাব ও রসের প্রতিপাদক, রস ও ভাব এই সকলের প্রতিপাদ্য। কাব্য, কাব্যোপাত্ত শব্দ, বিভাবাদি ও স্থায়ী ভাব এবং রসের পারস্পরিক সম্বন্ধের পর্য্যালোচনা করিলে কাব্যরূপ বাক্যের কেবল একটি কার্য্য অথবা প্রয়োজন দৃষ্ট হয়—সহৃদয়ের চিত্তে আনন্দোদ্‌ভূতির সঞ্চার করা। এই প্রয়োজন ছাড়া কাব্যের অন্য কোন প্রয়োজন দেখা যায় না ; অন্য কোন কাব্য প্রয়োজনের উপলব্ধি হয় না, এইজন্য আনন্দোদ্‌ভূতিকেই কাব্যের কার্য্য মানিতে হইবে।

—হিন্দী দশরূপক : ডঃ ভোলাশঙ্কর ব্যাস, পৃঃ ২৩৯

ধনঞ্জয় ও ধনিকের মতে রসের অর্থ সামান্য কাব্য চমৎকারিতা নয়—রস বলিতে সেই আনন্দ বুঝায় যাহা বিভাবাদি যুক্ত স্থায়ীভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয় :

তদুদ্‌ভূতিনিমিত্তত্বং চ বিভাবাদিসংসৃষ্টস্য স্থায়িন
এবাবগম্যতে। —হিঃ দঃ রূঃ, পৃঃ ২৩৯

—অর্থাৎ রসকে দশরূপকে উহার শুদ্ধ পরিভাষিক অর্থে—স্থায়ীভাবের আস্বাদন রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

মহিম ভট্ট—এই যুগের অপর এক মেধাবী আচার্য্য মহিম ভট্ট ধ্বনিবাদের প্রবল খণ্ডন করিয়া কাব্যের রসাত্মকতার অপূর্ব অনুমোদন করিয়াছেন :

কাব্যমাত্রস্য ধ্বনিব্যপদেশবিষয়ত্বেনেষ্টত্বাৎ তস্য
রসাত্মকত্বোপগমাদ্।

—ব্যক্তিবিবেক (চৌঃ খঃ) প্রথম বিমর্শ, পৃঃ ৯৩

—অর্থাৎ ধ্বনির বিষয় কেবল কাব্য (কাব্যের কোন বিশেষ ভেদ নয়)—বস্তুতঃ কাব্য সেখানেই যেখানে রস বিদ্যমান আছে।

তস্য রসাত্মতাভাবে মুখ্যবৃত্ত্যা কাব্যব্যপদেশ
এব ন স্যাৎ, কিমুত বিশিষ্টত্বম্। —ঐ, পৃঃ ৯৮

—রসাত্মকতার অভাবে কাব্যের নামই থাকে না। বৈশিষ্ট্যের ত কথাই নাই।

এইরূপে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে কাব্যের আত্মা রসাদিই, ইহাতে কোন মতভেদ হইতে পারে না।

কাব্যস্যাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্বিমতিঃ।

—ঐ, পৃঃ ১০১

এই রসের মহিমা অপূর্ব :

পাঠ্যাদথ ধ্রুবাগানাৎ ততঃ সম্পূরিতে রসে।
তদাস্বাদভরৈকাগ্রো হৃষ্যত্যন্তর্মুখঃ ক্ষণম্॥
ততো নির্বিষয়স্যাস্য স্বরূপাবস্থিতৌ নিজঃ।
ব্যজ্যতে হ্লাদনিষ্যন্দো যেন তৃপ্যন্তি যোগিনঃ॥ —ঐ, পৃঃ ৯৪

রসের অভাবে কাব্য থাকে না যেমন প্রহেলিকাদিতে কাব্যত্ব নাই। এই যুক্তি অনুসারে মহিম ভট্ট কাব্যের কোন ভেদ স্বীকার করেন নাই—রসধ্বনি, অলংকার ধ্বনি ও বস্তু ধ্বনিও নয় এবং ধ্বনি, গুণীভূত ব্যঙ্গ প্রভৃতিও নয়। তাঁহার যুক্তি অতি স্পষ্ট : যেখানে রস সেখানেই কাব্য এবং যেখানে রস নাই সেখানে কাব্য নাই : অতএব বস্তুধ্বনি, অলঙ্কার ধ্বনি রসের অন্তর্গতই নতুবা তাহাদের কাব্যই বলা যায় না। এইরূপে যেখানে রস বিদ্যমান আছে সেখানে রসের চমৎকারিতার জন্য গৌণতা সম্ভবপর নয়। রস-বিহীন কাব্য হইতে পারে না এবং রসের সদ্ভাব হইলে পরে গৌণতার প্রশ্নই ওঠে না।

কিঞ্চ মুখ্যে রসাত্মনি কাব্যে সম্ভবতি ন তস্য গৌণস্যাশ্রয়ণং যুক্তম্।

—ঐ, পৃ ১০১

সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রে রসের এইরূপ প্রবল সমর্থন অন্যত্র দুর্লভই॥

রসের অপ্রত্যক্ষ সমর্থন—এই শ্রেণীর অন্তর্গত ধ্বনি-যুগের দুইজন প্রসিদ্ধ আচার্য্যদের নাম উল্লেখ করা যায়—আনন্দবর্ধন ও ক্ষেমেন্দ্র। যদিও উভয়েই রস

হইতে পৃথক ধ্বনি ও ঔচিত্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রসের প্রতি ইঁহাদের হৃদয়ে প্রবল আস্থা বিদ্যমান ছিল। তাহার ফলে ধ্বনি ও ঔচিত্যের বাস্তবিক অর্থ ক্রমশঃ রসধ্বনি ও রসোচিত্যই হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে আনন্দবর্ধন ও ক্ষেমেন্দ্রও প্রকারান্তরে রস সিদ্ধান্তের প্রবল সমর্থকরূপে পরিগণিত হন।

আনন্দবর্ধন সবিস্তারে এবং বিবিধ প্রকারে রসের প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ফলে অনেক আলোচক তাঁহাকে নির্বিবাদে রসবাদী রূপেই স্বীকার করেন।[১] এই মতের সমর্থন সহজে সম্ভবপর নয়। কারণ, রস, অলঙ্কার ও রীতি হইতে স্বতন্ত্র ধ্বনি সিদ্ধান্তের স্থাপনার নানা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কারণ বিদ্যমান ছিল। ইহা ব্যতীত অন্যত্র প্রমাণ করা হইয়াছে যে কাব্যে "কেবল ভাবনা" ছাড়াও কল্পনা তত্ত্বের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার সফল প্রয়াস ধ্বনিবাদে করা হইয়াছিল। আনন্দবর্ধন অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ রসাদি ছাড়াও সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ বস্তুধ্বনি ও অলংকার ধ্বনিকেও উত্তম কাব্য স্বীকার করিয়াছেন এবং রস ধ্বনিতে ইহাদের পর্যবসান ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই যতটা অভিনব গুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন। অতএব রস ও ধ্বনি অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধে যুক্ত থাকিলেও উভয়ের মধ্যে আনন্দবর্ধনের মতে পার্থক্য স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে রসের প্রতি আনন্দবর্ধনের আগ্রহ অপর কোন রসবাদীর অপেক্ষা কম ছিল না।

১. কাব্যকে মূলতঃ ব্যঙ্গপ্রধান মানিয়া লইয়াও আনন্দবর্ধন অনেক প্রকারের ব্যঙ্গের মধ্যে কেবল রসাদিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেহস্মিন্ বিবিধে সম্ভবত্যপি।
রসাদিময় একস্মিন্‌কবিঃ স্যাদবধানবান্॥ —ধ্বন্যাঃ ৪.৫

—এই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবের নানারূপ সম্ভব হইলেও কবির কেবল রসাদি ভেদের প্রতিই মনোযোগ দেওয়া উচিত।

২. বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার ধ্বনিও (সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি) রসের উপকার করিয়া অধিক শোভাযুক্ত হয়। (ধ্বন্যাঃ ৩. ১৫)

অনুস্বানোপমাত্মাপি প্রভেদো য উদাহৃতঃ।
ধ্বনেরস্য প্রবন্ধেষু ভাসতে সোহপি কেষুচিৎ॥ —ধ্বন্যাঃ ৩. ১৫

—সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য রূপ ধ্বনির যে সব প্রভেদ কাব্যে (সাক্ষাৎ) ব্যঙ্গ্যরূপে বর্তমান থাকে, যে সকল প্রভেদগুলি (পর্যবসিত হইয়া) এই অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির ব্যঞ্জক-রূপে প্রতিভাসিত হয়।

৩. গুণ, অলঙ্কার, রীতি, বৃত্তি সকলেই রসের আশ্রয়ে থাকে, রসের প্রকাশেই তাহাদের সার্থকতা :

তমর্থমবলম্বন্তে যেহঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলংকারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ॥ —ধ্বন্যাঃ ২. ৬

---

১ গ. ত্র. দেশপাণ্ডে প্রভৃতি মারাঠী আলোচকগণ

যে সকল (মাধুর্য্যাদি) সেই প্রধানভূত (রস) অঙ্গীর আশ্রয়ে থাকে তাহাদের গুণ বলা হয় এবং যাহারা (তার) অঙ্গের (শব্দ এবং অর্থ) আশ্রয়ে থাকে তাহাদের কটকাদির সমান অলংকার বলা হয়।

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন।
কালে চ গ্রহণত্যাগৌ নাতিনির্বহৈষিতা॥ —ধ্বন্যাঃ ২. ১৮
নির্ব্যূঢাপি চাঙ্গত্বে যত্নেন প্রত্যবেক্ষণম্।
রূপকাদিরলঙ্কারবর্গস্যাঙ্গসাধনম্॥ —ধ্বন্যাঃ ২. ১৯

১. (রূপকাদির) বিবক্ষা (সর্বদা রসকে প্রধান মানিয়া) রসপরত্বেনই (বর্ণনীয়) হওয়া দরকার, ২. প্রধানরূপে কোন প্রকারেই নয়, ৩. (উচিত) সময়ে (তাহাদের) গ্রহণ ও ৪. পরিত্যাগ হওয়া দরকার, ৫. (আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত।) অত্যন্ত অধিক নির্বাহের ইচ্ছা (যত্ন) করা উচিত নয়। ৬. (যদি কোথাও অনায়াসে আদ্যন্ত নির্বাহ হইয়া যায় তাহা হইলে) নির্বাহ হইলে পরেও (তাহা) অঙ্গরূপেই হওয়া দরকার, এই কথাটি সাবধানে পুনরায় পর্য্যালোচনা করা উচিত। এই (সমীক্ষা) রূপকাদি অলংকারবর্গের অঙ্গত্বের সাধন।

গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী, মাধুর্য্যাদীন্ ব্যনক্তি সা।
রসান্, * * * * ॥ —ধ্বন্যাঃ ৩. ৬

মাধুর্য্যাদি গুণগুলিকে আশ্রয় করিয়া (সংঘটনা) রসের অভিব্যক্তি হয়।

৪. কাব্যের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অবয়বগুলি—সুপ্, তিঙ্, বচন, সম্বন্ধ, কারক কৃৎ, তদ্ধিৎ, সমাস এবং এইগুলি ছাড়া প্রবন্ধ-কাব্য সমস্তই রসকে প্রকাশিত করে। প্রকৃত পক্ষে রসের সংস্পর্শে আসিয়াই তাহারা কাব্য পদবাচ্যের অধিকারী হয়।

সুপ্-তিঙ্-বচন-সম্বন্ধৈস্তথা কারকশক্তিভিঃ।
কৃৎ-তদ্ধিত-সমাসৈশ্চ দ্যোতোঽলক্ষ্যক্রমঃ ক্বচিৎ॥

—ধ্বন্যাঃ ৩. ১৬

—সুপ্ (অর্থাৎ প্রথমাদি বিভক্তি), তিঙ্ (অর্থাৎ ক্রিয়া বিভক্তি), বচন (এক, দ্বি, বহুবচন), সম্বন্ধ (ষষ্ঠী বিভক্তি), কারক শক্তি, কৃৎ (ধাতু হইতে বিহিত তিঙ্ ভিন্ন প্রত্যয়), তদ্ধিত (প্রাতিপাদিক হইতে বিহিত সুপ্ ভিন্ন প্রত্যয়) এবং সমাসের দ্বারা (যে অভিব্যক্তি সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের দ্বারা হয়) কোন-কোন স্থলে অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির অভিব্যক্তি হয়। —হিন্দী ধ্বন্যালোক পৃঃ ২৭০

কাব্যের সম্পূর্ণ ভেদগুলিতে—মুক্তক হইতে মহাকাব্য পর্য্যন্ত—রসই প্রাণরূপে ব্যাপ্ত থাকে।

কবিনা কাব্যমুপনিবধ্নতা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্রেণ
ভবিতব্যম্। * * * ন হি কবেরিতিবৃত্তমাত্রনির্বহণেন
কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্, ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধেঃ।

—হিন্দী ধ্বন্যালোক, পৃঃ ২৬৪

—অর্থাৎ কাব্য নির্মাণের সময় কবিকে সর্বান্তঃকরণে রস-পরতন্ত্র হইতে হইবে। * * * * ইতিবৃত্তমাত্র নির্বাহে কবির কোন প্রয়োজনই নাই, কারণ ইতিহাসাদির দ্বারাও তাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

এইরূপে ধ্বন্যালোকে রসের সার্বভৌম গুরুত্বের কথা নির্ভুল শব্দাবলীতে বর্ণিত আছে—কিন্তু মাধ্যমরূপে সর্বত্র ধ্বনিকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। অভিনব গুপ্ত ও আনন্দবর্ধনের মন্তব্যগুলির সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে রসের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমর্থকরূপে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে শেষ স্তরে রস ও ধ্বনির মধ্যে প্রভেদ এতই কম যে, উভয়ের মধ্যে বিভাজক রেখা অঙ্কিত করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে কিন্তু প্রভেদ ত আছেই এবং উহা অস্বীকার করা যায় না।

অভিনব গুপ্তের দৃষ্টিতে বস্তুধ্বনি ও অলংকার ধ্বনির কোন স্বতন্ত্র্য মূল্য নাই—রস পর্য্যবসানেই তাহাদের মূল্য—ইহার বিপরীতে আনন্দবর্ধনের দৃষ্টিতে অংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের স্বতন্ত্র মূল্য আছে—তাহাদের রসোন্মুখতার কথা তিনিও বলিয়াছেন কিন্তু অভিনব গুপ্তের অনুরূপ ততখানি স্পষ্ট ও নির্ভুল ভাবে নয়। এই জন্য আনন্দবর্ধনের দ্বারা রসের সমর্থনের কথা সিদ্ধান্ত রূপে অপ্রত্যক্ষই স্বীকার করিতে হইবে।

ঔচিত্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য্য ক্ষেমেন্দ্রর দৃষ্টিকোণও অনেকটা এইরূপ। তিনি বস্তুতঃ রস-সিদ্ধ কাব্যকেই কাব্য পদের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং আনন্দবর্ধনের অভিমত ঃ

প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা। —হিন্দী ধ্বন্যা; পৃঃ ২৫৯

—অর্থাৎ 'প্রসিদ্ধ ঔচিত্যের অনুসরণই রসের পরম রহস্য।' আচার্য্য ক্ষেমেন্দ্র এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লিখিয়াছেন—

অলঙ্কারাস্ত্বলংকারা গুণা এব গুণাঃ সদা।
ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্॥

—ঔচিত্যবিচারচর্চা, পৃঃ ৫

—অর্থাৎ অলঙ্কার অলঙ্কারই এবং গুণ সর্বদা গুণই থাকে। রসসিদ্ধ কাব্যের স্থির জীবন ঔচিত্যই।

ক্ষেমেন্দ্রের মতানুসারে কাব্যের আস্বাদনীয় তত্ত্ব রসই, ঔচিত্যের দ্বারা রস আরও অধিক আস্বাদনীয় হইয়া সর্বহৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় ঃ

কুর্বন্সর্বাশয়ে ব্যাপ্তিমৌচিত্যরুচিরো রসঃ।

—ঔঃ বিঃ চঃ, পৃঃ ১৬

নিজের গ্রন্থের স্বল্প পরিধির মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র রসৌচিত্যের বিস্তৃত বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব, ব্যভিচারী প্রভৃতি রসের সমস্ত অবয়বের বর্ণনায় ঔচিত্যের পূর্ণনির্বাহ হওয়া আবশ্যক এবং রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সঙ্কর এবং সংসৃষ্টির ব্যাপারে ঔচিত্যের প্রতি পূর্ণদৃষ্টি রাখা উচিত।

এইরূপে প্রকৃতপক্ষে ক্ষেমেন্দ্রও রসকেই কাব্যের প্রধান তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন

কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে ঔচিত্যই রসের ভিত্তিস্বরূপ। এই মত রস-সিদ্ধান্তের অনুরূপ কারণ, রস-সিদ্ধান্তও রস-পরিপাকের জন্য ঔচিত্যের অনিবার্যতাকে স্বীকার করে। রস-সিদ্ধান্তের মতেও ঔচিত্যের অভাবে রস রসাভাস হইয়া যায়। এই দৃষ্টিতে ক্ষেমেন্দ্রও মূলতঃ রসবাদীই। তাঁহার ঔচিত্য বিচারের ভিত্তি সর্বশেষে রসই প্রমাণিত হয়। ক্ষেমেন্দ্রের দৃষ্টিতে রস ও ঔচিত্যের মধ্যে প্রায় অনিবার্য্যরূপে অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ বর্তমান আছে। যেমন ধ্বনিকারের দ্বারা নিরূপিত ধ্বনির রস ভিন্ন অন্যান্য ভেদগুলিতেও রসের অনিবার্য স্পর্শের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ ক্ষেমেন্দ্রও ঔচিত্যের রস ভিন্ন অন্য ভেদগুলিতে অনিবার্যরূপে রসকে স্থান দিয়াছেন। ভাব-সৌন্দর্য্যহীন কেবল নৈতিক অথবা বৌদ্ধিক ঔচিত্যের কল্পনা তিনি কাব্যের ক্ষেত্রে করেন নাই। কিন্তু এসকল মন্তব্য সুযুক্তিপূর্ণ হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ রসবাদী না বলিয়া অপ্রত্যক্ষ রসবাদীরূপে স্বীকার করা উচিত হইবে।

সমন্বয়বাদী—শৃঙ্গার রসকে একমাত্র এবং সার্বভৌম রসরূপে গ্রহণ করিলেও ভোজরাজকে সমগ্ররূপে সমন্বয়বাদী আচার্য স্বীকার করা সমীচীন হইবে। কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার মত ইহার স্পষ্ট প্রমাণ :

নির্দোষং গুণবৎকাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিং চ বিন্দতি॥ —সঃ কঃ ভঃ, ১. ২

—অর্থাৎ দোষ হইতে মুক্ত এবং গুণ হইতে যুক্ত, অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং রসের দ্বারা পরিপুষ্ট কাব্যের রচনা করিয়া কবি কীর্তি ও প্রীতির ভাগী হন।

ভামহ প্রভৃতি পূর্ববর্তী আচার্যদের অনুসরণ করিয়া ভোজরাজও শব্দ অর্থের সাহিত্য অথবা সমন্বয়কে কাব্য স্বীকার করিয়াছেন। এই সাহিত্য অথবা সম্বন্ধ দ্বাদশ প্রকার। ইহাদের মধ্যে প্রথম আটটি সম্বন্ধ বাঙ্ময়ের সমস্তরূপে অনিবার্যভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শেষের চারিটি সম্বন্ধ অর্থাৎ দোষহীনতা, গুণোপাদান, অলঙ্কারযোগ ও রসবিয়োগ কাব্যেরই লক্ষণ। কাব্যে এই চারিটিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে এবং ইহাদের মধ্যে রসবিয়োগের প্রাধান্য নির্বিবাদ :

বক্রোক্তিশ্চ রসোক্তিশ্চ স্বভাবোক্তিশ্চ বাঙ্ময়ম্।
সর্বাসু গ্রাহিণীং তাসু রসোক্তিং প্রতিজানতে॥ —সঃ কঃ ভঃ, ৫. ৮

—বাঙ্ময়ের তিনটি ভেদ—বক্রোক্তি, রসোক্তি এবং স্বভাবোক্তি; এই তিনটির মধ্যে রসোক্তি অধিক হৃদয়গ্রাহী।

ভোজরাজ কর্তৃক রসের সুবিস্তৃত বর্ণনায় তাঁহার রসের প্রতি আকর্ষণ স্বতঃ প্রমাণিত। রসের প্রত্যেকটি অবয়বের যে প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শৃঙ্গারপ্রকাশে করা হইয়াছে তাহা সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। শৃঙ্গার প্রকাশের ছত্রিশটি প্রকাশের মধ্যে প্রথম ছয়টিতে শব্দার্থের বিবেচনা আছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকাশে শব্দার্থের অভিধাদি আটটি সম্বন্ধের বর্ণনা আছে, নবম প্রকাশে দোষহানি ও গুণোপাদানের বর্ণনা আছে, দশমে অলঙ্কারযোগের ও দ্বাদশে নাটকের।

শেষের সম্পূর্ণ পঁচিশটি প্রকাশে রসের বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহা হইলেও ভোজরাজ গুণের অনুরূপ রসকেও অলঙ্কার স্বীকার করিতে সংকোচবোধ করেন নাই :

নানালংকারসংসৃষ্টেঃ প্রকারাশ্চ রসোক্তয়ঃ। —সঃ কঃ ভঃ ৫. ১১

প্রকৃত পক্ষে তাঁহার দৃষ্টি কেবল সমন্বয়াত্মকই নয় বরং সংগ্রহাত্মকও; তিনি ভরত ও দণ্ডীর প্রতি সমরূপে শ্রদ্ধাবান্, অপর দিকে তাঁহার উপর বামন ও আনন্দবর্ধনেরও গভীর প্রভাব বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের দিক দিয়া রসের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিত্ব করিলেও সিদ্ধান্তের দিক দিয়া তিনি সমন্বয়বাদীই থাকিয়া গিয়াছেন।

স্বতন্ত্র ধারা—এই যুগে পারম্পরিক ধারা হইতে ভিন্ন কুন্তক স্বীয় স্বতন্ত্র চিন্তনের দ্বারা বক্রোক্তি সিদ্ধান্তের স্থাপনা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিকরূপে বক্রোক্তি সিদ্ধান্ত অলংকার সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ এবং পরিণামে রসবাদের বিরোধী সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। কুন্তকও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে "সালঙ্কারস্য কাব্যতা"র ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু "বক্রোক্তি জীবিত" গ্রন্থের সম্যক্ অধ্যয়ন করিবার পর ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না যে কুন্তকের দৃষ্টিকোণ রস বিরোধী ছিল না—ইহা ঠিক যে তাঁহার দৃষ্টি রস হইতে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন অবশ্যই ছিল কারণ—১. তিনি রসের স্থানে বক্রোক্তিকেই কাব্যের আত্মভূত তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইরূপে ২. ভাব তত্ত্বের অপেক্ষা কলাতত্ত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তথাপি রসের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে প্রবল অনুরাগ বিদ্যমান ছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি রসের গুরুত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বক্রোক্তি এবং রসের মধ্যে সিদ্ধান্তরূপে এমন কোন মৌলিক সাম্য নাই যাহা ধ্বনি ও বক্রোক্তির মধ্যে আছে কিন্তু সব মিলিয়া বক্রোক্তি-চক্রে রসের স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—প্রকৃত পক্ষে এই কথাটি অসঙ্গত নয় যে রসের প্রতি বক্রোক্তি এবং ধ্বনি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ অনেকটা অনুরূপই ছিল।

কাব্যের লক্ষণ ও প্রয়োজনের অন্তর্গত রসের গুরুত্ব-প্রতিপাদন—সর্বপ্রথম কুন্তক কাব্যের লক্ষণ ও প্রয়োজনের বিবেচনার অন্তর্গত রসের গুরুত্বকে স্বীকার করিয়াছেন।

কাব্য লক্ষণ :

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপার শালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিনি॥ —বঃ জীঃ ১.১০

এখানে কাব্য-বন্ধের জন্য বক্র কবিব্যাপারের সহিত তদ্বিদাহ্লাদকারিতাকেও অনিবার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তদ্বিদ্ এর অর্থ হইতেছে : কাব্য মর্মজ্ঞ অথবা সহৃদয়। এইরূপে কুন্তকের মতানুসারে কাব্যকে সর্বদাই সহৃদয়-আহ্লাদকারী হইতে হইবে।

কাব্য প্রয়োজন :

চতুর্বর্গফলাস্বাদমপ্যতিক্রম্য তদ্বিদাম্।
কাব্যামৃতরসেনান্তশ্চমৎকারো বিতন্যতে॥ —বঃ জীঃ ১.৫

কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে ঔচিত্যই রসের ভিত্তিস্বরূপ। এই মত রস-সিদ্ধান্তের অনুরূপ কারণ, রস-সিদ্ধান্তও রস-পরিপাকের জন্য ঔচিত্যের অনিবার্যতাকে স্বীকার করে। রস-সিদ্ধান্তের মতেও ঔচিত্যের অভাবে রস রসাভাস হইয়া যায়। এই দৃষ্টিতে ক্ষেমেন্দ্রও মূলতঃ রসবাদীই। তাঁহার ঔচিত্য বিচারের ভিত্তি সর্বশেষে রসই প্রমাণিত হয়। ক্ষেমেন্দ্রের দৃষ্টিতে রস ও ঔচিত্যের মধ্যে প্রায় অনিবার্য্যরূপে অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ বর্তমান আছে। যেমন ধ্বনিকারের দ্বারা নিরূপিত ধ্বনির রস ভিন্ন অন্যান্য ভেদগুলিতেও রসের অনিবার্য স্পর্শের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ ক্ষেমেন্দ্রও ঔচিত্যের রস ভিন্ন অন্য ভেদগুলিতে অনিবার্যরূপে রসকে স্থান দিয়াছেন। ভাব-সৌন্দর্য্যহীন কেবল নৈতিক অথবা বৌদ্ধিক ঔচিত্যের কল্পনা তিনি কাব্যের ক্ষেত্রে করেন নাই। কিন্তু এসকল মন্তব্য সুযুক্তিপূর্ণ হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ রসবাদী না বলিয়া অপ্রত্যক্ষ রসবাদীরূপে স্বীকার করা উচিত হইবে।

সমন্বয়বাদী—শৃঙ্গার রসকে একমাত্র এবং সার্বভৌম রসরূপে গ্রহণ করিলেও ভোজরাজকে সমগ্ররূপে সমন্বয়বাদী আচার্য স্বীকার করা সমীচীন হইবে। কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার মত ইহার স্পষ্ট প্রমাণ ঃ

নির্দোষং গুণবৎকাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিং চ বিন্দতি॥ —সঃ কঃ ভঃ, ১. ২

—অর্থাৎ দোষ হইতে মুক্ত এবং গুণ হইতে যুক্ত, অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং রসের দ্বারা পরিপুষ্ট কাব্যের রচনা করিয়া কবি কীর্তি ও প্রীতির ভাগী হন।

ভামহ প্রভৃতি পূর্ববর্তী আচার্যদের অনুসরণ করিয়া ভোজরাজও শব্দ অর্থের সাহিত্য অথবা সমন্বয়কে কাব্য স্বীকার করিয়াছেন। এই সাহিত্য অথবা সম্বন্ধ দ্বাদশ প্রকার। ইহাদের মধ্যে প্রথম আটটি সম্বন্ধ বাঙ্ময়ের সমস্তরূপে অনিবার্যভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শেষের চারিটি সম্বন্ধ অর্থাৎ দোষহীনতা, গুণোপাদান, অলঙ্কারযোগ ও রসবিয়োগ কাব্যেরই লক্ষণ। কাব্যে এই চারিটিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে এবং ইহাদের মধ্যে রসবিয়োগের প্রাধান্য নির্বিবাদ ঃ

বক্রোক্তিশ্চ রসোক্তিশ্চ স্বভাবোক্তিশ্চ বাঙ্ময়ম্।
সর্বাসু গ্রাহিণীং তাসু রসোক্তিং প্রতিজানতে॥ —সঃ কঃ ভঃ, ৫. ৮

—বাঙ্ময়ের তিনটি ভেদ—বক্রোক্তি, রসোক্তি এবং স্বভাবোক্তি; এই তিনটির মধ্যে রসোক্তি অধিক হৃদয়গ্রাহী।

ভোজরাজ কর্তৃক রসের সুবিস্তৃত বর্ণনায় তাঁহার রসের প্রতি আকর্ষণ স্বতঃ প্রমাণিত। রসের প্রত্যেকটি অবয়বের যে প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শৃঙ্গারপ্রকাশে করা হইয়াছে তাহা সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। শৃঙ্গার প্রকাশের ছত্রিশটি প্রকাশের মধ্যে প্রথম ছয়টিতে শব্দার্থের বিবেচনা আছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকাশে শব্দার্থের অভিধাদি আটটি সম্বন্ধের বর্ণনা আছে, নবম প্রকাশে দোষহানি ও গুণোপাদানের বর্ণনা আছে, দশমে অলঙ্কারযোগের ও দ্বাদশে নাটকের।

শেষের সম্পূর্ণ পঁচিশটি প্রকাশে রসের বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহা হইলেও ভোজরাজ গুণের অনুরূপ রসকেও অলঙ্কার স্বীকার করিতে সংকোচবোধ করেন নাই :

নানালংকারসংসৃষ্টেঃ প্রকারাশ্চ রসোক্তয়ঃ। —সঃ কঃ ভঃ ৫. ১১

প্রকৃত পক্ষে তাঁহার দৃষ্টি কেবল সমন্বয়াত্মকই নয় বরং সংগ্রহাত্মকও; তিনি ভরত ও দণ্ডীর প্রতি সমরূপে শ্রদ্ধাবান্‌, অপর দিকে তাঁহার উপর বামন ও আনন্দবর্ধনেরও গভীর প্রভাব বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের দিক দিয়া রসের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিত্ব করিলেও সিদ্ধান্তের দিক দিয়া তিনি সমন্বয়বাদীই থাকিয়া গিয়াছেন।

স্বতন্ত্র ধারা—এই যুগে পারম্পরিক ধারা হইতে ভিন্ন কুন্তক স্বীয় স্বতন্ত্র চিন্তনের দ্বারা বক্রোক্তি সিদ্ধান্তের স্থাপনা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিকরূপে বক্রোক্তি সিদ্ধান্ত অলংকার সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ এবং পরিণামে রসবাদের বিরোধী সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। কুন্তকও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে "সালঙ্কারস্য কাব্যতা"র ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু "বক্রোক্তি জীবিত" গ্রন্থের সম্যক্ অধ্যয়ন করিবার পর ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না যে কুন্তকের দৃষ্টিকোণ রস বিরোধী ছিল না—ইহা ঠিক যে তাঁহার দৃষ্টি রস হইতে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন অবশ্যই ছিল কারণ—১. তিনি রসের স্থানে বক্রোক্তিকেই কাব্যের আত্মভূত তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইরূপে ২. ভাব তত্ত্বের অপেক্ষা কলাতত্ত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তথাপি রসের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে প্রবল অনুরাগ বিদ্যমান ছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি রসের গুরুত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বক্রোক্তি এবং রসের মধ্যে সিদ্ধান্তরূপে এমন কোন মৌলিক সাম্য নাই যাহা ধ্বনি ও বক্রোক্তির মধ্যে আছে কিন্তু সব মিলিয়া বক্রোক্তি-চক্রে রসের স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—প্রকৃত পক্ষে এই কথাটি অসঙ্গত নয় যে রসের প্রতি বক্রোক্তি এবং ধ্বনি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ অনেকটা অনুরূপই ছিল।

কাব্যের লক্ষণ ও প্রয়োজনের অন্তর্গত রসের গুরুত্ব-প্রতিপাদন—সর্বপ্রথম কুন্তক কাব্যের লক্ষণ ও প্রয়োজনের বিবেচনার অন্তর্গত রসের গুরুত্বকে স্বীকার করিয়াছেন।

কাব্য লক্ষণ :

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপার শালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিনি॥ —বঃ জীঃ ১.১০

এখানে কাব্য-বন্ধের জন্য বক্র কবিব্যাপারের সহিত তদ্বিদাহ্লকারিতাকেও অনিবার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তদ্বিদ্ এর অর্থ হইতেছে : কাব্য মর্মজ্ঞ অথবা সহৃদয়। এইরূপে কুন্তকের মতানুসারে কাব্যকে সর্বদাই সহৃদয়-আহ্লাদকারী হইতে হইবে।

কাব্য প্রয়োজন :

চতুর্বর্গফলাস্বাদমপ্যতিক্রম্য তদ্বিদাম্।
কাব্যামৃতরসেনান্তশ্চমৎকারো বিতন্যতে॥ —বঃ জীঃ ১.৫

—অর্থাৎ রসজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে কাব্যামৃতের রস চতুর্বর্গ রূপ ফলের আস্বাদের অপেক্ষা অধিক চমৎকার উৎপন্ন করে।

"চমৎকারো বিতন্যতে" এর অর্থ স্বয়ং কুন্তকের বৃত্তি অনুসারে এইরূপ : আহ্লাদ : পুনঃ পুনঃ ক্রিয়তে অর্থাৎ কাব্য আনন্দের প্রসার করে। এইরূপে কুন্তক আনন্দকে কাব্যের চরম প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে কুন্তক প্রকৃত পক্ষে রসকে গুরুত্ব দেন নাই আহ্লাদকে দিয়াছেন। তাহা হইলে কি কাব্যে আহ্লাদ রসাস্বাদের সমরূপ নয়?—ভামহ প্রভৃতি অলংকারিকগণ প্রীতি অথবা আনন্দকে কাব্যের মূল প্রয়োজন রূপে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের আনন্দের সম্বন্ধে যে ধারণা তাহা রস হইতে ভিন্ন ছিল। এইরূপে অনেকে বলেন যে কুন্তক আহ্লাদের যে স্তুতি করিয়াছেন তাহা রসের স্তুতি নয়। এই সন্দেহের নিরাকরণ স্বয়ং কুন্তকের মতের অনুসরণে করা যাইতে পারে। সুকুমার মার্গের বিবেচনায় কুন্তক সহৃদয় অথবা তদ্বিদ্‌কে স্পষ্টরূপে রসাদি পরমার্থজ্ঞ অর্থাৎ রসাদির পরম্ তত্ত্বের বেত্তা বলিয়াছেন :

রসাদিপরমার্থজ্ঞমনঃ সংবাদসুন্দরঃ।

—বঃ জীঃ ১. ২৬

ইহা ছাড়াও অন্যত্র নানাস্থানে এবং নানারূপে তিনি সহৃদয়কে রসজ্ঞের সমরূপ স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ সৌভাগ্য গুণের লক্ষণ বলিতে গিয়া সহৃদয়ের জন্য 'সরসাত্মনাম্' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'আর্দ্র চেতসাম্' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে :

সর্বসম্পৎপরিস্পন্দসম্পাদ্যং সরসাত্মনাম্।

* * * সরসাত্মনাম্ আর্দ্রচেতসাম্ * *।

—বঃ জীঃ ১. ৫৬

এইরূপে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে কুন্তকের সহৃদয় নিশ্চিত রূপে সরসাত্মা অথবা আর্দ্রচিত্ত রসজ্ঞ ব্যক্তি এবং তাঁহার আহ্লাদ রসস্বাদের অপেক্ষা অধিক ভিন্ন নয়।

কুন্তকের মতে কাব্যে রসের স্থান-বিচার—কুন্তকের বিবেচনায় নানা প্রসঙ্গের অন্তর্গত এমনি অনেকগুলি স্পষ্ট উক্তি আছে যেগুলির দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে ধ্বনিকারের অনুরূপ তিনি রসকে কাব্যের পরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন। প্রবন্ধ বক্রতার বিচারে তিনি দৃঢ়তার সহিত ইহা বলিয়াছেন যে বক্রোক্তির সর্বাধিক সুপরিণত ও উৎকৃষ্ট রূপ প্রবন্ধ বক্রতা :

প্রবন্ধেষু কবীন্দ্রানাং কীর্ত্তিকন্দেষু কিং পুনঃ।

—বঃ জীঃ ৪. ২৬ (অন্তঃ শ্লোক)

—অর্থাৎ কুন্তকের মতে প্রবন্ধ সাধারণ কবিদের নয় বরং কবীন্দ্রদের কীর্তির মূল কারণ।

এই প্রবন্ধের সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল :

নিরন্তররসোদ্গারগর্ভসন্দর্ভনির্ভরাঃ
গিরঃ কবীনাং জীবন্তি ন কথামাত্রমাশ্রিতাঃ। —বঃ জীঃ ৪. ১১

—অর্থাৎ যে সকল সন্দর্ভ নিরন্তর রসকে প্রবাহমান রাখে তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ কবিদের বাণী কেবল কথার আশ্রয়ে জীবিত থাকিতে পারে না।

উল্লিখিত দুইটি উদ্ধরণই অত্যন্ত স্পষ্ট। এই উদাহরণগুলির দ্বারা সাররূপে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কুন্তকের মতানুযায়ী প্রবন্ধ কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ এবং প্রবন্ধের প্রাণতত্ত্ব রস। এইরূপে ধ্বনি-কাব্যের অনুরূপ বক্রোক্তিজীবিত কাব্যের প্রাণতত্ত্ব রসই প্রমাণিত হয়।

ধ্বনি সিদ্ধান্তের অনুরূপ বক্রোক্তি সিদ্ধান্তের অন্তর্গত রসকে বাচ্য না মানিয়া ব্যঙ্গ মানা হইয়াছে—এই প্রসঙ্গে কুন্তক উদ্ভটের দ্বারা স্বীকৃত রসের স্বশব্দ বাচ্যত্বের উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন :

এই সম্বন্ধে (উল্লিখিত মন্তব্যানুসারে) রসের স্বশব্দবাচ্যতা আমরা আজ পর্যন্ত দেখি নাই। * * উহার অভিপ্রায় এই যে শৃঙ্গারাদি রস নিজেদের বাচক শব্দের দ্বারা কথিত হওয়ার পর শ্রবণের দ্বারা গৃহীত হইয়া চৈতন্যযুক্ত সহৃদয়কে চর্বনার চমৎকারিতা—আস্বাদের আনন্দ প্রদান করে। এই যুক্তি মানিয়া লইলে ঘৃতপূপ প্রভৃতি খাদ্য পদার্থের কেবল নাম লইলেই খাওয়ার আনন্দ উৎপন্ন হইয়া যায়, (ইহাই প্রমাণিত হয়)। এইরূপে সেই সমস্ত উদারচরিত মহাশয়দের কৃপায় কোন পদার্থের উপভোগ সুখের কামনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের সেই পদার্থের নাম লওয়া মাত্র ত্রৈলোক্য রাজ্যের সুখ সম্পত্তি বিনা প্রযত্নে হস্তগত হইয়া যায়।

—বঃ জীঃ ৩. ১১ (বৃত্তি)

কাব্যবস্তুর বিবেচনায় কুন্তক রসকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুকে স্পষ্টভাবে রসেরই স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রকারে তাহার রস নির্ভরতার প্রতিপাদন করিয়াছেন :

এইরূপে স্বভাব ও রসের প্রাধান্যের জন্য দুই প্রকারের বর্ণনীয় বিষয় বস্তুর সহজ সৌকুমার্যের জন্য রস স্বরূপ শরীরই অলংকরণের যোগ্য হয়।

—বঃ জীঃ ৩.১১ (বৃত্তি)

কুন্তক রস নির্ভরতাকে কাব্য বস্তুর প্রমুখ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—তিনি রস-প্রধান বস্তুরই অন্তর্গত রসের বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যবস্তুর চেতন ও জড় নামে দুইটি ভেদ করিয়া তিনি প্রথম ভেদটিকেই অর্থাৎ চেতনাকেই মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার জন্য রসাদির পরিপুষ্টিকে আবশ্যক বলিয়াছেন।

মুখ্য চেতন (দেবাদি) বস্তু অক্লিষ্ট থাকিয়া, রত্যাদির পরিপুষ্টির দ্বারা মনোহারী এবং জাতি-যোগ্য স্বভাব বর্ণনার দ্বারা চিত্তাকর্ষক হইয়া (মহাকবিদের বর্ণনার প্রমুখ বিষয় বলিয়া গণ্য হয়) (বঃ জীঃ ৩.৭) এবং এই রত্যাদি স্থায়ী ভাবের পরিপুষ্টিই রস-রূপ ধারণ করে। (উপর্যুক্ত কারিকার বৃত্তি ভাগ)।

এই স্থলে কুন্তক বিপ্রলম্ভ ও করুণ নানা উদাহরণের উল্লেখ করিয়া অন্য রসের প্রতিও সংকেত করিয়াছেনঃ কোমল রস হওয়ার জন্য বিপ্রলম্ভ ও করুণ রসের উদাহরণের উল্লেখ করা হইল—অন্য রসের কথা স্বয়ং বুঝিয়া লইতে হইবে।

জড়ের বর্ণনাও কাব্যের অঙ্গরূপে হয়—কিন্তু জড় অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা পদার্থের বর্ণনা প্রায় রসোদ্দীপনে সামর্থ্য হইলে কাব্য বলিয়া গৃহীত হয়ঃ

অমুখ্য চেতন (সিংহাদি তির্যক যোনির প্রাণী) এবং নানা জড় পদার্থের রসোদ্দীপনে সামর্থ্যের জন্য তাহাদের মনোহর গুণও কবিদের বর্ণনার বিষয় হইয়া পড়ে।

—বঃ জীঃ ৩.৮

এই প্রকার কাব্যবস্তুর উভয় রূপে রসের প্রাধান্য বিদ্যমান। প্রকৃত পক্ষে রসাসক্ত হইলে পরেই বস্তু কাব্যের জন্য বাঞ্ছনীয় হয়।

বক্রোক্তি সিদ্ধান্তে মার্গের বিচারেও রসকে ঠিক এইরূপই উচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সুকুমার ও বিচিত্র মার্গের উল্লেখ করিতে গিয়া কুন্তক প্রকারান্তরে রসের চমৎকারিতারও উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় সুকুমার মার্গ রসাদি পরমার্থজ্ঞমনঃ সংবাদ সুন্দর[১] অর্থাৎ রসাদির পরম তত্ত্বের জ্ঞাতা সহৃদয়ের মনের অনুরূপ হওয়ার জন্য সুন্দর বলিয়া গণ্য হয় এবং বিচিত্র মার্গ কমনীয় বৈচিত্র্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে[২] "সরসাকূত" ও অর্থাৎ কুন্তকের বৃত্তির অনুসারে "রস নির্ভরাভিপ্রায়" (রসনির্ভর অভিপ্রায় দ্বারা সংযুক্ত) গণ্য হয়। অপর দিকে, তৃতীয়—মধ্যম মার্গও এই দুইটির মিশ্ররূপ হওয়ার জন্য, স্বতই রসপুষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ তিনটি মার্গেই অনিবার্যরূপে রসের সঞ্চরণ হয়।

সারার্থ এই যে, কাব্যভেদ, কাব্যবস্তু এবং কাব্যমার্গ এই তিনটি ক্ষেত্রেই কুন্তক রসের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

রসবদ্ অলঙ্কারের নিষেধ এবং রসের অলঙ্কার্যতা—শেষে রসবদ্ অলঙ্কারের নিষেধ এবং রসের অলঙ্কার্যতাকে প্রমাণিত করিয়া কুন্তক ইহা আরও স্পষ্ট করিয়াছেন যে তাঁহার হৃদয়ে রসের প্রতি কতখানি আগ্রহ ছিল। বাস্তবিক দৃষ্টিতে রসের তিরস্কার কুন্তকের পূর্ববর্তী অলঙ্কারবাদীরাও করেন নাই কিন্তু তাঁহারা রসকে অলঙ্কাররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। রসধ্বনীবাদীদের দৃষ্টিতে ইহার দ্বারা রসের তিরস্কারই করা হয় কারণ এইরূপ আত্মভূত রস অলঙ্কার মাত্র থাকিয়া যায়। এই দৃষ্টির অনুসরণে কুন্তক রসবদ্ অলঙ্কারের নিষেধ করিয়া রসের অলঙ্কার্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কুন্তক রসের ব্যাপারে ভামহ, দণ্ডী ও উদ্ভটের, বিচারধারাকে ত্যাগ করিয়া রসধ্বনিবাদীদেরই অনুসরণ করিয়াছেন—

অলঙ্কারো ন রসবৎ পরস্যা প্রতিভাসনাৎ।
স্বরূপাতিরিক্তস্য শব্দার্থাসঙ্গতেরপি॥ —বঃ জীঃ ৩.১১

---

১. বঃ জঃ ১।২৬
২. ঐ, ১।৪১

—অর্থাৎ রসবৎ অলঙ্কার নয় কারণ, প্রথমতঃ, নিজের স্বরূপ ভিন্ন ইহাতে অলঙ্কার্যরূপে অন্য কাহারোও প্রতীতি হয় না এবং দ্বিতীয়তঃ, অলঙ্কার্য রসের সঙ্গে অলঙ্কার শব্দের প্রয়োগ হওয়ার জন্য শব্দ এবং অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় না।

ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে রস অলঙ্কার্য, অলঙ্কার নয়।

এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে রসকে অলঙ্কার্য স্বীকার করিয়া লইলেও রসের গুরুত্ব বিশেষ প্রমাণিত হয় না : বড় জোর রস শরীররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এইরূপে আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা ঠিক নয়—এই প্রসঙ্গে কুন্তক উল্লিখিত সন্দেহের নিরাকরণ করিয়াছেনঃ

রসবতোহলঙ্কার ইতি ষষ্ঠীসমাসপক্ষোহপি ন সুস্পষ্ট সমন্বয়ঃ।
যস্য কস্যচিৎ কাব্যত্বংরসবত্ত্বমেব ॥

— অর্থাৎ "রসবানের অলঙ্কার'' এই ষষ্ঠী সমাস পক্ষেরও স্পষ্ট সমন্বয় সম্ভব নয় কারণ যে কোন কাব্যের রসবত্তাই সেই কাব্যের কাব্যত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয়।

—বঃ জীঃ ৩. ১১ (বৃত্তি)

এই প্রসঙ্গে ইহার পর কুন্তক আবার রসের প্রতি নিজের সমর্থন ব্যক্ত করিয়াছেন। রসবৎ অলঙ্কারের রীতিগত রূপের খণ্ডন করিবার পর তিনি নিজের মতানুসারে তাহার বাস্তবিক স্বরূপের বিচার করিয়াছেন : রসতত্ত্বের বিধান অনুসারে সহৃদয়ের জন্য আহ্লাদকারী হওয়ার দরুন যে অলঙ্কার রসের অনুরূপ হয় সেই অলঙ্কারকে রসবৎ বলা যায়। —১. ১৪১

উক্ত লক্ষণের দ্বারা ইহার স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া যায় এবং কুন্তক নিজের বৃত্তিতে ইহা বলিয়াছেনও যে "এইরূপ অর্থাৎ (রসতত্ত্বের বিধান অনুসারে) এই অলঙ্কার সমস্ত অলঙ্কারের প্রাণ এবং কাব্যের অদ্বিতীয় সারসর্বস্ব প্রমাণিত হয়।''

ইহার অধিক রসের গুণগান আর কি হইতে পারে?

রস ও বক্রোক্তির সম্বন্ধ-বিচার—এখন প্রশ্ন এই থাকিয়া যায় যে একদিকে যখন অলঙ্কাররূপী বক্রোক্তি কাব্যের প্রাণ এবং অন্যদিকে রসও কাব্যের পরমতত্ত্ব তখন এই দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য কেমন করিয়া সম্ভব—অর্থাৎ বক্রোক্তি ও রসের মধ্যে বাস্তবিক সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তর কঠিন নয়। কুন্তকের বিচার ধারার মূল কথা ধরিতে পারিলেই এই সন্দেহ দূর হইয়া যায়। কুন্তকের মতে কাব্যের প্রাণ নিশ্চিতরূপে বক্রোক্তি : এবং বক্রোক্তির অর্থ যেমন আমরা অন্যত্র স্পষ্টরূপে বলিয়াছি কেবলমাত্র উক্তির চমৎকারিত্ব নয় বরং কবিকৌশল অথবা কাব্যকলাও। কুন্তকের মতানুসারে কাব্য হইতেছে বক্রোক্তি অথবা কলা। এই কাব্যকলার রচনার জন্য কবি শব্দ অর্থের নানা গুণের সাহায্য গ্রহণ করেন। অর্থের বিভিন্ন গুণের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান হইতেছে রস। অতএব রস বক্রোক্তিরূপিনী কাব্যকলার পরমতত্ত্ব : কাব্যের প্রাণ চেতনা হইতেছে বক্রতা এবং রস-সম্পদ্ এই বক্রতার সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি। ইহাই কুন্তকের সার বক্তব্য।

ধ্বনি-পরবর্তী কাল

ধ্বনি-পরবর্তী কালেও ধ্বনিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মহিমভট্ট প্রভৃতি বিদ্বান-গণের বিরুদ্ধ-তর্কের অত্যন্ত প্রামাণিক রূপে খণ্ডন করিয়া মম্মট অতি দৃঢ়-ভিত্তির উপর ধ্বনি সিদ্ধান্তের স্থাপনা করিয়াছিলেন এবং সেইযুগ হইতে এক প্রকারে ইহাই সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের সর্বমান্য সিদ্ধান্তরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ধ্বনি-পরবর্তী কালের সর্বপ্রমুখ কাব্যশাস্ত্রীয় ধারা (১) ধ্বনিবাদ অথবা রসধ্বনিবাদ ছিল—ইহার সমর্থক ও অনুরাগী-দের মধ্যে মম্মট, হেমচন্দ্র, বিদ্যাধর ও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও (২) অলংকারবাদী অথবা (অন্ততপক্ষে) অলংকার অনুরাগী রুয়্যক,জ য়দেব ও অপ্পয্যদীক্ষিত প্রভৃতিরাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ধ্বনির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। (৩) রসবাদের প্রভাব ও প্রসারও কম হয় নাই। এই যুগে এমন অনেক আচার্য ছিলেন যাঁহারা ধ্বনির প্রভাব হইতে মুক্ত শুদ্ধ রসবাদের প্রতি-পাদন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অগ্নিপুরাণের রচয়িতা অথবা সম্পাদক, রামচন্দ্র, গুণচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শারদাতনয়, শিঙ্গভূপাল, ভানুদত্ত, রূপগোস্বামী প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। (৪) চতুর্থ ধারাটি ছিল কবিশিক্ষার—যাহার প্রচার এই যুগে প্রাচীন কালের অপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই ধারার লেখকদের দৃষ্টি কাব্যের মূলভূত সিদ্ধান্তের বিচার-বিশ্লেষণ অপেক্ষা কাব্য রচনায় সাহায্যকারী শাস্ত্রীয় সামগ্রীর সংকলনের উপর অধিক কেন্দ্রীভূত. ছিল। বস্তুতঃ এই ধারার কাহারও কোন একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্ত অথবা সম্প্রদায়ের প্রতি নিষ্ঠা ছিল না—অমরচন্দ্রের কাব্যকল্পলতা ও দেবেশ্বরের কবিকল্পলতা এই শ্রেণীর দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ধ্বনিবাদী—এই যুগের ধ্বনিবাদীদের রসের প্রতি দৃষ্টিকোণ আনন্দবর্ধনের দৃষ্টির সহিত প্রায় অভিন্ন ছিল। (১) ইঁহাদের হৃদয়েও রসের প্রতি অবাধ আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা রসকে "সকলপ্রয়োজনমৌলিভূত" এবং শব্দভেদে রসধ্বনিকে সর্বোত্তম কাব্যরূপে স্বীকার করিতেন। কিন্তু—(২) রসের বিচার ইঁহারা স্বতন্ত্র কাব্যাঙ্গরূপে না করিয়া প্রায় অসংলক্ষক্রমব্যঙ্গরূপেই করিয়াছেন। (৩) বস্তুধ্বনি ও অলংকার ধ্বনিকেও উত্তম কাব্যস্বীকার করিয়াছেন এবং (৪) কেবল ব্যঙ্গ যেখানে অপ্রধান সেখানে অত্যন্ত রসময় কাব্যকেও গুণীভূত ব্যঙ্গ বলিয়া মধ্যম কাব্যরূপে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে ইঁহারা সকলেই রসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও রসকে ধ্বনির আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যেখানে ব্যঙ্গ অর্থ ও সরস অর্থের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দৃষ্ট হয় সেখানে ইহারা ব্যঙ্গার্থের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ প্রয়োজনের দিক দিয়া রসকে অনিবার্যরূপে বাঞ্ছনীয় স্বীকার করিয়াও ধ্বনিকে আত্মতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

মম্মট এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। নিজের গ্রন্থের মঙ্গল শ্লোকে ও কাব্যে প্রয়োজন প্রসঙ্গে তিনি রসের প্রতি প্রবল অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছেন।

মঙ্গল শ্লোকের প্রারম্ভে :

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্ ।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি ॥

কাঃ প্রঃ ১.১

—কবির সেই কবিতা-সরস্বতীর জয় হউক যাহার রূপরেখা নিয়তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বথা মুক্ত, তাহা কেবলমাত্র আনন্দময়, নিজকে ছাড়িয়া অন্য সমস্ত কার্যকলাপের আশ্রয় হইতে মুক্ত, বস্তুতঃ ইহা অলৌকিক রসের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং খুবই সুন্দর।[১]

কাব্য-প্রয়োজন—"সদ্যঃ পরনির্বৃতির" ব্যাখ্যা করিয়া মম্মট লিখিয়াছেন :

সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদান্তরমানন্দম্ ।

—অর্থাৎ (এবং, ইহার সকলের অপেক্ষা অধিক) কাব্য হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হয় যাহা সকল প্রয়োজনের মধ্যে মূল প্রয়োজন, যাহা ব্যবধান ও বিলম্ব না করিয়াই রসাস্বাদন হইতে সমুদ্ভূত এবং যাহার আস্বাদনকালে অন্য সমুদয় বেদ্য বা জ্ঞেয় বিষয় তৎকালের জন্য বিগলিত হইয়া যায়।[২]

মম্মট স্পষ্ট রূপে রসাদিকে অলঙ্কার্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :

রসভাবতদাভাসভাবশান্ত্যাদিরক্রমঃ ।
ভিন্নো রসাদ্যলঙ্কারাদলংকার্যতয়া স্থিতঃ ॥ —কাঃ প্রঃ ৪.২৬

—রস, ভাব, রসাভাস ও ভাবশান্তি প্রভৃতি (কাব্য) অলঙ্কার্যরূপে বিদ্যমান থাকার জন্য ইহাদের রসবাদাদি অলঙ্কার হইতে ভিন্ন ধরা হয়।

এইরূপে রস-ব্যঞ্জন-ক্ষমতাকেই তিনি শব্দার্থের প্রত্যেকটি অবয়বের কাব্যত্বের ভিত্তিরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্যত্বের জন্য কেবল ব্যঞ্জন-ক্ষমতাই যথেষ্ট নয়। পদৈকদেশরচনাবর্ণেষ্বপি রসাদয়ঃ। সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের একদেশ অর্থাৎ প্রকৃতি, প্রত্যয় ও উপসর্গের দ্বারা, রচনার (রীতি, বৃত্তি) দ্বারা ও বর্ণের দ্বারাও রসাদি (প্রবন্ধ ব্যতীত) অভিব্যঙ্গ হয়। কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে মম্মট আনন্দবর্ধনের অনুসরণে প্রকৃতি প্রত্যয়াদি হইতে প্রবন্ধ পর্য্যন্ত শব্দ অর্থের সমস্ত রূপের রসব্যঞ্জনার বিস্তারের সহিত মার্মিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রসপ্রসঙ্গের প্রামাণিক ব্যাখ্যা হিসাবে বিদ্বানদের নিকটে কাব্যপ্রকাশের এই উল্লাসটি প্রথম হইতেই সমাদর পাইয়া আসিয়াছে। এই উল্লাসে মম্মট অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গম্ভীর রীতিতে রসের সারমর্মকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

গুণ, অলঙ্কার ও দোষ প্রসঙ্গে রসের প্রাধান্য আরও স্পষ্ট হইয়া যায়—

গুণ—যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ ।
উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ ॥ —কাঃ প্রঃ ৮.৬৬

—আত্মার যেমন শৌর্যাদি গুণ, তেমনি রসের যে সকল অঙ্গীভূত ধর্ম অব্যাভি-

১. হিন্দী কাব্যপ্রকাশ, পৃঃ ২
২. হিন্দী কাব্যপ্রকাশ, ১.২ বৃত্তিভাগ

চারীভাবে তাহার উৎকর্ষ সাধন করে তাহাই গুণ।

এখানে রসকে স্পষ্টরূপে অঙ্গীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অলঙ্কার—উপকুর্বন্তি তং সন্তং যেহঙ্গদ্বারেণ জাতুচিৎ।
হারাদিবদলঙ্কারাস্তেহনুপ্রাসোপমাদয়ঃ॥ —কাঃ প্রঃ ৮.৬৭

সেই অঙ্গীভূত বিদ্যমান রসের যারা শব্দার্থরূপ অঙ্গের দ্বারা উপকার করে, সেই অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি হারাদির সমান অলঙ্কার নামে অভিহিত হয়।

এই উদ্ধরণেও রসের আঙ্গিত্বের স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে দোষের বর্ণনাতেও রসের প্রাধান্য স্পষ্ট বিদ্যমান।

মুখ্যার্থহতির্দোষো রসশ্চ মুখ্যঃ। —কা প্রঃ ৩.১

—দোষ বলিতে বুঝায় মুখ্য অর্থের অপকর্ষক—এবং মুখ্য অর্থ হইতেছে রস। অর্থ ও শব্দ তাহার উপায় অতএব দোষ বলিতে মূলরূপে রসাপকর্ষক তত্ত্বেই বুঝায় এবং রসের আশ্রয়ে অর্থ ও শব্দের অপকর্ষক তত্ত্বও দোষ হইয়া যায়।

উল্লিখিত সবগুলি প্রসঙ্গে মম্মট রসের প্রতি নিজের অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তবুও মম্মটের সিদ্ধান্তানুসারে ধ্বনির পরে রসের স্থান। সকল প্রয়োজন মৌলিভূত হইলেও রস ধ্বনির আশ্রিত এবং সেই দিক দিয়া ধ্বনি হইতে গৌণও। এই সম্বন্ধে বলিষ্ঠ প্রমাণও আছে:

(ক) রসের বর্ণনা তিনি অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ ধ্বনির অন্তর্গত করিয়াছেন:

রসভাবতদাভাসভাবশান্ত্যাদিরক্রমঃ। —কাঃ প্রঃ ৪.২৬

—রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাবাস, ভাবশান্তি প্রভৃতি অর্থাৎ ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতা অক্রম (অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ) ধ্বনির অন্তর্গত বিদ্যমান থাকে।[১]

(খ) রসের গৌণ স্থিতিকেও তিনি স্বীকার করিয়াছে—তাঁহার মতে যেখানে রস মুখ্য রূপে বিদ্যমান আছে সেখানে তাহা অলংকার্য রূপে স্বীকৃত হয় এবং সেখানে গুণীভূত অথবা অন্য অর্থের অঙ্গ রূপে বিদ্যমান আছে সেখানে তাহাকে অলঙ্কার বলা হয়।

অন্যত্র তু প্রধানে বাক্যার্থে যত্রাঙ্গভূতো রসাদিস্তত্র
গুণীভূতব্যঙ্গয়ে রসবৎ-প্রেয়-উর্জস্বি-সমাহিতাদয়োহলংকারা।

—হিঃ কাঃ প্রঃ পৃঃ ৬৫

—অন্যত্র যেখানে রসাদি প্রধান বাক্যার্থের অঙ্গভূত থাকে, সেখানে গুণীভূত কাব্য হয় এবং রসাদি অলঙ্কাররূপে গৃহীত হয়।

রসবাদীরা এই বিচার স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে রস কখনই গৌণ হইতে পারে না: মুখ্য বাক্যার্থ ভিন্ন হইলেও কবিত্ব রসেরই আশ্রিত থাকিবে—এবং এই কবিত্বের দৃষ্টিতে তথাকথিত অভিপ্রেত অর্থই গৌণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে যদি কোন কাব্যে রসার্থ মুখ্য না হইয়া অন্য কোন অর্থ মুখ্য হয়

১. আদিগ্রহণাদ্ ভাবোদয়-ভাবসন্ধি-ভাবশবলত্বানি।—হিঃ কাঃ প্রঃ (চৌঃ বিঃ ভঃ), পৃঃ ৬৪

সেখানে কবিত্বের দৃষ্টিতে রসার্থ মুখ্য হইয়া যাইবে এবং অভিপ্রেত অর্থ গৌণ—অর্থাৎ রস কখনই গুণীভূত অথবা অঙ্গভূত বা অলঙ্কার হইতে পারে না।

(গ) ব্যঙ্গার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গুণীভূত ব্যঙ্গের উদাহরণেও কোন-কোন স্থানে রসের অবস্থান গৌণ হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত বিবেচনায় ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে ঃ

অতাদৃশি গুণীভূতব্যঙ্গংব্যঙ্গয়ে তু মধ্যমম্ ।
অতাদৃশি বাচ্যাদনতিশায়িনি । যথা—
গ্রামতরুণং তরুণ্যা নববঞ্জুলমঞ্জরীসনাথকরম ।
পশ্যন্ত্যা ভবতি মুহুর্নিতরাং মলিনা মুখচ্ছায়া ॥ —কাঃ প্রঃ ১.৫

অত্র বঞ্জুললতাগৃহে দত্তসংকেতা নাগতেতি ব্যঙ্গ্যং গুণীভূতং তদপেক্ষয়া বাচ্যস্যৈব চমৎকারিত্বাৎ ॥

—সেই কাব্য মধ্যমকাব্য যাহাতে ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থের অপেক্ষা বিশেষ চমৎকারক নয় এবং সেইজন্য সেই কাব্যকে গুণীভূত ব্যঙ্গ কাব্য বলা হইয়াছে। এখানে ব্যাঙ্গার্থ সেই রকম নয় বলার উদ্দেশ্য, ইহা বাচ্যার্থের অপেক্ষা অধিক চমৎকারজনক নয়। যেমন এখানে "যাহার হাতে নববঞ্জুলমঞ্জরী আছে সেই তরুণকে দেখিয়া তরুণীর বদন-কান্তি থাকিয়া থাকিয়া ম্লান হইয়া যাইতেছে। এখানে বঞ্জুল নিকুঞ্জে মিলনের জন্য নিজের দিক হইতে সংকেত দিলেও সে ওখানে যায় নাই"—ইহা অবশ্যই ব্যঙ্গার্থ—কিন্তু গৌণ রূপে প্রকট হইয়াছে, কারণ ইহার অপেক্ষা বাচ্যার্থ অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া ম্লান হওয়া অধিক সুন্দর প্রতীত হইতেছে।

এই বিচার বাস্তবিক দৃষ্টিতে ধ্বনি সিদ্ধান্তের দুর্বলতাকেই দেখাইয়া দিতেছে। উল্লিখিত শ্লোকটি নিঃসন্দেহে সরস ও রমণীয়। তরুণীর হৃদয়ের কোমল অনুতাপ রমণীয় অনুভাবরূপে অর্থাৎ থাকিয়া-থাকিয়া যে বদনকান্তি ম্লান হইয়া যাইতেছে তাহার দ্বারা সহজ সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইতেছে; কিন্তু ধ্বনিবাদী মম্মট এই সুন্দর অনুভাবের চিত্রটিকে মধ্যম কাব্যের শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন—যেহেতু এখানে ব্যাঙ্গার্থ—অর্থাৎ বঞ্জুল নিকুঞ্জে মিলনের জন্য নিজের দিক হইতে সংকেত দেওয়া সত্ত্বেও সে ওখানে যায় নাই সেইজন্য ইহা গৌণ থাকিয়া দিয়াছে।—ধ্বনিকার নিজের এই দুর্বলতাকে অনুভব করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে ঃ

ধ্বনিনিস্পন্দরূপো দ্বিতীয়োহপি মহাকবিবিষযোহ-
তিরমনীয়ো লক্ষণীয়ঃ সহৃদয়ৈঃ ।

—(ধ্বন্যালোক, চৌঃ; পৃঃ ৪৭৪)

—অতএব অতি রমণীয় মহাকবি-বিষয় এই দ্বিতীয় ধ্বনি-প্রবাহটিকেও সহৃদয়দের বুঝিয়া লইতে হইবে।

এই সন্দর্ভে মম্মটের কাব্য-সংজ্ঞার কথা উদ্ধৃত করিয়া অভিযোগ করা হয় যে উহাতে রসের কোন উল্লেখ হয় নাই। এই অভিযোগটি খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ

রসকে সহৃদয়গত স্বীকার করিবার জন্য শব্দার্থের মধ্যে তাহার অবস্থান মম্মট স্বীকার করেন নাই এবং সেইজন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যঙ্গ এবং সহৃদয়নিষ্ঠ রসকে নিজের কাব্য সংজ্ঞাতে ব্যঙ্গই রাখিয়াছেন—বাচ্যরূপে তাহার উল্লেখ করেন নাই। অন্য যুক্তি অনুসারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে রস গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। তবুও এই সংজ্ঞার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে রসের প্রতি বোধ হয় মম্মটের ততখানি গভীর আগ্রহ ছিল না যতখানি বিশ্বনাথ প্রভৃতির রচনায় পরিলক্ষিত হয়। আমরা অন্যত্র প্রমাণিত করিয়াছি যে মম্মটের এই কাব্য-লক্ষণ রস-বিরোধী বামনের কাব্য-লক্ষণের ভাষ্য মাত্র। এই প্রমাণটিও উপেক্ষণীয় নয়।[১] যাহাই হউক, আমাদের সার কথা এই যে রসের রসিক হইলেও ধ্বনিবাদকেই মম্মট পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র ও বিদ্যাধর উভয়ের উপরই মম্মটের বিশেষ প্রভাব ছিল। হেমচন্দ্র নিজের কাব্যানুশাসনে প্রায় সেই সকল বিচারই ব্যক্ত করিয়াছেন যাহা মম্মট নিজের গ্রন্থে করিয়াছিলেন।

একদিকে তিনি:

(ক) মম্মটের কথার অনুবাদ করিয়া রসাস্বাদজন্য আনন্দকে সর্বপ্রয়োজনোপনিষদ্ভূত বলিয়াছেন।

সদ্যোরসাস্বাদজন্মা নিরস্তবেদ্যান্তরা ব্রহ্মাস্বাদসদৃশী প্রীতিরানন্দঃ।
ইদং সর্বপ্রয়োজনোপনিষদ্-
ভূতং কবিসহৃদয়য়োঃ কাব্যপ্রয়োজনম্।

—(কাব্যানুশাসন, অঃ ১, সূঃ ৩)

(খ) তিনি গুণ-দোষকে রসের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণরূপে স্বীকার করিয়াছেন:

রসস্যোৎকর্ষাপকর্ষহেতু গুণদোষৌ।

—(কাব্যানুশাসন, অঃ ১, সূঃ ১২)

(গ) অলঙ্কারকে তিনি রসের উপকারী রূপে স্বীকার করিয়াছেন:

রসস্যাঙ্গিনো যদঙ্গং শব্দার্থো তদাশ্রিতা অলঙ্কারাঃ। —১. ১৩ (বৃত্তি)

অর্থাৎ অঙ্গ-রূপী রসের অঙ্গ হইতেছে শব্দার্থ এবং শব্দার্থের আশ্রিত হইতেছে অলঙ্কার।

এই অলঙ্কারের খুব বেশী ব্যবহার ঠিক নয়—এবং যেখানে ইহার ব্যবহার প্রয়োজন সেখানে অঙ্গরূপে এবং রসের উপকারী রূপেই ইহার ব্যবহার করিতে হইবে:

নির্বাহেঽপ্যঙ্গত্বে রসোপকারিণঃ।

—কাব্যানুশাসন, ১. ১৪

১. দ্রষ্টব্য—ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র কী ভূমিকা (ভাগ ২), পৃ ৫

এবং (ঘ) তিনি রস-প্রসঙ্গের অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন—
কাব্যানুশাসন, অঃ ২।
—অপর দিকে তিনি :

(ক) রসের বর্ণনা ব্যঙ্গের ভেদ হিসাবে করিয়াছেন :
রসভাবতদাভাসভাবশান্তিভাবোদয়ভাবস্থিতিস্থিভাব-
সন্ধিভাবশবলত্বান্যর্থশক্তিমূলানিব্যঙ্গ্যানি —(অঃ ১, সূঃ ২৫)

—অর্থাৎ রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস প্রভৃতি অর্থশক্তিমূলক ব্যঙ্গের প্রকার-ভেদ বলিয়া গৃহীত হয়। এবং (খ) মম্মটের কাব্যলক্ষণের প্রায় অনুরূপ নিজের কাব্যলক্ষণেও তিনি রসকে কোন স্থান দেন নাই—

অদোষৌ সগুণৌ সালংকারৌ চ শব্দার্থৌ কাব্যম্।
—(কাঃ অনুঃ অঃ ১, সূঃ ১১)

বিদ্যাধরের একাবলী বলিতে গেলে 'কাব্যপ্রকাশেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', সেখানেও ধ্বনির মাধ্যমে রসকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই শ্রেণীর অন্তিম কিন্তু অত্যন্ত সমর্থ আচার্য ছিলেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী)। কালক্রমানুসারে তিনি সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রের অন্তিম আচার্য। পণ্ডিতরাজের সরসতা ও রসিকতা সর্বজনবিদিত। কাব্যরসের আনন্দ-ময়তার প্রমাণ দিতে গিয়া তিনি শ্রুতির উদ্ধৃতি উপস্থিত করিয়া রসকে আত্মানন্দের তুল্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

অন্যত্রাপি "রসো বৈ সঃ।"
"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাহহনন্দীভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি।

—সেই আত্মা রস-রূপ, রসকে পাইয়াই তাহা আনন্দ রূপ হইয়া যায়।

এইরূপে তিনি ধ্বনির পাঁচটি ভেদের মধ্যে রসধ্বনিকেই সর্বাধিক রমণীয় মানিয়া রসকে রসধ্বনির আত্মারূপে স্বীকার করিয়াছেন :

এবং পঞ্চাত্মকে ধ্বনৌ পরমরমণীয়তয়া রসধ্বনেস্তদাত্মা
রসস্তাবদভিধীয়তে। —ঐ, পৃঃ ৩৯

এই উদ্ধৃত সমূহ ছাড়াও তিনি রস তত্ত্বের এবং তাহার অঙ্গ উপাঙ্গের প্রায় একটি সম্পূর্ণ আননে যে রকম মনোনিবেশের সহিত সূক্ষ্ম ও গভীর বিচার করিয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে রসের প্রতি তাঁহার মনে গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল। রসের নানা প্রসঙ্গের বিষয়ে তিনি যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন সেই সব সিদ্ধান্ত আজ রসবাদীদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা অধিক মান্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই সম্বন্ধে আমরা পরে যথাস্থানে বিচার করিব।

রসের প্রতি আগ্রহ থাকিলেও কাব্যাত্মার বিষয়ে পণ্ডিতরাজের মত ধ্বনির পক্ষেই দেখা যায়। এই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে স্বভাবের দিক দিয়া অধিক রসিক হইলেও তিনি ধ্বনির ব্যাপারে মম্মটকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন :

(ক) মম্মটের অনুরূপ তিনিও ধ্বনির মধ্যেই রসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গের অন্তর্গত রূপেই রসের বিচার করিয়াছেন।

(খ) মম্মটাদিরা যেখানে অলঙ্কারকে রসের উপকারী রূপে গ্রহণ করেন সেখানে পণ্ডিতরাজ অলঙ্কারকে ব্যঙ্গেরই 'রমণীয়তা-প্রয়োজক' রূপে গ্রহণ করেন :

অথাস্য প্রাগভিহিতলক্ষণস্য কাব্যাত্মনো ব্যঙ্গ্যস্য রমণীয়তাপ্রয়োজকা অলঙ্কারা নিরূপ্যন্তে ॥

—ঐ, দ্বিতীয় আনন, পৃঃ ১৯৪

—যাহার লক্ষণ পূর্বে বলা হইয়াছে এখন সেই কাব্যাত্ম রূপ ব্যঙ্গের শোভা সম্পাদক অলঙ্কারের নিরূপণ করিব।

(গ) কাব্যলক্ষণে রসের উল্লেখ না করিলেও এবং বস্তু-ধ্বনি প্রভৃতিকে উত্তম কাব্যরূপে স্বীকার করিলেও মম্মট রসের প্রাধান্যকে স্পষ্ট রূপে অস্বীকার করেন নাই কিন্তু পণ্ডিতরাজ নির্দ্বিধায় ইহা ঘোষণা করিয়াছেন যে :

যত্তু 'রসবদেব কাব্যম্' ইতি সাহিত্যদর্পণে নির্ণীতম্, তন্ন, বস্ত্বলংকারপ্রধানানাং কাব্যানামকাব্যত্বাপত্তেঃ। ন চেষ্টাহহপত্তিঃ, মহাকবিসম্প্রদায়স্যাকুলীভাবপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ জলপ্রবাহবেগনিপতনোৎপতনভ্রমণানি কবিভির্বর্ণিতানি, কপিবালাদিবিলসিতানি চ। ন চ তত্রাপি কথঞ্চিৎ পরম্পরয়া রসস্পর্শোহস্ত্যেবেতি বাচ্যম্, ইদৃশরসস্পর্শস্য "গৌশ্চলতি" "মৃগো ধাবতি" ইত্যাদাবতিপ্রসক্তত্বেনাপ্রয়োজকত্বাৎ। অর্থমাত্রস্য বিভাবাহনুভাবব্যভিচার্যন্যতমত্বাদিতি দিক্। —ঐ, প্রথম আনন, পৃঃ ২৩-২৪

--অর্থাৎ সাহিত্য দর্পণে যে রসান্বিত রচনাকেই কাব্য বলা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। কারণ তাহা হইলে বস্তু ও অলংকার কাব্যগুলি অকাব্য হইয়া পড়ে। ইহাদের কাব্য বলা যাইতে পারে না। এ কথাও বলা যায় না তাহাতে মহাকবিদের ধারাবাহিক সিদ্ধান্তের উচ্ছেদ ঘটে। কবিগণ জলপ্রবাহের বেগ, পতন উত্থান আবর্ত্ত এবং বানর ও শিশু প্রভৃতির বিলাসগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সব রচনাতেও যে কোন প্রকারে পরম্পরাক্রমে রস স্পর্শ আছে--এ কথা বলা চলে না। কারণ এরূপ রসের প্রসঙ্গ "গরু চলিতেছে"—"মৃগ দৌড়াইতেছে" প্রভৃতি চমৎকারিতাহীন শব্দের মধ্যেও আসিয়া পড়ে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাব—ইহাদের মধ্যে যে কোন একটির অস্তিত্ব অর্থমাত্রে থাকিবেই। তাহা হইলে সমস্ত বাক্যই কাব্যে পরিণত হইবে।

(ঘ) বস্তুতঃ জগন্নাথ চমৎকারিতার দ্বারা সংযুক্ত কাব্যকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন :

কাব্যজীবিতং চমৎকারিত্বং চাবিশিষ্টমেব।

—রঃ গঃ পৃঃ ২১

তিনি এই ব্যঙ্গ অর্থকে সর্বত্র রস বলিয়া ধরেন নাই সেইজন্য একদিকে তিনি

বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিকেও উত্তমোত্তম কাব্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন ও অপর দিকে অর্থ-চিত্রকে মধ্যম কাব্যের শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। ইহার সারার্থ এই যে পণ্ডিতরাজের রমণীয় অর্থ রসের অপেক্ষা অধিক ব্যাপক এবং উহার পরিধির মধ্যে প্রায় সকল প্রকারের কাব্য-চমৎকারিতার স্থান বিদ্যমান।

এই যুগের অলঙ্কারবাদী অথবা অলঙ্কার অনুরাগী আচার্য রুয়্যক (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী), জয়দেব (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী) ও অপ্পয্যদীক্ষিতেরও (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) রসের অপেক্ষা ধ্বনির প্রতিই অধিক আগ্রহ ছিল। রুয়্যক নিজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অলঙ্কারসর্বস্বে এবং উহারও অপেক্ষা অধিক ব্যক্তিবিবেকের টীকায় ধ্বনির প্রতি পক্ষপাত ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও মহিমভট্ট ব্যক্তিবিবেকের রচনা ব্যঞ্জনা অথবা ধ্বনির খণ্ডনের জন্যই করিয়াছিলেন কিন্তু টীকাকার রুয়্যক নানা-স্থানে মহিমভট্টের মতবাদ খণ্ডন করিয়া ধ্বনির প্রতি নিজের আস্থা ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বভাবতঃ রসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিকোণ ধ্বনিবাদীদের অনুরূপ ছিল—অর্থাৎ অসংলক্ষ-ক্রমব্যঙ্গের অন্তর্গত তিনি রসের বিচার করিয়াছেন এবং ইহা ছাড়া বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিকে নির্বিবাদে উত্তম কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জয়দেব নিজের "চন্দ্রালোক"-এ ও অপ্পয্যদীক্ষিত "চিত্র মীমাংসা"য় রস ও ধ্বনির আপেক্ষিক প্রাধান্যের ব্যাপারে ঠিক এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কতিপয় আলোচক জয়দেবকে ধ্বনিবাদী বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে চন্দ্রালোকে রসের বর্ণনা অসংলক্ষক্রমব্যঙ্গরূপেই হইয়াছে। সম্পূর্ণ দুইটি ময়ূখে ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনার মধ্যে ব্যঞ্জনাকেই অধিক সারগর্ভ বলিয়া ধরা হইয়াছে ঃ

কটাক্ষ ইব লোলাক্ষ্যা ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ।

—চঃ আঃ ৭. ২

—ব্যঞ্জনা-ব্যাপার চঞ্চলাক্ষী রমণীর (সাভিলাষ) কটাক্ষের অনুরূপ।

কিন্তু তবুও তিনি কোন কাব্য-সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা নিম্নলিখিত উক্তির দ্বারা স্পষ্ট হইয়া যায় ঃ

অঙ্গীকরোতি যঃ কাব্যং শব্দার্থাবনলঙ্কৃতী।
অসৌ ন মন্যতে কস্মাদনুষ্ণমনলঙ্কৃতী॥

—চঃ আঃ ১. ৮

—যাঁহারা অলঙ্কারহীন শব্দার্থকেও কাব্য বলিয়া স্বীকার করেন, সেই সব কৃতী বিচারকেরা অগ্নিকে উষ্ণতাহীন বলিয়া কেন গ্রহণ করেন না?

ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও রসের বিষয়ে জয়দেব অনুদার ছিলেন না। নিজের কাব্যলক্ষণে তিনি রসের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

নির্দোষা লক্ষণবতী সরীতির্গুণভূষণা।
সালঙ্কাররসানেকবৃত্তির্বাক্কাব্যনামভাক্॥ —চঃ আঃ ১. ৭

—এবং ষষ্ঠ ময়ূখে রসের সবিস্তার বর্ণনাও করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্ররূপে বিবেচনা করিলে চন্দ্রালোকে রস গৌণরূপেই বর্ণিত হইয়াছে :

ভাবস্য শান্তিরুদয়ঃ সন্ধিঃ শবলতা তথা।
কাব্যস্য কাঞ্চনস্যেব কুঙ্কুমং কান্তিসম্পদে॥

—চঃ আঃ ৬. ২০

—যেইরূপ কুঙ্কুমের দ্বারা সুবর্ণের শোভা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ভাবশান্তি প্রভৃতির দ্বারা কাব্যের শোভার বিস্তার হয়।

অপ্পয্যদীক্ষিতের দৃষ্টিকোণও প্রায় জয়দেবের অনুরূপই। চিত্র মীমাংসায় তিনি ব্যঙ্গকাব্যকে উত্তম[১] বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ধ্বনির[২] মধ্যে রসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সমগ্ররূপে বিচার করিলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে অপ্পয্য-দীক্ষিতের মূল প্রতিপাদ্য অলঙ্কারই—ধ্বনির কেবল গতানুগতিক উল্লেখ করিয়াছেন ও রস প্রায় উপেক্ষিতই থাকিয়া গিয়াছে।

রসবাদী—আলোচ্য যুগে রসবাদের প্রতিপাদক প্রথম গ্রন্থ অগ্নিপুরাণ (খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রারম্ভে)। ইহাতে, ৩৩৭ হইতে ৩৪৭ পর্যন্ত, এগারটি অধ্যায়ে কাব্যশাস্ত্রের সুন্দর বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রে শব্দের প্রাধান্য, ইতিহাসে (পুরাণাদি) আস্থা ও কাব্যে অভিধার প্রাধান্য অগ্নিপুরাণে স্বীকৃত হইয়াছে; এবং বোধহয় এই কারণে ইহাতে ধ্বনির উল্লেখ নাই। অগ্নিপুরাণকারের উপর ধ্বনি-পূর্ব অলঙ্কারবাদী আচার্যদের—ভামহ ও দণ্ডীর নিশ্চিত রূপে গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং ইহার ফলস্বরূপ তিনি অলঙ্কারের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

কাব্যকে তিনি গুণবৎ ও দোষবর্জিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহা ছাড়া কাব্যকে স্ফুরদলঙ্কারও বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি কাব্যের ক্ষেত্রে অলঙ্কারের উপস্থিতিকে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন :

(ক) কাব্যং স্ফুরদলংকারং গুণবদ্দোষবর্জিতম্।[৩]

—অঃ পুঃ ৩৩৭.৭

—এখানে অলঙ্কারের উল্লেখ সর্বাগ্রে করা হইয়াছে এবং "স্ফুরৎ" শব্দটি তাহার প্রাধান্যকে আরো স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আশ্চর্যের কথা এই যে কাব্য-লক্ষণে রসের কোথাও উল্লেখ নাই।

(খ) অর্থালংকাররহিতা বিধবেব সরস্বতী।[৪]

—অঃ পুঃ ৩৪৪.২

অর্থালঙ্কার না থাকিলে কবিতা বিধবাতুল্য হয়। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও অগ্নি-

১. চিত্রমীমাংসা (নির্ণয়সাগর প্রেস), প্রস্তাবনা-অংশ
২. ঐ, পৃ০ ৩৩
৩. দ্রষ্টব্য—অগ্নিপুরাণ কা কাব্যশাস্ত্রীয় ভাগ, পৃ০ ২৬
৪. ঐ, পৃ০ ৭০

পুরাণে রসের প্রাধান্য অসন্দিগ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে :

(১) পরব্রহ্মের অভিব্যক্তির নামই রস, এই রস চৈতন্য ও চমৎকার-স্বরূপ :

আনন্দঃ সহজস্তস্য ব্যজ্যতে স কদাচন ।
ব্যক্তিঃ সা তস্য চৈতন্যচমৎকাররসাহ্বয়া ।[১]

—অঃ পুঃ ৩৩৯.২

—এই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বাভাবিক, যাহার কখনও-কখনও অভিব্যক্তি হয়। সেই অভিব্যক্তির নামই চৈতন্য, চমৎকার অথবা রস ।

(২) লক্ষ্মীরিব বিনা ত্যাগান্ন বাণী ভাতি নীরসা ।[২]

—অঃ পুঃ ৩৩৯.৯

—দান ভিন্ন যে রকম লক্ষ্মী শোভা পান না, সেইরূপ রস না থাকিলে কবিতার শোভা থাকে না ।

রসাদিবিনিয়োগোঽথ কথ্যতে হৃতিমানতঃ ।
তমন্তরেণ সর্বেষামপার্থৈব স্বতন্ত্রতা ।[৩] —অঃ পুঃ ৩৪২.৩

—এখন বিস্তারপূর্বক রসাদির প্রকরণ নির্দিষ্ট করা হইতেছে। ইহা না থাকিলে সকলের (কবি এবং সহৃদয়ের) উপস্থিতি ব্যর্থ হইয়া যায় ।

(৩) বাগ্বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্ ।
পৃথক্প্রয়ত্ননির্বর্ত্যং বাগ্বিক্রমণি রসাদ্বপুঃ ।[৪]

—অঃ পুঃ ৩৩৭.৩৩

—বাগ্বৈদগ্ধ্যের প্রাধান্যকে মানিয়া লইলেও মহাকাব্যের আত্মা রসই ।

অতএব কবিকে ব্যর্থ বাগ্‌বিক্রম ছাড়িয়া কাব্যের কলেবরকে রসাক্ত করিতে হইবে ।

উল্লিখিত উদ্ধরণে লেখকের মনের গ্রন্থি যেন অনিবার্যভাবে খুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার মনে নিশ্চিতরূপে অলঙ্কারের (বাগ্‌বৈদগ্ধ) প্রতি অত্যন্ত মোহ বিদ্যমান ছিল এবং কাব্যে, মহাকাব্য তো উপলক্ষণ মাত্র, তিনি অলঙ্কারের প্রাধান্যকেই স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে আত্মা রসই—অর্থাৎ আপেক্ষিক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে রসের প্রাধান্য অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয় ।

ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে অগ্নিপুরাণকারের দৃষ্টিকোণ আরও স্পষ্ট হইয়া যায় । শাস্ত্রানুসারে অর্থেরই অর্থাৎ বস্তুর প্রাধান্য থাকে এবং বস্তুর প্রভাব মূলরূপে উহার শোভা অথবা কথা-রসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে ।

১. দ্রষ্টব্য—অগ্নিপুরাণ কা কাব্যশাস্ত্রীয় ভাগ, পৃ০ ৩৭
২. ঐ, পৃ০ ৩৯
৩. ঐ, পৃ০ ৫৫
৪. ঐ, পৃ০ ৩০

অগ্নিপুরাণের রচনাকাল পর্যন্ত পুরাণের ক্ষেত্রে কাব্যতত্ত্বেরও প্রচুর অভিনিবেশ হইয়া গিয়াছিল এবং অপরদিকে কাব্যশাস্ত্রেরও যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছিল—রস ও অলংকার ব্যতীত ধ্বনি, রীতি, (বক্রোক্তি ?) প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়গুলি প্রকাশ পাইয়াছিল। স্বভাবতঃ অগ্নিপুরাণের কাব্যশাস্ত্রীয় অংশের লেখক এই সব সম্প্রদায়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন—অপরদিকে পুরাণের রচয়িতা হওয়ার জন্য সম্ভবতঃ তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিকোণও ছিল। অতএব একদিকে তিনি নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অপরদিকে স্বকীয় বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং কার্যক্ষেত্রের জন্য ধ্বনিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং বস্তুর রুচিরতা ও কথা-রসের উপর মূলরূপে নির্ভরশীল থাকার জন্য তিনি অবশেষে রসকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র কৃত নাট্য দর্পণ (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে) রসবাদের দ্বিতীয় প্রমুখ গ্রন্থ (গ্রন্থের বিবেচ্য-বিষয় নাটক হওয়ার জন্য স্বভাবতই উহাতে রসের প্রাধান্য বিদ্যমান আছে এবং ইহার রচয়িতারা ভরত ধনঞ্জয় প্রভৃতির রসধারারই সমর্থন করিয়াছেন।

কবির পক্ষে অলঙ্কার-রচনার-অপেক্ষা রস-পরিপাক অনেক কঠিন। যদিচ অলঙ্কারের দ্বারা কথা প্রভৃতি কোমল ও সুখপূর্বক সঞ্চরণ-যোগ্য হইয়া ওঠে। কিন্তু রস-কল্লোলের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য নাট্য-মার্গ অত্যন্ত কঠিন বলিয়া পরিগণিত হয়। এখানে কঠিন শব্দ প্রকৃত পক্ষে গ্রহণীয়তার ব্যঞ্জনা করিতেছে ঃ

অলংকারমৃদুঃ পন্থাঃ কথাদীনাং সুসঞ্চরঃ।
দুঃসঞ্চরস্তু নাট্যস্য রসকল্লোলসঙ্কুলঃ॥ —নাঃ দঃ ১. ৩

—নাটকের আকর্ষণের মূল কারণ রসই—কাব্যের সার্থকতা ইহাই যে তাহার দ্বারা জনসাধারণেরও রসামৃত প্রাপ্তি সুলভ হইয়া যায় ঃ

স কবিস্তস্য কাব্যেন মর্ত্যা অপি সুধান্ধসঃ।
রসোর্মিঘূর্ণিতা নাট্যে যস্য নৃত্যতি ভারতী॥ —নাঃ দঃ ১. ৫

—রসামৃতের সিদ্ধির দ্বারাই কবি কবীন্দ্রপদের অধিকারী হন। যাঁহারা নানার্থক শব্দের প্রলোভনে পড়িয়া রসামৃত হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া যান, সেই সব বিদ্বানেরা উত্তম কবির খ্যাতি লাভ করিতে পারেন না ঃ

নানার্থশব্দলৌল্যেন পরাঞ্চো যে রসামৃতাৎ।
বিদ্বাংসস্তে কবীন্দ্রাণামর্হন্তি ন পুনঃ কথাম্॥ —নাঃ দঃ ১. ৬

—নাট্যদর্পণের প্রায় দুই বিবেকে অর্থাৎ তিন-চতুর্থাংশ গ্রন্থে রস ও উহার নানা রূপ এবং আলম্বন প্রভৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে রসের প্রতি উক্ত লেখকদ্বয়ের আগ্রহের কথা প্রমাণিত হয়।

শারদাতনয়ের—(খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) "ভাবপ্রকাশন"এ রসের প্রতি আগ্রহ আরও প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। নাট্যদর্পণের মূল বিষয় হইতেছে

নাট্য বিবেচনা এবং এই বিবেচনা প্রসঙ্গে রসের প্রাধান্যের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাব প্রকাশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে রস এবং ভাবাদিই রসের ভিত্তিস্থানীয়। এইরূপে ভাব প্রকাশন সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের সেই সব বিরল গ্রন্থের মধ্যে একটি, যাহাকে বিশুদ্ধ রস শাস্ত্রের গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। নাট্য এবং নাট্যাঙ্গের বিবেচনা এই গ্রন্থে রসের ভিত্তিতেই করা হইয়াছে। এখানে প্রচুর মাত্রায় রস-সিদ্ধান্ত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান একত্র সংকলিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্র এবং শৃঙ্গার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও রসের সম্বন্ধে এত সামগ্রী পাওয়া যায় না। শারদাতনয় অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত রসের আবির্ভাব এবং রসের স্বরূপাদির বিষয়ে ভরতের পূর্ববর্ত্তী আচার্য্যদের নানা সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই আচার্য্যদের মধ্যে ভরতবৃদ্ধ, বাসুকি, পদ্মভূ এবং নারদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটকের প্রসঙ্গে কোহল প্রভৃতির প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে এই সমস্ত সামগ্রী নবীন ও সুন্দর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রামাণিকতার ব্যাপারে এখনও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। ভাব প্রকাশনের প্রচার হওয়ার পরও এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত বিদ্বান্-মণ্ডলী ইহার ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহা ছাড়াও ভাবপ্রকাশনে অনেক মৌলিক প্রসঙ্গের প্রামাণিক রীতিতে বিচার করা হইয়াছে, যেমন কাব্য ও রসের মধ্যে সম্বন্ধ, ভাব ও রসের মধ্যে সম্বন্ধ, শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ, রূপকের নানা প্রভেদের মধ্যে রসের স্থান ইত্যাদি। সমগ্র রূপে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই গ্রন্থে রস বিষয়ক নানাবিধ প্রশ্নের বিস্তৃত, সুস্থ ও সবিবরণ বিচার পাওয়া যায় এবং এই কারণে রসশাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে ভাবপ্রকাশের স্থান বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

শারদাতনয় নিশ্চিতরূপে রসবাদী আচার্য্য ছিলেন—যথার্থ রূপে বলিতে গেলে প্রবল রসবাদী ছিলেন। তাঁহার কাশ্মীরী শৈব-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের উপর আস্থা ছিল এবং এই দর্শনের আলোকে তিনি রস ভোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যদর্শন অভিনব গুপ্তের অপেক্ষা ভট্টনায়ক দ্বারা অধিক প্রভাবিত যাঁহার মতানুসারে স্বয়ং সহৃদয় রসের ভোগ করেন :

রসালম্বনভাবানামুক্তাঃ সাধারণা গুণাঃ
সুখেপ্সবস্তে সর্বেহপি ভোগস্তৎসুখসাধনম্ ॥

—ভাঃ প্রঃ ৪, ৯

ভাবপ্রকাশন গ্রন্থের নানা স্থানে কাব্যের সমস্ত ভেদগুলিতেই রস নির্ভরতার উপরই ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে; যদিও বৃত্তি ছাড়া কাব্যের অন্য তত্ত্বের এখানে একান্তভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে। অবশ্য ধ্বনির বর্ণনা এখানে বর্ত্তমান এবং প্রধানুসারে ইহাকে উত্তম কাব্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ইহা ছাড়া ধ্বনিকে তাৎপর্য্য শক্তির অন্তর্গত করিয়া উহার শক্তিকে ক্ষীণ

করিয়া দেওয়া হইয়াছে।[১] রসবাদী হইলেও শারদাতনয় নিজের পূর্ববর্তী অভিনব গুপ্ত ও পরবর্তী বিশ্বনাথের অনুরূপ রসকে অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[২] কিন্তু তিনি রসের বর্ণনা ধ্বনির অন্তর্গত করেন নাই, বরং ধ্বনির বর্ণনার পূর্বে এবং প্রধান বিষয় রূপে রসের বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে ধ্বনি ও রসের তারতম্য এবং এই সম্বন্ধে ধ্বনিবাদী ও রসবাদীর মধ্যে দৃষ্টিকোণের প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া যায়।

সমগ্র ভাবে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে রসের বিষয়ে শারদাতনয়ের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভ্রান্ত ছিল—তিনি নাটককে কাব্যের প্রতীক বলিয়াছেন এবং তাহাকে সর্ব রসাশ্রয় ও প্রেক্ষক, নট ও কবির জন্য মুক্তি-ভুক্তি-প্রদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ইত্থমুক্তক্রমোপেতং নাট্যং সর্বরসাশ্রয়ম্।
প্রেক্ষকস্য প্রয়োক্তুশ্চ কবেঃ স্যাদ্ মুক্তিভুক্তিদম্॥
—ভাঃ প্রঃ পৃঃ ৩১৩, পংক্তি ৪.৫

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র ও শারদাতনয় নাট্যপ্রসঙ্গে রসবাদের সমন্বয় করিয়াছেন কিন্তু বিশ্বনাথ কবিরাজ (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী) নাট্য ও কাব্য উভয়ের বিবেচনা প্রসঙ্গে, বলিতে গেলে সম্পূর্ণ ললিত বাঙ্ময়ের ক্ষেত্রে, রসের প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করিবার সময় কেবল রসের উল্লেখই যথেষ্ট: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। অন্য কাব্য-তত্ত্বগুলি রসাশ্রিত হওয়ার জন্য উহাতে স্বতঃই অন্তর্ভুক্ত থাকে। গুণ, রীতি ও অলংকার রসের উৎকর্ষ সাধন করিয়াই কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে।

উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালংকাররীতয়ঃ।
—সাঃ দঃ ১. ৩.

গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ অলংকারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ দেহদ্বারেণেব শব্দার্থদ্বারেণ তস্যৈব কাব্যাস্যাত্মভূতং রসমুৎকর্ষয়ন্তঃ কাব্যস্যোৎকর্ষকা ইত্যুচ্যন্তে।

—গুণ, অলংকার ও রীতি কাব্যের উৎকর্ষের কারণ। যেমন শৌর্য্যাদি গুণ, কটক-কুণ্ডলাদি আভরণ ও অঙ্গ রচনাদি মনুষ্য শরীরের উৎকর্ষ সাধন করে, তেমনি কাব্যেও মাধুর্য্যাদি গুণ উপমাদিক অলংকার ও বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি শরীরস্থানীয় শব্দ ও অর্থের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আত্মস্থানীয় রসের উৎকর্ষ সাধন করে এবং যেমন শৌর্য্যাদিক মনুষ্যের উৎকর্ষক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তেমনি মাধুর্য্যাদিকে কাব্যের উৎকর্ষক বলা হয়।[৩]

---

১. ভাবপ্রকাশন—গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, পৃ০ ১৫০
২. ঐ, পৃঃ ১৭৩, পংক্তি ৮—৯
৩. সাহিত্যদর্পণ—বিমলা টীকা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ, পৃঃ ২২

এই রূপ রসের অপকর্ষতাকে কাব্যের ক্ষেত্রে অপকর্ষক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ * * * —সাঃ দঃ ১. ৩

শ্রুতিদুষ্টাপুষ্টার্থত্বাদয়ঃ কাণত্বখঞ্জত্বাদয় ইব শব্দার্থদ্বারেণ দেহদ্বারেণেব ব্যভিচারিভাবাদেঃ স্বশব্দবাচ্যত্বাদয়ো মূর্খত্বাদয় ইব সাক্ষাৎকাব্যস্যাত্মভূতং রসমপকর্ষয়ন্তঃ কাব্যস্যাপকর্ষকা ইত্যুচ্যন্তে।

—কাব্যের অপকর্ষতাকে দোষ বলা হয়—যেমন কাণত্ব, খঞ্জত্বাদিক দোষ, শরীরকে দূষিত করিয়া শরীরস্থ আত্মার হীনতাকে সূচিত করে, সেইরূপ কাব্যের শরীরভূত শব্দে শ্রুতিদুষ্টত্বাদি এবং অর্থে অপুষ্টার্থত্বাদিক দোষও শব্দ এবং অর্থকে দূষিত করিয়া কাব্যের আত্মভূত রসের অপকর্ষ বা হীনতাকে সূচিত করে।

—(সাঃ দঃ বিমলা টীকা, পৃঃ ২১)

অতএব বিশ্বনাথের মতানুসারে রসই কাব্যের আত্মা—তাহাই কাব্যের একমাত্র প্রধান তত্ত্ব। মনে হয় রাজশেখরের নিকট হইতে সংকেত গ্রহণ করিয়া তিনি কাব্য-পুরুষ রূপকের দ্বারা কাব্য-তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ এবং কাব্যের ক্ষেত্রে তাহাদের সাপেক্ষিক প্রাধান্যের স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ,
দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ,
অলংকারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ।

—কাব্যের শব্দ ও অর্থ তাহার দেহ, এবং রস তাহার আত্মা। মাধুর্য্যাদি গুণ শৌর্য্যাদির অনুরূপ শ্রুতিকটুত্বাদি দোষ কাণত্বাদি দোষের অনুরূপ, বৈদর্ভী আদি রীতি অঙ্গরচনার সমান ও উপমাদি অলংকার কটক, কুণ্ডলাদির মতো আভরণ।

—সাঃ দঃ বিমলা টীকা, পৃঃ ১৬

—এই রূপকে ধ্বনির কোন উল্লেখ নাই—যদিও বক্রোক্তিকে কবিরাজ স্বীকার করিয়াছিলেন ঃ বক্রোক্তেরলংকাররূপত্বাৎ—বক্রোক্তি অলংকার রূপই, অতএব তাহাকে কাব্যের আত্মা বলা যাইতে পারে না। —ঐ, পৃঃ ১৬

তথাপি, সাহিত্য দর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ধ্বনির বিস্তারিত বিচার করা হইয়াছে —ধ্বনিবাদীদের অনুরূপ বিশ্বনাথ ধ্বনি কাব্যকে উত্তম কাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বাচ্যাতিশায়িনি ব্যঙ্গে ধ্বনিস্তৎকাব্যমুত্তমম্। —ঐ, ৪. ১

অর্থাৎ কাব্যের অপেক্ষা অধিক চমৎকারীতাযুক্ত ব্যঙ্গকে ধ্বনি বলা হয় এবং ধ্বনি কাব্যই উত্তম কাব্য। রসকে তিনি অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মে যে রস ও ধ্বনির তারতম্যের বিষয়ে বিশ্বনাথের বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ কি ছিল? পণ্ডিত বলদেব

উপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাকে রসবাদী না বলিয়া ধ্বনিবাদী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট; বিশ্বনাথ রসকেই কাব্যের আত্মারূপে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু রস অনিবার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ বাচ্য না হইয়া রস সর্বদা ব্যঙ্গই থাকে, অতএব কাব্যে ধ্বনিরও মহত্ত্ব অনস্বীকার্য্য। অর্থাৎ রস বলিতে আমরা রসধ্বনিকেই বুঝি এবং রসধ্বনির অর্থে ধ্বনিকাব্য নিশ্চিত রূপে উত্তম কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয় কিন্তু এই বিচার বস্তু-ধ্বনি প্রভৃতির অর্থে নয়, রসধ্বনির অর্থেই হয়ঃ

> যত্তু ধ্বনিকারেণোক্তম্—"কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ" ইতি,
> তৎ কিং বস্ত্বলংকাররসাদিলক্ষণস্ত্রিরূপো ধ্বনিঃ
> কাব্যস্যাত্মা, উত রসাদিরূপমাত্রো বা? নাদ্যঃ, প্রহেলিকা-
> দাবতিব্যাপ্তেঃ। দ্বিতীয়শ্চেদোমিতি ব্রুমঃ নন্ যদি
> রসাদিরূপমাত্রো ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মা, তদা—
> অত্তা এত্থ ণিমজ্জই এত্থ অহং দিঅসঅং পলোএহি।
> মা পহিঅ রত্তিঅন্ধিয় সজ্জাএ মহ ণিমজ্জহিসি॥

ইত্যাদৌ বস্তুমাত্রস্য ব্যঙ্গত্বে কথং কাব্যব্যবহার ইতি চেৎ, ন। অত্রাপি রসাভাস-বত্তৈবেতি ব্রুমঃ। অন্যথা "দেবদত্তো গ্রামং যাতি" ইতি বাক্যে তদ্‌ভৃত্যস্য তদনু-সরণরূপব্যঙ্গাবগতেরপি কাব্যত্বং স্যাৎ। অস্ত্বিতি চেৎ ন। রসবৎ এব কাব্যত্বাংগী-কারাৎ। অর্থাৎ, কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ।

—কাব্যের আত্মা ধ্বনি, ধ্বনিকারের এই মত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তিনি কি বস্তু, অলংকার ও রসাদির মধ্যে নিহিত সমস্ত ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মারূপে স্বীকার করেন অথবা কেবল রসাদির ধ্বনিকেই? ইহাতে প্রথম পক্ষটি ঠিক নয় কারণ প্রহেলিকা প্রভৃতিতে—যেখানে বস্তু ধ্বনিত হয়—তাহাকে গ্রহণ করিলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়িবে। অলক্ষ্যের দিকে লক্ষণ যদি চলিয়া যায় তাহা হইলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি নামক দোষ আসিয়া পড়ে। যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার্য্য হয় তাহা হইলে আমরাও উহাকে স্বীকার করিব। রসাদি ধ্বনিকে আমরাও কাব্যাত্মা রূপে স্বীকার করি।

যদি কেবল রসাদিধ্বনিকে কাব্যাত্মা রূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে নিম্ন-লিখিত পদ্যে কাব্যের লক্ষণ আসিতে পারিবে নাঃ

> শ্বশ্রূরত্র নিমজ্জতি, অত্রাহহং, দিবস এব প্রলোক্য।
> মা পথিক রাত্র্যন্ধ, শয্যায়াং মম নিমংক্ষ্যসি॥

—এই স্থলে আমার শাশুড়ী নিদ্রা যান অর্থাৎ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকেন এবং এই স্থানে আমি নিদ্রা যাই। দিনের বেলায় ভাল করিয়া দেখিয়া লও হে রাত-কানা পথিক, রাত্রিতে অন্ধকারে আমার শয্যায় আসিয়া পড়িয়া যাইও না। ইহা স্বয়ংদূতীর উক্তি। এই স্থলে যেখানে বস্তু মাত্রই ব্যঙ্গ—কাব্যত্বের ব্যবহার কেমন করিয়া হইবে?

এখানে "অত্রাপীতি" রসাভাসের জন্য আমরা কাব্যত্বকে স্বীকার করি না। উক্ত পদ্যে আগন্তুক পরপুরুষের প্রতি স্বয়ংদূতীর অনুরাগ প্রকশিত হইতেছে, অতএব শৃঙ্গারাভাস আসিয়া গিয়াছে। (সাঃ দঃ বিমলা টীকা, পৃঃ ১৩)

এইরূপে বিশ্বনাথের মত সম্পূর্ণরূপে নির্ভ্রান্ত ছিল—যেরূপ রসের অর্থ হইতেছে রসধ্বনি, সেইরূপ কাব্যগত ধ্বনির অর্থও রসধ্বনিই। প্রাধান্য রসেরই ঃ তাহাই কাব্যের আত্মা, ধ্বনি এই আত্মভূত রসের অনিবার্য্য মাধ্যম বলিয়া স্বীকার্য্য। এইজন্য বিশ্বনাথ রসের সহিত ধ্বনিকেও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। —ইহাই তাঁহার দৃষ্টিতে রস ও ধ্বনির মধ্যে প্রভেদ এবং এইরূপে তাঁহার স্থান আনন্দবর্ধনের অপেক্ষা অভিনব গুপ্তের অধিক নিকট বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ভানু দত্তের (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী) গ্রন্থ রসতরঙ্গিনী ও রসমঞ্জরী কেবলমাত্র রসশাস্ত্রের গ্রন্থ। রসতরঙ্গিনীতে রসের অবয়ব ও ভেদ-প্রভেদের এবং রসমঞ্জরীতে রসের আলম্বন নায়িকা ও নায়কের নানা রূপের বিস্তারের সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থে বলিতে গেলে কেবল রসেরই বর্ণনা বিদ্যমান আছে। রস ব্যতীত অন্য কাব্য-তত্ত্ব, অলংকার, রীতি, গুণ ও ধ্বনিকে লেখক গৌণ ও রসানুগত মানিয়া ইহাদের সম্বন্ধে আর কিছু উল্লেখ করেন নাই। রসতরঙ্গিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ঃ

ভারত্যাঃ শাস্ত্রকান্তারশ্রান্তায়াঃ শৈত্যকারিনী।
ক্রিয়তে ভানুনা ভূরিরসা রসতরঙ্গিনী॥ —রঃ তঃ ১. ২

ভানু কবি ভূরিরসময়ী রসতরঙ্গিনীর রচনা করিতেছেন যাহার দ্বারা শাস্ত্রের গহন কান্তারে ভ্রমণ করিবার দরুণ শ্রান্ত-ক্লান্ত ভারতী শান্তি ও শীতলতা প্রাপ্ত হইবেন।

বিদ্বৎ সমাজের মনোভৃঙ্গকে রসপান করাইবার উদ্দেশ্যই ছিল রসমঞ্জরীর রচনার উদ্দেশ্য ঃ

বিদ্বৎকুলমনোভৃঙ্গরসব্যাসঙ্গহেতবে।
এষা প্রকাশ্যতে শ্রীমদ্‌ভানুনা রসমঞ্জরী॥ —রঃ মঃ ১. ২

স্বভাবতঃ লেখক অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গাদির ঝঞ্ঝাটে না পড়িয়া "হেতোঃ পূর্ববৃত্তিত্ত্ব-নিয়মাদতঃ"কে অনুসরণ করিয়া প্রথমে রসের কারণ ভাবের বিবেচনা করিয়াছেন। ভানুদত্তের মতানুসারে ঐহিক ও পারলৌকিক জীবনের সারই রস। ঐহিক জীবনের ভিত্তি হইতেছে প্রবৃত্তি যাহার পূর্ণ পরিপাক দেখা যায় মায়া রসে। এই মায়ারসের স্থায়ীভাব হইতেছে মিথ্যাজ্ঞানবাসনা। মিথ্যাজ্ঞানবাসনার পরিপাক রূপ এই মায়া-রসই লৌকিক রসের মূল। পারলৌকিক জীবনের ভিত্তি হইতেছে ভগবানের প্রতি রতি যাহা নানা রসময় ঃ

লক্ষ্মীমালোক্য লুভ্যা[illegible]প্রহসন্‌শোচয়ন্নুজ্জজন্তন্
ক্ষত্রং শোণাক্ষি পশ্যন্[illegible] দশমুখং বীক্ষ্য রোমাঞ্চমঞ্চন॥

হৃত্বা হৈয়ঙ্গবীনং চকিতমপসরন্ম্লেচ্ছরক্তৈর্দিগন্তান্
সিঞ্চন্দন্তেন ভূমিং তিলমিব তুলয়ন্পাতু নঃ পীতবাসাঃ ॥

—রঃ তঃ ১. ১

—লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়া যিনি আসক্ত হন (শৃঙ্গার), বেদের যিনি উপহাস করেন (হাস্য), যজ্ঞের বলি—জীবের প্রতি যাঁহার মনে শোক বিদ্যমান (করুণ), ক্ষত্রিয়কে যিনি রক্তনেত্রে দেখেন (রৌদ্র), রাবণকে দেখিয়া যিনি রোমাঞ্চিত হন (বীর), নবনীত লইয়া (যশোদার ভয়ে) যিনি চকিত-ভীত পলায়ন করেন (ভয়ানক), ম্লেচ্ছের রক্ত লইয়া যিনি দিগন্তকে সিঞ্চিত করেন (বীভৎস), এবং পৃথিবীকে যিনি তিলের সমান নিজের দন্তের উপর ধারণ করেন (অদ্ভুত), সেই পীতাম্বর কৃষ্ণ যেন আমাদের রক্ষা করেন।

এই সব উদ্ধরণের দ্বারা ভানুমিশ্রের রসের প্রতি আগ্রহ পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃতের কাব্যরসিকদের নিকট তাঁহার দুইটি গ্রন্থই অত্যন্ত লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতব্দীতে বাংলার বৈষ্ণব আচার্য্যরা রস-সিদ্ধান্তের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন রূপগোস্বামী (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী) যিনি কাব্যশাস্ত্রের উপর তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—(১) নাটকচন্দ্রিকা, (২) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৩) উজ্জ্বলনীলমণি। ইহাদের মধ্যে শেষের দুইটি গ্রন্থ বৈষ্ণব রস পরিকল্পনার ভিত্তিস্থানীয়। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় সাহিত্য শাস্ত্রে প্রায় শৈবাগম, বেদান্ত ও যৎকিঞ্চিৎ সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতেই রস-সিদ্ধান্তের বিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগে গৌড়ীয় আচার্য্যরা বৈষ্ণব মাধুর্য্য-ভাবের অনুসরণ করিয়া রসশাস্ত্রের মৌলিক বিকাশ করিলেন। হরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধু অনুসারে ভক্তি-রসই পরম রস—শৃঙ্গারাদি নাট্য অথবা কাব্য রস ইহার বিকাশ মাত্র। ভক্তিরস পঞ্চ প্রকার: শান্ত, দাস্য (প্রীতি), সখ্য (প্রেয়স্), বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ ভেদে মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ প্রকার, আর হাস্য প্রভৃতি নাটকের সপ্ত রস ভেদে গৌণ নাট্য-রস সাত প্রকার। এইরূপে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে মুখ্য ও গৌণ মিলিয়া ১২টি রসের উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত রসের মূলাধার একই ভগবদ্রতি—তাহাই মূল অথবা পরম ভাব এবং ইহার চরম পরিপাক উজ্জ্বল অথবা মধুর ভাবে হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে এই উজ্জ্বল রসেরই বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের আর একজন আচার্য্য হইতেছেন জীবগোস্বামী যিনি হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উপর দুর্গমসঙ্গমিনী ও উজ্জ্বলনীলমণির উপর লোচন-রোচনী টীকা রচনা করিয়া ও ষট্ সন্দর্ভ প্রভৃতি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রচনা করিয়া বৈষ্ণব রস পরিকল্পনার বিকাশের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অলংকার কৌস্তুভের রচয়িতা কবিকর্ণপূরের (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের উত্তরার্ধে) বিচার ক্ষেত্র যদিও অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যাপক ছিল তবুও বৈষ্ণব রস পরিকল্পনাই তাঁহার মূল আলোচনার বিষয় থাকিয়াছে। তিনি দাস্যের উল্লেখ করেন নাই এবং মধুর রসকে "প্রেমান্" সংজ্ঞা

দিয়াছেন। এই "প্রেমান্" রসই সর্ব রসের মূলাধার। ইহা অঙ্গী এবং শৃঙ্গার ইহার অঙ্গ। অন্য সমস্ত রস ও ভাব ইহার মধ্যে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতে থাকে, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ—

বয়ং তু প্রেমাঙ্গী, শৃঙ্গারোঽঙ্গমিতি বিশেষঃ। তথা চঃ
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ন্যখণ্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গইব বারিধৌ॥

—অলংকারকৌস্তুভ, পৃঃ ১৪৮

প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও অদ্বৈত সিদ্ধান্তের অনুসরণে ভক্তি রসকে পরম রস বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেব-বিষয়ক রতিকে ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু পরমানন্দ-রূপ পরমাত্মার প্রতি যে রতি তাহা পরিপূর্ণ রসই, এবং তাহা শৃঙ্গারাদি ক্ষুদ্র রসের অপেক্ষা অনেক অধিক প্রবল, যেমন খদ্যোতের অপেক্ষা সূর্য্যের প্রভা ঃ

পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্যপ্রভেব বলবত্তরা॥

—ভগবদ্‌ভক্তিরসায়ন, ২. ৭৮

বলা বাহুল্য যে এই সকল বৈষ্ণব আচার্য্যরা প্রবল রসবাদী ছিলেন। ইঁহাদের মতানুসারে রস কেবল কাব্য ও নাটকেরই নয়, সম্পূর্ণ জীবনের সার পদার্থ ছিল। যেরূপ কঠোর ভাষায় তাঁহারা মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের নিরানন্দ মোক্ষের পরিকল্পনার পরিহাস করিয়াছেন তাহাতে রসের প্রতি তাঁহাদের প্রবল আগ্রহ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইয়া যায় ঃ

—ভক্তি হইতে উদাসীন, বৈরাগ্যের দ্বারা দগ্ধ, শুষ্ক জ্ঞানগর্বিত, তার্কিক এবং বিশেষ করিয়া যাঁহারা মীমাংসক তাঁহারা ভক্তি রসের আস্বাদ হইতে বহির্মুখ থাকেন। ইঁহাদের নিকট হইতে ভক্তি-রসিকদের সর্বদা কৃষ্ণ-ভক্তি-রসকে রক্ষা করিতে হইবে যেমন চোরের নিকট হইতে পরম নিধিকে রক্ষা করা হয়।

এই পরম রসকে পান করিবার জন্য ভক্ত-জন সুখলেশবর্জিত বৈশেষিক-প্রতিপাদিত মোক্ষের অপেক্ষা বৃন্দাবনের সরস নিকুঞ্জের শৃগাল হইয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেওয়াকে অধিক কাম্য মনে করেন ঃ

বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং বৃণোম্যহম্।
বৈশেষিকোক্তমোক্ষাত্তু সুখলেশবিবর্জিতাৎ॥

—সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, পৃঃ ২৮

এইরূপ রসশাস্ত্রে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল এবং মধুর-রস-পরিপূর্ণ নবীন ভক্তি কাব্যের শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

কবিশিক্ষা—এই যুগের তৃতীয় প্রবৃত্তি ছিল কবিশিক্ষা। —এই ধারাটিও বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিল। এই মার্গের অন্তর্গত অনেক গ্রন্থের রচনা হয় কিন্তু

ইহাদের মধ্যে অমরের কাব্যকল্পলতা এবং দেবেশ্বরের কবি কল্পলতা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। উদীয়মান কবি ও সামান্য কাব্য রসিকদিগকে ছন্দ-সিদ্ধি, শ্লেষ-সিদ্ধি, শব্দ-সিদ্ধির বিভিন্ন নিয়মের শিক্ষা দেওয়াই এই সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল। স্বভাবিতঃ অলংকার চমৎকারিত্বের প্রতিই ইঁহাদের লক্ষ্য ছিল বেশী।

সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রেতে রস-সিদ্ধান্তের বিকাশের ইহাই ইতিবৃত্ত। সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রে সংক্ষেপে রস বিকাশের তিনটি ধারা উপলব্ধ হয়: (১) ভরত-পূর্ব আচার্য্য ও ভরত দ্বারা রসের বস্তুনিষ্ঠ বিচারের ধারা; (২) ভরতের কাশ্মীরী ভাষ্যকারগণকৃত শৈবাদ্বৈতের আলোকে রসের আত্মনিষ্ঠ বিচারের ধারা; এবং (৩) বাংলার বৈষ্ণব আচার্য্যদের দ্বারা মধুর রসের পরিকল্পনা। এই তিনটির মধ্যে শৈবাদ্বৈতের অনুসরণে রসের আত্মনিষ্ঠ ব্যাখ্যানই সর্ব্বাধিক প্রমাণিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রসের বস্তুনিষ্ঠ মত ধারা এক প্রকার লুপ্তই হইয়া গিয়াছে; এবং বৈষ্ণব মধুর রস পরিকল্পনাও ভক্তি সম্প্রদায় ভিন্ন কাব্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ সমাদর পায় নাই, যদিও রসের ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা শৃঙ্গার রসের প্রাধান্যের আরও অধিক প্রসার লাভ হইয়াছে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই প্রচুর রস সামগ্রীকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছে এবং এই বিভিন্ন ভাষাগুলি স্বীয় প্রকৃতি ও পরিস্থিতি অনুসারে ইহার বিকাশ ও বিস্তার করিয়াছে।

সংস্কৃত ও আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের বিশেষ স্থান আছে কিন্তু এই সম্বন্ধে ইহা উল্লেখযোগ্য যে প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে সংস্কৃত এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বত্র মাধ্যমরূপে পাওয়া যায় না অর্থাৎ সংস্কৃত বাঙ্ময়ের সমস্ত বৈশিষ্টগুলি প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় আসিয়া সংযোজিত হয় নাই। কালক্রমানুসারেও প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিবার পরেও সংস্কৃত বাঙ্ময়ের ধারা প্রবাহিত থাকিয়া গিয়াছিল। অতএব অনেক প্রবৃত্তি ও প্রভাব রূপএই আছে যাহা সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে আসিয়া ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও অনেক প্রবৃত্তি ও প্রভাব এমনও আছে যাহা প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হইতেই আসিয়াছে, সংস্কৃত হইতে আসে নাই। কাব্যরূপ, ছন্দ বিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতির ধারা অবাধ গতিতে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের ও কাব্য শাস্ত্রের ধারার এইরূপ শৃংখলিত গতির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্যাকরণের উপর দামোদর শর্মার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যুক্তিব্যক্তি প্রকরণ ও হেমচন্দ্র সূরির প্রাকৃত-ব্যাকরণ (একাদশ শতক) উল্লেখযোগ্য। ছন্দের উপর প্রাকৃত পৈঙ্গলম্, সিদ্ধ শান্তিপার ছন্দোরত্নাকর (১০০০ শতক), হেমচন্দ্র সূরির ছন্দোনুশাসন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ রচনা রূপে খ্যাত। অপর দিকে সুদর্শন চরিত্র (১০ম—১১শ শতক) প্রভৃতি গ্রন্থে নায়িকা-বর্ণনাও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত কাব্য

শাস্ত্র বিষয়ক কোন গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অন্যদিকে সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রীয় ধারার ১৮শ—১৯তম শতক পর্য্যন্ত অবাধ রূপে বিকাশ হইয়াছে এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লিখিত কাব্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থের স্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান আছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষার কাব্য শাস্ত্রেতে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ হয় নাই যাহার অস্তিত্ব সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রে পূর্বে ছিল না। কাব্যের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যায় কিন্তু কাব্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এমন কোন অংশ নাই যাহার অনুসন্ধানের জন্য প্রাকৃত-অপভ্রংশের উপলব্ধ অথবা অনুপলব্ধ সাহিত্যের বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। অতএব এই প্রসঙ্গে ইহা মানিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে যে প্রায় অন্য সমস্ত শাস্ত্রীয় ধারার অনুরূপ ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ধারাও প্রাকৃত অপভ্রংশের মাধ্যমে নয় বরং প্রত্যক্ষতঃ সংস্কৃত হইতে ভারতীয় ভাষায় অবতরিত হইয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশে ভারতীয় সাহিত্যের জীবন্ত ভাব ধারার বিশেষ ভাবে প্রতিপালন হইয়াছিল কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাব ধারার বিকাশ ভূমি অপরিবর্ত্তিত রূপে সংস্কৃতই থাকিয়া গিয়াছিল।

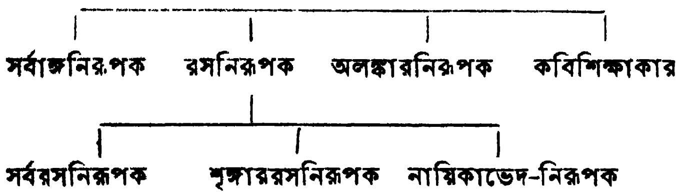
আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসকে সাধারণতঃ দুই চরণে বিভক্ত করা যায়। প্রথম চরণ সমস্ত ভাষার আদিকাল হইতে আধুনিক কালের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত, এবং দ্বিতীয় চরণ আধুনিক কালের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রসারিত। প্রথমার্ধে হিন্দী ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় কাব্য শাস্ত্রীয় বিচার-বিবেচনা অল্প-বিস্তর হইয়াছিল। মারাঠী ও বাংলা ভাষায় বিশেষ করিয়া মারাঠী ভাষায় কাব্যশাস্ত্র অত্যন্ত সমৃদ্ধ, কিন্তু এই সমৃদ্ধি বর্ত্তমান যুগেই আসিয়াছে। সমগ্র রূপে বিচার করিলে বিকাশের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাসের সম্পূর্ণ মধ্যযুগে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লিখিত কাব্য-শাস্ত্রবিষয়ক তিন রকমের গ্রন্থ পাওয়া যায় —(১) সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ, (২) সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের রূপান্তর, (৩) ভক্তিমূলক রসশাস্ত্র গ্রন্থ।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষায় 'কাব্যপ্রকাশ' অথবা কয়েক স্থলে 'সাহিত্য দর্পণ'এর খণ্ডিত অনুবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার সংখ্যা অত্যন্ত কম—মধ্যযুগে অনুবাদ কার্য্য খুবই অল্প হইয়াছে। হিন্দীতে ধনীরাম নামক কোন একজন অল্প-পরিচিত কবি কাব্যপ্রকাশের অপূর্ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ইহা প্রায় পাওয়াই যায় না। অন্য ভাষায় যেমন তেলেগু, কানারী প্রভৃতিতে অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ধরণের কাজ হইয়াছে এবং দুই-চারিটি নামের উল্লেখও করা যাইতে পারে কিন্তু এই সকল গ্রন্থও প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে কানারী ভাষায় "কবিরাজ-মার্গ" (লেঃ নৃপতুংগ, সময় নবম শতক) ও কাব্যাবলোকন (লেঃ নাগবর্মা, সময় দ্বাদশ শতক), রসবিবেক অথবা শৃঙ্গার-রত্নাকর (লেঃ কবিকাম, ১২০০ শতকের আশেপাশে), রস-রত্নাকর (লেঃ সাল্ব, ১৫৩০ শতকের আশেপাশে), নবরসালংকার (লেঃ তিম্ম,

১৬০০ শতকের আশেপাশে) ইত্যাদি; মলয়ালম ভাষার লীলাতিলকম্ যাহাতে সংস্কৃতে লক্ষণাদি রচিত হইয়াছে (লেঃ অজ্ঞাত, সময় ১৩শ — ১৪শ শতক); মারাঠী ভাষায় নাগেশ ও বীঠল দ্বারা রচিত রসমঞ্জরী, গঙ্গাধরশাস্ত্রী-কৃত রস-কল্লোল; তেলেগু ভাষায় অনন্তামাত্য রচিত রসাভরণম্, বিন্নকোট পেদ্দয় কবিকৃত কাব্যালংকার-চূড়ামণি, বেন্ন তুর্ল বড্ডি কবিকৃত রসালবালম্ প্রভৃতি। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে সবার অধিক কার্য্য হিন্দী ভাষায় হইয়াছে, যেখানে ভক্তিকালেও অন্য ভাষার অপেক্ষা অধিক কার্য্য হইয়াছিল এবং তাহার পরে বিক্রম সম্বৎ ১৭০০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রীতি-কালে এবং উহার পরও পুরোপুরি ২০০—২৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কাব্যশাস্ত্রের ধারা অবাধ গতিতে প্রবাহিত থাকিয়াছে। এই সমস্ত কবিরা কাব্য-প্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, রসমঞ্জরী, চন্দ্রালোক, কুবলয়ানন্দের ভিত্তিতে সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের, নিয়ম ও কাব্যাঙ্গের হিন্দী ভাষায় বিস্তারের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। স্থূলরূপে এই সমস্ত কবি আচার্য্যদের নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণী করা যাইতে পারে ঃ

রীতি-নিরূপণ



সর্বাঙ্গনিরূপক আচার্য্যদের মধ্যে কেশব, চিন্তামণি, কুলপতি, দেব, দাস, সোম-নাথ, প্রতাপসাহি প্রভৃতি আচার্য্যই উল্লেখযোগ্য। সর্বাঙ্গনিরূপক আচার্য্যরূপে রসলীন, রামসিংহ, পদ্মাকার, বেণী প্রবীন, গ্বাল কবিরও সুনাম আছে। শৃঙ্গারনিরূপক ধারার মতিরাম ও সুখদেব প্রভৃতিরও হিন্দী কাব্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান আছে। নায়িকাভেদের বর্ণনকারীদের মধ্যে ভক্তিযুগের কৃপারাম, রহীম ও কেশব প্রভৃতি রীতিকালীন নানা রসিক আচার্য্যদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও ভারতীয় ভাষায় রচিত কাব্যসমূহ বহুলাংশে ভক্তিমূলক রসশাস্ত্রের পরিকল্পনার আধার-ভিত্তি তবুও এই ধারার মূলগ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সংস্কৃত ভাষায় রচিত তথাপি ইহা বলিতেই হইবে যে নবীন ভক্তিরসশাস্ত্রের মূলাধার সংস্কৃত নয় বরং আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত সমৃদ্ধ এবং বহুবিস্তৃত ভক্তিকাব্যই ইহার মূলাধার। এই শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখ নিম্নে করা গেল ঃ

হিন্দীতে সুরদাস-কৃত সাহিত্যলহরী, নন্দদাস-কৃত রসমঞ্জরী, রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের মধুরোপাসক কবিদের বাণী যথা ব্যাসবাণী, ধ্রুবদাসের বয়ালীস লীলা,

নেহী নাগরীদাস-রচিত সিদ্ধান্ত-দোহাবলী ইত্যাদি। বাংলাতে কৃষ্ণ দাস বাবাজীর ভক্তমাল ও বৃন্দাবনদাস-রচিত চৈতন্য-ভাগবত; গুজরাতীতে দয়ারাম কৃত রসিক-বল্লভ ইত্যাদি যাহাতে প্রসঙ্গতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রীতিতে ভক্তি রসের বিবেচনা করা হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণের দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে প্রথমার্ধে হিন্দী ব্যতীত অন্য ভারতীয় ভাষায় কাব্যশাস্ত্রের বিশেষ বিকাশ হয় নাই। হিন্দীর ক্ষেত্রেও বোধ হয় বিকাশ শব্দের ব্যবহার ঠিক হইবে না, কারণ অনেক গ্রন্থ রচিত হইলেও হিন্দীর কবি-আচার্য্যদের ভারতীয় কাব্য শাস্ত্রের বিকাশ ব্যাপারে মৌলিক অবদান খুবই কম। সংস্কৃততেও বলিতে গেলে এই সময় কাব্যশাস্ত্রের হ্রাস সূচিত হইয়া গিয়াছিল। মম্মটের পরে সেখানেও ব্যাখ্যা ও আবৃত্তিই অধিক হইতেছিল। প্রতিভাশালী কেবল একজন আচার্য্যেরই নাম এই যুগে উল্লেখযোগ্য। শাজাহানের সমকালীন পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথ। এই যুগের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে অধ্যয়ন করিবার পরে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে একদিকে যেমন নানা আধুনিক ভাষায় বেশীর ভাগ সাহিত্যের রচনা হইতেছিল তেমনি অন্যদিকে সিদ্ধান্ত-নিরূপণের জন্য লেখকেরা দেশের প্রায় প্রত্যেক ভাগে সংস্কৃতকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ অনেক বৈষ্ণব কবিরা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রান্তীয় ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্ত-কথা প্রায় সংস্কৃতেই করিয়াছেন। সেইজন্য বোধ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই যুগে প্রান্তীয় ভাষায় কাব্য-শাস্ত্রের সম্যক্ বিকাশ সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু তথাপি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে সেইযুগে প্রান্তীয় ভাষার কবিরা প্রকারান্তরে কাব্যশাস্ত্রের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছেন। মধ্যযুগে মাধুর্য্য ভাবের দ্বারা ওতঃপ্রোত ভক্তি কাব্যের যে রসধারা ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার ফলস্বরূপ ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে ধ্বনির স্থানে রস-সিদ্ধান্তের একচ্ছত্র রাজ্যের স্থাপনা সম্ভবপর হয়। বস্তুতঃ রসের প্রাধান্য থাকিলেও সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের প্রতিনিধি সিদ্ধান্ত ধ্বনিকেই স্বীকার করা হইত। ভারতীয় বাঙ্ময়ের উপর হইতে রসধ্বনির আবরণকে সরাইয়া তাহাকে শুদ্ধ রসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার শ্রেয়াংশ প্রকৃতপক্ষে এই ভক্ত কবিদেরই প্রাপ্য। ১৪শ—১৫শ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭শ—১৮শ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র মধুরা ভক্তির ধারা এইরূপ উদ্দাম বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল যে, হৃদয়-রস ও কাব্যের মধ্যে স্থিত ব্যঞ্জনার হাল্কা আবরণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভাসিয়া গেল। এইজন্য রস-সিদ্ধান্তের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সংস্কৃতের অপেক্ষা আঞ্চলিক সাহিত্যের মাধ্যমেই হইয়াছিল ইহা স্বীকার করা অধিক যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহা ছাড়াও এই সমস্ত কবিরা রসের পরিধির বিস্তারও করিয়াছিলেন। হিন্দীর রীতিকালের অধিকাংশ আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত ও ব্যবহার উভয়ের দ্বারা রসবাদের প্রবল সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারবাদ

একটি নবীন রূপ ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। এইরূপে আধুনিক ভারতীয় ভাষার ইতিহাসের মধ্যযুগ রস-সিদ্ধান্তের অতিশয় সমৃদ্ধ ও বিকাশের যুগ ছিল যখন অধিকাংশ প্রান্তীয় ভাষার কবিরা নিজেদের সরল কাব্যের দ্বারা এবং হিন্দীর কবিরা সৃজন ও আলোচনা উভয়ের দ্বারা রসের প্রচার ও প্রসার করিয়াছিলেন।

আধুনিক যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের মধ্যকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সাহিত্যের অন্য অঙ্গের অনুরূপ ভারতীয় ভাষাগুলিতে কাব্যশাস্ত্রের বিকাশ সাধন দ্রুতগতিতে হইয়াছে। যদিও এই ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত ভাষায় মূল্যবান কাজ হইয়াছে তবুও হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় যে কাজ হইয়াছে তাহা গুণ ও পরিমাণের দিক্ দিয়া অন্যান্য ভাষার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের পরে বাংলা ও গুজরাতী এবং তাহার পরে তেলেগু কানাড়াকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। আধুনিক ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসকে সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগ ঊনবিংশ শতকের মধ্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই সময় কাব্যশাস্ত্রের প্রতি পণ্ডিত-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সচরাচর সংস্কৃত গ্রন্থের ভিত্তিতে, কখনও-কখনও নবীন পাশ্চাত্য বিচার ধারার সাহায্য লইয়া প্রথাগত রূপে ভারতীয় কাব্য সিদ্ধান্তগুলির প্রতিষ্ঠা করা হইতেছিল। দ্বিতীয় ভাগে পণ্ডিতগণের দৃষ্টিকোণের বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাগে অতীতের জ্ঞানরাশিকে উদ্‌ঘাটিত করিবার সঙ্গে-সঙ্গে নবীন আলোকে তাহার মূল্য নির্ধারণের প্রতি পণ্ডিতগণের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগিল, গ্রহণের সহিত সংরক্ষণের প্রতি স্পৃহাও দেখা গেল। স্থূলরূপে এই যুগের কাব্য-শাস্ত্রের প্রধান প্রবৃত্তিগুলির বর্গীকরণ নিম্নপ্রকারে করা যাইতে পারে—(১) সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের অনুবাদ; (২) প্রাচীন কাব্য-সিদ্ধান্তের পরম্পরাগত নিরূপণ; (৩) ভারতীয় কাব্য-সিদ্ধান্তের নবীন আলোচনা শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির আলোকে আখ্যান, পুনরাখ্যান ও মূল্যনির্ধারণ, (৪) নবীন আলোচনা-শাস্ত্র। প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে, বিশেষ করিয়া বিকসিত ভাষাগুলিতে, এই সমস্ত প্রবৃত্তি ন্যূনাধিক রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির অনুবাদের কাজ চলিয়া আসিতেছে। হিন্দী ভাষায় কাব্যাদর্শ, কাব্যপ্রকাশ (তিনটি বিভিন্ন অনুবাদ), সাহিত্যদর্পণ (দুই তিনটি বিভিন্ন অনুবাদ), রসগঙ্গাধর (দুইটি বিভিন্ন অনুবাদ), ধ্বন্যালোক (দুই-তিনটি অনুবাদ), বক্রোক্তিজীবিতম্ কাব্যালংকারসূত্র, দশরূপক, নাট্যদর্পণ, কাব্যমীমাংসা, কুবলয়ানন্দ, চন্দ্রালোক, নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী, লোচন, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভামহ ও রুদ্রট কৃত কাব্যালংকার ইত্যাদি প্রায় সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা সহ ভাষ্য হইয়া গিয়াছে। মারাঠীতে নাট্যশাস্ত্র, ধ্বন্যালোক, অভিধাবৃত্তি-মাত্রিকা, রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার ইত্যাদির অনুবাদ পাওয়া যায়। বাংলায় রসগঙ্গাধর, ধ্বন্যালোক প্রভৃতির অনুবাদ পাওয়া যায়। গুজরাতী ভাষায় কাব্যপ্রকাশ ও নাট্যশাস্ত্রের, কানারি ভাষায় কাব্যালঙ্কার, ধ্বন্যালোক, কাব্যপ্রকাশ, দশরূপক ঔচিত্যবিচার চর্চা, সাহিত্যদর্পণ চন্দ্রালোকের,

তামিলে কাব্যাদর্শ ও কুবলয়ানন্দের এবং তেলেগুতে নাট্যশাস্ত্র, কাব্যাদর্শ, কাব্যালঙ্কার-সূত্র, ধ্বন্যালোক, দশরূপক, ব্যক্তিবিবেক কাব্যপ্রকাশ, কাব্যমীমাংসা, সাহিত্যদর্পণ ও রস-গঙ্গাধর প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রচুর অনুবাদ দেখা যায়। প্রাচীন সিদ্ধান্তের পরম্পরাগত রূপে যাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে হিন্দীর জগন্নাথ প্রসাদ ভানু, শেঠ কহৈয়ালাল পোদ্দার, লালা ভগবানদীন, মিশ্রবন্ধু, হরিঔধ, বিহারীলাল ভট্ট, অর্জুন দাস কেডিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য; মারাঠির প্রভুদা-জি, শিবাজী প্রধান, বলবন্ত কমালকর মাকোডে, রা০ রা০ ভাগবত, গণেশ শাস্ত্রী লেলে, সদাশিব বাপুজী কুলকর্ণী প্রভৃতিরা উল্লেখযোগ্য এবং বাংলার জয়গোপাল গোস্বামী, লালমোহন বিদ্যানিধি, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জীবেন্দ্র সিংহ রায় প্রভৃতি; তেলেগুর সীতারমৈয়া, রাঘব আয়াংগার, নারায়ণ শর্মা, নাগভূষণম্, শ্রীনিবাসাচার্যলু, নরসিংহরাও, উমাকান্তম্, লক্ষ্মীকান্তম্ প্রভৃতি; গুজরাতীর কমলাশংকর ত্রিবেদী, মোহনলাল দবে; কানারীর এ০ আর০ কৃষ্ণ শাস্ত্রী, শ্রীকনটৈয়া প্রভৃতি ও তামিলের পী০ কোদণ্ডরামন এবং এম০ বরদরাজনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের কোন বিশেষ গ্রন্থের অনুবাদ করেন নাই বরং নানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সাহায্য লইয়া কাব্য প্রকাশের ভিত্তিতে ও সাহিত্যদর্পণ, রসগঙ্গাধর, চন্দ্রালোক ও কুবলয়ানন্দ অথবা প্রসঙ্গানুকূল ধ্বন্যালোকের সাহায্য লইয়া—ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ভিত্তি স্থানীয় সিদ্ধান্তের, বলিতে গেলে কাব্যের দশাঙ্গের সহজ এবং সরল বিবেচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের দৃষ্টি প্রায় পরম্পরাগতই ছিল এবং মৌলিক চিন্তাধারার প্রসারের অপেক্ষা নিজের-নিজের ভাষায় ভারতীয় কাব্য সিদ্ধান্তের রূপান্তরণই ইঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপে ইঁহারা ব্যাখ্যান পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের সূত্রবৃত্তি অথবা কারিকাবৃত্তির ভিত্তিতে লক্ষণ-উদাহরণ সহিত কাব্য-লক্ষণ, কাব্য-ভেদ কাব্য-প্রয়োজন, কাব্যাত্মা, শব্দ-শক্তি, রীতি, গুণ, অলংকার দোষাদির সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা নিজেদের দৃষ্টি অনুসারে কখনও নানা গ্রন্থের সাহায্যে লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, অথবা কখনও নানা গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত বিভিন্ন লক্ষণের বিচার করিয়া তাহার পর নিজেদের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। উদাহরণ কখনও-কখনও সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধৃত কবিতার অনুবাদ করিয়া এবং বেশীর ভাগ সময় ভাষা-কাব্য হইতে দিয়াছেন। নূতন উদ্ভাবনার দৃষ্টিতে ইঁহারা রসের সংখ্যায় কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। যেমন মারাঠী লেখক ভাগবত ভক্তির এবং হিন্দীর লেখক হরিঔধ বাৎসল্য রসের উল্লেখ করিয়াছেন। অথবা ইঁহারা অলংকারের সংখ্যার অল্পাধিক্যের ব্যাপারে মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে গেলে, রস ও অলংকারই ইঁহাদের মূল প্রতিপাদ্য ছিল। এই শ্রেণীর প্রমুখ আচার্য্য হইতেছেন হিন্দীর হরিঔধ, বিহারীলাল ভট্ট, মারাঠির প্র০ শি০ প্রধান, ব০ ক০ মাকোডে, রা০ রা০ ভাগবত বাংলার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি, গুজরাতীর কমলাশংকর ত্রিবেদী ও মোহনলাল দবে, তেলেগুর রাঘব আয়াঙ্গার, নাগভূষণম্, নরসিংহরাও,

লক্ষ্মীকান্তম্ প্রভৃতি, কানাড়ীর শ্রীকণ্ঠৈয়া। এই সকল বিদ্বানগণ রসকেই কাব্যের আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য কাব্যাঙ্গকে রসের অনুবর্ত্তী মানিয়াছেন এবং রস বিবেচনাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব ও বিস্তার প্রদান করিয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের সেই সব পণ্ডিতগণের উল্লেখ করা হয় যাঁহারা প্রাচীন সিদ্ধান্তের আধুনিক মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও আলোচনা শাস্ত্রের আলোকে আখ্যান পুনরাখ্যান ও মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত-গণের ভারতীয় সিদ্ধান্তের প্রতি অটুট আস্থা থাকিলেও ইঁহারা বিশ্বাস করেন যে এই সব সিদ্ধান্তের সম্যক উপযোগ ও প্রসারের জন্য নবীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় লওয়া অত্যন্ত দরকার। ইউরোপেও কাব্যশাস্ত্রের একটি সুবিস্তৃত ধারা প্রারম্ভকাল হইতে বিদ্যমান আছে যাহা দর্শন, মনোবিজ্ঞান, মনোবিশ্লেষণ শাস্ত্র, বিজ্ঞান, সমাজশাস্ত্র প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। পরিস্থিতিবশতঃ বর্ত্তমান যুগে হিন্দীর মনীষিগণ ও আলোচকেদের সম্পর্ক পাশ্চাত্য আলোচনা ও আলোচনা শাস্ত্রের সহিত অধিক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ রূপে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্য জগতে পাশ্চাত্য আলোচনা শাস্ত্রের মান-প্রতিমানগুলি এইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে আসিয়া মিলিয়া গিয়াছে যে বর্ত্তমানের সাহিত্যিক-মনীষিবৃন্দ উহাদের মাধ্যমে কাব্যগত চিন্তা ও তাহার মূল্য নির্ধারিত করিতেছেন। অতএব প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির প্রান্তীয় ভাষায় যথাযথভাবে রূপান্তরের অপেক্ষা নূতন আলোচনা পদ্ধতির অনুসরণে বিচার-বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য প্রায় প্রত্যেক ভাষার প্রবুদ্ধ আলোচকগণ কমপক্ষে তিন-চার দশক হইতে খুবই মনোযোগের সহিত এই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, ফলে একটি নূতন সংশ্লিষ্ট কাব্যশাস্ত্রের উদ্ভব অমোঘ হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রবৃত্তিরও সর্ব্বা-ধিক প্রসার হিন্দী ও মারাঠিতেই দেখা যায় এবং ইহার পরে বাংলা ভাষায়। হিন্দীতে এই প্রবৃত্তির সর্বপ্রথম প্রসারক ছিলেন ৺আচার্য্য রামচন্দ্র শুক্ল যিনি অত্যন্ত আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত একদিকে বর্ধমান জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিয়া প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলির ব্যাপক প্রসার করিয়াছেন এবং অপর দিকে পাশ্চাত্য বাদ ও মত ধারার কুজ্ঝটিকা হইতে নির্ভুল ভাবে কেবল সেই সকল প্রকাশ কণাকে গ্রহণ করিয়াছেন যাহা বিবেকসম্মত ছিল এবং ভারতের মূলবর্ত্তী চিন্তাধারার অনুকূলে ছিল। প্রকৃতপক্ষে শুক্লজিকে আধুনিক ভারতের সংশ্লিষ্ট কাব্যশাস্ত্রের মেরুদণ্ড রূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শুক্লজি ছাড়া ডঃ শ্যামসুন্দর দাস, ডঃ গুলাব রায়, শ্রীরামদহিন মিশ্র, পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু প্রভৃতি আলোচকদের নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দীতে খুব বিস্তৃত ভাবে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের রস, অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি প্রভৃতি মূলভূত সিদ্ধান্তের প্রামাণিক পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হইয়াছে, যাহার ফলে এই সব সিদ্ধান্তগুলি অধিক গ্রহণযোগ্য হইয়া আধুনিক রূপ ধারণ করিতে পারিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বরং উহারও পূর্ব হইতে, মারাঠী ভাষায় এই প্রবৃত্তির প্রসার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীনরসিংহ চিন্তামণি কেলকার এই সময় সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ক্রম-

বর্ধমান মারাঠী সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের সম্বন্ধ বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এখন নবীন সাহিত্য শাস্ত্রের নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে—(হাস্য-বিনোদ মীমাংসা, পৃষ্ঠা ৩১৫)। শ্রী বা০ ব০ পটবর্ধন নিজের গ্রন্থে "কাব্য আণি কাব্যোদয়ে" (১৯০৯), ডঃ শ্রীধর ব্যঙ্কটেশ কেতকর নিজের "মহারাষ্ট্র যাঁচে কাব্য পরীক্ষণ" (১৯২৮) গ্রন্থে, শ্রীরা০শ্রীজোগ "অভিনব কাব্যপ্রকাশে" (১৯৩০) ও "সৌন্দর্য্য শোধ আণি আনন্দবোধ" (১৯৪৩) গ্রন্থে, শ্রীদত্তাত্রেয় কেশব কেলকর "কাব্যালোচনে" (১৯৩১), শ্রী যা০ রা০ আগাশে "সারস্বত সমীক্ষা" (১৯৩৪) গ্রন্থে, শ্রীনারায়ণ সীতারাম ফড়কে "সাহিত্য আণি সংসার" ও "প্রতিভা সাধন" গ্রন্থে, ডঃ দেশমুখ "মারাঠী চেঁ সাহিত্য শাস্ত্র" (১৯৪১) গ্রন্থে ও "ভাবগন্ধে" (১৯৫৫), ডঃ কেশব নারায়ণ বাটবে "রসবিমর্শ" (১৯৪২) গ্রন্থে, ডঃ রামচন্দ্র শঙ্কর বালিম্বে, "সাহিত্য মীমাংসা" গ্রন্থে, ডঃ সুরেন্দ্র শিবদাস বারলিঙ্গে "সৌন্দর্য্যা চে ব্যাকরণ" (১৯৫৬) গ্রন্থে এবং শ্রীগণেশ ত্র্যম্বক দেশপাণ্ডে "ভারতীয় সাহিত্য শাস্ত্রে" (১৯৫৮) অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ভারতীয় কাব্য শাস্ত্রের বিবিধ সিদ্ধান্তের পুনরাখ্যান করিয়াছেন।[১] এই বিষয়ে বাংলা ভাষাতেও পর্য্যাপ্ত আলোচনা হইয়াছে এবং ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সুধীর কুমার দাসগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, হরিহর মিশ্র, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য ও উমা রায়ের নাম এই সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। যে সব গুজরাতী আলোচকেরা পাশ্চাত্য আলোচনা শাস্ত্রের প্রভাব গ্রহণ করিয়া ভারতীয় কাব্য সিদ্ধান্তের পুনরখ্যান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৺রাম নারায়ণ ব্যতীত ডালররায় মানকড় ও রামপ্রসাদ বক্সীর নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণী ভাষাগুলির মধ্যে তেলেগুর সী০ আর০ রেড্ডী, পী০ এস০ শাস্ত্রী, জী০ বী০ কৃষ্ণরাও, এ০ রামকৃষ্ণরাও, পী০ সুরিশাস্ত্রী ও কানাড়ী ভাষার মাস্তি বেঙ্কটেশ আয়াঙ্গার, শ্রীকণ্ঠৈয়া, ডঃ পুট্টপ্পা প্রভৃতি আলোচকদের দৃষ্টিকোণও মূলরূপে আখ্যানাত্মকই ছিল।

এই সকল পণ্ডিতগণ যদিও সাহিত্য শাস্ত্রের সর্বাঙ্গের বিবেচনা করিয়াছেন তবুও ইঁহারা কেবল রসকে মূলভূত সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কাব্য শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন করিবার সময় যে কোন প্রবুদ্ধ আলোচক ইহা স্পষ্ট বুঝিতে সক্ষম হন যে রস-সিদ্ধান্তই ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের মেরুদণ্ড এবং এই সিদ্ধান্তের নিজস্ব শক্তি এত প্রবল যে, যে কোন দেশ ও যে কোন যুগের সাহিত্যের রসাত্মক মূল্য নির্ধারণে ইহা সক্ষম। আচার্য্য রামচন্দ্র শুক্ল রস-সিদ্ধান্তকে একটি সার্বভৌম সাহিত্য সিদ্ধান্ত রূপে বিকশিত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা ও অকাল মৃত্যুর জন্য ইহা অপূর্ণই থাকিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য শাস্ত্রে কল্পনা ও অনুভূতি তত্ত্ব, ইহার উদ্ভব কাল হইতে, প্রাধান্য পাইয়া

১. দ্রষ্টব্য : ডঃ মনোহর কালের গ্রন্থ "আধুনিক হিন্দী মারাঠী মেঁ কাব্যশাস্ত্রীয় অধ্যয়ন—ঐতিহাসিক নিরীক্ষণ"।

আসিয়াছে। সহস্র বৎসরের মন্থন ও সৈদ্ধান্তিক সংসর্গের পরে সেখানকার মনীষিগণ বহুমতে অনুভূতির কল্পনাত্মক আস্বাদকেই সাহিত্যের প্রাণতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনুভূতির কল্পনাত্মক্ আস্বাদের যেরূপ সংশ্লিষ্ট ও সর্বাঙ্গপূর্ণ বিচার আমাদের রস-সিদ্ধান্তে করা হইয়াছে সেইরূপ অন্যত্র দুর্লভ। সেইজন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যবিদ্ ও পাশ্চাত্য সাহিত্য শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ ভারতীয় আলোচক অনিবার্য্যরূপে রসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। মারাঠী আলোচকদের মধ্যে ডঃ বাটবে, শ্রী জোগ, ডঃ মাধব গোপাল দেশমুখ ও ডঃ বালিম্বে রস-সিদ্ধান্তের নব রূপায়ণ ও বিকাশের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। বাংলায় বঙ্কিম চন্দ্র, ও সবার অধিক রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর স্বকীয় সাহিত্য সৃজন ও চিন্তনের সাহায্যে, নবীন জীবন দর্শনের আলোক কাব্যের ক্ষেত্রে আনন্দের স্থাপনা করিয়া রস-সিদ্ধান্তকে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অপর দিকে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এবং আলোচক মোহিতলাল মজুমদার, শশিভূষণ দাস গুপ্ত, নলিনী কান্ত গুপ্ত প্রভৃতিরা রসবাদের পরিবর্ধন করিয়াছেন। তেলেগু ভাষায় অধ্যাপক সুব্বারাও, জী০ বী০ কৃষ্ণরাও, পী০ এস০ শাস্ত্রী নতুন আলোকে স্বরুচি অনুসারে রস-সিদ্ধান্তের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিষয়ে কানাড়ী ভাষায় মাস্তি বেঙ্কটশ আয়াঙ্গার, পুট্টপ্পা প্রভৃতি ও গুজরাতীতে ৺রাম নারায়ণ পাঠক প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে আধুনিক কাব্য শাস্ত্রের বিকাশের এই তৃতীয় চরণকে রস-সিদ্ধান্তের স্বর্ণযুগ বলা হয়। বর্ত্তমান কাল হইতে এক সহস্র বৎসর পূর্বে দর্শনের ভিত্তিতে যেরূপ আনন্দবর্ধন, ভট্টনায়ক, অভিনব গুপ্ত, মহিম ভট্ট ও ভোজরাজ প্রভৃতি অনেক আচার্য্যরা রস-সিদ্ধান্তের চরম বিকাশ করিয়াছিলেন সেইরূপ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বর্ত্তমান যুগের আলোচকেরা মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোক ও প্রেরণা গ্রহণ করিয়া নূতন ভাবে রসের পূর্ণবিকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষে অর্থাৎ ১৯৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দের সমকালে ভারতীয় সাহিত্যে রম্য ও অদ্ভুত তত্ত্বের দ্বারা পুষ্ট রোমান্টিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল। ইহার ফলে এক দিকে কাব্যের আনন্দবাদী মূল্যের স্থানে লোককল্যাণবাদী মূল্যের প্রতি অধিক আগ্রহ বাড়িল এবং অপর দিকে ভাব তত্ত্বের স্থানে বুদ্ধি তত্ত্বের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইল। মার্ক্সীয় জীবন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত প্রগতিবাদী লেখক ও আলোচকেরা জনহিতের জন্য সাহিত্য সৃজনের দাবী করিলেন এবং অপর দিকে ইউরোপ ও মার্কিন দেশের নূতন কবিতা ও তাহার পৃষ্ঠপোষক নূতন আলোচনার দ্বারা প্রেরিত ভারতীয় ভাষার অতি নবীন কবিরা নবীন সৌন্দর্য্য বোধের নামে বৌদ্ধিক চমৎকারিতার প্রতি প্রবণতা ব্যক্ত করিলেন। স্বভাবতঃ এই দুইটি ভাব ধারাই রসবাদের বিরোধী এবং এই দুই ধারার কবিবৃন্দরা সিদ্ধান্ত এবং ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রে রস-সিদ্ধান্তের উগ্র বিরোধিতা করিয়াছেন :

যুগ ও সমাজের মনোবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অথবা উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া

রচয়িতা নিজের রচনার জন্ম দেন। যখন সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র এবং কালিদাসের মত কবিদের যুগ ছিল, তখন বহু শতাব্দীর জন্য ভারতবর্ষের দাসত্ব জন্ম গ্রহণ করিতেছিল। সেই সময় মহান্ আচার্য্যগণ এবং কবিগণ ভারতীয় জীবনের মধ্যে যে সব সংস্কারকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন সেই সব সংস্কার এখনও নির্মূল হয় নাই। যে ভাব ধারার সাহায্যে নায়িকা-ভেদের বিশাল ভবন নির্মিত হইয়াছিল তাহাকে ব্রহ্মানন্দ সহোদরের আবরণ দিয়া ঢাকিয়া জনতাকে প্রবঞ্চিত করা হইয়াছিল। সাহিত্যশাস্ত্রীরা বলিয়াছেন যে কাব্য কেবল সহৃদয়ের জন্য, তাহার জন্য অলঙ্কার, ধ্বনি, রস প্রভৃতির জ্ঞান পরম আবশ্যক; ইহার মর্ম সকলে বুঝিতে পারেন না। শৃঙ্গার রসের অলঙ্কার, ধ্বনি, রস প্রভৃতির সহিতই বিশেষ সম্বন্ধ কেন হয় এবং ইহার দ্বারা কুসংস্কার জন্মাইতে পারে কি না এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হয় যে সাহিত্যে, ভাবনা অথবা ব্যঞ্জনার দ্বারা একটি অলৌকিক আনন্দ উৎপন্ন হয় এবং ফলে চিত্তে কোন সংস্কার অবশেষে থাকে না। কিন্তু গীতায় বলা হইয়াছে যে, বিষয়ের চিন্তা করিলে তাহার প্রতি আসক্তি জন্মায়। এই মহান্ মনোবৈজ্ঞানিক অর্থকে কাব্যশাস্ত্রীরা পরিবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন সাহিত্যে বিষয়-চিন্তার দ্বারা, ব্রহ্মানন্দ-সহোদর আনন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রবঞ্চনা আজও চলিতেছে এবং অনেক আলোচক এই প্রশ্নের সম্মুখীনই হইতে চান না যে, কোন্ সাহিত্য কিরূপ সংস্কার তৈয়ারী করে এবং সমাজের জন্য এই সব সংস্কারগুলি ভাল কি মন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ ধারার সম্পর্কে পরবর্তীকালে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ইহা বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করিয়া পরকীয়ার সঙ্গে প্রেম করে, সে শৃঙ্গারের চরম উৎকর্ষ কিরূপ তাহা বুঝিতে পারে। (অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ)। এই বিচার ধারার পরাকাষ্ঠা ব্রজ ভাষার নায়িকা-ভেদে দৃষ্ট হয়। এই রসে ডুবিয়া কবিরা একেবারে রসাতলে হাজির হইলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে দেশকেও ডুবাইলেন।[১] (ডঃ রামবিলাস শর্ম্মা)।

বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনঃস্থিতি, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্য এতদূর বদলাইয়া গিয়াছে যে আজ সে নিজের আবেগপ্রবণ ভাবধারার উপর দার্শনিক রঙ্গ ছড়াইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না অথবা কোন দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে না। গভীর অসন্তোষে, স্বাভাবিক অনাস্থা ও ব্যর্থতায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে বিশ্বাস স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিতেছে না। বুদ্ধি ও তর্ক বিশ্বাসকে সরাইয়া ফেলিতেছে। এক দিকে ভৌতিকতার জড় উপাসনার প্রতি তাহার চেতনা বিদ্রোহ করিতেছে এবং অপর দিকে আত্মার অতপ্রীয় সত্তা ও অখণ্ড অনাহত আনন্দের অনুভূতি সে করিতে পারিতেছে না। অন্তর্জগত ও বহির্জগত-এর সংঘর্ষ এবং তাহাদের মহিমার সংবর্ধক সিদ্ধান্তের দ্বন্দ্ব জীবনের মধ্যে একটি বিচিত্র নিশ্চলতা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। বহু শতাব্দী হইতে প্রতিষ্ঠিত

---

১. সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃ· ১২৮-২৯

আদর্শের মধ্যে খুবই অরাজকতা দেখা দিয়াছে এবং আদর্শ ও বাস্তবের পারস্পরিক সংঘাত ঘনীভূত হইয়াছে। এই মনঃস্থিতি ব্যক্তির নয় যুগের এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন রচনার মাধ্যমে স্পষ্টরূপে এই মনোভাবের অভিব্যক্তি করা হইতেছে। কেবল বর্ত্তমান আর্থিক কারণের জন্য এই অসন্তোষ এবং অনাস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। নৈতিক মূল্য ও সংস্কারের মধ্যে যে ক্রান্তি আসিয়াছে, তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ক্রান্তির উপর এই বৈজ্ঞানিক যুগের বৌদ্ধিকতার গভীর প্রভাব দেখা যায়। বুদ্ধি ভাবকে স্থির থাকিতে দিতেছে না, এবং ফলে আলম্বন স্থির থাকিতে পারিতেছে না। রস একটি বিশেষ মনঃস্থিতিতে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই বিষাদ-সংঘাতপূর্ণ যুগের কবিদের দৃষ্টি রস নিষ্পত্তির দিকে প্রসারিত নয় এবং আমার ধারণা এই যে অধিকাংশ নূতন কবিতার লক্ষ্য রসানুভূতির জন্য নয়।[১] (ডঃ জগদীশ গুপ্ত)

কিন্তু উল্লিখিত উদাহরণগুলির দ্বারাই ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে রস-সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহাদের বিরোধ অপূর্ণ জ্ঞানের উপর আশ্রিত। রস-সিদ্ধান্ত এইরূপ ব্যাপক সিদ্ধান্ত যে, উহা কখনই লোক মঙ্গলের বিরোধী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না এবং ভাবাত্মক বিশ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যও উচিত সীমার মধ্যে বুদ্ধি তত্ত্বের ও বহিষ্কার করিতে পারে না। রস-সিদ্ধান্ত কেবল মাত্র ইহা স্বীকার করে যে যেখানে বুদ্ধি ভাব হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায় সেখানে উহার কবিত্বের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন নয় যে এই ধরণের বিরোধ কখনই স্থায়ী হইতে পারে না এবং রস-সিদ্ধান্ত ব্যাপক এবং বিকাশশীল মানববাদী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কেবল এই যুগেই নয়, ভবিষ্যতেও কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণের কাজে আসিবে এবং মানদণ্ডরূপে গৃহীত হইবে।

---

১. আলোচনা : ত্রৈমাসিক, বর্ষ ২, অঙ্ক ৩, পৃ০ ৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ক) রসের পরিভাষা

(খ) রসের স্বরূপ

(গ) করুণ রসের আস্বাদ

(ক) রসের পরিভাষা

সমগ্র রস বিবেচনার মূল ভিত্তিরূপে ভরতের এই প্রসিদ্ধ সূত্রটিরই উল্লেখ করা হয় :

তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।

(নাট্যশাস্ত্র, কাব্যমালা, ৪২, পৃ০ ৯৩)

প্রকৃতপক্ষে ইহা রসের সংজ্ঞা নয়, যদিও স্বয়ং অভিনবগুপ্ত ইহাকে সংজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :

এবং ক্রমহেতুমভিধায় রসবিষয়ং লক্ষণসূত্রমাহ—এইভাবে (পর্যায়) ক্রমের হেতুটি বলিবার পর রসের বিষয়ের লক্ষণ সূত্রটি বলিয়াছেন (হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃ০ ৪৪২)

এই সূত্রে, মূল রূপে, রসের নিষ্পত্তির কথা বলা হইয়াছে, উহার স্বরূপ সম্পর্কে নয়। কিন্তু রস-স্বরূপের বিচারও ইহাতে নিহিত আছে এবং পরবর্তী যুগে ইহার ভিত্তিতে রসের প্রসার হইয়াছে। স্বয়ং ভরত নিজের বিচার নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন :

যথা হি নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তির্ভবতি,
যথা হি গুড়াদিভির্দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরোষধিভিশ্চ ষাডবাদয়ো রসা নির্বর্তন্তে,
তথা নানা ভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্ব মাপ্নুবন্তীতি।

অত্রাহ—রস ইতি কঃ পদার্থঃ। উচ্যতে। আস্বাদ্যত্বাৎ। কথমাস্বাদ্যতে রসঃ। যথা হি নানাব্যঞ্জন সংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ। পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি-সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তস্মান্নাট্যরসা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ।

(নাট্যশাস্ত্র, কাব্যমালা, পৃ০ ৯৩)

—যেইরূপ নানা প্রকারের ব্যঞ্জন, ঔষধি এবং দ্রব্যের পরস্পর সুসংযোগে (ভোজ্য) রসের নিষ্পত্তি হয়, যেইরূপ গুড় প্রভৃতি, দ্রব্য, ব্যঞ্জন ও ঔষধির দ্বারা 'ষাড়বাদি' রস তৈরী হয়, সেইরূপ বিবিধ ভাবের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া স্থায়ী ভাবও (নাট্য) রসরূপে পরিণত হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে রস কি, অথবা রসকে রস কেন বলা হয়? উত্তর হইবে যে আস্বাদ্য বলিয়াই রসকে রস বলা হয়, অর্থাৎ যাহা আস্বাদ্য তাহাই রস।

যেইরূপ নানাবিধ সুখাদ্য ব্যঞ্জনার উপভোগ করিয়া প্রসন্নচিত্ত পুরুষ রসের আস্বাদন করেন এবং হর্ষাদির অনুভব করেন, সেইরূপ প্রেক্ষক বিবিধ ভাব এবং অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক (মানসিক) অভিনয়ের দ্বারা সংযুক্ত স্থায়ী ভাবের আস্বাদন করেন ও হর্ষাদির অনুভব করেন। এই ভাবে নাট্যের মাধ্যমে আস্বাদিত হওয়ার জন্য ইহাকে নাট্য রস বলা হয়।

উল্লিখিত বিচারের সার তত্ত্ব এই যে :

(১) রস আস্বাদ নয়, ইহা আস্বাদ্য—অর্থাৎ রসকে অনুভূতি বলা যাইতে পারে না, বরং ইহাকে অনুভূতির বিষয় বলিয়া ধরিতে হইবে : নূতন রীতিতে রস বিষয়ীগত নয়, বরং ইহা বিষয়গত।

(২) বিবিধ ভাবসমূহের দ্বারা অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা সংযুক্ত এবং ত্রিবিধ অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়ী ভাবই রস (অথবা নাট্য রস) রূপে পরিণত হয়। যেরূপ ব্যঞ্জন প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর ভাবে প্রস্তুত অন্নই ভোজ্য রসের (ষাড়িবাদির) রূপ ধারণ করে, সেইরূপ নাট্য সামগ্রীর (বিবিধ ভাব সমূহ+ত্রিবিধ অভিনয়ের) দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়ী ভাবই নাট্য রস রূপে পরিণত হয়। এখানে স্থায়ী ভাব অন্নের এবং নাট্য সামগ্রী ব্যঞ্জন, ঔষধি (মসলা) প্রভৃতির সমতুল্য :

স্থায়ী ভাব = অন্ন
নাট্য সামগ্রী = ব্যঞ্জন প্রভৃতি

অভিনবগুপ্ত এই উদাহণের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সংগতি রক্ষার জন্য প্রযত্ন করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য, হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃ০ ৪৯৬), কিন্তু তাঁহার এই কাজটি বিশেষ যুক্তিসম্মত হয় নাই। যথার্থরূপে বলিতে গেলে, ইহার দরকারই ছিল না। কারণ, ইহার ফলে মূল তথ্যটি জটিল ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

(৩) স্থায়ী ভাব রস নয় কিন্তু ইহা 'রসের' ভিত্তিস্থানীয়, কারণ নাট্য সামগ্রী দ্বারা সংযুক্ত হইয়া ইহাই 'রস' রূপে পরিণত হইয়া যায়—যেরূপ অন্ন রস নয় কিন্তু ইহা ভোজ্য রসের ভিত্তিস্থানীয় কারণ ব্যঞ্জন প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াই তাহা রসরূপে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ—রতি স্থায়ী ভাবকে তাহার মূল অবস্থায়, শৃঙ্গার রস বলা চলে না, কিন্তু নায়ক-নায়িকা, স্মিতি-কটাক্ষ, হর্ষ-বিতর্কাদি নানা প্রসঙ্গে পরিবদ্ধ হইয়া ত্রিবিধ অভিনয়ের দ্বারা যখন রতিকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করা হয় তখন উহা শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়।

(৪) এখানে স্থায়ী ভাব বলিতে সহৃদয় অথবা কবির স্থায়ী ভাবকে উদ্দেশ করা হইতেছে না, বরং নায়কের স্থায়ীভাবের প্রতি সঙ্কেত করা হইতেছে এবং নায়ক যেহেতু লোক-প্রতিনিধি, অতএব নায়কের স্থায়ী ভাবের অর্থ হইতেছে লোক-সামান্যের স্থায়ী ভাব।

(৫) এইরূপ রসকে কলার আস্বাদ বলা চলে না, রস স্বয়ং কলা অথবা কলাত্মক স্থিতি বিশেষ যাহা আস্বাদের বিষয় রূপে গৃহীত হয়।

(৬) সহৃদয় ইহার আস্বাদন করেন কিন্তু তাঁহার এই আস্বাদ রস রূপে হয় না, হর্ষাদিরূপে হয়।

(৭) হর্ষাদির দুইটি অর্থ আছে—প্রথমতঃ, রসাস্বাদ কেবল আনন্দময়ই হয় না, বিভিন্ন স্থায়ী ভাবের অনুসারে বিভিন্ন প্রকার হয়; দ্বিতীয়তঃ, ভরত 'আদি' শব্দের দ্বারা হর্ষ বিরোধী অর্থাৎ কটু অনুভূতির উল্লেখ করেন নাই বরং কুতূহল প্রভৃতি আনন্দময়ী অনুভূতির প্রতিই সঙ্কেত করিয়াছেন। প্রাচীনদের মধ্যে রামচন্দ্র গুণচন্দ্র প্রথম মতের প্রবর্তক এবং অভিনবগুপ্ত দ্বিতীয় মতের। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই প্রথম অর্থের সমর্থক, যদিও আনন্দবাদী মতের সমর্থকদেরও সংখ্যা কম নয়—আমরা এই মতেরই সংবর্ধন করি।

বিষয়গত পরিভাষা—এই ভাবে ভরতের মতানুসারে নানাভাবোপগত স্থায়ী ভাবই রস; আরও স্পষ্ট ভাবে বলিতে হইলে—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা সংযুক্ত এবং বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়ী ভাবই রস অর্থাৎ রস ভাবমূলক কলাত্মক স্থিতি ভিন্ন আর কিছুই নয় যাহা কবি-নিবদ্ধ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচার ভাবের নানা প্রসঙ্গের সাহায্যে নাট্যসামগ্রীর মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়। উদাহরণস্বরূপ রম্য তপোবনের দৃশ্যে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার (বিভাব) অভিনয়কারী নট-নটী যখন বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা অনুভাব ব্যভিচারী প্রভৃতির অভিব্যক্তি করিয়া রতি স্থায়ীভাবকে সর্বাঙ্গরূপে উপস্থিত করেন তখন একটি সুন্দর ভাবের সৃষ্টি হয়। ইহা সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে হর্ষ, কুতূহল প্রভৃতি জাগ্রত করে। ভরতের মতানুসারে এই সুন্দর ভাবমূলক অবস্থাই রস। সহৃদয়ের অনুভূতি ইহা হইতে ভিন্ন হয়—তাহার অনুভূতি ইহার আস্বাদরূপ হয় যাহা হর্ষ, কুতূহল প্রভৃতি রূপে অনুভূত হয়। এই অবস্থা কেবল নাট্য-সৌন্দর্যও নয় অর্থাৎ কেবল নাট্য অলঙ্কার ও বস্তুর সৌন্দর্য রস হইতে পারে না; নাট্য-সৌন্দর্য ও কাব্য-সৌন্দর্যের মাধ্যমে স্থায়ী ভাবের উপস্থিতিকেই রস বলা হয়।

রসের এই পরিভাষা বিষয়গত এবং ভরতের বিবেচনার ভিত্তিতে রচিত হওয়ার জন্য ইহাকে মৌলিকও বলা চলে। ধ্বনি-পূর্বকালে অলঙ্কারবাদীরা কাব্যের ক্ষেত্রেও এই পরিভাষাকে ঠিক এইরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে কেবল পরিভাষার ভাষায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল :

শব্দ-অর্থের সৌন্দর্যের মাধ্যমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর দ্বারা সংযুক্ত স্থায়ী ভাবই রস-রূপ ধারণ করে :

১. প্রাক্প্রীতির্দর্শিতা সেয়ং রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা।
রূপবাহুল্যযোগেন তদিদং রসবদ্বচঃ। —কাব্যাদর্শ ২.২৮১

—বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট না হইলে রতি কেবল 'প্রীতি'ই (নামক 'ভাব') থাকিয়া যায়

কিন্তু বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। এখানেও রসের স্বরূপ বিষয়গতই—অর্থাৎ ইহা আস্বাদ্য রূপই, আস্বাদ নয়।

বিষয়িগত পরিভাষা—ভরত-সূত্রের ব্যাখ্যাকার আচার্য্যদের বিবেচনার ফলে রসের স্বরূপ ক্রমশঃ বিষয়িগত হইতে লাগিল এবং তাহা 'আস্বাদ্য' হইতে 'আস্বাদ' রূপে পরিণতি লাভ করিল। এই অর্থ-পরিবর্তনের সর্বাধিক দায়িত্ব অভিনব গুপ্তের উপর ছিল। অভিনব গুপ্ত শৈবাদ্বৈতবাদের প্রসিদ্ধ আচার্য্য ছিলেন। অতএব তিনি স্বকীয় দার্শনিক মেধার সাহায্যে রস বিবেচনাকেও শৈবাদ্বৈত সিদ্ধান্তের রঙে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রসের অর্থ আনন্দ এবং এই আনন্দ বিষয়গত না হইয়া আত্মগতই। বিষয় আত্ম-পরামর্শ অথবা আত্মাস্বাদের মাধ্যমমাত্র, যাহার সাহায্যে প্রমাতা সংবিদ্‌-বিশ্রান্তি লাভ করেন। এই সংবিদ্‌-বিশ্রান্তিই আনন্দ। অতএব রস নাট্যগত হইতে পারে না—নাট্য কেবল সংবিদ-বিশ্রান্তি রূপ রসের মাধ্যমই হইতে পারে। অভিনব গুপ্তের এই বক্তব্যের ফলে রসের আনন্দ ভিন্ন অন্য কোন রূপেরই কল্পনা করা যায় না। অভিনব গুপ্ত হইতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত সকলেই রসের এই রূপটিকেই স্বীকার করিয়াছেন; ব্যাখ্যার ধারা অল্প-বিস্তর পরিবর্তিত হইলেও প্রতিপাদ্য অপরিবর্তিত থাকিয়া গিয়াছে।

অভিনব গুপ্ত রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ নিম্নরূপে করিয়াছেন :

নটের অভিনয়ের প্রভাব স্বরূপ যাহা প্রত্যক্ষের অনুরূপ প্রতীত হয়, একাগ্র মনের নিশ্চলতার জন্য যাহা অনুভূত হয়, সমস্ত নাটকে ও কোন কাব্য বিশেষে যাহা প্রকাশিত হয়, সেই অর্থকে নাট্য বলা হয়। তাহা যদিও (নানা প্রকারের নায়ক-নায়িকা প্রভৃতি আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের অপরিসংখ্যেয় হওয়ার জন্য) অনন্ত বিভাবাদি রূপ হয় তবুও সমস্ত অচেতন বিভাবাদির জ্ঞানের মধ্যে (পর্যবসিত হওয়ার জন্য) এবং তাহার (সেই জ্ঞানের) ভোক্তার (আলম্বন বিভাব রূপ কোন পাত্র বিশেষের মধ্যে পর্যবসিত হওয়ার জন্য) এবং (এইরূপ নানা) ভোক্তাগণের প্রধান ভোক্তার (অর্থাৎ নায়কের) মধ্যে পর্যবসিত হওয়ার জন্য নায়ক কথিত ভোক্ত-বিশেষের (রত্যাদি রূপ) স্থায়িভাবাত্মক চিত্তবৃত্তি স্বরূপ (অর্থ যাহা নাট্য) হয়।

এবং সেই (প্রধান-চিত্তবৃত্তি রূপ নায়কের) একটি চিত্তবৃত্তি, লৌকিক গানের (নাটক অথবা কাব্যে সংযোজিত) গেয় পদাদি, লাস্য (নৃত্য-বিশেষ) প্রভৃতি দশ অঙ্গের দ্বারা সংযুক্ত এবং স্বীকৃত লক্ষণযুক্ত, গুণ-অলঙ্কার-গীত-বাদ্য প্রভৃতির সংযোগের দ্বারা অপরিসীম সৌন্দর্যকে প্রাপ্ত করিয়া কাব্যের মহিমা ও নট কর্তৃক প্রয়োগ ধারাও অভ্যাস বিশেষের ফলস্বরূপ, (এই বিভাবাদি আমার অথবা ইহা অপরের এইরূপ) স্বকীয়-পরকীয় ভাব হইতে মুক্ত হইয়া যায়, এইভাবে সাধারণীকরণ হওয়ার জন্য (নায়কের স্বীয় চিত্তবৃত্তি) সামাজিককেও নিজের সত্তার ভিতর সমাবিষ্ট করিয়া, এবং নায়ক ও সামাজিকের চিত্তবৃত্তির তাদাত্ম্য (অভেদ-সাধারণীকরণ) হওয়ার জন্যই অনুমান ও আগম (পরোক্ষাত্মক রূপ) এবং (ইন্দ্রিয় সংযোগাদি রূপী সাধনাদি ছাড়াই

যাহারা উৎপন্ন হয়) যোগিপ্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন (করণক) তটস্থ (উদাসীন, রসাদির অনুভব যাঁহারা করেন না) প্রমাতা এবং প্রমেয় হইতে বিলক্ষণ এবং পরকীয় লৌকিক চিত্তবৃত্তি হইতে ভিন্নরূপে অনুভূত (নায়ক-বিশেষের) নিজের পরিমিত স্বরূপের আশ্রয়ে অনুভূত হওয়ার জন্য, লৌকিক প্রমদাদি হইতে উৎপন্ন নিজের রতি ও শোকের (বর্ণনার) অনুরূপ (লজ্জা-নাশাদি রূপ রসবিরোধিনী) অন্য চিত্তবৃত্তির উৎপাদনে অক্ষম হওয়ার জন্যই নির্বিঘ্ন অনুভূতির বিশ্রান্তি রূপ আস্বাদন নামে কথিত ব্যাপারের দ্বারা গৃহীত হওয়ার জন্য (রস্যতে ইতিরসঃ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে) 'রস' শব্দরূপে গৃহীত হয়।১

অভিনবের ব্যাখ্যান শৈলীতে অর্থ-গরিমার সহিত শব্দাড়ম্বরের বৈচিত্র্যও বিদ্যমান আছে, অতএব উল্লিখিত উদ্ধরণের বিশ্লেষণ আবশ্যক। জনসাধারণের প্রতিনিধি প্রধান পাত্রের চিত্তবৃত্তিরূপ স্থায়ী ভাব কাব্য-সৌন্দর্য ও নাট্য-সৌন্দর্যের প্রভাবে সাধারণীকৃত হইয়া সামাজিকের চিত্তবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য স্থাপিত করিয়া, নির্বিঘ্ন অর্থাৎ দেশ কালের সীমা হইতে মুক্ত, সংবিদ্বিশ্রান্তি রূপে রসনীয় হওয়ার জন্য রস হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ—কুশল নট-নটী দুষ্মন্ত-শকুন্তলা রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। ইঁহারা প্রথমে তপোবনের রমণীয় কুঞ্জে সম্মিলিত হন (বিভাব)। উভয়ে পরস্পরের আহ্লাদকর সৌন্দর্য দেখিয়া চকিত হইয়া যান এবং তৃষিত-উৎসুক নেত্রে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেন—অনিচ্ছাপূর্বক সেখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় শকুন্তলা লুকাইয়া দুষ্মন্তের দিকে চাইয়া দেখেন (অনুভাব)। বিয়োগজনিত কখনও উৎকণ্ঠা এবং কখনও নিরাশার দরুণ ব্যগ্র হইয়া পরস্পর মিলিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন (ব্যভিচারী ভাব)। সৌভাগ্যবশতঃ শকুন্তলা, সখীর সাহায্যে, পত্রের দ্বারা দুষ্মন্তের প্রতি প্রেম নিবেদন করার অবসর খুঁজিয়া পান। এমন সময় সহসা দুষ্মন্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এইরূপে উভয়ের মিলন ঘটে। যখন এই

১। তত্র নাট্যং নাম নটগতাভিনয়প্রভাবসাক্ষাৎকারায়মাণৈক-ঘনমানসনিশ্চলাধ্যবসেয়ঃ সমস্ত-নাটকাঙ্গতমকাব্যবিশেষাশ্চ দ্যোতনীয়োঽর্থঃ। স চ যদ্যপ্যনন্তবিভাবাদ্যাত্মা তথাপি সর্বেষাং জ্ঞানাং সংবিদি, তস্যাশ্চ ভোক্তরি, ভোক্তৃবর্গস্য চ প্রধানে ভোক্তরি পর্যবসানাৎ, নায়কাভিধানভোক্তৃবিশেষ-স্থায়িচিত্তবৃত্তি স্বভাবঃ।

সা চৈকচিত্তবৃত্তিঃ স্বকীয়পরকীয়মিতি প্রতীয়মানানন্তচিত্তবৃত্ত্যন্তরশতবিশেষিতালৌকিকগীত গেয়পদাদিলাস্যাঙ্গদলকোপজীবনস্বীকৃতলক্ষণগুণালঙ্কারগীতাতোদ্যাদিসম্যক্ সুন্দরীভূত — কাব্যমহিমা প্রয়োগ মালাভ্যাসবিশেষাশ্রয়ত্বাৎ স্বপরভাবাৎ প্রচ্যাবিতা, অতএব সাধারণী ভূততয়া সামাজিকানপি স্বাত্মসদ্ভাবেন সমাবেশয়ন্তী, তাদাত্ম্যাদেব চ অনুমানাগমযোগিপ্রত্যক্ষাদিকরণকতটস্থপ্রমাতৃপ্রমেয়পর-কীয়লৌকিকচিত্তবৃত্তিবিলক্ষণতয়া নির্ভাসমানা, পরিমিতস্বাত্মাশ্রয় তানির্ভাসনাবিরহাচ্চ লৌকিক প্রমদাদিজনিত নিজরতিশোকাদিবৎচিত্তবৃত্ত্যন্তরজননাক্ষমা অত এব নির্বিঘ্নস্বসংবেদনাত্মক বিশ্রান্তি লক্ষণেন রসনাপরপর্যায়েন ব্যাপারেণ গৃহ্যমানত্বাদ্ রসশব্দেনাভি ধীয়তে।

—হিং অ. ভা.—আ. বিশ্বেশ্বর (পৃ. ৪২৭-৪২৮)

সকল বিষয়ের (বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারী প্রভৃতি প্রপঞ্চগুলির) কাব্য, সঙ্গীত, রঙ্গ-বৈভবের সাহায্যে মঞ্চে প্রদর্শন হয় তখন প্রেক্ষকের চিত্তে বাসনা রূপে স্থিত রতি স্থায়ী ভাব জাগ্রত হইয়া এতদূর পর্যন্ত উদ্দীপ্ত হয় যে প্রেক্ষক বীতবিঘ্ন হইয়া অর্থাৎ ব্যক্তি, দেশকালের অন্তর ইত্যাদি সমস্ত ভুলিয়া, বর্তমান রস-বিষয়ের সহিত তন্ময় হয় এবং আত্মবিশ্রান্তিময়ী আনন্দ-চেতনায় বিভোর হয়। এই আনন্দ-চেতনাই রস। এই-রূপে, সংক্ষেপে অভিনব গুপ্তের মতানুসারে নাট্যাদির সেবনের দ্বারা উদ্ভূত ভাবের আশ্রয়ে আত্মবিশ্রান্তিময়ী আনন্দ-চেতনাই রস বলিয়া গৃহীত হয়।

অভিনব গুপ্তের পরে মম্মট রসের এই পরিভাষার বিচার করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত এই বিচারই চলিয়া আসিতেছিল। কেবল পণ্ডিতরাজ শৈব দর্শনের স্থানে আবরণের ভগ্নতার ভিত্তিতে নব্যন্যায় ও বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সামান্য অর্থ—সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে সামান্য কাব্য-সৌন্দর্যের অর্থেও রসের প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, দণ্ডী মাধুর্যগুণের বিবেচনায় রসের প্রয়োগ এই অর্থরূপেই করিয়াছেন :

১. মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ। —কাঃ দঃ ১.৫১

২. কামং সর্বোঽপ্যলঙ্কারো রসমর্থে নিষিংচতু। —কা০ দ০ ১ ৬২

এখানে—বাণী অর্থাৎ শব্দে রসের অবস্থান এবং অলঙ্কারের দ্বারা অর্থে রসের নিষেক—এই দুইটি তথ্যের সাহায্যে ইহাই প্রমাণিত করা হইয়াছে যে এই প্রসঙ্গে রসের অর্থ ভাবমূলক কাব্য-সৌন্দর্য নয় বরং কেবল অভিব্যক্তির সৌন্দর্য। প্রকৃত-পক্ষে, রসের এই অর্থ শাস্ত্রীয় ও পারিভাষিক অর্থ নয়। আজও যথারূপ ইহার প্রচলন দেখা যায়। অভিব্যক্তির চমৎকারিতার জন্য রস শব্দের প্রয়োগ কেবল ব্যবহারেই নয় সাহিত্যেও ক্রমাগত হইতেছে, কিন্তু ইহা লক্ষণার দ্বারা মূল অর্থের বিস্তৃতিমাত্র, কারণ, রসের অর্থ কেবল আহ্লাদ নয়—ইহা রাগাত্মক আহ্লাদ রূপ, যাহা শব্দার্থের চমৎকারিতায় অনিবার্যতঃ বিদ্যমান থাকে না।

অতএব সংক্ষেপে রসের মাত্র তিনটি অর্থ :

১. ভাবমূলক কাব্য-সৌন্দর্য (ভাবের কলাত্মক অভিব্যঞ্জনা)।

২. ভাবমূলক কাব্য-সৌন্দর্যের অনুভূতি।

৩. সামান্য কাব্য-সৌন্দর্য।

ইহাদের মধ্যে তৃতীয় অর্থটি শাস্ত্রীয় অর্থ নয় কেবলমাত্র ব্যবহারিক।

■ ■ ■

(খ) রসের স্বরূপ

রসের স্বরূপ দ্বিবিধ ইহা উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রমাণপূর্বক বলা যাইতে পারে :

(১) বিষয়গত অর্থাৎ রস ভাবের কলাত্মক অভিব্যঞ্জনা মাত্র = ভাবমূলক কাব্য-সৌন্দর্য।

(২) বিষয়িগত অর্থাৎ রস উক্ত কাব্য-সৌন্দর্যের আস্বাদ মাত্র।

ইহাদের মধ্যে প্রথম রূপটি মৌলিক হইলেও প্রায় লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং অনুভবগম্য রূপই শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রকৃত তথ্য এবং ভরতের অভিপ্রায় যাহাই হউক না কেন, ভারতীয় সাহিত্য এবং সাহিত্যশাস্ত্রে অভিনব গুপ্ত প্রতিপাদিত রসের আস্বাদগম্য রূপকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। বিষয়গত অর্থ অর্থাৎ ভরতের অভীষ্ট অর্থ 'রসের' স্থানে কাব্যের বাচক হইয়া গিয়াছে। ভাবের কলাত্মক অভিব্যঞ্জনা রস নয় তাহা কাব্য এবং এইরূপ পরিভাষিত কাব্যের আস্বাদ 'রস'। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে রসের এই শাস্ত্রীয় ও প্রধান অর্থটি অবশেষে সর্বমান্য রূপে গৃহীত হইয়াছে :

অভিনব গুপ্ত রসের স্বরূপের বিবেচনা নিম্ন ভাবে করিয়াছেন :

১। এই ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের মধ্যে কার্য-কারণের একান্তভাবে অবস্থানের চিহ্ন দেখিয়া, অপরের স্থায়ী চিত্তবৃত্তির অনুমানের অভ্যাসের ফলে পটুতা অর্জন করা চাই। উদ্যান, কটাক্ষ, ধৃতি ইত্যাদি তাহাদের লৌকিক কারণ স্বভাব ইত্যাদির সীমা ছাড়াইয়া বিভাবনা-অনুভাবনার জন্য সব কিছু রঙীন করিয়া (তুলিবার) স্বরূপত্ব লাভ করে; এইজন্যই ইহাদের অলৌকিক বিভাব ইত্যাদি বলা হয়। পূর্বের কারণ ইত্যাদি জাত সংস্কারের উপরেই ইহারা নির্ভরশীল—ইহা বোঝানোর জন্যই বিভাব ইত্যাদি নাম-করণের প্রয়োজন। ভাবাধ্যায়ে ইহাদের স্বরূপের বিভিন্নতা আলোচনা করিব। এখন গৌণতা ও মুখ্যতার পর্যায় অনুসারে সম্যক ভাবে যুক্ত হইয়া এবং সব মিলিয়া অভিন্ন হইয়াই সামাজিকের চেতনায় তাহারা ধরা পড়ে; এবং অলৌকিক বিঘ্নবিহীন জ্ঞানাত্মক এক চর্বণার উপলব্ধির বস্তুকে জাগাইয়া তোলে; যতক্ষণ চর্বণা চলে ততক্ষণই এই বস্তুটির প্রাণ; পূর্ব হইতেই আছে এমন কোনো কিছু ইহা নয়; ইহা ঠিক সেই সময়টিরই বিষয়; চর্বণার বাহিরে, কোন সময় ইহা থাকে না, ইহা স্থায়ী হইতে স্বতন্ত্র এবং এই

(প্রাণ) বস্তুই রস[১] (অবন্তী কুমার সান্যাল-এর দ্বারা অনূদিত : অভিনব গুপ্তের রসভাষ্য)

২। এইজন্য অলৌকিক-চমৎকার-স্বরূপ রসাস্বাদ স্মৃতি, অনুমান, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি হইতে পৃথক্।

যেহেতু লৌকিক অনুমানের প্রক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত (সামাজিক, নাটকে) প্রমদাদিকে (বিভাবাদিকে) (লৌকিক পরগত রত্যাদির অনুরূপ) তটস্থ থাকিয়া গ্রহণ করেন না। বরং হৃদয়সংবাদাত্মক (সমস্ত সামাজিকের হৃদয়ের একরূপতার রূপ) সহৃদয়ত্বের বলে অখণ্ড রসাস্বাদের অঙ্কুর রূপে, অনুভাব, স্মৃতি প্রভৃতির প্রক্রিয়া হইতে মুক্ত থাকিয়া, তন্ময়স্থিতিকে প্রাপ্ত করিয়া (উচিত) চর্বণার উৎপাদক রূপে (প্রমদাদি বিভাবের অনুভূতি করেন)।

এবং সেই চর্বণা (সেই রসাস্বাদ হইতে) পূর্বের কোন অন্য প্রমাণের দ্বারা হয় না এবং এইজন্য ইহাকে স্মৃতি বলা চলে না। এবং ইহাতে লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ব্যাপারও থাকে না। কিন্তু অলৌকিক বিভাবাদির সহিত সম্বন্ধের বলে এই চর্বণা প্রাপ্ত হয়। এবং সেই (রস-চর্বণা) (১) প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম ও উপমান রূপ লৌকিক প্রমাণ হইতে উৎপন্ন রত্যাদি জ্ঞান হইতে, এবং (২) যোগিপ্রত্যক্ষ হইতে জাত (অর্থাৎ অপরের দ্বারা অনুভূত রত্যাদির) তটস্থ পর-সংবেদনাত্মক জ্ঞান হইতে এবং (৩) সমস্ত বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য-যুক্ত (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্থিত) পরমযোগীর অন্তরে স্থিত স্বাত্মানন্দের অনুভব (রূপ সাক্ষাৎকারাত্মক) হইতে ভিন্ন রূপ হয়। কারণ, ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে (১) (লৌকিক প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে) লাভালাভ রূপ অন্য বিঘ্নের প্রবেশ লাভ ঘটে, (২) (যুঞ্জান যোগীর প্রত্যক্ষ পরগত রত্যাদিকে প্রত্যক্ষ করাতে) তটস্থতা এবং অস্পষ্টতার জন্য, এবং (৩) (পরযোগীর প্রত্যক্ষ আত্মনিষ্ঠারূপ) বিষয়াবেশের বিবশতার জন্য (সৌন্দর্য) আহ্লাদকত্বের অভাব ঘটে (রস-চর্বণা ইহাদের সকলের অপেক্ষা ভিন্ন)।[২]

১। তত্র লোকব্যবহারে কার্যকারণসহচারাত্মকলিঙ্গদর্শনে স্থায্যাত্মপরচিত্তবৃত্ত্যনুমানাভ্যাসপাটবাদধুনা তৈরেবোদ্যানকটাক্ষ ধীক্ষাদিভির্লৌকিকীং কারণত্বাদিভূবমতিক্রান্তৈর্বিভাবনানুভাবনাসমুপরঞ্জকত্বমাত্রপ্রাণৈঃ, অত এবাহলৌকিকবিভাবাদিব্যপদেশ ভাগ্ভিঃ, প্রাচ্যকারণাদি রূপসংস্কারোপজীবনখ্যাপনায় বিভাবাদিনামধেয়ব্যপদেশৈর্ভাবাধ্যায়েপি বক্ষ্যমাণস্বরূপ ভৈদেগু'ণ প্রধান পর্যায়েন সামাজিকধিয়ি সম্যগ্যোগংসম্বন্ধ মৈকাগ্রং বাসাদিতবদ্ভিঃ, অলৌকিকনির্বিঘ্ন সংবেদনাত্মক চর্বণাগোচরতাং নীতোঽর্থঃ চর্বমাণতৈকসারো, ন তু সিদ্ধস্বভাবঃ, তাৎকালিক এব, ন তু চর্বণাতিরিক্ত কালাবলম্বী স্থায়িবিলক্ষণ এব রসঃ।

(হিন্দী অভিনবভারতী—আচার্য বিশ্বেশ্বর, পৃ০ ৪৮৩)

২। তেনালৌকিকচমৎকারাত্মা রসাস্বাদঃ স্মৃতি-অনুমান-লৌকিকস্বসংবেদন বিলক্ষণ এব।

তথাহি—লৌকিকেনানুমানেন সংস্কৃতঃ, প্রমদাদি না তাটস্থ্যেন প্রতিপদ্যতে। অপি তু হৃদয়সংবাদাত্মকসহৃদয়ত্ববলাৎ পূর্ণীভবদ্রসাস্বাদাংকুরীভাবেন অনুমানস্মৃত্যাদিসোপানমনারুহ্যৈব তাম্ময়ীভাবোচিত চর্বণা প্রবণতয়া। (ক্রমশঃ পৃ০ ৯৬ দ্রষ্টব্য)

৩। এইজন্য বিভাবাদি রসের নিষ্পত্তির কারণ (অর্থাৎ কারণ-হেতু) নয় যেহেতু (যদি বিভাবাদিকে রসের কারক হেতু মানিয়া লওয়া হয় তবে) তাহার কারণ বোধটি অপসৃত হইলেও রসের উৎপত্তি সম্ভবপর, একথা বলিতে হয়।

এবং (বিভাবাদি রসের), জ্ঞাপক হেতুও নয়; কারণ, তাহা হইলে উহাদের প্রমাণ বলিয়া ধরিতে হইবে যেহেতু (পূর্বসিদ্ধ ঘটাদির সমান) প্রমেয়ভূত পূর্ব হইতে বিদ্যমান কোন রসাদির সত্তা নাই।

তাহা হইলে এই সব বিভাবাদি কি?

চর্বণার ব্যাপারে উপযোগী এই সব বিভাবাদির ব্যবহার অলৌকিক। (লোক-ভাষায় উহাদের স্থিতি ঠিক ভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর নয়।)[১]

উল্লিখিত উদ্ধরণগুলির রচনাধারা এইরূপ যে অভিনব গুপ্তের ব্যাখ্যান স্পষ্ট ভাবে বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে তাঁহার মতের সারতত্ত্ব এইরূপ ঃ

(১) যাহা লোকে রত্যাদির কারণ, সূচক অথবা পোষক কাব্য-নাটকাদিতে তাহাই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী নামে অভিহিত হয়। কাব্যে নিবদ্ধ হইলে পরে কারণ-কার্যাদি সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া ইহাদের লৌকিক রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহারা এক ধরণের অলৌকিক রূপ গ্রহণ করে।

(২) সহৃদয়ের দ্বারা এই অলৌকিক বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী সমবেত রূপের প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা অন্তঃকরণে সাক্ষাৎকারকে অথবা চর্বণাকেই 'রস' বলা হয়।

(৩) এই রস চর্বণ অথবা আস্বাদ হইতে অভিন্ন—অর্থাৎ রস আস্বাদ রূপই হয়, আস্বাদ্য রূপ অথবা আস্বাদের বিষয় হয় না। এইরূপ স্থায়ী ভাব রস নয়।

(৪) অলৌকিক বিষয়ের আস্বাদ হওয়ার জন্য রস স্বয়ংও অলৌকিক অর্থাৎ স্মৃতি অনুমান, প্রত্যক্ষ অনুভব ইত্যাদি হইতে ভিন্ন। ইহা কার্য নয়, জ্ঞাপ্য নয়, সবিকল্পক জ্ঞান অথবা নির্বিকল্পক জ্ঞানও নয়।

(৫) এবং, যেরূপ রসের পরিভাষা প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হইয়াছে যে চর্বণার এই অবস্থায় প্রমাতার চিত্ত দেশকাল, স্ব, পর, তটস্থতা প্রভৃতির সীমা হইতে মুক্ত হইয়া তন্ময়, আত্মবিশ্রান্তিরূপ হইয়া পড়ে; অর্থাৎ রস অনিবার্য রূপে আত্মবিশ্রান্তিময়ী

ন চ সা চর্বণা প্রাঙ্‌ মানান্তরাৎ। যেনাধুনা স্মৃতিঃ স্যাৎ। ন চাত্র লৌকিকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ ব্যাপারঃ। কিন্তু লৌকিক বিভাবাদি সংযোগবলোপনতৈবেষং চর্বণা। সা চ প্রত্যক্ষানুমানাগমোপ-মানাদি লৌকিক প্রমাণজনিতরত্যাদ্যববোধতঃ, তথা যোগিপ্রত্যক্ষ জনিত-তটস্থ-পরসংবিত্তিজ্ঞানাৎ, সকলবৈষয়িকোপরাগশূন্য-শুদ্ধপরয়োগিগতস্বানন্দৈকঘনানুভবাচ্চ বিশিষ্যতে। এতেষাং যথাযোগ-মজ্জনাদিবিঘ্না[illegible]দয়াৎ তাটস্থ্য-অস্ফুটত্ব-বিষয়াবেশবৈবশ্যেন চ সৌন্দর্যবিরহাৎ।

(হিন্দী অভিনব ভারতী—আচার্য বিশ্বেশ্বর, পৃষ্ঠ ৪৮৫)

১. অতএব বিভাবাদয়ো ন নিষ্পত্তিহেতবো রসস্য, তদ্‌বোধাপগমেঽপি রসসম্ভবপ্রসঙ্গাৎ। নাপি জ্ঞপ্তিহেতবো যেন প্রমাণমধ্যে পতেয়ুঃ। সিদ্ধস্য কস্যচিৎ প্রমেয়ভূতস্য রসস্যাভাবাৎ। কিং তর্হি এতদ্বি বিভাবাদয় ইতি? অলৌকিক এবায়ং চর্বণোপয়োগী বিভাবাদিব্যবহারঃ। কাস্ত্রেত্থং দৃষ্টমিতি চেৎ, ভূষণমেতদস্মাকমলৌকিকত্বসিদ্ধৌ। পানকরসাস্বাদোঽপি কিং গুড়মরিচাদিষু দৃষ্ট ইতি সমানমেতৎ।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৮৬-৮৭)

আনন্দচেতনা রূপেই প্রকাশ পাইতেছে।

পরবর্তী আচার্যগণ প্রায় ক্ষেত্রেই রসের এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; চতুর্দশ শতকের সংগ্রাহক আচার্য বিশ্বনাথ এই রস-স্বরূপবিষয়ক ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণের সার নিজের ভাষায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎপ্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ —সাহিত্যদর্পণ ৩.২.৩

—সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে কোন-কোন প্রমাতা বা সহৃদয় সামাজিক কর্তৃক রস নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া আস্বাদিত হয়। এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দময় ও চিন্ময়, অন্য বেদ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কহীন এবং ব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ; লোকোত্তর চমৎকারই ইহার প্রাণস্বরূপ।

এই পরিভাষানুসারে—

(১) রস আস্বাদনের বিষয়—কিন্তু নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া আস্বাদিত হয় অর্থাৎ রস আস্বাদ হইতে অভিন্ন। রস আস্বাদ-রূপই।

(২) সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে পরে ইহার আবির্ভাব হয়।

(৩) ইহা অখণ্ড।

(৪) অপর জ্ঞান হইতে সম্পর্কহীন।

(৫) ইহা স্বপ্রকাশানন্দ।

(৬) চিন্ময়।

(৭) লোকোত্তরচমৎকারময়। এবং

(৮) ইহা ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর অর্থাৎ ব্রহ্মাস্বাদের অত্যধিক অনুরূপ।

উল্লিখিত উদ্ধরণের অধিকাংশ কথাগুলি শাস্ত্রীয় ও পারিভাষিক, অতএব আধুনিক ভাষায় ইহার পুনরাখ্যান আবশ্যক।

(১) নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্নভাবে রসের আস্বাদন করা হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে রস মূলতঃ আস্বাদরূপই, আস্বাদ্য পদার্থ নয়—কিন্তু তবুও ব্যবহারে 'রসের আস্বাদন করা হয়' এই প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। এই বিরোধাভাসকে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অদ্বৈত সিদ্ধান্তের শরণ হইতে হইবে। অদ্বৈত দর্শনের অনুসারে কেবল একটি আত্মতত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান—তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই আত্মা আনন্দরূপ। আনন্দ ইহার স্বভাব, ভোগ্য পদার্থ নহে। তবুও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মার দ্বারা আনন্দ ভোগের চর্চা শাস্ত্রে বরাবরই পাওয়া যায়। এইরূপ আত্মা, আনন্দ ও ভোগ—অর্থাৎ আস্বাদয়িতা, আস্বাদ্য এবং আস্বাদ তত্ত্বরূপে একই, কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন।

রস আস্বাদ-রূপ, আস্বাদ্য পদার্থ নয়—ইহার অর্থ এই যে ভরত ও ধ্বনি-পূর্ব কালের অলঙ্কারবাদীদের বস্তু-পরক ব্যাখ্যা অশুদ্ধ ছিল। রস শব্দার্থ-সৌন্দর্য অথবা

নাট্য-সৌন্দর্যের তুল্য নয়। বলিতে গেলে শব্দার্থ-সৌন্দর্য এবং নাট্য-সৌন্দর্যই 'কাব্য' ও 'নাট্য' যাহা রসের নিমিত্ত ঃ রস ইহাদের আস্বাদ—দার্শনিক ভাষায় ইহাদের নিমিত্তে প্রমাতা আত্মতত্ত্বের আস্বাদ করেন।

(২) সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলেপর রসের আবির্ভাব হয়। রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে অসংস্পৃষ্ট অন্তঃকরণকে সত্ত্ব বলা হয়। সামান্য ভাষায় সাংসারিক রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত চিত্তের বৈশদ্যই সত্ত্বগুণ। অতএব উল্লিখিত বাক্যের অর্থ এই যে (ক) রসের আস্বাদ রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত চিত্তের বৈশদ্য-ময় স্থিতিতে অথবা সমাহিত অবস্থায় সম্ভবপর এবং (খ) এই আস্বাদ ইন্দ্রিয় উত্তেজনা হইতে ভিন্ন সাত্ত্বিক অর্থাৎ অত্যন্ত পরিষ্কৃত আস্বাদযুক্ত। রসের সম্বন্ধে এই মতের প্রচার মূলতঃ ভট্টনায়ক করিয়াছেন। অভিনব গুপ্ত ইহাকে প্রায় যথাযথভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

(৩) রস অখণ্ড ঃ এই উক্তির বিবক্ষিত অর্থ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। (ক) প্রথমতঃ ইহার অর্থ এই যে রসানুভূতিতে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতি হয় না, বরং সকলের মিলিত অখণ্ড অনুভূতি হয়। (খ) দ্বিতীয় বিবক্ষিত অর্থ ইহাও যে রসানুভূতির সময় আত্মা পূর্ণরূপে তদ্‌গত অবস্থায় থাকে সেইজন্য ইহার কোন শ্রেণীভেদ সম্ভব নয়। যেখানে পূর্ণতা সেখানে তারতম্যের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু পূর্ণ হইতে পূর্ণতরের কথা কল্পনাই করা যাইতে পারে না এবং যাহা পূর্ণ হইতে কম সেখানে রসের অবস্থান সম্ভব নয়।

(৪) রসানুভূতির অন্য জ্ঞান অথবা অনুভবের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। যেরূপ পূর্বে বলা হইয়াছে যে রস পূর্ণ তন্ময়তার স্থিতি এবং তন্ময়ী অবস্থায় স্বভাবতঃ অন্য জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বর্তমান প্রসঙ্গে ইহার অর্থ এই যে রসাস্বাদ করিবার সময় প্রমাতা স্ব, পর, তটস্থতা প্রভৃতির চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া যায়—দেশ-কালের বন্ধন উহাকে বাঁধিতে পারে না এবং সেই রস-প্রসঙ্গের সহিত পূর্ণ একাত্মতার অনুভব করিয়া কিছু সময়ের জন্য সর্বথা আত্মলীন হইয়া পড়ে।

(৫), (৬) রস স্বপ্রকাশানন্দ ও চিন্ময় বিশ্বনাথের এই কথাগুলি মূলতঃ ভট্টনায়কেরই কথা। ইহার অর্থ এই যে রসানুভূতি আত্মচৈতন্য হইতে প্রকাশিত একটি আনন্দময়ী চেতনা অর্থাৎ ইহা এক ধরণের আনন্দময়ী চেতনা এবং এই আনন্দে মৃন্ময় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূতির প্রায় অভাব এবং চৈতন্য আত্মাস্বাদের সদ্‌ভাব থাকে। প্রকৃতপক্ষে এখানেও প্রকারান্তরে সেই কথাই বলা হইয়াছে যাহার উল্লেখ সত্ত্বোদ্রেক প্রসঙ্গে করা হইয়াছে—রসানুভব এক ধরণের সুস্থ-পরিষ্কৃত আনন্দ—তাহা ইন্দ্রিয় আনন্দ অথবা বিষয়-সুখের আনন্দ হইতে ভিন্ন।

(৭) লোকোত্তর চমৎকারিত্বই রসের প্রাণস্বরূপ—রস প্রত্যক্ষ অনুভব নয়, পরোক্ষ নয়; রস কার্য নয়, জ্ঞাপ্য নয়; ইহা সবিকল্পক জ্ঞান নয় যাহাতে জ্ঞাতার চেতনা বিদ্যমান থাকে এবং নির্বিকল্পক জ্ঞানও নয় যাহাতে জ্ঞাতার চেতনা বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্বপ্রকার লৌকিক পরিভাষা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য

ইহাকে অনির্বচনীয় ও অলৌকিক বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক শব্দটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক এবং এই শব্দটির জন্য আধুনিক বিচারকেরা রস-সিদ্ধান্তের উপর নানা অভিযোগ করিয়াছেন। কাব্য এই জগতের বস্তু অতএব কেমন করিয়া উহার আস্বাদ অলৌকিক হইতে পারে? ইহার উত্তরে রসের সমর্থকেরা বলিয়াছেন যে অলৌকিকের অর্থ অতিপ্রাকৃত নয় বরং অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাকে অনুভব করা যায় না।[১]

(৮) রস ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর অর্থাৎ ব্রহ্মাস্বাদের অনুরূপ। রস বিষয়ানন্দ হইতে ভিন্ন। উহার অনুভূতি চৈতন্য স্বরূপ: উহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয় বরং চৈতন্য আত্মার বিষয়। কিন্তু তবুও ইহা বিশুদ্ধ আত্মানন্দ অথবা ব্রহ্মানন্দের তুল্য নয় কারণ (ক) ব্রহ্মানন্দ স্থায়ী ও রস অস্থায়ী; (খ) রসে লৌকিক বিষয়ের সর্বথা তিরোভাব হয় না।

পণ্ডিতরাজের মতানুসারে ত্রিবিধ আনন্দের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করা যাইতে পারে:

(১) লৌকিক সুখ (বিষয়ানন্দ) = আনন্দাভাস = চৈতন্যাভাসের দ্বারা আভাসিত অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলির বিষয়-সামঞ্জস্য হইতে প্রাপ্ত সুখ অতএব অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ।

(২) ব্রহ্মানন্দ = আত্মানন্দ (বিশুদ্ধ) = নিরূপাধিক চৈতন্যের স্বরূপানন্দ।

(৩) কাব্যানন্দ (রস) = আত্মানন্দ = সোপাধিক (= সোপাধিক চৈতন্যের আনন্দ, বিশুদ্ধ রত্যাদিকী উপাধি হইতে উপহিত চৈতন্যকারাকারিত চিত্তবৃত্তির আনন্দ)।[২]

এইরূপ কাব্যানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে প্রভেদ আছে কিন্তু এই প্রভেদ প্রকৃতির নয়, গুণের। কাব্যানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ আত্মানন্দেরই দুই ভেদ—কাব্যানন্দে বিশুদ্ধ (সাধারণীকৃত) রত্যাদি ভিত্তিরূপে বিদ্যমান থাকে অতএব উহা অস্থায়ী ও সোপাধিক থাকিয়া যায়। ব্রহ্মানন্দে এইরূপ কোন বস্তু ভিত্তিরূপে বিদ্যমান থাকে না অতএব উহা স্থায়ী ও নিরূপাধিক বলিয়া পরিগণিত হয়। বিষয়ানন্দে যে আনন্দতত্ত্ব বিদ্যমান থাকে তাহা আত্মপরামর্শ বা আত্মাস্বাদেরই সূচক কিন্তু ইহা বিষয়ের দ্বারা আক্রান্ত থাকে অর্থাৎ প্রকৃতির দোষগুলি ইহাতে দেখা যায়। ভোগ্য জড় পদার্থের স্থূলতা এবং উহার দ্বারা প্রেরিত ভোক্তার চিত্তের রাগদ্বেষ ইহাতে সংযুক্ত থাকে সেইজন্য এই আনন্দকে মিশ্রিত বলিয়া ধরা হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং মৃন্ময় অংশের দ্বারা আবিষ্ট থাকে। কাব্যাস্বাদে রসের স্থিতি মধ্যবর্তী, উহা বিষয়ানন্দের অপেক্ষা অধিক শুদ্ধ এবং চিন্ময় ও অধিক সূক্ষ্ম-পরিষ্কৃত যদিও ইহা ব্রহ্মানন্দের অপেক্ষা অধিক স্থূল।

উল্লিখিত বিবেচনার সারাংশ এই যে:

কাব্যের আস্বাদ রস। এই আস্বাদন আনন্দময় অর্থাৎ রস এক প্রকারের আনন্দ-চেতনা।

---

১ দ্রষ্টব্য—পণ্ডিত কেশব প্রসাদ মিশ্রের বিচার—সাহিত্যালোচন (১৯৯৯ বিক্রমী), পৃ° ২৮০

২ রসগঙ্গাধরের শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন: ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্ত, পৃ° ২০৪

আনন্দ-চেতনার অর্থ আত্ম-সাক্ষাৎকার। অভিনব গুপ্তের ভাষায় ইহা আত্ম-পরামর্শ এবং ভট্টনায়কের ভাষায় ইহা সংবিদ্বিশ্রান্তি।

এই আনন্দ-চেতনায় মৃন্ময় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভোগাদির প্রায় অভাব এবং চৈতন্য আত্মানন্দের সদ্‌ভাব থাকে। লৌকিক ভাব-সমুদায় কাব্যে নিবদ্ধ হইয়া স্থূল, ইন্দ্রিয় রূপকে পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে। শাস্ত্রানুসারে বলিতে গেলে এই ভাব সকল দেশ কালের সীমা হইতে মুক্ত হইয়া সাধারণীকৃত হইয়া যায়। ফলে ভাবগুলি প্রমাতার প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হইতে পারে না। সাধারণীকৃত হওয়ার জন্য ইহারা নিজেদের সংসর্গের দ্বারা প্রমাতাকেও স্ব, পর, তটস্থ ইত্যাদির চিন্তা হইতে অথবা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। অতএব কাব্য অর্থাৎ কবি-নিবদ্ধ ভাবের মাধ্যমে প্রমাতা যে আত্মপরামর্শ অথবা সংবিদ্বিশ্রান্তি লাভ করে তাহাতে ইন্দ্রিয় ভোগাদির প্রায় অভাব থাকে।

কিন্তু তবুও এই আনন্দ শুদ্ধ আত্মানন্দ নয়, কারণ প্রথমতঃ ইহা স্থায়ী নয় এবং দ্বিতীয়ঃ এই আনন্দ লৌকিক বিষয়ের চিন্তা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়।

এইরূপ সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের প্রতিনিধি আচার্যদের মতানুসারেঃ শব্দার্থের মাধ্যমে, বিশুদ্ধ ভাব-ভূমিকার ভিত্তিতে আত্মচৈতন্যের (আনন্দময়) আস্বাদনের নাম রস।

আজ প্রায় এই সমস্ত বিচার খুবই বিবাদাস্পদ। রসের উল্লিখিত স্বরূপ সম্বন্ধে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন উপস্থিত হয়ঃ

(১) ভাবানুভূতি ও রসানুভূতির মধ্যে সম্বন্ধ কি?

(২) রসানুভূতি কি অনিবার্যরূপ একটি আনন্দময়ী চেতনা?

(৩) যদি হয়, তাহা হইলে সেই আনন্দের স্বরূপ কি?

এই প্রশ্নের সমাধান না হইলে পরে বর্ত্তমান কালের কাব্য-জিজ্ঞাসুর মন সন্তুষ্ট হইতে পারে না, অতএব আধুনিক আলোচনাশাস্ত্রের আলোকে ইহাদের বিবেচনা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে।

ভাবানুভূতি ও রসানুভূতির মধ্যে সম্বন্ধ কি?

রস নিশ্চিতরূপে ভাবের উপর আশ্রিত অর্থাৎ ভাবের ভিত্তি ভিন্ন রসের উপস্থিতি সম্ভব নয়। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে একমত। ভাবের স্পর্শ হইতে মুক্ত শব্দার্থের চমৎকার রস নয়। স্বয়ং অলঙ্কারবাদীরাও এই সম্বন্ধে কোন রকম দ্বিমত করেন না। তাঁহারা যদিও রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না বরং শব্দার্থের চমৎকারিত্বের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন তবুও বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর সংযোগে রসের নিষ্পত্তির কথাটিকে স্বীকার করেন অর্থাৎ তাঁহাদের মতেও রস ভাবের উপর আশ্রিত। অতএব রস ও ভাব অনিবার্য ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নাট্যশাস্ত্রের নিম্ন বাক্যটি ইহার প্রমাণরূপে সর্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ। ৬. ৩৭

কিন্তু রসানুভূতি ভাবানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—কোন প্রকারেই এই দুইটি অনুভূতি এক হইতে পারে না। রসের আশ্রয়ভূত স্থায়ীভাব আস্বাদের দৃষ্টিতে সামান্যতঃ দুই প্রকার : রতি, উৎসাহ, বিস্ময়, হাস্য এবং শমের আস্বাদ সুখদায়ক এবং শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সার আস্বাদ ইহ-লোকে দুঃখদায়ক বলিয়া ধরা হয়। যদি আমরা ইহা স্বীকার করিয়া লই যে রস অনিবার্যরূপে আনন্দরূপ, তাহা হইলে ইহা সহজেই প্রমাণিত হইয়া যায় যে রসানুভূতি ভাবানুভূতি হইতে ভিন্ন, কারণ করুণ রসের অনুভূতি অনন্তপক্ষে আনন্দময়ী এবং শোকের নিশ্চিতরূপে দুঃখময়ী ও বীভৎস রস নিশ্চতরূপে সুখদায়ক ও জুগুপ্সা দুঃখদায়ক। এখানে শৃঙ্গার, বীর, হাস্য প্রভৃতির বিষয়ে সন্দেহ উঠিতে পারে, কারণ তাহাদের স্থায়ী ভাবের অনুভূতিও সুখদায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ, লৌকিক প্রেম-প্রসঙ্গ ও কাব্যগত প্রেম-প্রসঙ্গের তুল্যরূপতার সম্বন্ধে অথবা উহাদের অপেক্ষা আরও বেশী লৌকিক হাস্য-প্রসঙ্গ ও কাব্যগত হাস্য-প্রসঙ্গের সমরূপতার ব্যাপারে মনে নিশ্চিত সন্দেহ হইতে পারে। লৌকিক জীবনের প্রেম-পরিহাস অথবা সাকেতে[১] চিত্রিত লক্ষ্মণ-উর্মিলার প্রেম-পরিহাসের মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে? সামান্য ভাবে দেখিলে এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ মনে হয় না। কিন্তু প্রভেদ একটি আছেই। প্রকৃতপক্ষে লৌকিক জীবনে কাব্যের অনুপ্রবেশ ঘটিবার জন্য তাহা জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে এবং সামান্য অনুভবের অঙ্গই হইয়া পড়িয়াছে। প্রেম-প্রসঙ্গে অথবা হাস্য-প্রসঙ্গে আমরা সহজ-ভাবে প্রায় যে বাগ্‌বিদগ্ধতার ব্যবহার করি তাহা প্রকৃতপক্ষে কাব্যেরই অঙ্গ হইয়া থাকে। 'ভাব ও কল্পনা, শব্দ ও অর্থের রমনীয় সহভাবকেই ত' কাব্য বলা হয়—উহার পক্ষে লিপিবদ্ধ হওয়া অনিবার্য কথা নয়। এইজন্য প্রীতির বিবিধ প্রসঙ্গের রমনীয় উক্তিগুলি শৃঙ্গার রসের অত্যন্ত নিকট আসিয়া পড়ে যেহেতু রমনীয় উক্তিকেই ত' কাব্য বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু এখানেও শুদ্ধ শৃঙ্গার রস হয় না, কারণ এই ধরণের প্রসঙ্গও ব্যক্তিগত বিচ্যুতির দ্বারা পরিবদ্ধ থাকে। ইহার স্থায়ী, সঞ্চারী, আলম্বন ও উদ্দীপন সমস্তই বিশিষ্ট এবং অসাধারণীকৃত হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত রাগদ্বেষে লিপ্ত থাকিবার জন্য প্রমাতার চিত্ত এখানেও বীতবিঘ্ন হয় না। অতএব ইহা রস হইতে পারে না। এই আনন্দ কল্পনা রমনীয় বিচারের সহিত সংযুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রেমানন্দের অপেক্ষা শৃঙ্গার রসের অধিক সন্নিকট কিন্তু ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের সংসর্গের জন্য এই আনন্দকে শৃঙ্গার রস বলা যায় না। বাস্তবিক প্রেম-প্রসঙ্গে কখনও-কখনও পরিহাসে বলা কথাগুলি মনে আঘাত দেয় এবং ফলে মন ক্ষুণ্ণ হয়। ইহা রস-পরিপাকে বিঘ্ন উৎপন্ন করে; কিন্তু 'সাকেতে' বর্ণিত লক্ষ্মণ-উর্মিলার পরিহাসের সম্বন্ধে এইরূপ কোন আশঙ্কা নাই—কটুতা আসিলে পরেও সাধারণীকৃতির জন্য প্রমাতার চিত্ত মলিন হয় না।

১. হিন্দী কবি মৈথিলী শরণ গুপ্ত রচিত মহাকাব্য।

ভাবের প্রত্যক্ষ অনুভব ও রসের মধ্যে ইহাই প্রভেদ—এইজন্য অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি আচার্যগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে রস প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য নয়।

তবে কি রস ভাবের পরোক্ষ অনুভব?—শাস্ত্রানুসারে ইহা কোন মতেই সম্ভব নয়। পরোক্ষ অনুভবের কী অর্থ, ইহা বিচার করা প্রয়োজন। আমার ধারণা এই যে ভাবের পরোক্ষ অনুভবের একটি স্পষ্টরূপ হইতেছে ভাবের স্মৃতি। যেমন প্রেমের তাৎকালিক ভোগ প্রত্যক্ষ অনুভব এবং সেই ভোগের স্মৃতি পরোক্ষ অনুভব। এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে ভাবের স্মৃতি ও রসের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করার কি কোন প্রয়োজন আছে? প্রমাণ আছে—ভাবস্মরণং রসঃ। প্রমাতার প্রত্যক্ষ প্রেমানুভব শৃঙ্গার রস নয়, কিন্তু প্রেমানুভবের স্মরণ অথবা কাব্যনিবদ্ধ প্রেম-প্রসঙ্গের ভাবন অথবা প্রেক্ষণ হইতে পূর্বানুভূত প্রেম-সংস্কারের উদ্‌বুদ্ধি ও শৃঙ্গার রসের মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে? প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের দুইটি স্পষ্ট উত্তর আছে। প্রথমতঃ প্রেমানুভবের স্মরণ ব্যক্তির নিজস্ব সীমার মধ্যে পরিবদ্ধ থাকার জন্য পরিস্থিতি অনুসারে সুখজনক অথবা দুঃখজনক উভয় প্রকারই হইতে পারে—স্মরণ করিবার সময় চিত্তের বীতবিঘ্নতা হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য মিলনের স্মৃতি সুখদায়ক এবং বিয়োগের দুঃখদায়ক হয়; পরোক্ষ অনুভব হওয়ার জন্য এই পরিস্থিতিতে অনুভূতির তীব্রতা অবশ্যই কমিয়া যায় কিন্তু তাহার অনুভূত্যাত্মক রূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অপরদিকে রসের আস্বাদে সংযোগ ও বিয়োগের নিশ্চয়ই এইরূপ (মধুর ও কটু) কোন প্রভেদ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কাব্য-নিবদ্ধ প্রেম-প্রসঙ্গের ভাবন করিলে পূর্বানুভূত প্রেমের উদ্‌বুদ্ধ সংস্কার ততক্ষণ পর্যন্ত রস-রূপ ধারণ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির নিজস্ব সীমা বিদ্যমান থাকে। যখন কাব্যের প্রভাব স্বরূপ (সৌন্দর্যবলাৎ) ব্যক্তিগত সীমাগুলি নষ্ট হইয়া যায় তখনই প্রেমের সেই সংস্কার রসে পরিণত হয়। অতএব ভাবের স্মৃতি রস নয়ঃ পরোক্ষ অনুভব হওয়ার জন্য স্মৃতির মধ্যে ইন্দ্রিয় তত্ত্বের অভাব ঘটে এবং অপরদিকে উহাতে কল্পনা-তত্ত্বের প্রসার লাভ হয়, সেইজন্য উহা প্রত্যক্ষ ভাবানুভূতির অপেক্ষা রসানুভূতির নিকট বলা যাইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ উহা ভিন্ন।

এইরূপে ইহা প্রমাণিত হইল যে রস স্বগত ভাবানুভূতি নয়—প্রত্যক্ষও নয় এবং পরোক্ষও নয়। তবে কি উহাকে পরগত অনুভূতিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? শকুন্তলা নাটকের শৃঙ্গার রস আমাদের নিজস্ব প্রেমানুভূতি নয়, তাহা নায়ক-নায়িকার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া মাত্র (?)। আমাদের প্রেমানুভূতি ভাব ছাড়া আর কিছু নয়—কাব্যজনিত তাদাত্ম্যের ফলে অপরের প্রেমানুভূতির আস্বাদন রস হইতে পারে (?) কারণ সেখানে ব্যক্তির নিজত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু ভট্টনায়ক প্রভৃতি আচার্যরা এক সহস্র বর্ষ পূর্বেই এই সম্বন্ধে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অপরের প্রেমানুভূতির প্রতি প্রতিক্রিয়াতেও আমাদের ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ অত্যন্ত প্রখররূপে বিদ্যমান থাকে এবং ইহা রসানুভূতিতে ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং ইহা ব্যতীত পরগত রস আমাদের মনে রসের স্থানে সঙ্কোচ, বিতৃষ্ণা, ক্রোধ ইত্যাদিও আনিতে

পারে। স্বগত অনুভবের অনুরূপ পরগত অনুভবও ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং ফলে রাগদ্বেষ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না। অতএব রস পরগত ভাবানুভূতিও নয়।

তাহা হইলে আমাদের সার-কথা এই যে রস ভাবের উপর আশ্রিত থাকিলেও ইহা ভাবানুভূতি হইতে ভিন্ন — প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, স্বগত, পরগত, সুখদায়ক, দুঃখদায়ক— যে কোন প্রকারের ভাবানুভূতি হউক না কেন তাহা রসানুভূতি হইতে পারে না। উক্ত ভাবানুভূতির প্রত্যেকটি রূপের সহিত অনিবার্যভাবে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের সংসর্গ থাকে; এই সংসর্গ যখন পর্যন্ত থাকিবে তখন পর্যন্ত চিত্তের মুক্তাবস্থা সম্ভব নয় এবং চিত্তমুক্ত হইতে না পারিলে আনন্দের অনুভূতি সম্ভবপর নয়। এই সার-কথা সম্বন্ধে এই যুগের জিজ্ঞাসু আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন: রস ভাবের উপর আশ্রিত এবং তবুও ভাবানুভূতি হইতে ভিন্ন, এই রকম পরস্পর বিরোধী উক্তির তাৎপর্য কি? কিন্তু শাস্ত্রের নিকট ইহার উত্তর আছে এবং তাহা এই যে রস ব্যক্তিবদ্ধ ভাবের আস্বাদ নয়, সাধারণীকৃত ভাবের আস্বাদ। সাধারণীকৃত ভাব নির্বিষয় হওয়ার জন্য রাগদ্বেষের দংশন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, সেইজন্য তাহা আনন্দময়—ইহা এক প্রকার ভাবের মাধ্যমে আত্মার অর্থাৎ শুদ্ধ-বুদ্ধ চেতনার আস্বাদ যাহা সর্বথা আনন্দময়ই হয়। শুদ্ধ-বুদ্ধ চেতনার আস্বাদ মননের দ্বারাও সম্ভবপর, কিন্তু তাহা রস হইতে পারে না—রসের জন্য ভাবের মাধ্যম অনিবার্য।

রস কি অনিবার্যরূপে একটি আনন্দময়ী চেতনা?

কাব্যশাস্ত্রের ইহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিবাদাস্পদ প্রশ্ন। রস (কাব্যাস্বাদ) আনন্দময়—ইহার সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই, কিন্তু অনিবার্যরূপে ইহা আনন্দময় এই বিষয়ে মতভেদ আছে। অর্থাৎ শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, অদ্ভুৎ ও শান্ত রসের আস্বাদ স্পষ্টতই আনন্দময় কিন্তু করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতিরও আস্বাদ আনন্দময়—ইহা বিবাদের বিষয়। যদিও স্বদেশ ও বিদেশের অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতানুসারে রস অনিবার্যরূপ একটি আনন্দময়ী চেতনা কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে অনেকেই নিজেদের মত দিয়াছেন ও সাম্প্রতিক কালে এই বিরোধের আরও প্রসার ঘটিয়াছে।

ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ভরতের মতের পর্যালোচনা আবশ্যক:

> যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি
> সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তথা
> নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়ি-
> ভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি
> তস্মান্নাট্যরসা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ।

—যেমন বিবিধব্যঞ্জনোপসংস্কৃতান্ন ভোজনকারী জনগণ রসাস্বাদন করিয়া হর্ষাদি অনুভব করেন, তেমনই বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত রসপদবীপ্রাপ্ত স্থায়িভাবের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সহৃদয় দর্শক আনন্দাদি লাভ করেন। এইজন্যই ইহাকে নাট্যরস বলা হয়। (না০ শা০ অ০ ৬, পৃ০ ৯৩)।

এখানে হর্ষাদির 'ইত্যাদি' পদের অনুসারে বিরোধী বিদ্বানেরা ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করেন যে রসের আস্বাদ কেবল আনন্দরূপ নয়, স্থায়ীভাবের আস্বাদের অনুসারে ইহা অন্যরূপ—বিপরীতও হইতে পারে। কিন্তু এই ধারণা বোধহয় তাঁহাদের নিজস্ব চিন্তার পরিণাম, ভরতের এই অভিপ্রায় ছিল না। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বিভিন্ন অঙ্গের তুলনার দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়া যায়। যেইরূপ স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ ব্যঞ্জনের দ্বারা সংস্কৃতান্নের আস্বাদন করেন, সেইরূপ প্রসন্নচিত্ত প্রেক্ষক অভিনয়-সম্পৃক্ত স্থায়ী ভাবের আস্বাদন করেন এবং যেইরূপ অন্নের ভোক্তা পুরুষ হর্ষাদির অনুভব করেন, সেইরূপ রসের ভোক্তা প্রেক্ষকও করেন অর্থাৎ আস্বাদের অনুভাবিতরূপ উভয় পক্ষে একই রকম হয়। ইহা প্রমাণিত হইলে পরে হর্ষাদির অর্থ স্পষ্ট হইয়া যায়। যেইরূপ ব্যঞ্জনোপসংস্কৃতান্নের আস্বাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া হর্ষাদিরূপে—অর্থাৎ হর্ষ বা হর্ষের অনুরূপ অন্য প্রীতিকর বিকার—তৃপ্তি ইত্যাদিরূপে হয়, হর্ষের বিপরীত দুঃখ, ক্ষোভ প্রভৃতি অপ্রীতিকর বিকাররূপে হয় না এবং হইতেও পারে না; সেইরূপ রসাস্বাদের অনুভাবিত রূপ আনন্দময়ই হয়—দুঃখ ক্ষোভাদি রূপ হয় না এবং হইতে পারেও না। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত প্রসঙ্গে ইহা স্বীকার করা হইতেছে না যে স্বাদিষ্ট ভোজন কোন রূপে অপ্রীতিকরও হইতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত রসাস্বাদকে অপ্রীতিকর ধরিয়া লওয়ার কোন কারণ নাই। 'আদি' পদ ভোজন ও রস উভয় প্রসঙ্গে হর্ষ ভিন্ন শান্তি, বিস্ময় প্রভৃতিরই বাচক, ক্ষোভাদির নয়। অতএব ভরতের এই উদ্ধরণের দ্বারা আস্বাদরূপ রসের সুখদুঃখাত্মকতার সিদ্ধি এবং আনন্দরূপের নিষেধ হয় না। তাঁহার সম্পূর্ণ রস-বিবেচনা, বিশেষ করিয়া আস্বাদ-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যান রসের আনন্দময়তার সহায়ক, উহার পরপন্থী নয়।

ভরতের টীকাকার অভিনব গুপ্ত এই মতের পুষ্টি করিয়াছেন :

অপরে (ব্যাখ্যাতা) (হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তির মধ্য প্রযুক্ত) 'আদি' শব্দ হইতে শোকাদির অর্থ গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কারণ সামাজিকের পক্ষে নাটকের আনন্দদায়ক হওয়া আবশ্যক। উহার ফল শোকাদি হওয়া উচিত নয়। সেই (নাটকের দুঃখজনকত্বের) প্রমাণ অভাবে এবং (যদি নাটকের দ্বারা দুঃখের প্রসার হয়, ইহা মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে) সেইরূপ (অনুভব) প্রাপ্ত হইবে (যাহা অভীষ্ট নয়)।

—(হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃ০ ৫০০)

অভিনব গুপ্তের সম্বন্ধে আচার্য বিশ্বেশ্বর একটি নবীন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন—তাঁহার ধারণা এই যে অভিনব গুপ্ত রসকে উভয়াত্মক (সুখদুঃখাত্মক) বলিয়া স্বীকার

করেন, অর্থাৎ তাঁহার মতানুসারে প্রত্যেক রসে সুখ ও দুঃখের প্রায় অনিবার্যরূপে সংমিশ্রণ থাকে। অভিনব ভারতীর প্রথম অধ্যায়ের নিম্নোক্ত বিবেচনা এই ধারণার মূল ভিত্তি :

ভরত :

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ।
সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ১১৯ ॥
অয়মিতি প্রত্যক্ষকল্পানুব্যবসায়বিষয়ো লোকপ্রসিদ্ধ সত্যা-
সত্যাদিবিলক্ষণত্বাৎ যচ্ছব্দবাচ্যো, লোকস্য সর্বস্য
সাধারণতয়া স্বত্বেন ভাব্যমানশ্চর্ব্যমাণোঽর্থো নাট্যম্।
স চ সুখদুঃখরূপেণ বিচিত্রেণ সমনুগতো ন তু তদেকাত্মা
তথাহি—রতি-হাস-উৎসাহ-বিস্ময়ানাং সুখস্বভাবত্বম্।
× × ×
ক্রোধময়-শোক-জুগুপ্সানাং তু দুঃখস্বরূপতা।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ২১৯-২০)

—ভরত—সুখদুঃখের দ্বারা যুক্ত সংসারের যে স্বভাব তাহা আঙ্গিকাদি (চতুর্বিধ) অভিনয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে পরে নাট্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। ১১৯।

অয়ম্ এর অর্থ হইতেছে প্রত্যক্ষ-সদৃশ অনুব্যবসায়ের বিষয়—যৎ শব্দের অভিপ্রায় হইতেছে লোকপ্রসিদ্ধ সত্যত্ব ও অসত্যত্ব হইতে বিলক্ষণ। অর্থাৎ, লোক-প্রসিদ্ধ সত্যত্ব ও অসত্যত্ব হইতে বিলক্ষণ, প্রত্যক্ষ-সদৃশ অনুভবের বিষয় সাধারণীকরণ ব্যাপারের জন্য, সম্পূর্ণ সংসারের দ্বারা স্বীয় অনুভবরূপে ভাব্যমান ও চর্ব্যমান অর্থ নাট্য বলিয়া কথিত হয়। এবং, তাহা সুখ ও দুঃখ উভয়ের দ্বারা সংযুক্ত বিচিত্র (নানা প্রকারের) হয়, কেবল সুখরূপ অথবা দুঃখরূপ হয় না।

যেমন রতি, হাস, উৎসাহ ও বিস্ময় সুখপ্রধান হয়।
ক্রোধ, ভয়, শোক, জুগুপ্সা দুঃখরূপ (দুঃখপ্রধান) হয় ॥

এই উদ্ধরণে স্পষ্টতঃ অর্থ—(নাট্য) ও স্থায়ী ভাবের সুখদুঃখরূপতার বর্ণনা করা হইয়াছে। ভরত 'অর্থ' অথবা উহার সমার্থ 'নাট্য'কে সুখদুঃখসমন্বিত স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহার ব্যাখ্যা করিয়া অভিনব গুপ্ত রতি-হাস-উৎসাহ-বিস্ময়কে সুখ-প্রধান ও ক্রোধ-ভয়-শোক-জুগুপ্সাকে দুঃখপ্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অভিনব অত্যন্ত মার্জিত ভাবে ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তিনি নয়টি স্থায়ী ভাবের প্রকৃতিবিশ্লেষণ করিয়া ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে আটটি রূপ উভয়াত্মক এবং একটির অর্থাৎ নির্বেদের রূপ শুদ্ধ সুখাত্মক। উভয়াত্মকের অর্থ হইতেছে যে রতি, হাস, উৎসাহ এবং বিস্ময় প্রধানতঃ সুখময় হইয়াও দুঃখ হইতে সর্বথা মুক্ত নয়; এইরূপ ক্রোধ, ভয়, শোক ও জুগুপ্সা দুঃখপ্রধান হইলে পরেও উহাতে সুখের লেশ থাকে। এমন কি শোকও যাহা সমগ্ররূপে দুঃখরূপ তাহাতেও পূর্বকালীন

সুখের স্মৃতি অনুবিদ্ধ থাকে। ইহার বিস্তারিত চর্চা পুনরায় উপযুক্ত প্রসঙ্গে করিব। —এখানে কেবল ইহাই বলিতে চাই যে এই প্রসঙ্গে জানি না কেন আচার্য বিশ্বেশ্বর রতি, ক্রোধ প্রভৃতিকে স্থায়ী ভাবরূপে গ্রহণ না করিয়া (রতিস্থায়িক) শৃঙ্গার রস, (ক্রোধস্থায়িক) রৌদ্র রস প্রভৃতির অর্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত বিবেচনার পূর্বে কিংবা অগ্রে এমন কোন কথা বলা হয় নাই যাহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত করা যাইতে পারে। যদি ইহার উত্তর দিতে গিয়া বলা হয় যে ভরত 'স্থায্যেব রসঃ' এর অনুসারে স্থায়ী ও রসের মধ্যে কোন ভেদ করেন নাই, ইহাও ঠিক কথা নয় কারণ অভিনব গুপ্তও নিশ্চিতরূপে 'স্থায়িবিলক্ষণো রসঃ'কেই স্বীকার করেন। অতএব আমাদের মত এই যে অভিনব গুপ্ত স্থায়ী ভাবের সুখ দুঃখরূপতাকেই গ্রহণ করিয়াছেন যাহা স্বতঃ স্পষ্ট। তিনি রসের সুখদুঃখাত্মকতাকে অস্বীকার করিয়াছেন—

বিলক্ষণাকার সুখদুঃখাদিবিচিত্র বাসনানুবেধোপনতহৃদ্যতাতিশয়সংবিচ্চর্বণাত্মনা ভুজ্যতে।

—বিলক্ষণ প্রকারের সুখদুঃখরূপী নানারকমের বাসনার সম্পর্ক হইতে প্রাপ্ত অত্যন্ত আহ্লাদাত্মক চর্বণারূপে সহৃদয় পুরুষ (স্থায়িভাবের) ভোগ করেন।[১]

সাংখ্যবাদী আচার্যদের মত খণ্ডন করিয়া অভিনব গুপ্ত এই তথ্যটিকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন:

যিনি উল্লিখিত সাংখ্য সিদ্ধান্তের অনুসারে রসের সুখ-দুঃখ মোহাত্মকত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন তিনি "স্থায়িভাবকে রসত্ব প্রাপ্ত করাইব (স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনৈষ্যামঃ) ইত্যাদি (ভরত মুনির বাক্যে) উপচারকে (লক্ষণাকে) অঙ্গীকার করিয়া (রস) গ্রন্থের সহিত (নিজের মতের) বিরোধের ব্যাপারটিকে স্বয়ং বুঝিয়া (আমাদের মতন) প্রামাণিক পুরুষদিগকে (সেই ভরত-মুনি বিরোধী সিদ্ধান্তের, মূর্খেরাও বুঝিতে পারে, এমন অপ্রীতিকর) দোষের প্রদর্শনের মূর্খতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে কি বলা (কিরূপে ধন্যবাদ দেওয়া) যায়। ইহা ব্যতীত (রস-প্রতীতিকে সুখ-দুঃখ মোহাত্মক মানিয়া লইলে একই জ্ঞানে তিনটি বিরুদ্ধ প্রকারের প্রতীতির সংমিশ্রণ হইয়া যায়, ফলে) প্রতীত-বৈষম্যাদি দোষ আসিয়া পড়ে অতএব এই সম্বন্ধে আর কত বলিব।"[২]

অতএব এই ধারণা অভিনব গুপ্তের মূল সিদ্ধান্তের প্রতিকূলই।

"অস্মন্মতে তু সংবেদনমেবানন্দঘনমাস্বাদ্যতে।
তত্র কা দুঃখাশংকা।

—আমাদের মতে আনন্দময় জ্ঞানস্বরূপের (আত্মার)ই আস্বাদন (রস রূপে) হয়। ইহাতে দুঃখের আশঙ্কা কেমন করিয়া থাকিতে পারে?"[৩]

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ॰ ৫০৩
২. ঐ, পৃ॰ ৪৬১
৩. ঐ, পৃ॰ ৫০৭

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের আচার্যদের বহুমত নিশ্চয়ই এই মতেরই স্বপক্ষে ছিল। অভিনব গুপ্তের পূর্বে ভট্টনায়ক উৎপত্তি ও প্রতীতি প্রভৃতি সিদ্ধান্তের খণ্ডনের জন্য যে-সব বিচার প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেইগুলির মধ্যে একটি প্রবল যুক্তি ইহাও ছিল যে যদি রসের উৎপত্তিকে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে শোকের দ্বারা শোকই উৎপন্ন হইবে—শোকাদির অভিনয় দেখিয়া অভিনয় কালে সামাজিক দুঃখ পাইবে—অর্থাৎ করুণ রসের আস্বাদ দুঃখাত্মক স্বীকার করিতে হইবে ঃ

"রসো ন প্রতীয়তে নোৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে। স্বগতত্বেন হি প্রতীতৌ করুণে দুঃখিত্বং স্যাত্। ন চ সা প্রতীতির্যুক্তা। সীতাদেরবিভাবত্বাৎ। স্বকান্তাস্মৃত্য সংবেদনাৎ।

(হি০ অ০ ভা০, পৃ০ ৪৬২)

—রসের না প্রতীতি হয়, না উৎপত্তি হয়, না অভিব্যক্তি। স্বগত অর্থাৎ সামাজিকে রসের প্রতীতি মানিয়া লইলে করুণার দ্বারা দুঃখের প্রতীতি হওয়া উচিত। কিন্তু এই প্রতীতি ঠিক নয়।

১. বাস্তবিক সীতা প্রভৃতির বিভাব (রূপে উপস্থিত) না হওয়ার জন্য।

২. নিজের স্ত্রী প্রভৃতির স্মৃতি (অভিনয় কালে) না থাকাই (দুঃখের মূল কারণ)।

এইরূপ ভট্টনায়ক করুণ রসের দুঃখাত্মক স্বরূপ খণ্ডন করিয়া রসের আনন্দরূপতাকে যুক্তি-যুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মম্মট রসকে সকল প্রয়োজন মৌলিভূত এবং রসাস্বাদকে আনন্দরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং
বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্।

(কাব্যপ্রকাশ ১.২ বৃত্তি)

অপর দিকে দশরূপকের টীকাকার ধনিক কয়েকটি বিচিত্র দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমস্তরসের সুখরূপতাকে প্রমাণিত করিয়াছেন। রসবাদী বিশ্বনাথের মত তো আরও স্পষ্ট ঃ

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥
কিং চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা।

—সা০ দ০ ৩.৪—৫

—করুণ প্রভৃতি রসেও যে অপূর্ব আনন্দ নিহিত থাকে, তাহার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান্ লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি। যদি করুণ রস দুঃখেরই কারণ হইত তবে কেহ উহার প্রেক্ষণ-অধ্যয়ন প্রভৃতির প্রতি প্রবৃত্ত হইত না; এরূপ হইলে রামায়ণ

(অমর কাব্য) দুঃখের কারণ হইয়া পড়িবে।

এবং, শেষে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন :

(ক) স্বপ্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজস্বরূপানন্দেন সহ গোচরীক্রিয়মাণঃ × × × রত্যাদিরেব রসঃ।[১]

—সত্য ও বিজ্ঞান স্বরূপ হওয়ার জন্য রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবই স্বতঃ প্রকাশমান্ আত্মানন্দের—সহিত অনুভূত হইয়া রসে পরিণত হইয়া যায়।

(খ) 'রসো' 'বৈ সঃ', 'রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽঽনন্দীভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিঃ সকলসহৃদয় প্রত্যক্ষং চেতি প্রমাণদ্বয়ম্।[২]

—রসের আনন্দরূপতার দুইটি প্রমাণ আছে—এক, বেদের এই বাক্যগুলি : 'আত্মাই রসরূপ', 'সেই রস-স্বরূপকে লাভ করিয়া জীব আনন্দই হইয়া যায়—' এবং দ্বিতীয় প্রমাণ, সম্পূর্ণ সহৃদয় সমাজের প্রত্যক্ষ অনুভব।

(গ) সত্যম্, শৃঙ্গারপ্রধানকাব্যেভ্যঃ ইব, করুণপ্রধানকাব্যেভ্যোঽপি যদি কেবলাহ্লাদ এব সহৃদয়হৃদয়প্রমাণকঃ, তদা কার্যানুরোধেন কারণস্য কল্পনীয়ত্বাল্লোকোত্তরব্যাপারস্যৈবাহ্লাদ প্রয়োজকত্বমিব, দুঃখপ্রতিবন্ধকত্বমপি কল্পণীয়ম্।

—শৃঙ্গার রস-প্রধান কাব্য হইতে যেইরূপ সুখ অনুভব হয় সেইরূপ করুণ রস-প্রধান কাব্য হইতেও কেবল সুখই পাওয়া যায়, যদি সহৃদয়ের হৃদয় অর্থাৎ অনুভবরূপ প্রমাণের দ্বারা এই কথা সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে "কার্যের অনুরোধে কারণ কল্পনা করিতে হইবে," (অর্থাৎ যেরূপ কার্যকারণ সেইরূপই হইবে) এই নিয়মানুসারে ইহা অবশ্যই কল্পনীয় যে লোকোত্তর কাব্য ব্যাপার যেরূপ আহ্লাদের হেতু হয় সেই-রূপ তাহা দুঃখেরও প্রতিবন্ধক (অর্থাৎ দুঃখের অনুৎপাদের প্রয়োজক) হইবে।

× × × ×

অথ তত্র কবীনাং কর্ত্তুম্, সহৃদয়ানাং চ শ্রোতুং কথং প্রবৃত্তিঃ? অনিষ্টসাধনত্বেন নিবৃত্তেরুচিতত্বাদিতি চেৎ।

—দুঃখানুভব যদি অনিবার্যই হয়—তাহা হইলে কবির সেরূপ কাব্য রচনায় এবং সহৃদয়েরই বা সেরূপ কাব্য শ্রবণে কি করিয়া প্রবৃত্তি হইবে। অনিষ্টের সাধন বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্তিই তো স্বাভাবিক।[৩]

এইরূপ সংস্কৃতের প্রায় সকল প্রতিনিধি আচার্যরা রসকে অনিবার্যরূপে আনন্দানুভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বিরোধী পক্ষের জৈন আচার্যদ্বয় রামচন্দ্র—গুণচন্দ্র রসের আনন্দরূপ তার স্পষ্টভাবে সর্বাধিক বিরোধিতা করিয়াছেন :

---

১. রসগঙ্গাধর : (চৌখম্বা বিদ্যাভবন) প্রথম আনন, পৃ° ৮০

২. ঐ, পৃ° ৯১

৩. ঐ, পৃ° ১০৬—১০৭

"সুখদুঃখাত্মকো রসঃ—অর্থাৎ রস সুখাত্মক ও দুখাত্মক উভয়রূপ হয়।

নাঃ দঃ ৩.১০৯

× × ×

ইহাদের মধ্যে শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, অদ্ভুত ও শান্ত ইষ্ট বিভাবাদির দ্বারা স্বরূপ-সম্পত্তিকে প্রকাশিত করে বলিয়া ইহাদের সুখপ্রধান রস বলা হয়, এবং অনিষ্ট বিভাবাদির দ্বারা স্বরূপ লাভ করে করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক। ইহাদের দুঃখপ্রধান রস বলা হয়।[১] "

উক্ত জৈন আচার্যরা সবগুলি রসকে সুখাত্মক বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নন :

"(কয়েকজন আচার্যদের দ্বারা) যে সমস্ত রসগুলিকে সুখাত্মক বলা হইয়াছে তাহা প্রতীতির বিপরীত (হওয়ার জন্য অমান্য, অসঙ্গত)। মুখ্য (অর্থাৎ বাস্তবিক) বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন (করুণ প্রভৃতির দুঃখাত্মকতার) এগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও, কাব্যের অভিনয়ের দ্বারা প্রাপ্ত (নকল) বিভার প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন ভয়ানক, বিভৎস, করুণ অথবা রৌদ্র রসের আস্বাদন কর্ত্তাদের হৃদয়ে অবর্ণনীয় কিঞ্চিৎ ক্লেশদশাও উৎপন্ন করে। এইজন্য ভয়ানক প্রভৃতি রসে সামাজিক অশান্তি অনুভব করে। সুখাস্বাদে কাহারও উদ্বেগ হয় না।"

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসে রসের আনন্দরূপতার এইরূপ স্পষ্ট বিরোধ অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না—রুদ্রভট্ট নিজের গ্রন্থ 'রসকলিকা'র এক স্থানে রসের উভয়াত্মক প্রকৃতির নিরূপণ করিয়াছেন :

করুণাময়ানামপ্যুপাদেয়ত্বং সামাজিকানাম্,
রসস্য সুখদুঃখাত্মকতয়া তদ্রুভয়লক্ষণত্বেন উপদদ্যতে।[২]

—অর্থাৎ সামাজিকের জন্য করুণ প্রধান প্রসঙ্গ ও ভাবেরও উপাদেয়তা আছে—রসের সুখদুঃখাত্মকতার আশ্রয়ে উহার উভয়াত্মক স্বরূপ সিদ্ধ হয়।

বিপক্ষের আর কয়েকজন আচার্যদের উল্লেখ এই সূত্রে করা যাইতে পারে—যেমন লোল্লট অথবা অভিনব ভারতীতে উল্লিখিত সাংখ্যাবাদী আচার্যরা—যাঁহারা নিশ্চিতরূপে রসকে, স্থায়ী ভাবের উপচিত রূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে সুখদুঃখাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রীয় চিন্তাধারাকে এই সব আচার্যরা বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের ধারা ক্রমশঃ আধুনিক ভারতীয় ভাষায় আসিয়া প্রসারিত হইল এবং হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় ইহা বিশেষ ভাবে বিকাশ লাভ করিল। হিন্দী কাব্যশাস্ত্রের ধারা মধ্যযুগ হইতে প্রসার লাভ করিতে শুরু করিয়াছিল এবং সেই যুগে

---

১. হিন্দী নাট্যদর্পণ, পৃ০ ২৯১

২. রুদ্রভট্ট—রসকলিকা (মাদ্রাস, পাণ্ডুলিপি) পৃ০ ৫১-৫২.—ডা০ রাঘবনের গ্রন্থ 'দি নম্বর অব রসস হইতে উদ্ধৃত।

রচিত রসের সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থরাশিও পাওয়া যায়। রীতিকালের[১] অনেক সমর্থ কবি-আচার্যরা রস-সিদ্ধান্তের ব্যাপক বিবেচনা করিয়াছেন; কিন্তু এই বিবেচনা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের উপর আশ্রিত—রসের সম্বন্ধে রীতিকালীন প্রত্যেকটি আচার্য বার-বার ইহাই বলিয়াছেন যে রস অলৌকিক, আনন্দরূপ এবং ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর :

নৃত্য, কবিত দেখত, সুনত, ভয়ে আবরন ভঙ্গ।
আনন্দ রূপ প্রকাশ হৈ, চেতন হী রস অঙ্গ ॥
জৈসো সুখ হৈ ব্রহ্মকো, মিলে জগত সুধি জাতি।
সোই গতি রস মৈ মঁগন ভয়ে সুরস নৌ ভাঁতি ॥ রসরহস্য, ৩.৩৪-৩৬

এই সম্বন্ধে যেন তাঁহাদের কাছে আর কোন বিকল্পই ছিল না। আধুনিক আলোচকেদের মধ্যে বেশীর ভাগ বিদ্বানদেরও ইহাই মত। আচার্য কেশবপ্রসাদ মিশ্র, পণ্ডিত রামদহিন মিশ্র, ডঃ ভগবান দাস, ডঃ শ্যামসুন্দর দাস, ডঃ গুলাব রায়, আচার্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী সকলেই রসকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ইঁহারা নবীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে নিজস্ব বিচার ধারার অনুসরণে রসের অলৌকিকতার এবং আনন্দরূপতার বিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কেবল আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল অন্যতম বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। ভারতীয় শাস্ত্র-পরম্পরার, বিশেষ করিয়া রসবাদের, অত্যন্ত প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইয়াও আচার্য শুক্ল রসের আনন্দরূপতার বিশেষ-ভাবে বিরোধিতা করিয়াছেন।

"যদি শ্রোতার হৃদয়ে প্রদর্শিত ভাবের অনুরূপ ভাব উদিত না হয়—সেই ভাবের স্বানুভূতি ভিন্ন প্রকার আনন্দরূপ অনুভব হয়—তাহা হইলে 'সাধারণীকরণ' কিরূপ হইবে? ক্রোধ, শোক, জুগুপ্সা প্রভৃতির বর্ণনায় যদি শ্রোতার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয় তাহা হইলে হয় শ্রোতা সহৃদয় নয় নতুবা কবি ভাবের অনুভূতি স্বয়ং না করিয়াই তাহার কেবল প্রদর্শন করিয়াছেন।"[২]

"আমার বিবেচনায় রসাস্বাদনের প্রকৃত স্বরূপের নির্ধারণ 'আনন্দ' শব্দের দ্বারা হয় না। 'লোকোত্তর' 'অনির্বচনীয়' প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা উহার অবাচকত্বের পরিহার হয় না এবং এই প্রয়োগের প্রায়শ্চিত্তও হয় না। ক্রোধ, শোক, জুগুপ্সা প্রভৃতি কি আনন্দের রূপ ধারণ করিয়া শ্রোতার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, নিজেদের প্রকৃত রূপকে কি সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জন দেয়, একটুও কি তাহাদের আসল রূপ দেখা দেয় না? 'বিভাবত্ব' কি তাহাদের স্বরূপ নষ্ট করিয়া কেবল সুখের স্বরূপ প্রদান করে? দুঃখের ভেদ কি সুখের ভেদের অনুরূপ হইয়া যায়? মৃত পুত্রের জন্য বিলাপ রত শৈব্যার নিকট হইতে রাজা হরিশচন্দ্রকে শবাচ্ছাদন চাহিতে দেখিয়া-শুনিয়া কি আমা-দের চোখে জল আসে না, আমরা কি হাসিতে থাকি? মাহমুদের অত্যাচারের বর্ণনা পড়িয়া আমরা কি ক্রোধে দাঁত কড়-মড় করিতে থাকি না? কোন দুঃখান্ত গল্প পড়িয়া

১. ১৭০০ হইতে ১৯০০ বিক্রমাব্দে রচিত হিন্দী সাহিত্য এই নামে খ্যাত।
২. রসমীমাংসা, পৃ০ ৯৯

আমরা কি অনেকক্ষণ দুঃখের মধ্যে ডুবিয়া থাকি না ? চিত্তের এই অবস্থা কি আনন্দ-দায়ক ? এই আনন্দ শব্দটির জন্য কাব্যের গুরুত্ব অনেক খানি কমিয়া গিয়াছে—ইহা নাচ-গানের সমপর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।"১

আমার বিচারে আনন্দ-সিদ্ধান্তের উপর ইহার অপেক্ষা অধিক নির্মম প্রহার আর কেহ করেন নাই। ইহার সম্মুখে জৈন আচার্যদের প্রতিবাদও অপেক্ষাকৃত অধিক কোমল মনে হয়। কিন্তু আচার্য শুক্লের কয়েকটি কথার সদুত্তর পাওয়া যায় না :

ইহা আমরা স্বীকার করি যে সহৃদয় হাসিবার জন্য 'সত্য হরিশ্চন্দ্র' নাটক দেখেন না, কিন্তু কাঁদিবার জন্য কি তিনি সময় ও টাকা ব্যয় করেন ? আচার্য শুক্লের দৃষ্টি একদেশদর্শী ছিল না—এই প্রশ্ন তাঁহার মনেও উঠিয়াছিল, অতএব নিজের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি রসের স্বরূপের নিজস্ব নিশ্চয় জ্ঞানের অনুকূল ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

> যেরূপ আত্মার মুক্তাবস্থাকে জ্ঞানদশা বলা হয়,
> সেরূপ-হৃদয়ের মুক্তাবস্থাকে রসদশা বলা হয়।২

"তাৎপর্য এই যে রস-দশায় নিজস্ব পৃথক সত্তার চিন্তা আর থাকে না অর্থাৎ কাব্যগত বিষয়কে আমরা নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সম্বদ্ধরূপে দেখি না, নিজের যোগ-ক্ষেম-বাসনার দ্বারা গ্রস্ত হৃদয়ের দ্বারা গ্রহণ করিনা, বরং নির্বিশেষ, শুদ্ধ এবং মুক্ত হৃদয়ের দ্বারা গ্রহণ করি। ইহাকে পাশ্চাত্য সমীক্ষা-পদ্ধতিতে অহংএর বিসর্জন এবং নিঃসঙ্গতা (Impersonality and detachment) বলা হইয়াছে। ইহাকে ইচ্ছা হইলে রসের লোকোত্তরত্ব বলুন অথবা ব্রহ্মানন্দ সহোদরত্ব বা বিভাবন—ব্যাপারের অলৌকিকত্ব বলুন।"৩

এইরূপে আচার্য শুক্লের মতানুসারে রস (১) আনন্দরূপ নয়, (২) উহাতে অস্মিতার ভোগ হয় না, তাহার বিসর্জন হয়, (৩) উহা প্রকৃত ভাব হইতে মূলতঃ ভিন্ন না হইয়াও পরিণামে ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃত ভাবের সামান্য অনুভব যেখানে সুখ-দুঃখময় হয় সেখানে রসের অনুভব—শৃঙ্গার ও করুণ উভয়রূপে—সুখ ও দুঃখ হইতে অধিক 'উদাত্ত ও অবদাত' হয়।

মারাঠী আলোচকেরাও কাব্যশাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত সচেতন—তাঁহারা রস-সিদ্ধান্তের বিবিধ অঙ্গ লইয়া অত্যন্ত গম্ভীর বিবেচনা ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র-চিন্তনের ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদেরও বহুমত রসের আনন্দরূপতারই পক্ষে ব্যক্ত হইয়াছে। "দঃ কেঃ কেলকর রসধ্বনিবাদী আচার্যদের মতানুসারে রসের আনন্দরূপতার প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি রস-স্বরূপের বিবেচনা ব্যাপারে রস=আস্বাদ=আনন্দ—এই সমীকরণের বিশেষ রূপে সমর্থন করিয়াছেন :

১. রসমীমাংসা, পৃ০ ১০১
২ চিন্তামণি, ভাগ ১, পৃ০ ১৪১
৩. ঐ, পৃ০, ২৪৭

× × ×

কাব্যের দ্বারা সহৃদয়ের হৃদয়-সাগর প্রসারিত হয়। এই প্রসারিত হৃদয়-সাগরে যখন সহৃদয় তন্ময় হইয়া পড়ে তখন উহার তদাকার কৃতিতে যে আনন্দ নিহিত থাকে তাহাকেই সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা রস বলিয়াছেন। (কাব্যালোচন, পৃ০ ১২৭-২৮)।[১]

ডঃ বাটবে নিজের 'রস-বিমর্শ' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত প্রসঙ্গের বিস্তারিত ভাবে বিবেচনা করিয়া রসকে সহৃদয়-নিষ্ঠ এবং আহ্লাদময়ই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :

কল্পনার সাহায্যে প্রাপ্ত আহ্লাদদায়ক অনুভবকেই রস বলা হয়। এই রসের উৎপন্নকারী মূল সামগ্রী কাব্যেই বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ বলিতে গেলে রস, কারণ-রূপে কাব্যেই নিহিত থাকে।[২]

কাব্যে উৎকট বিচারের ললিত অবিষ্কারের দ্বারা সহৃদয় পাঠকের সুখ-সংবেদক এবং সমগ্র-প্রত্যুত্তরাত্মক ক্রিয়াকে রস বলা হয়।[৩]

গ০ ত্রং০ দেশপাণ্ডেও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে রসের স্বরূপ সম্বন্ধে দুইটি পৃথক মত পাওয়া যায়—এক—'স্থায্যেব রসঃ' এবং দ্বিতীয়—'স্থায়িবিলক্ষণো রসঃ।' শ্রী দেশপাণ্ডের মতানুসারে এই দুইটি মতের সমীকরণ সমীচীন নয় : যেহেতু প্রথম মতের অনুসারে রস সুখদুঃখাত্মক ভাবরূপ এবং দ্বিতীয় মতের অনুসারে ইহা আনন্দরূপ। তাঁহার নিজস্ব মত অভিনবগুপ্ত প্রভৃতির দ্বারা প্রতি-পাদিত আনন্দরূপেরই সপক্ষে :

আমাদের মতানুসারে অভিনবগুপ্তের মত নানা কারণে স্বীকার্য্য, কারণ এই সিদ্ধান্তের দ্বারাই সম্পূর্ণ কাব্যাঙ্গের উপযুক্ত উপপত্তি সম্ভবপর হয়। ফলে ইহার সহিত অপরিহার্য্যরূপে সম্বদ্ধ আনন্দবাদই আমাদের গ্রাহ্য প্রতীত হয়।[৪] কিন্তু মারাঠীর স্বতন্ত্রচেতা আলোচকেরা পারস্পরিক ধারণাগুলির মধ্যে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাঃ শ্রীঃ যোগ রসকে অনুকূল-সংবেদনারূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াও করুণ রসের অনুভূতিকে কেবল সুখাত্মক রূপে স্বীকার করেন নাই :

কাব্যাধ্যয়নে পাঠকের বৈয়ক্তিক স্বার্থ সংযুক্ত থাকে না, অতএব তাহার দ্বারা দুঃখও হয় না। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই নয় যে সহৃদয়ের সমস্ত রজোগুণাত্মক ও তমোগুণাত্মক বাসনা নষ্ট হইয়া যায় ও কেবল সত্ত্বোদ্রেক অবশেষ থাকিয়া যায়। ভাবনানুসারে রসোৎপত্তিও ত্রিগুণাত্মকই হইবে। কেবল তাহাতে পাঠকের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিবে না, সেইজন্য পাঠক রজোগুণ-তমোগুণের আবিষ্কার করেন না এবং এই সকল গুণ সুখের গণ্ডীর মধ্যেই পরিবদ্ধ থাকে।[৫]

---

১. আধুনিক হিন্দী-মারাঠী কাব্যশাস্ত্রীয় অধ্যয়ন : লে০ ডঃ মনোহর কালে, পৃ০ ১০৯

২. রসবিমর্শ, পৃ০ ৭৩

৩. ঐ, পৃ০ ১৬৯

৪. ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্র, পৃ০ ২৯১

৫. অভিনব কাব্যপ্রকাশ, পৃ০ ৯৬

বলা বাহুল্য শ্রী যোগের এই অভিমত আচার্য শুক্লের মতানুকূল। শ্রী যোগও, প্রকৃতপক্ষে রস দশাকে হৃদয়ের মুক্তাবস্থার অনুরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু বোধ হয় তিনি নিজের ধারণাকে স্পষ্টরূপ প্রকাশিত করিতে পারেন নাই।[১]

হিন্দী ও মারাঠী ব্যতীত তৃতীয় ভাষা হইতেছে বাঙলা। এই ভাষার আধুনিক মনস্বীরা কাব্যের মূলতত্ত্বকে লইয়া গম্ভীর মনন করিয়াছেন। বাঙলার আলোচকদেরও বহুমত আনন্দেরই সপক্ষে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত নিজের গ্রন্থ 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের প্রাচীন ধারারই অনুমোদন করিয়াছেন:

কবি যখন তাঁহার প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটাইয়া তোলেন, তখন পাঠকের মনে রসের উদয় হয়, যাহার নাম 'করুণ রস'। এই করুণ রস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক হইতেছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়, তাহা চোখের জল আনিলেও মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে। এ কথা কাব্যের আস্বাদ যাঁহার আছে, তিনিই জানেন, যদিও প্রমাণ করিয়া দেখানো কঠিন, কারণ—

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥ —সাহিত্যদর্পণ

× × ×

রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব' তাহা দুঃখময় হইলেও ইহার পরিণাম যে 'রস', তাহা নিত্য আনন্দের হেতু।[২]

রবীন্দ্রনাথের দর্শন স্পষ্টরূপে আনন্দেরই দর্শন:

রসমাত্রেই অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়বোধেই, আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। .... দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটু স্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্র্যাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি, এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, একথা মানতেই হবে, তবু এই ঘটনাটি নিয়ে কত কাব্যনাটক, ছবি, গান, পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে, ভিড় জমেছে, কত আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি পুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধজল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্যবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে,

১. মারাঠী ভাষায় রস-স্বরূপের বিস্তৃত বিবেচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ড০ মনোহর কালের ডক্‌ট্রেট-প্রবন্ধ—আধুনিক হিন্দী-মরাঠী মেঁ কাব্যশাস্ত্রীয় অধ্যয়ন, অধ্যায় ১/৫

২. কাব্যজিজ্ঞাসা, পৃ০ ১৮-১৯

তাই দুঃখে, বিপদে, বিদ্রোহে, বিপ্লবে, অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।[১]

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এতে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রেজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই 'ভূমৈব সুখম্'।[২]

এইরূপ রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে কাব্য-নিবদ্ধ দুঃখ, যাহা ব্যক্তি-ভাবনা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য অনিষ্টের আশঙ্কা হইতেও সর্বথা মুক্ত থাকে, আত্ম-লাভের প্রবল সাধনরূপ বলিয়া আনন্দকর।

বাঙলার প্রসিদ্ধ আলোচক মোহিতলাল মজুমদার নিজের "বাঙলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি" প্রবন্ধে ইহা স্বীকার করিলেও যে ইউরোপীয় কাব্যকলা (ট্র্যাজেডী) তাঁহাকে মুগ্ধ করে, ভারতীয় সাহিত্য এমন করিতে পারে না; শেষে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ট্র্যাজেডীর রস ভারতীয় অথবা হিন্দু সাহিত্যের রস নয়—আমরা জীবনে এইরূপ রসকে প্রশ্রয় দিই না যেহেতু ইহা দুঃখের পূজা। ভারতীয় সাহিত্যে রসের সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে ভারতীয় জীবনদর্শন স্বতন্ত্র-দর্শন; ইহাতে রসও সেই বস্তুর আস্বাদন যাহার দ্বারা দেহ ও মনের বন্ধন ছিন্ন হইয়া একটি অপূর্ব মুক্তি-সুখের উদয় হয়।[৩] ইহার তাৎপর্য এই যে শ্রী মজুমদারের মতানুসারে ভারতীয় রস দেহ ও মনের সংবেদনার উর্দ্ধে আত্মার মুক্তি-সুখের অনুভব: ট্র্যাজেডীতেও রস বিদ্যমান থাকে, কিন্তু দুঃখ অর্থাৎ অসত্যের উপর ন্যস্ত থাকার জন্য তাহা ভারতীয় রসের অনুরূপ পূর্ণ ও অখণ্ড হয় না।

পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রে রসের কোন বিবেচনা হয় নাই। কিন্তু যদি রসের অর্থ কাব্যাস্বাদ ধরিয়া লই তাহা হইলে সেখানকার অন্ততঃ প্রাচীন আচার্যরা কাব্যাস্বাদের আনন্দরূপতার পক্ষে নিজেদের মত দিয়াছেন। সর্বপ্রথম প্লেটোর মত বিবেচনা করা যাক। প্লেটো আনন্দের দুইটি রূপ স্বীকার করিয়াছেন—একটি বিশুদ্ধ আনন্দ, যাহাকে সমাহিত আত্মার অনুভূত্যাত্মক রূপ বলা হইয়াছে (আত্মসামঞ্জস্য = পূণ্য = = সৌন্দর্য = আনন্দ) এবং দ্বিতীয়টি ভৌতিক আনন্দ যাহাকে ইন্দ্রিয় সুখের তুল্য বলা হইয়াছে। প্লেটোর সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ এই যে কাব্যের দ্বারা আত্মসামঞ্জস্য (ইহা বাস্তবে ভট্টনায়কের আত্মবিশ্রান্তির অনুরূপ) লাভ না হইয়া কেবল ঐন্দ্রিয় সুখই পাওয়া যায়: কারণ কেহ যদি ইহা প্রমাণিত করিতে পারেন যে ইহা কেবল প্রীতিকরই নয়

১. সাহিত্য তত্ত্ব: 'সাহিত্যের পথ'-এ উদ্ধৃত
২. 'সাহিত্যের পথ'-এর ভূমিকা
৩. সাহিত্য-বিতান

শ্রেয়স্করও, তাহা হইলে ইহার দ্বারা আমাদেরই লাভ হইবে।[১] কিন্তু এই সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত স্পষ্ট যে কাব্যের কমেডী, ট্র্যাজেডি সকল রূপের আস্বাদ আহ্লাদ-ময়ই হয়:

কল্লিক্লেস—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, সাক্রতেস, যে ট্র্যাজেডি প্রেক্ষকদের আহ্লাদ ও পরিতোষের জন্যই প্রবৃত্ত থাকে।[২]

এরিস্টটল নিজের গ্রন্থে কাব্যাস্বাদ প্রসঙ্গে আহ্লাদ (Pleasure) শব্দটির বার-বার প্রয়োগ করিয়াছেন: অনুকৃল বস্তু হইতে প্রাপ্ত আনন্দও কম সার্বভৌম নয়। অনুভব ইহার প্রমাণ—যে সব বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শনে আমাদের ক্লেশ অনুভব হয় সেই সবের যথাযথ প্রতিকৃতির ভাবন আহ্লাদকারী হয়, যেমন কোন অত্যন্ত জঘন্য পশু অথবা শবের রূপ-আকৃতির উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। কাব্যশাস্ত্র, পৃ০ ১৪।—এখানে অনুকৃত বস্তু বলিতে কলাকৃতি ধরা হইয়াছে এবং এরিস্টটলের স্পষ্ট মত এই যে কলাকৃতির বিষয় যতই জঘন্য হউক না কেন, উহার ভাবন নিশ্চিতরূপে আহ্লাদকারী হয়। ত্রাস ও করুণার আবেগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ট্র্যাজেডির আস্বাদ ট্র্যাজিক অথবা দুঃখদায়ক না হইয়া প্রীতিদায়কই কেন হয়, এই বিবাদগ্রস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য এরিস্টটল নিজস্ব প্রসিদ্ধ ক্যাথারসিস সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে দুইটি তথ্য বিচারযোগ্য। প্রথমতঃ এই যে প্রথম উদ্ধরণে এরিস্টটল কাব্যজনিত যে আহ্লাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ভাবতত্ত্বের অপেক্ষা কল্পনা তত্ত্বেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় যদিও ভাবতত্ত্বের উপেক্ষা করা হয় নাই। তবুও ইহাতে বোধ হয় সেরূপ ক্ষমতা নাই যাহা 'রসে' অনিবার্যরূপে বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় কথা এই যে ট্র্যাজেডির আস্বাদে ভাবের ক্যাথারসিস ও তাহার ফলে কেবল চিত্তের বৈশদ্যই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ভাব-ভূমিকার আশ্রয়ে আত্মভোগের উল্লেখ এখানে নাই অর্থাৎ ইহাতে উল্লিখিত চিত্তের বৈশদ্য ব্যাপারটি প্রায় নঞর্থক। কিন্তু ইহা তো কেবল সূক্ষ্ম বিচার মাত্র; তাঁর নিজস্ব বিচারানুসারে তিনি নিশ্চিতরূপে কাব্যাস্বাদকে প্রীতিকর রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এরিস্টটলের পরে পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রের প্রমুখ প্রকাশ-স্তম্ভ হইতেছেন লোঞ্জাইনাস, যিনি সর্বতোভাবে আনন্দবাদী ছিলেন। তাঁহার মতানুসারে ঔদার্য্য (Sublime) কাব্যের প্রাণতত্ত্ব এবং ঔদার্য্যের মূল তত্ত্বগুলির মধ্যে আত্মার উল্লাস সর্বপ্রধান:

(ক) এবং (যাহার দ্বারা আমাদের আত্মা) হর্ষ ও উল্লাসের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে।

১. গ্রীক লিটরেরী ক্রিটিসিজ্‌ম, পৃ০ ৮৮

২. ঐ, পৃ০ ৪৪

(খ) সাধারণতঃ ঔদার্য্যের সেই সব উদাহরণগুলিকেই শ্রেষ্ঠ এবং ঠিক বলা উচিত যাহা সকলকে সর্বদা আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ।[১]

এইরূপ লোঞ্জাইনাসের মতানুসারে কাব্যাস্বাদের লক্ষণ হইতেছে আত্মার উল্লাস।

পরবর্তী আলোচকেরাও প্রায় কাব্যাস্বাদকে আহ্লাদরূপ স্বীকার করিয়াছেন। কেবল কাব্য-প্রয়োজনের ব্যাপারে মতভেদ থাকিয়া গিয়াছেঃ একটি দল আহ্লাদকে এবং অপর দল লোক-কল্যাণকে কাব্য-প্রয়োজন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যে সব আলোচকেরা আহ্লাদকে কাব্যের সিদ্ধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—যেমন ভিক্টর হুগো, শিলার, কলরিজ, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলী প্রভৃতি তাঁহাদের মত এই সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট যে কাব্যাস্বাদ আহ্লাদরূপ হয়। ইহার সাথে, যাঁহারা লোক-কল্যাণকে কাব্যের সাধ্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের উপর যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারাও আহ্লাদকে অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশ আহ্লাদকে সাধ্য না মানিয়া সাধন রূপে গ্রহণ করিয়াছেনঃ উদাহরণস্বরূপ হোরেস, ব্র্যাঅলো, রেপিন, রাস্কিন, মেথ্যু আর্নল্ড প্রভৃতি বিদ্বানদের নাম লওয়া যাইতে পারে। কেবল টল্‌স্‌টয় আনন্দ ও সৌন্দর্যের স্পষ্টরূপে খণ্ডন করিয়াছেনঃ শেষে, ইহা (কলা) আনন্দ নয়, বরং মানব-একতার মিলন-সাধনা, যাহা মানবদের সহ-অনুভূতির দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করে।[২] প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য আলোচনা-শাস্ত্রে প্রারম্ভ হইতেই, কাব্যাস্বাদের স্বরূপ-বিশ্লেষণের প্রতি ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, যতখানি ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছিল—ফলে পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রে কাব্যাস্বাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে ব্যবস্থা ও সূক্ষ্ম গম্ভীরতার অভাব দৃষ্টিগোচর হয়। বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া যখন মনোবিজ্ঞান সাহিত্য ও সাহিত্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল তখন এই প্রসঙ্গটি পুনরায় উত্থাপিত হইল এবং ডঃ রিচার্ড্‌স প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কাব্যানুভূতির সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক বিবেচনা উপস্থিত করিলেনঃ

.......যাঁহারা বিবেকশীল তাঁহারা ট্র্যাজেডির প্রেক্ষণ মনোরঞ্জনের জন্য করেন না এবং শিক্ষার জন্যও করেন না—এরিস্টটলের বাক্য ইহার প্রমাণ। মনোরঞ্জন এবং শিক্ষা উভয়ের মধ্যে কোনটাই, যখন পর্যন্ত আমরা এই শব্দগুলিকে ইহাদের প্রচলিত অর্থ হইতে সর্বথা ভিন্ন অর্থ গ্রহণ না করি, কলার ভব্যতর রূপের অনুরূপ নয়। কলার ভব্যতর রূপের দ্বারা প্রেরিত অনুভব এতই পরিপূর্ণ, বিবিধ এবং অখণ্ড—উহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অন্তর্বৃত্তি, করুণ ও ত্রাস, সুখ ও নিরাশার এতই সূক্ষ্ম সন্তুলন বিদ্যমান থাকে যে (কোন এক সামান্য প্রচলিত শব্দের দ্বারা) সহজে উহার অনুভূতি সম্ভবপর নয়।

১. (ক) কাব্যে উদাত্ত তত্ত্ব, পৃ০ ৫২, (খ) কাব্যে উদাত্ত তত্ত্ব, পৃ০ ৯৯

২. কলা ক্যা হৈ? ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ

........ট্র্যাজেডির অনুভূতি মানব-চেতনার এতই উদাত্ত অনুভূতি যে উহাকে মনোরঞ্জন ও আহ্লাদের পর্যায়ে ফেলা যায় না এবং স্থূল জীবন মূল্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যম রূপেও স্বীকার করা যায় না বিশেষ করিয়া যে মূল্যগুলি নীতি-সংহিতার মধ্যে সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব।

—অর্থাৎ (১) রিচার্ড্‌সের মতানুসারে কাব্যের অনুভূতি আহ্লাদরূপ নয়। (২) উহার দ্বারা পরস্পর-বিরোধী অন্তর্বৃত্তির সূক্ষ্ম সন্তুলন সম্ভবপর হয়। (৩) উহা আহ্লাদের অপেক্ষা অধিক বৈবিধ্যপূর্ণ, পরিপূর্ণ এবং উদাত্ত।

× × ×

উল্লিখিত মন্তব্যগুলির বিবেচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত মূল তথ্য কয়টি স্পষ্ট হইয়া যায়ঃ

(১) রস আনন্দরূপ এবং এই আনন্দের আবার দুইটি রূপ বিদ্যমানঃ (ক) উদাত্ত আত্মবিশ্রান্তি, এবং (খ) আহ্লাদ বা মনঃপ্রীতি—সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে।[১] একটি তৃতীয় রূপও আছে মনোরঞ্জন, যাহা সম্প্রতি 'এন্টরটেনমেন্টের' সমরূপ হইয়া হীনতর অর্থের বাচক হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু কাব্য ও কলার সহিত তাহার চিরন্তন সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই তিনটি রূপে প্রীতি তত্ত্ব সমান ভাবে বর্তমান। অর্থাৎ রস উদাত্ত আত্ম-বিশ্রান্তি রূপ অথবা মনঃপ্রীতি বা আহ্লাদরূপ অথবা অন্তশ্চমৎকার রূপ এবং আরও নিম্নস্তরের মনোরঞ্জন রূপই হউক না কেন—প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহা প্রীতিকর[২] বা সুখাত্মক।

(২) রস সুখাত্মক এবং দুঃখাত্মকও—অর্থাৎ প্রীতিকর স্থায়ী ভাবের উপর আশ্রিত শৃঙ্গার, বীর, শান্ত প্রভৃতির স্বরূপ সুখাত্মক এবং অপ্রীতিকর স্থায়ী ভাবের উপর আশ্রিত করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতির স্বরূপ দুঃখাত্মক।

(৩) রস উভয়াত্মক—অর্থাৎ ইহা সুখদুঃখময়ী একটি মিশ্র অনুভূতি। প্রত্যেকটি স্থায়ী ভাবের মধ্যে সুখদুঃখের বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ বিদ্যমান থাকে যাহা উহাদের উপর আশ্রিত রসেও প্রতিফলিত হয়।

(৪) রস না সুখাত্মক না দুঃখাত্মক—হৃদয়ের মুক্তাবস্থাকে রসদশা বলা হয় যাহাতে বৈয়ক্তিক রাগদ্বেষ ও তাহার পরিণামী সুখদুঃখ সর্বথা নিঃশেষ হইয়া যায়ঃ রসের অনুভূতি চিত্তের বৈশদ্যের, বলিতে গেলে শান্তির অনুভূতি।

(৫) রস (কাব্যাস্বাদ) সরল অনুভূতি নয়—উহাতে অনেক, প্রায় পরস্পর বিরোধী অন্তর্বৃত্তির সূক্ষ্ম সন্তুলন বিদ্যমান থাকে, অতএব রসানুভব অত্যন্ত বৈবিধ্যপূর্ণ অনুভূতি।

সঠিক উত্তরের জন্য আমাদের উক্ত পাঁচটি বিকল্প পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। নানা কারণে দ্বিতীয় বিকল্প দিয়া শুরু করিলে অধিক সুবিধা হইবেঃ রস সুখাত্মক ও দুঃখাত্মকও। সাধারণতঃ এই সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ধারণা এই হয় যে করুণ,

১. ধ্বন্যালোক ১।১
২. Pleasurable

ভয়ানক প্রভৃতি কাব্য-প্রসঙ্গের আস্বাদ, উহার ভিত্তিস্থানীয় স্থায়ী ভাবের অনুসারে দুঃখময়ই হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহার বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। কেবল দুঃখানুভূতির জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাব্যের পাঠ অথবা নাটকের প্রেক্ষণ কেন করিবেন? দুঃখ জীবনে অবধারিত, অতএব মানুষ তাহার ভোগ করে এবং কেবল ভোগই করে না নিজের পুরুষার্থের বলে তাহার দ্বারা লাভান্বিত হইবার জন্য পুরাপুরি ভাবে চেষ্টা করে—অর্থাৎ উহার সম্মুখীন হওয়ার জন্য নিজের আত্মশক্তির বিকাশ করে, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদির অভিজ্ঞতা লাভ করে, সহ-অনুভূতি প্রভৃতি বিচারের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সুখকে আরও সুখময় করিবার জন্য উহাকে (দুঃখকে) কাজে লাগায়। কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়া সুখানুসন্ধানেরই বিভিন্ন উপায়—ইহার দ্বারা দুঃখা-ভিলাষা প্রকট হয় না, দুঃখের ইচ্ছাকৃত বা সোৎসাহ বরণও প্রমাণিত হয় না। যে সব দর্শনশাস্ত্র দুঃখকে একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহারা ইহার বিনিবৃত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করে, এবং যে সকল সন্ত-কবিরা দুঃখের জয়গান গাহিয়াছেন তাঁহারাও প্রকারান্তরে ইহাকে প্রভুর নাম-স্মরণের সুখ-সাধন রূপে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে দার্শনিক দৃষ্টিকোণের অনুসারে দুঃখের গুরুত্ব যতই অধিক হউক না কেন, দুঃখ জীবনের অন্তিম ভোগ্য নয় এবং দুঃখের জন্য দুঃখের আমন্ত্রণ তাত্ত্বিক বিচার বুদ্ধিতেও ঠিক নয়। তৎসম্পর্কে আর এক কথা এই যে সামান্য সহৃদয় দার্শনিক নয়, সন্ত-কবিও নয়; তাহার সহৃদয়তা সামান্য বাসনাযুক্ত মানব-হৃদয়ে নিহিত থাকে। অতএব ইহা ভাবিয়া লইলে যে দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অথবা দুঃখজনিত লাভের জন্য সহৃদয় করুণ ও ভয়ানক প্রসঙ্গে বর্ণিত কটুরসকে গ্রহণ করে, লোকানুভবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে; অতএব ইহা অশুদ্ধ। আলোচ্য বিকল্পটির প্রবর্তক রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন যে প্রমাতা করুণাদি রস হইতে দুঃখানুভই করে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে কবি ও নটের কৌশলজনিত চমৎকারীত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কাব্য-পাঠ করে বা নাটকের প্রেক্ষণ করে—অর্থাৎ এইরূপ কাব্য-নাট্যাদির করুণাদি প্রসঙ্গ হইতে প্রাপ্ত আহ্লাদ রস নয়—বরং তাহা কবি ও নটের কৌশলজনিত চমৎকার মাত্র, যাহার ফলে কাব্য-নাট্য রসের আস্বাদের সময় প্রমাতার হৃদয়ে আহ্লাদরূপী ভ্রান্তির উদয় হয়। এই কৈফিয়তটিকে মানিয়া লইলে কাব্যকলার চমৎকার ও রসের আস্বাদের মধ্যে স্পষ্ট বিচ্ছেদ ঘটে—উভয়ের সর্বথা পৃথক স্থিতি স্বীকার করিবার জন্য আমরা বাধ্য হইয়া পড়ি, যাহা প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে কেহ স্বীকার করিতে রাজি নন। কারণ স্পষ্ট: (১) প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রানুসারে কাব্যে অভিব্যক্ত স্থায়ী ভাবের অনুভূতিই তো রস এবং কবি-কৌশল ব্যতীত কাব্যে স্থায়ী ভাবের অভিব্যক্তি সম্ভবপর নয়—কবি-কৌশলের দ্বারা অভিব্যক্ত না হইলে পরস্থায়ী ভাবের রূপ সর্বথা ইন্দ্রিয়-মানসিক থাকিয়া যায় এবং উহার অনুভূতি রসানুভূতি না হইয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতি রূপ হয়। অতএব রসানুভূতিতে কাব্যকলার চমৎকার অনি-বার্যরূপে অন্তর্ভুক্ত থাকে—উহা ভিন্ন রসের সিদ্ধি সম্ভবপর নয়। (২) বর্তমান

মনোবিজ্ঞান বা সৌন্দর্যশাস্ত্রের অনুসারে ভাব তত্ত্ব এবং কলা তত্ত্বের পৃথক অনুভূতির কল্পনাও সর্বথা অসঙ্গত। বস্তুরূপেও উভয়ে অবিচ্ছিন্ন রূপে বিদ্যমান থাকে—এবং অনুভূতি রূপে তো বিচ্ছিন্ন থাকিবার একেবারে প্রশ্নই ওঠে না—উভয়ের সমাসক্ত অনুভূতিই সৌন্দর্যানুভূতি বা রস।

এইরূপ (করুণাদিতে) রসের দুঃখাত্মকতা প্রমাণিত হয় না। ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণ দেওয়া যায়:

(ক) সাধারণতঃ দুঃখের প্রতি ঘোর অপ্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও সামাজিক দুঃখানুভূতির জন্য নয় বরং কোন-না-কোন রূপে সুখানুভূতির জন্য করুণ কাব্যের প্রতি আকর্ষিত হয়।

(খ) কেবল কবি-কৌশল অথবা/এবং নটের কৌশল হইতে প্রাপ্ত চমৎকার এই আকর্ষণের পর্যাপ্ত কারণ নয়, কারণ কাব্য-নাট্য প্রভৃতি দ্বারা নিরূপিত উৎকট শোক অথবা ভয় হইতে উৎপন্ন ক্লেশ (যদি বাস্তবিক দৃষ্টিতে উহা ক্লেশই) এত প্রবল হয় যে কবি-কৌশল অথবা নটের কৌশল পৃথক বা সমবেত রূপেও উহার নিরাকরণে সমর্থ হয় না। সামান্য জনের তো এই কৌশলের কোন পরিজ্ঞানই থাকে না এবং সূক্ষ্মচেতা সহৃদয়ের পরিতোষের জন্য কেবল কৌশল পর্যাপ্ত নয়।

(গ) এই মত স্বীকার করিয়া লইলে রসানুভূতি ও কলানুভূতির মধ্যে প্রভেদের অসঙ্গত কল্পনা করিতে হয় যাহা প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রে এবং আধুনিক সৌন্দর্যশাস্ত্রে স্বীকৃত নয়।

(ঘ) রস-ভেদের আশ্রয়ে আস্বাদ-ভেদের কথা মানিয়া লইলে রসের পরম্পরানুমোদিত একরূপতাকে অস্বীকার করিতে হয়। (কিন্তু ইহা প্রাচীন শাস্ত্রীয় ধারণা কেবল পরম্পরার জন্য—আধুনিক আলোচনাশাস্ত্র ইহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য নয়।)

এখন তৃতীয় ও পঞ্চম বিকল্পের বিবেচনা করা যাক। ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে উভয়ে রসকে মিশ্র অনুভূতিরূপে গ্রহণ করে। একটির মধ্যে সুখ-দুঃখের মিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে, অপরটিতে বিভিন্ন প্রকারের সংবেদনার সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের কথা বলা হইয়াছে। রসের উভয়াত্মক রূপের কল্পনা ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ভাবে কখনই মান্য হয় নাই: যদিও প্রত্যেক রসের নানা সঞ্চারীর কল্পনায় এই রূপ সংকেত নিহিত আছে। উদাহরণস্বরূপ, শৃঙ্গার রসেরই কথা ধরা যাক—উহার স্থায়ী ভাব রতি এবং সঞ্চারীর মধ্যে হর্ষ, ব্রীড়া, গর্ব প্রভৃতি প্রীতিকর ভাব ব্যতীত নির্বেদ, চিন্তা, ব্যাধি, উন্মাদ প্রভৃতি দুঃখাত্মক ভাবেরও উল্লেখ আছে। এইরূপ রতি নিশ্চিত একটি মিশ্রভাব—সুখ ও দুঃখ বিভিন্ন অনুপাতে ইহার মধ্যে মিশ্রিত থাকার জন্য রতির স্বরূপ নিশ্চয়ই উভয়াত্মক ধরিয়া লইতে হইবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান তর্ক এবং প্রয়োগের দ্বারা ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। বিস্ময় ও শম এবং ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি স্থায়ী ভাবগুলির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু প্রশ্ন ভাবের নয়—রসের উভয়াত্মক স্বরূপের। রস-প্রক্রিয়ায় ভাবের অনুরূপ দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু পরিণতিতেও

দুঃখের দংশন বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার করা সঙ্গত হইবে না কারণ দুঃখের আংশিক অনুভূতিও পাঠক অথবা প্রেক্ষক কেহই চান না। দুঃখ মাত্রতেই মানুষের অরুচি —কেবল মাত্রা ভেদের দ্বারা দুঃখের প্রতি অভিরুচি প্রমাণিত করা যায় না। রিচার্ড্‌স বলেন যে কাব্যাস্বাদের স্বরূপ এত সরল নয় যে সুখ বা আহ্লাদের মধ্যে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে। উহার মধ্যে নানা প্রকারের সংবেদনার সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে—অতএব উহা অধিক পূর্ণ। পুনরায় প্রশ্ন ওঠে যে জটিলতা ও বৈবিধ্য রসের প্রক্রিয়ার মধ্যে বর্তমান থাকে, অথবা উহার পরিণতির মধ্যে—আমার নিজস্ব মত এই যে রস-নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার সহিত এই সমস্ত সংযুক্ত থাকে। পরিণতিতে কেবল নানা সংবেদনার সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যই বিদ্যমান থাকিতে পারে। কাব্যাস্বাদের প্রক্রিয়ায় নানা সংবেদনার অবস্থান স্বতঃস্পষ্ট। ভারতীয় রসশাস্ত্রও ইহা স্বীকার করে যে রস-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিশ্চিতরূপে বৈবিধ্য ও জটিলতা বিদ্যমান থাকে—প্রমাতার চেতনা নানা সুখদুঃখাত্মক সংবেদনার মধ্য হইতে অগ্রসর হয়। প্রসিদ্ধ ভরত-সূত্র এবং স্বয়ং ভরতের দ্বারা সেই সূত্রের ব্যাখ্যা ইহার প্রমাণ: যেমন বিবিধ ব্যঞ্জন, ঔষধি ও দ্রব্যের সংযোগে (ভোজ) রস নিষ্পন্ন হয়, যেমন গুড়াদি দ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ঔষধির দ্বারা ষাড়বাদি রস তৈয়ারী হয়, ঠিক সেইভাবে নানা ভাবের সংযোগে স্থায়ী ভাবও (নাট্য) রসে পরিণত হয়।

(নাট্যশাস্ত্র, কাঃ ভাঃ, পৃ০ ৯৩)

কিন্তু পরিণত অবস্থায় সংবেদনার বিভিন্নতা একত্বে পরিণত হয়—বিবিধ সংবেদনার সামঞ্জস্য মূলরূপে বৈবিধ্যপূর্ণ হইলেও অবশেষে অনুভূতির এককত্বে পরিণত হয়। বিবিধ সংবেদনার আস্বাদ বিবিধ; সংবেদনার বৈবিধ্যের আস্বাদও মিশ্র: কিন্তু উহাদের সাংশ্লেষিক রূপের আস্বাদ অখণ্ড এবং প্রীতিকরও হইবে কারণ—

(১) সংশ্লেষ বা সামঞ্জস্যের অর্থ হইতেছে বহুর মধ্যে একতার স্থাপনা। অতএব অনুভবের বৈবিধ্য একত্বে পরিণত হইয়া যায়; (২) অনুভবের এলাকায় সামঞ্জস্যের অর্থ হইতেছে অন্তর্বৃত্তির সমাহিতি বা চিত্তের সমাহিতি এবং চিত্তের সমাহিতি যদি স্বয়ং আনন্দরূপ নাও হয়, উহা নিশ্চিত আনন্দের প্রবর্তক। অতএব রিচার্ড্‌স 'আনন্দকে' অগ্রাহ্য করেন নাই—তিনি সুখ ও আহ্লাদকেও গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কাব্যাস্বাদকে কেবল সুখ ও আহ্লাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উহাকে অনেক অধিক উদাত্ত এবং অবদাত রূপে স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজি শব্দ 'প্লেজর'-এর জন্য এই ভ্রান্তির প্রসার ঘটিয়াছে। 'প্লেজর' শব্দটি অত্যন্ত হাল্কা ও নিকৃষ্ট অনুভবের সমার্থ রূপ; আনন্দের স্বরূপ উহার অপেক্ষা অনেক অধিক উদাত্ত ও অবদাত: 'আনন্দ' শব্দটিকে উহার ব্যাপক অর্থরূপে গ্রহণ করিলে এই বিবাদ বোধহয় মিটিতে পারে।

এখন চতুর্থ বিকল্পটি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই বিকল্প অনুযায়ী, হৃদয়ের মুক্তাবস্থার অপর নাম রস-দশা। ইহা আচার্য শুক্লের মত। শুক্লের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহার অন্তর্গত মূলরূপে তিনটি তথ্য বিদ্যমান আছে: (ক) ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ এবং

উহার পরিণামরূপী সুখ-দুঃখ হইতে মুক্তি; (খ) চিত্তের বিস্তার; (গ) ভাব-বিচারের সাধারণীকরণ এবং তাহার ফলে নৈতিক পরিতোষ। প্রকৃতপক্ষে ইতিপূর্বে আমরা অন্যত্র স্পষ্ট করিয়াছি যে আচার্য শুক্লের এই সিদ্ধান্তটি এরিস্টটলের 'ক্যাথারসিস' সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত। এরিস্টটলের ক্যাথারসিস সিদ্ধান্তের দুইটি প্রমুখ অঙ্গ আছে —মনোবৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক : মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ক্যাথারসিসের অর্থ হইতেছে আবেশের নির্গতির পরে চিত্তের প্রসন্নতা এবং নৈতিক দৃষ্টিতে ক্যাথারসিস মানসিক স্বাস্থ্যের বাচক। ডঃ রিচার্ড্স বর্তমান মনোবিজ্ঞানের আলোকে ক্যাথারসিসের দ্বারা প্রেরিত হইয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তটির প্রতিপাদন করিয়াছেন। অন্তর্বৃত্তির সামঞ্জস্য এবং চিত্তের প্রসন্নতা বা হৃদয়ের মুক্তাবস্থার মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নাই। অন্তর্বৃত্তির সংশ্লেষণ নিশ্চিতরূপে চিত্তকে নির্মল করে—অর্থাৎ হৃদয়কে রাগ-দ্বেষ-জনিত বিকার হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই—অথবা এমনও বলা যাইতে পারে যে চিত্তের প্রকৃতিস্থ হওয়ার অভিপ্রায়ই এই যে আমাদের বিভিন্ন অন্তর্বৃত্তিগুলি পরস্পরে সংহতি লাভ করে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে এই ধারণা হয় যে প্রসন্নতা বা মুক্তাবস্থার অর্থ বিকারের অভাব অর্থাৎ উহা নঙ্‌াত্মক স্থিতি-বিশেষ এবং বৃত্তির সামঞ্জস্য ধনাত্মক স্থিতির দ্যোতক—একটি চিত্তের নির্বিকার বা নীরোগ অবস্থা এবং অপরটি স্বাস্থ্যকর দশা। কিন্তু ইহা বোধ হয় শব্দ লইয়া খেলা করা হইতেছে কারণ ব্যবহারে নীরোগতা এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে প্রভেদ করা খুবই দুষ্কর হইবে। কেবল আচার্য শুক্ল নৈতিকতার কথা বলিয়া আর একটু আগাইয়া যান অর্থাৎ তাঁহার সিদ্ধান্তটি আরও অধিক ধনাত্মক (Positive) হইয়া পড়ে। তিনি বলেন যে যেখানে ব্যক্তিগত শোক, ক্রোধ প্রভৃতিতে মোহজনিত মলিনতা বিদ্যমান থাকে, সেখানে লোকাদর্শের প্রেরণা পাইয়া ব্যক্তির সঙ্কুচিত পরিধি হইতে মুক্ত এই ভাবগুলি একটি অলৌকিক সৌন্দর্যে পরিমণ্ডিত হইয়া যায়। এখন প্রশ্ন ওঠে যে উক্ত পরিস্থিতি বা পরিস্থিতিগুলি কি নিরানন্দের সূচক? আমার ধারণায়—তাহা নয়। এই রকম পরিস্থিতিকে আমরা আনন্দের ভূমিকা বলিয়া বা আনন্দের নঙ্‌াত্মক রূপ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে পারি—আনন্দের দ্বারা আপ্লাবিত আত্মভোগ পর্যন্ত না পৌঁছাইতে পারিলেও আত্মবিশ্রান্তি হইতে বোধহয় ইহার দূরত্ব খুব বেশী নয়। রিচার্ড্স নিজের সামঞ্জস্য-সিদ্ধান্তে, ন্যূনতম ক্ষয় এবং অধিকাধিক পরিতোষের সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া এবং অপর দিকে আচার্য শুক্ল লোকাদর্শের সৌন্দর্যের উদ্-ভাবনা করিয়া অভাবাত্মক স্থিতির পরিহার ব্যাপারে বিশেষ প্রযত্ন লইয়াছেন; কিন্তু নিজেদের সিদ্ধান্তের পূর্বদৃষ্টতার জন্য উভয়ে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিয়াছেন কিন্তু এই দুরাগ্রহের ফলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আনন্দতত্ত্বই অপ্রকাশিত থাকিয়া গিয়াছে। তবুও, ইতিপূর্বে যাহা আমি বলিয়াছি, এই দুইজন আচার্যদের দ্বারা নির্দিষ্ট মনঃস্থিতি—'হৃদয়ের মুক্তাবস্থা' এবং 'অন্তর্বৃত্তির সমাহিতি'কে আমরা নিরানন্দ বলিতে পারি না : প্রত্যক্ষ অনুভবই ইহার প্রমাণ।

অতএব আমাদের সার কথা এই যে রসের আনন্দরূপতার বিরোধে যে সবা বিকল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সবই অসিদ্ধ অথবা প্রকারান্তরে আনন্দেরই আভাস দেয়।

শেষে, শাস্ত্রার্থের প্রপঞ্চে না পড়িয়া একটি বিশিষ্ট করুণ কাব্য-প্রসঙ্গের আস্বাদের বিশ্লেষণ দ্বারা এই প্রশ্নের নির্ণয় দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত হইবে। 'সত্য-হরিশ্চন্দ্র' নাটকে রোহিতের মৃত্যুর পরে শৈব্যার বিলাপ প্রসঙ্গটির কথা ধরা যাক্। কবি অত্যন্ত মার্মিক ভাবে রোহিতের অকাল মৃত্যু এবং উহার শোকে সন্তপ্ত শৈব্যার অতি ক্রন্দনের বর্ণনা করিয়াছেন এবং সূত্রধার, বালক নট এবং নটীর অভিনয় কৌশল ও অন্য নাট্য-উপকরণের সাহায্যে যথাযথ রূপে নাটকটিকে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সামাজিকের এই প্রসঙ্গটির দর্শনে কীরূপ অনুভব হয়? ইহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। এই সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে সামাজিকের মন সাধারণতঃ প্রকৃতিস্থ থাকে। দৈনন্দিন জীবনের রাগ-দ্বেষ এবং হর্ষ-বিষাদ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া একটি উচ্চতর অনুভবের প্রতি আকর্ষিত হইয়া তিনি সেখানে আসিয়াছেন বা তাঁর আসা উচিত। প্রেক্ষাগৃহের নাট্য-প্রসাধন তাঁর কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া ব্যবহারিক জীবনের সংসর্গ হইতে মুক্তি পাইতে তাঁহাকে সাহায্য করে। তবুও, রঙ্গমঞ্চে তিনি যখন সর্পদংশে অবোধ রাজকুমারের মৃত্যু দেখেন তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মনে শোক উৎপন্ন হয় এবং তিনি এক ধরণের ক্লেশ অনুভব করেন। ইহা ঠিক যে এই বিপত্তি সর্বথা ব্যক্তিগত নয়; তবুও অন্যের বালকেরও এইরূপ মৃত্যু দেখিয়া আমরা শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি—মাত্রা ভেদ নিশ্চতই থাকে কিন্তু সে অনুভব শোকেরই হয়—আমরা ইহা জানি যে এ সব সত্য নয় কিন্তু সেই সময় আমরা এই তথ্যটি বিস্মৃত হই—কবি এবং নটের কৌশল আমাদের বিস্মৃত হইতে বাধ্য করে। এবং ইহা সত্য যে এই সব কিছু নগ্ন বাস্তব রূপ হয় না বরং কল্পনার রমনীয় আবরণের দ্বারা বিজড়িত থাকে সেইজন্য নগ্ন বাস্তবের আঘাতের তীব্রতা ইহাতে থাকে না। এই আঘাত নিশ্চয়ই বাস্তবিক আঘাতের অপেক্ষা কোমল হয়। কিন্তু বিবেচ্য কাব্য-প্রসঙ্গের আস্বাদ কি কেবলমাত্র এই আঘাতের শোক ব্যতীত আর কিছু নয়? যদিও ইহা অপেক্ষাকৃত কোমল তবুও কি প্রেক্ষকের এই শোকের আঘাতের দ্বারা সন্তপ্ত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপলব্ধি হয় না? কোন বিবেকশীল ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে রাজী হইবেন না যে সহস্র বর্ষ হইতে প্রেক্ষক-সমাজ কেবল সন্তপ্ত হইবার জন্য কাব্যের অধ্যয়ন এবং নাটকের প্রেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে উক্ত তাৎকালিক ক্লেশ করুণ রসের আস্বাদ নয়, বরং পরিপাক প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ মাত্র। এই ক্লেশ, যাহার উল্লেখ রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র ও আচার্য শুক্ল করিয়াছেন, তাৎকালিক অনুভব ছাড়া আর কিছু নয়, ইহা উহার পরিণতি নয়। প্রত্যেক সফল কলাকৃতির অধ্যয়ন বা প্রেক্ষণ করিবার পর সহৃদয় অনিবার্যরূপে এক প্রকার মনঃপ্রসাদ ও আত্ম-পরিতোষ লাভ করেন—মনঃ-

প্রসাদের অর্থ এই নয় যে তিনি হাসিতে-হাসিতে (আচার্য শুক্লের অনুসারে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে) প্রেক্ষাগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। কলাকৃতি যত উদাত্ত ও গম্ভীর হইবে, প্রেক্ষক সেই অনুপাতে গম্ভীর হইয়া আত্ম-পরিতোষ লাভ করিবেন। কিন্তু আত্ম-পরিতোষের স্থানে তাঁহার চিত্তে যদি কোন ক্লেশ বা বিক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং তিনি যদি কুণ্ঠিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে কোথাও-না-কোথাও ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। হয় কবি নিজের সামগ্রীর (কাঁচা মালের) —প্রকৃত করুণা এবং ত্রাস প্রভৃতির কলাত্মক পরিণতির ব্যাপারে সফল হন নাই, অর্থাৎ করুণা ও ত্রাসের যথার্থ নগ্নতার পরিহার তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই নতুবা সহৃদয়ের মন কোন উৎকট পূর্বনির্দ্দিষ্ট বিচার-ধারণার দ্বারা আক্রান্ত ছিল। 'প্লেজর' বা আহ্লাদ শব্দের প্রতি যদি আপনি বিরূপ হন, তাহা হইলে উহার উল্লেখ করিব না কিন্তু এই গম্ভীর আত্ম-পরিতোষ নিরানন্দ নয় ইহা মানিতেই হইবে। করুণা ও ত্রাসের পরিণতি মনঃপ্রসাদ বা আত্ম-পরিতোষ রূপে কেমন করিয়া ঘটে, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার এখন সুযোগ আসে নাই—ইহার বিবেচনা আমরা পরে করিব। এখন কেবল ইহা জানিয়া লওয়া পর্যাপ্ত হইবে যে রস-প্রক্রিয়ায় সহৃদয়ের মন অনেক অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়ঃ স্থায়ী ভাবের স্বরূপ অনুসারে তিনি সুখ বা দুঃখ অনুভব করেন, কল্পনা জাগ্রত হইলে পর তাঁহার মনে এক ধরণের স্বচ্ছন্দতার ভাব প্রসার লাভ করে। অপর দিকে কলা তত্ত্বের অনুভূতি সামঞ্জস্য (পরিতোষ), আহ্লাদ, বিস্ময় প্রভৃতির উদ্রেক করে এবং শেষে একটি বিশেষ ধরণের মনোদশা রূপে পরিণতি লাভ করে যাহা নিঃসন্দেহ পরিতোষকারী। কলাত্মক সৃষ্টি প্রক্রিয়া একটি সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াঃ করুণ প্রসঙ্গের আস্বাদনের সময় সহৃদয়ের চিত্তবৃত্তি শোক-ত্রাসাদির অনুভবের দ্বারা কিছুক্ষণ সময়ের জন্য বিক্ষুব্ধ হইয়া অবশেষে সংহতি লাভ করে এবং চিত্তবৃত্তির সংহতি লাভ নিঃসন্দেহ একটি সুখকর স্থিতি। এইরূপ করুণ রসের আস্বাদ শোক, ত্রাসাদির আস্বাদ না হইয়া উহার কলাত্মক পরিণতির আস্বাদ হয়—আস্বাদনের এই প্রক্রিয়ায় সহৃদয় অল্প-বিস্তর কটু অনুভবও লাভ করে, কিন্তু পরিণতিতে কেবল আত্ম-পরিতোষ কিম্বা সুখেরই অনুভূতি হয়।

অতএব রসের অনুভূতি প্রীতিকরই—ইহা আনন্দময়ী চেতনারই রূপঃ বিবাদ যাহা বিদ্যমান আছে—তাহা শাব্দিক, তাত্ত্বিক নয়।

আনন্দের স্বরূপ—কিন্তু আনন্দেরও তো বিভিন্ন স্তর এবং রূপ আছে। রসানন্দের স্বরূপ কি? ইহা স্পষ্ট না করিলে রসের স্বরূপের ব্যাখ্যা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ভারতের সকল প্রাচীন এবং অনেক আধুনিক আচার্যগণ ও অপর দিকে পশ্চিমের নানা মনীষিগণ রসকে এক ধরণের অলৌকিক আনন্দ বা অনুভব রূপে স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্যরা অত্যন্ত আগ্রহপূর্বক এবং প্রবল তর্কের ভিত্তিতে রসের অলৌকিকত্বের প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতের সার কথা এই যেঃ

লৌকিক ভাব এবং বিষয়সকল কাব্য-নিবদ্ধ হইলে পর কারণ-কার্য সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং উহাদের লৌকিক রূপ নষ্ট হইয়া যায়। অলৌকিক বিষয়ের আস্বাদ হওয়ার জন্য রসও অলৌকিকই হয় অর্থাৎ স্মৃতি, অনুমান, প্রত্যক্ষ অনুভব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন হয় ঃ উহা কার্য রূপ নয়, জ্ঞাপ্য নয়, সবিকল্পক জ্ঞান বা নির্বিকল্প জ্ঞানও নয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ নিজেদের ভাবানুসারে প্রায় এই তথ্যেরই আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ

বাস্তবিক সংসারের (যে অর্থে আমরা সাধারণতঃ এই ব্যাক্যাংশের প্রয়োগ করিয়া থাকি) অঙ্গরূপ হওয়া বা অনুকৃতি হওয়া ইহার (কাব্যের) প্রকৃতি নয়; ইহা একটি (অদ্ভুত) স্বতন্ত্র জগৎ—পূর্ণ এবং স্বায়ত্ত।[১]

পরিণামে কোন কলাকৃতির রসাস্বাদনের জন্য আমাদের জীবন হইতে কোন কিছু সঙ্গে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই—উহার বিভিন্ন ভাবধারার এবং কার্য-কলাপের জ্ঞান আবশ্যক নয় এবং কাব্যের মনোবেগের সহিত পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নাই।[২] এই সন্দর্ভে ডঃ রিচার্ড্স বলিয়াছেন[৩] যে উক্ত ধারণার উদ্‌গম স্রোত কান্টের একটি গ্রন্থ; পরবর্তীকালে যাহার আশ্রয়ে হেগেল সৌন্দর্যের সহিত আত্মবাদের সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং ইহার পরের বিচারকেরা—ক্রোচে, বার্ণনলী, ব্রেডলে, বোসাঙ্কে, ক্লাইব বেল প্রভৃতিরা—সৌন্দর্যানুভূতির বিশিষ্ট স্বরূপের একটি সুনিশ্চিত পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ঃ এই পরিকল্পনা অনুসারে সৌন্দর্যের অনুভূতি বিলক্ষণ ও বিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কান্ট এবং হেগেল তো এই বিশিষ্ট অনুভূতিকে আনন্দ রূপ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু পরবর্তী আলোচকগণ নিজেদের নবোৎসাহের দরুণ হয় আনন্দকে এই অনুভবের বিধিমাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, নতুবা আনন্দ হইতেও ইহাকে বিলক্ষণ বলিয়াছেন। এই বিলক্ষণতা বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি ইহাই যে সৌন্দর্যের অনুভূতি তটস্থ, পরোক্ষ, নির্বৈয়ক্তিক, সাধারণীকৃত অনুভূতি—এবং ইহা বৌদ্ধিক এবং সামান্য ইন্দ্রিয় বা রাগাত্মক অনুভূতি হইতে ভিন্ন। এইরূপ প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের উৎসাহী প্রবর্তকেরা কাব্যের অনুভূতিকে প্রকৃতপক্ষে লৌকিক এবং ইহার সাথে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতেও ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

উল্লিখিত বিবেচনার আলোকে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে অলৌকিক এবং বিশিষ্ট বা বিলক্ষণ বিশেষণগুলির ভাবার্থ প্রায় সমান। রস অথবা কাব্যানুভূতি জীবনের অন্য অনুভূতি হইতে ভিন্ন—উহা বৌদ্ধিক অনুভূতি নয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুভব অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্দ্রিয় অথবা রাগাত্মক অনুভূতিও নয়; ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত, ব্যক্তিগত চেতনার সীমানা বহির্ভূত ইহা সাধারণীকৃত অনুভব—অপর দিকে অন্য জীবনগত অনুভূতিগুলি হয় ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষের দ্বারা লিপ্ত প্রত্যক্ষ

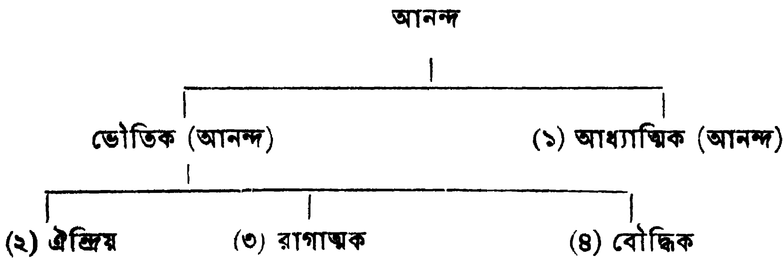
১। অক্সফোর্ড লেক্‌চর্স অন্ পোইট্রী—ব্র্যাড্‌লে, পৃ০ ৫

২। আর্ট—ক্লাইব বেল, পৃ০ ২৫

৩। প্রিন্সিপ্‌লস্ অফ লিটরেরী ক্রিটিসিজ্‌ম্, পৃ০ ২৫

=পরোক্ষ ইন্দ্রিয় অথবা রাগাত্মক অনুভূতি নতুবা বৌদ্ধিক অনুভূতি। সেইজন্য ভারতীয় মনীষিগণ রসানন্দকে অনির্বচনীয় বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন এবং পাশ্চাত্য বিচারকেরা কাব্যানন্দের অনুভূতিরূপে একটি নবীন বিচার 'সৌন্দর্য-বিচারের' কল্পনা করিয়াছেন।

আত্মার সত্তার প্রতি বিশ্বাস থাকিলে অনুভূতির বা সেই অনুসারে আনন্দের স্থূল চারটি ভেদের উল্লেখ করা যাইতে পারে :



স্পষ্টতঃ এই বর্গীকরণ স্থূল এবং ইহা আত্যন্তিক নয়, কারণ ইন্দ্রিয় এবং বৌদ্ধিক অনুভূতি ব্যতীত আধ্যাত্মিক অনুভূতি অসম্ভব। এবং এইরূপে আধ্যাত্মিক বা বৌদ্ধিক অনুভূতি ইন্দ্রিয় অনুভূতি হইতে নিরপেক্ষ কেমন করিয়া থাকিতে পারে? অথব বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বা আত্মা কেমন করিয়া ক্রিয়াশীল হইতো পারে? অতএব এই বর্গীকরণ অনুভূতির মধ্যে উক্ত কোন একটি তত্ত্বের প্রাধান্যকেই সূচিত করে—অনুভূতির কোন রূপই সর্বথা নিরপেক্ষ নয়। উদাহরণস্বরূপ—প্রিয়জনের স্পর্শের আনন্দ ইন্দ্রিয়, (প্রিয়জনের স্নেহের) আনন্দ রাগাত্মক, শাস্ত্রের কোন প্রশ্নের সমাধানের আনন্দ বৌধিক এবং আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের আনন্দ আধ্যাত্মিক।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে কাব্যানন্দ ইহাদের মধ্যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত অথবা উহা কি কোনটিরও অন্তর্ভুক্ত নয়—অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে উহা কি সর্বথা নিরপেক্ষ এবং বিলক্ষণ? সংস্কৃতের অধিকাংশ আচার্যগণ অলৌকিক এবং অনির্বচনীয় বলিয়া উহার বিলক্ষণ স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে তাঁহারা কাব্যানন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ জন্য কোন প্রয়াসই করেন নাই। রস-স্বরূপ প্রসঙ্গে আমরা স্পষ্ট বলিয়াছি যে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে কাব্যাস্বাদের বিষয়ে দুইটি মত পাওয়া যায় : ভৌতিকবাদী এবং আত্মবাদী। প্রাচীনদের মধ্যে ভরত এবং ভট্টলোল্লটের ও পরবর্তী আচার্যদের মধ্যে জৈন বিদ্বান্ রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ ভৌতিকবাদী। ভরত রস এবং উহার আস্বাদের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছেন : রস সুখদুঃখাত্মক ভাবের উপর আশ্রিত কলাত্মক স্থিতিবিশেষ বা সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং উহার আস্বাদ হর্ষাদিসমন্বিত এক ধরণের প্রীতিকর অনুভব। স্পষ্টতঃ উভয় রূপই ভৌতিক—রস ও ইন্দ্রিয়গম্য এবং উহার আস্বাদও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ভট্টলোল্লট রসকে ভাবানুভূতি হইয়া অভিন্ন

স্বীকার করিয়াছেন এবং কাব্যের আস্বাদকে চমৎকার-রূপ। তাঁহার মতানুসারে রসের ভোক্তা মূল নায়কাদি; সহৃদয় সাদৃশ্য প্রভৃতির আশ্রয়ে নটের উপর উঁহাকে আরোপিত করিয়া চমৎকারিত্বের অনুভূতি করেন। এখানে রসের স্বরূপ স্পষ্টতঃ ভৌতিক কিন্তু নাট্য-কৌশলাদির জন্য সহৃদয়ের দ্বারা অনুভূত চমৎকারিত্বের স্বরূপ কীরূপ হইয়া পড়ে তাহা বলা কঠিন। ইহাও কিন্তু প্রসঙ্গের অনুসারে ভৌতিকই প্রতীত হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে নিশ্চিতপূর্বক ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। জৈন আচার্যদের মত খুবই স্পষ্ট। তাঁহাদের অনুসারে রস সুখদুঃখাত্মক অনুভব বিশেষ; শ্রোতা বা প্রেক্ষক উহারই আস্বাদন করেন যদিও এই আস্বাদে কাব্য-কৌশল এবং নাট্য-কৌশলজনিত চমৎকারিতাও সংমিশ্রিত থাকে। অতএব তাঁহাদের মতানুসারে কাব্যানুভূতি নিশ্চিতভাবে ইন্দ্রিয় অনুভূতি, এবং তাহা সর্বদা আনন্দরূপ হয় না।

আত্মবাদী মত আনন্দবাদী মতেরই সমার্থক এবং ইহাই ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের প্রতিনিধি মত। এই মতের অনুসারে রস=কাব্যানন্দ, যাহা ইন্দ্রিয় আনন্দ বা বিষয়ানন্দ হইতে ভিন্ন এবং আত্মানন্দের অত্যন্ত নিকটে ইহার স্থান, যদিও ইহা শুদ্ধ আত্মানন্দ নয়। কাব্যানন্দে রত্যাদি ভাবের ভূমিকা বিদ্যমান থাকে অতএব বিষয়ানন্দ হইতে ইহা সর্বথা অসংপৃষ্ট নয়; কিন্তু এই ভাবগুলি বিশুদ্ধ অর্থাৎ সাধারণীকৃত হওয়ার জন্য রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হয়। অতএব কাব্যানন্দে মৃন্ময় অংশ কম ও চিন্ময় অংশ অধিক বিদ্যমান আছে। চিন্ময় অংশের প্রাধান্যের জন্য ইহা আত্মানন্দের সমীপ আসিয়া যায় কিন্তু রত্যাদির ভূমিকা থাকার জন্য ইহা অস্থায়ী এবং সোপাধি রূপ গ্রহণ করে—স্থায়ী এবং নিরুপাধি হইতে পারে না। এইরূপে কাব্যানন্দের স্থিতি মধ্যবর্তী: ইহা বিষয়ানন্দের অপেক্ষা অধিক শুদ্ধ এবং চিন্ময় এবং আত্মানন্দের তুলনায় স্থূল ও অস্থায়ী। বস্তুতঃ ভারতের আনন্দবাদী দর্শনে আনন্দকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আত্মাস্বাদ রূপেই স্বীকার করা হইয়াছে—বিষয়ানন্দেও আনন্দতত্ত্ব আত্মাস্বাদেরই বাচক এবং কাব্যানন্দেও আনন্দের অর্থ স্পষ্টতঃ বিশুদ্ধ ভাব-ভূমিকার আশ্রয়ে আত্মভোগই। অতএব কাব্যানন্দের মধ্যে স্বভাব এবং শ্রেণীগত কোন পার্থক্য নাই, যদিও গুণের দৃষ্টিতে পার্থক্য বিদ্যমান আছে এবং ইহাকে বিলক্ষণ বলা চলে যেহেতু কাব্যানন্দ বিষয়ানন্দ নয় এবং শুদ্ধ আত্মানন্দও নয়।

পশ্চিমে কাব্যাস্বাদের স্বরূপের ইতিহাস অত্যন্ত রুচিকর। প্লেটো বুদ্ধি এবং আত্মাকে এক স্বীকার করিয়া দুই ধরণের অনুভূতির কথা বলিয়াছেন—আধ্যাত্মিক (বৌদ্ধিক) অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতি। কাব্যানুভূতিকে তিনি সৌন্দর্যানুভূতি (যাহাকে তিনি আত্মার অনুভব রূপে গ্রহণ করেন) হইতে পৃথক্ ঐন্দ্রিয় অনুভূতি রূপে স্বীকার করিয়া ইহাকে মিথ্যা নিম্ন কোটির অসুস্থ আনন্দ বলিয়াছেন:

সক্রেতিস—ইহাদের মধ্যে কিছু কলা-প্রক্রিয়া এমনও আছে যাহা আত্মার পরম কল্যাণ করে; অন্য × × × কল্যাণকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল সুখ এবং উহার সিদ্ধির

উপায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে, এই বিচার করে না যে কোন আনন্দটি সৎ এবং কোনটি অসৎ।

× × ×

সক্রেতিস—× × × ইহার (ট্র্যাজেডির) কি একমাত্র প্রয়োজন ও লক্ষ্য প্রেক্ষককে সুখ প্রদান করা অথবা সুখের বিরোধ করা বা তাহাদের মধুর পাপের উল্লেখ না করিয়া শব্দ এবং গানের দ্বারা স্বেচ্ছাপূর্বক প্রিয় ও অপ্রিয় সত্যের বর্ণনা করা ? তোমার বিচারে ইহার প্রকৃতি কি ?

কাল্লিক্লেস—সক্রেতিস, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ট্র্যাজেডি সামাজিকের সুখ ও পরিতোষের প্রতি উন্মুখ থাকে।

সক্রেতিস—এবং কাল্লিক্লেস। ইহা কি সেইরূপ বস্তু নয়, যাহাকে আমরা সম্প্রতি চাটুক্রিয়া শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছি ? (গোরগিঅস, পৃঃ ৫০১-৫)

এরিস্টটলও কাব্যের আনন্দকে আধ্যাত্মিক না বলিয়া লৌকিকই বলিয়াছেন, কিন্তু প্লেটোর অনুরূপ উহাকে অসৎ অথবা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া উহার তিরস্কার করেন নাই। তাঁহার মতানুসারে কাব্যের আনন্দ আধ্যাত্মিক আনন্দ নয়, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় আনন্দ নয় এবং বৌদ্ধিক আনন্দও নয়—উহা লৌকিক জীবনেরই অন্তর্গত প্রত্যভিজ্ঞানের আনন্দ, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রত্যভিজ্ঞান নয় কল্পনাত্মক প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ এই আনন্দ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-মানসিক আনন্দের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ আলোচক এডিসন ইহাকেই 'কল্পনার আনন্দ' বলিয়াছেন। কল্পনার এই (গৌণ) আনন্দকে তিনি সর্বত্রই মনের সেই ক্রিয়ার পরিণাম বলিয়াছেন যাহা মূল বস্তু হইতে উৎপন্ন বিচারের (মানস-বিম্বের) সহিত গঠনগত ভাবে মূর্তি, চিত্র অথবা সঙ্গীতাত্মক অভিব্যঞ্জনা হইতে উৎপন্ন বিচারের (মানস-বিম্বের) তুলনা করে। এই উদ্ধরণটি নিশ্চিত এরিস্টটলের বাক্যেরই ব্যাখ্যা—এডিসন এরিস্টটলের বিবেচনাকে পারিভাষিক ভাষায় রূপবদ্ধ করিয়াছেন।[১]

প্লেটো এবং এরিস্টটলের পরে প্লেটোরই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত প্রেরণা হইতে ইউরোপে ক্রমশঃ 'আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে'র পরিকল্পনা বিকাশ লাভ করিল। ক্রোচে নিজের গ্রন্থ 'এ্যাস্থেটিক'এ ইহাকে 'রহস্যবাদী সৌন্দর্য-দর্শন' বলিয়াছেন। ইহার স্পষ্ট প্রতিপাদন সর্বপ্রথম গ্রীক-রোমন পণ্ডিত প্লোটিনস করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্যের সার কথা এই যে: প্রকৃতির সৌন্দর্যের উদ্‌গম আত্মা। অতএব প্লেটোর এই নির্ণয় ভ্রান্ত যে 'কলা প্রকৃতির অনুকরণ করে এবং প্রকৃতি স্বয়ং জ্ঞানের অনুকৃতি, অতএব অনুকৃতির-অনুকৃতি হওয়ার জন্য কলা মিথ্যা এবং অস্পৃহনীয়'। কারণ এই যে কলার উদ্‌গমও সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান হইতে স্বয়ং প্রকৃতি উৎপন্ন হয়।[২] এই রহস্যবাদী বা

---

১. দ্রষ্টব্য: অরস্তু কা কাব্যশাস্ত্র—ভূমিকা, পৃ০ ৩৭

২. দ্রষ্টব্য: এ্যাস্থেটিক (ক্রোচে) ১৯২৩, পৃ০ ১৬৮

আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য-দর্শন অন্ধকার যুগে ধর্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া কলার দর্শন এবং ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়ে। কয়েক শতাব্দী পরে যখন ইউরোপে জার্মান অধ্যাত্মবাদের উদ্ভব ও বিকাশ লাভ হয় তখন সৌন্দর্য ও কলারও অধ্যাত্মপরক গহন ব্যাখ্যার প্রসার ঘটে—কাণ্ট, শিলর, হীগেল প্রভৃতি বিদ্বানগণ এই সিদ্ধান্তের বিকাশে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করিয়াছেন। এই দার্শনিকদের সূক্ষ্ম সৈদ্ধান্তিক ভেদাভেদের বিবেচনা করা এখানে অভীষ্ট নয় এবং সঙ্গতও নয়। সাধারণতঃ ইহাদের সকলের স্পষ্ট মত ছিল যে কলার (বা সৌন্দর্যের) সৃষ্টি একটি আধ্যাত্মিক ক্রিয়াবিশেষ ঃ এই রূপে আত্মার (মূর্ত) ইন্দ্রিয়গম্য অভিব্যক্তিরই নাম সৌন্দর্য।১ অতএব পারিভাষিত সৌন্দর্যের চর্বণাও স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিক অনুভূতিই হওয়া প্রয়োজনীয়। এই বর্গের বিদ্বানদের মতানুসারে আধ্যাত্মিক অনুভূতিই কাব্যের আস্বাদ এবং এই অনুভূতি নিশ্চিতরূপে আনন্দময়। কাণ্টের ভাষায় ইহা এক ধরণের অতীন্দ্রিয় এবং সার্বভৌম আনন্দ যাহা একদিকে যোগ-ক্ষেময় ভাবনা হইতে মুক্ত এবং অপর দিকে বৌদ্ধিক ধারণা হইতেও মুক্ত।২

কালক্রমে এই অধ্যাত্মবাদী সৌন্দর্য-দর্শনের বিরোধ শুরু হয় এবং মার্ক্স এবং ফ্রয়েডের বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের আলোক সৌন্দর্য এবং উহার অনুভূতির অত্যন্ত প্রবল ভাষায় ভৌতিকবাদী ব্যাখ্যার প্রসার ঘটে। মার্ক্সবাদের অনুসারে কলার অনুভূতি আর্থিক লাভের দ্বারা অনুশাসিত ভৌতিক অনুভূতি এবং অপর দিকে ফ্রয়েডের মতে উহা কামের দ্বারা প্রেরিত ইন্দ্রিয় আস্বাদ মাত্র। বিংশ শতাব্দীতেও অনেক কাব্য-সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ইহাদের আলোকে কাব্যানুভূতির স্বরূপের বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখান করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রায় উক্ত ধারণারই রূপান্তর মাত্র। হ্যাঁ, কেবল ক্রোচের (সহজানুভূতি) সিদ্ধান্তে অল্পবিস্তর নবীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতানুসারে আত্মার দুইটি ক্রিয়া—(১) বিচারাত্মক এবং (২) ব্যবহারাত্মক। বিচারাত্মক ক্রিয়া বা জ্ঞানের দুইটি রূপ আছে ঃ জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ্য হয় অথবা প্রমেয়; কল্পনার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান অথবা প্রমা দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান; ব্যষ্টির (বিশেষ) জ্ঞান বা সমষ্টির (সামান্য) জ্ঞান; বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান অথবা উহাদের পরস্পর সম্পর্কের জ্ঞান; প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান হয় বিম্বের উৎপাদক, নতুবা ধারণার উৎপাদক হয়।৩

জ্ঞানের প্রথম ভেদের সহিত—অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ্য জ্ঞানের সহিত কলা সম্বন্ধযুক্ত—ইহারই নাম সহজানুভূতি ঃ কলা সহজানুভূতিই। এইরূপ ক্রোচের অনুসারেও কলা এক ধরণের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াবিশেষ যাহা আত্মার বিচারাত্মক প্রবৃত্তি অথবা জ্ঞানেরই অঙ্গ। কলা অর্থাৎ সহজানুভূতির আস্বাদ কলাকারের পক্ষে আনন্দময়ই হয় এবং যখন ইহা

---

১. এ্যাস্থেটিক (ক্রোচে)—১৯৫৩, পৃ০ ২৯৯

২. ঐ, পৃ০ ২৮০

৩. এ্যাস্থেটিক, পৃ০ ১৪

মূর্তরূপ ধারণ করিয়া লয় তখন স্বভাবতঃ সেই মূর্তরূপের আস্বাদও সামাজিকের পক্ষে আনন্দদায়কই হয়। অতএব এখানে কলা বা কাব্যের আস্বাদকে মূলতঃ আধ্যাত্মিক মানিয়া লইলেও উহাকে ভাবের অপেক্ষা কল্পনার উপরই আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং ক্রোচে প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক এবং এরিস্টটলের বিচারের সমন্বিত রূপের আশ্রয়ে এই পরিকল্পনাটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

উল্লিখিত বিবেচনার ফলে কাব্যানন্দ অথবা 'রসাস্বাদন-সমুদ্ভূত আনন্দের' স্বরূপের বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া যায়ঃ

(১) কাব্যানন্দ প্রত্যক্ষ ঐন্দ্রিয়-মানসিক আনন্দ। প্রাচীনদের মধ্যে প্লেটো এবং নবীন বিচারকদের মধ্যে মার্ক্স ও ফ্রয়েড স্বকীয় বিচারানুভূতির অনুসারে এই মতের প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(২) কাব্যের আনন্দ আত্মিক আনন্দেরই সমরূপঃ সংস্কৃতের প্রতিনিধি আচার্যগণ অভিনব, মম্মট, জগন্নাথ প্রভৃতিদের এবং অপর দিকে পশ্চিমের অধ্যাত্মবাদী বিচারকদের ইহাই মত।

(৩) কাব্যানন্দ কল্পনার আনন্দঃ এরিস্টটলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এডিসন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মতের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ক্রোচে ইহাকেই দার্শনিক রূপে ঢালিয়া সহজানুভূতির আনন্দ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(৪) কাব্যের আনন্দ সব রকম লৌকিক (এবং আধ্যাত্মিক) অনুভব হইতে ভিন্ন এক ধরণের বিলক্ষণ আনন্দ এবং যাহা সর্বথা নিরপেক্ষ। যদিও এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত প্রাচীন কিন্তু নবীন ভাবে, উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের আরম্ভে ব্রাডলি, ক্লাইব বেল প্রভৃতি কলাবাদীরা সুব্যবস্থিতরূপে এই সিদ্ধান্তটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যদিও এই সিদ্ধান্তটি কিছু-কিছু রহস্যবাদী বিশেষত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত এবং রিচার্ড্স ইহার উপর কাণ্ট ও হীগেল প্রভৃতিদের অপ্রত্যক্ষ প্রভাবকে স্বীকারও করিয়াছেন, তবুও 'বিলক্ষণ অনুভূতি' এবং 'আধ্যাত্মিক অনুভূতি'কে এক মানিয়া লওয়া ঠিক হইবে না, কারণ এই 'বিলক্ষণ অনুভূতি' কেবল লৌকিক আনন্দ হইতে নয়, আধ্যাত্মিক আনন্দ হইতেও বিলক্ষণ।

কাব্যানন্দ অথবা রসের স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য এই চারটি সিদ্ধান্তের পরীক্ষণ আবশ্যক। শেষ সিদ্ধান্ত হইতে আলোচনা শুরু করা যাক। বিলক্ষণতার সপক্ষে যতগুলি কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে কাব্যের আস্বাদ ভাবের আস্বাদ যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ঐন্দ্রিয় রাগাত্মক অনুভূতি হইতে ভিন্ন, শুদ্ধ বৌদ্ধিক অনুভব—সমস্যার সমাধান, অনুমান, প্রমাণ প্রভৃতির অনুভব হইতেও ভিন্ন এবং অপর দিকে শুদ্ধ আত্মানন্দ, যোগ ইত্যাদির আনন্দ হইতেও ভিন্ন। কিন্তু ইহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে এই অনুভবটি সামান্য জীবনগত অনুভব নয়—ইহা লোকের অনুভব নয়। ইহাতে ইন্দ্রিয় তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, বৌদ্ধিক তত্ত্বেরও একান্ত অভাব নাই এবং আত্মায় যাঁদের বিশ্বাস আছে তাঁহাদের

মতানুসারে—আত্মানুভবেরও কিঞ্চিৎ স্পর্শ আছে। এই অনুভবের স্বরূপের সংঘটন অন্য অনুভূতি সকল হইতে অবশ্যই ভিন্ন কিন্তু উহার আধার-তত্ত্ব সর্বথা বিলক্ষণ নয়, অতএব ইহাতে শ্রেণীগত ভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু স্বভাবগত ভিন্নতা খুবই কম। তটস্থ অনুভব বা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত সাধারণীকৃত অনুভবও তো ঐন্দ্রিয়-রাগাত্মক অনুভবেরই পরিষ্কৃত রূপ। উদাহরণস্বরূপ ডঃ রিচার্ড্‌স বলিয়াছেন কাব্যানুভূতির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় আমাদের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিই মাধ্যম রূপে কাজ করে, অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সৌন্দর্যের আস্বাদের জন্য কোন অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-বিশেষের আবিষ্কার করিতেছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত সৌন্দর্য-চেতনাকে বিলক্ষণ ভাব বা অনুভূতি বলিয়া স্বীকার করা অসঙ্গত হইবে। এই যুক্তি অনুসারে বিলক্ষণবাদিদের মত সহজেই অশুদ্ধ প্রমাণিত হয়।

কাব্যানন্দ কল্পনার আনন্দ—এই মতটিই কেবল আংশিক রূপে ঠিক। কাব্যানন্দে ভাবের আধার-ভূমিকাও অনিবার্যরূপে বিদ্যমান থাকে, এই মহত্ত্বপূর্ণ তথ্যটি এখানে উপেক্ষিত। আমাদের আবেগপ্রবণ জীবনই কাব্যের মূল ভিত্তিরূপ—কল্পনা উহার মাধ্যম এবং অনিবার্য মাধ্যম, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবুও কেবল কল্পনার আশ্রয়ে কাব্য রচনা সম্ভবপর নয়। অতএব কাব্যের আস্বাদ কেবল কল্পনার আস্বাদ হইতে পারে না। কাব্য-ক্ষেত্রের বাহিরেও জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে কল্পনার প্রচুর ব্যবহার হয়—বিজ্ঞানের আবিষ্কারে কল্পনার যতখানি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, ততখানি আর অন্যত্র কোথায় হইতে পারে? কিন্তু এইরূপ অনুভূতির কাব্যাস্বাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা ব্যতীত, কল্পনাও তো মন ও বুদ্ধিরই ক্রিয়া, অতএব কল্পনার আনন্দ মানসিক-বৌদ্ধিক আনন্দেরই অন্তর্গত। ইহা আনন্দের কোন নবীন ভেদ বা প্রভেদ নয়।

কাব্যের আনন্দ আত্মিক আনন্দেরই সমরূপ। বাস্তবে এই মন্তব্যটির বিষয়ে তর্ক করা অপেক্ষাকৃত কঠিন, কারণ আত্মার সত্তা এবং স্বরূপই বিতর্কমূলক। ভারতীয় রস সিদ্ধান্তের মূল স্রোত শৈব দর্শনের অনুসারে আনন্দ আত্মারই স্ব-রূপ, অতএব প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আনন্দ আত্মপরামর্শ বা আত্মাস্বাদ রূপই হয়ঃ বিষয়ানন্দেও আনন্দ-তত্ত্ব আত্মাস্বাদেরই সমার্থক। এইরূপে, ইতিপূর্বে যাহা আমরা বলিয়াছি ইন্দ্রিয় এবং আত্মিক আনন্দের মধ্যে প্রকৃতগত প্রভেদ নাই, গুণের দিক দিয়া প্রভেদ আছে। এবং সেইজন্য বিষয়ানন্দ, কাব্যানন্দ ও আত্মানন্দের মধ্যে শুদ্ধতার দিক দিয়া কেবল মাত্র ভেদ অবশেষ থাকিয়া যায়। বেদান্তের মত ইহা হইতে একটু ভিন্ন —বেদান্ত বলে যে ঐন্দ্রিয় আনন্দ মিথ্যা, মায়াজনিত ভ্রান্তি মাত্র। আত্মজ্ঞান আত্মার শুদ্ধ নিরুপাধি স্থিতিবিশেষ—ইহা নির্বিতর্ক জ্ঞানেরই অপর নাম। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা প্রায় আত্মানুভূতিকে অতীন্দ্রিয় অনুভব বলিয়া স্বীকার করেন—কিন্তু তাঁহারাও ইন্দ্রিয়ের সংসর্গের নিষেধ করেন না—তাঁহাদের মত এই যে আত্মানুভবে ইন্দ্রিয় সংসর্গ শেষে ছিন্ন হইয়া যায় এবং শুদ্ধ নির্বিকার স্থায়ী আনন্দেরই স্থিতি অবশেষ থাকিয়া যায়।

উল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে অন্ততঃ ইহা নিশ্চিতরূপে স্পষ্ট হয় যে কাব্যানন্দ শুদ্ধ আত্মানন্দ নয় এবং বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ কেহ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন নাই—উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সমতাকে স্বীকার করিয়াও গুণের দিক দিয়া প্রভেদকে অবশ্যই সকলে স্বীকার করিয়াছেন। আত্মানন্দে যেখানে শুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বের ভোগ বিদ্যমান, সেখানে কাব্যানন্দে ভৌতিক জীবনের স্পর্শ বর্তমান। সাধারণীকৃত ভাব-ভূমিকাও অভৌতিক নয়: উহাতে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্তি লাভের ফলে ভাবের পরিষ্করণ ও উন্নয়ন ঘটে কিন্তু ইহাকে অভৌতিক বা অতীন্দ্রিয় বলার কি কোন অর্থ আছে? মনই তো ইহাকে অনুভব করে। কাব্যের আনন্দ প্রত্যক্ষ স্থায়ী ভাবের আস্বাদ নয়—কাব্য-নিবদ্ধ বা কাব্য দ্বারা পরিশুদ্ধ স্থায়ী ভাবেরই আস্বাদ। এখন প্রশ্ন এই যে স্থায়ী ভাব কি কাব্য নিবদ্ধ হইয়া, অথবা কাব্যের প্রভাব স্বরূপ ব্যক্তি-সংসর্গ হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি রূপে প্রমাতার চেতনায় সন্নিবিষ্ট হইয়া যায়? আমার ধারণা যে ইহার উত্তর নঞর্থকই হইবে, কারণ কাব্যের রচনা বা অনুভূতি ক্রিয়া আত্মার ক্রিয়া নয়—অন্ততঃ সেই অর্থে তো নয়ই যে অর্থে যোগ-সাধন বা ব্রহ্ম-চিন্তার উল্লেখ করা হয়। এমন অবস্থায় কাব্য-নিবদ্ধ বা কাব্য-প্রেরিত স্থায়ী ভাবের আস্বাদকেও আধ্যাত্মিক আনন্দ বলা যাইতে পারে না অর্থাৎ কাব্যানন্দ প্রচলিত অর্থে আত্মানন্দের সমার্থক বা সমরূপ নয়। বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার জন্য সামান্য অনুভব হইতে বড় আর কি প্রমাণ হইতে পারে? যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লই যে প্রত্যেকটি অনুভূতি আত্মারই অনুভূতি এবং আনন্দের প্রত্যেকটি রূপ আত্মানন্দেরই সমরূপ, তাহা হইলে তো সব ভেদই মিটিয়া যায়। কিন্তু আমরা আনন্দের বিভিন্ন রূপ ও স্তরের মধ্যে প্রভেদ করি, তাহা হইলে কাব্যানন্দকে অত্যন্ত উদাত্ত ও অবদাত অনুভব রূপে স্বীকার করিলেও আত্মানন্দ-রূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এখন প্রথম বিকল্পটির বিবেচনা অবশিষ্ট আছে। প্রথম বিকল্পটির অনুসারে কাব্যের আনন্দ ইন্দ্রিয় আনন্দ। প্লেটো ইহাকে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় আনন্দ বলিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই মত কাব্য-সত্য এবং বস্তু-সত্যের ভ্রান্তির উপর আশ্রিত ছিল এবং আমরা যুক্তি তর্কের দ্বারা ইহার খণ্ডন করিয়াছি। তবুও, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় বা লৌকিক অনুভব না হইলেও, কাব্যের আনন্দ লৌকিক জীবনেরই অনুভূতি—এই স্বতঃস্পষ্ট তথ্যটিকে অগ্রাহ্য করা কেমন করিয়া সম্ভব? ভক্তি ও রহস্যবাদ ব্যতীত কাব্যের সমস্ত বিষয় লৌকিকই, উহার উপকরণ—ভাব, কল্পনা, বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বগুলিও লৌকিকই এবং আস্বাদয়িতা বাসনাযুক্ত সামাজিকই, ভক্ত, বা যোগী নয়। এমন অবস্থায় কাব্যানন্দকে লোক বাহ্য বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বলা যাইতে পারে না। ইহার সম্বন্ধে কোন বিবাদও নাই অর্থাৎ ইহা লৌকিক-ইন্দ্রিয়-মানসিক অনুভূতিই এবং, ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণিত করিয়াছি ইহার আধার ভাব। অতএব মনোবিজ্ঞানের পরিধির ভিতরই ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে এই প্রসঙ্গটির বিবেচনা সমীচীন হইবে :

অস কহি ফির চিতয়ে তেহি ওরা।
সিয়মুখ-সসি ভয়ে নয়ন চকোরা।
ভয়ে বিলোচন চারু অচঞ্চল।
মনহুঁ সকুচি নিমি তজে দিগঞ্চল॥
দেখি সীয় সোভা সুখ পাবা।
হৃদয় সরাহত বচনু ন আবা।
জনু বিরঞ্চি, সব নিজু নিপুনাই।
বিরচি বিশ্ব কহঁ প্রগট দেখাই॥
সুন্দরতা কহঁ সুন্দর করই।
ছবিগৃহঁ দীপসিখা জনু বরই।
সব উপমা কবি রহে জুঠারী।
কেহি পটতরৌঁ বিদেহকুমারী॥

(রামচন্দ্র মানস, বালকাণ্ড-দোহা ২২৯-২৩০)

ইহা রামচরিত মানসের জনকবাটিকা-প্রসঙ্গ। ইহার মনন করিয়া আমি নিশ্চিতরূপে আনন্দ অনুভব করি ঃ প্রসঙ্গটি শৃঙ্গার রসের এবং আমার এই আনন্দের প্রেম (রতি) ভাবের সহিত নিশ্চিত সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ আমার হৃদয় রতি-ভাবের অনুভবের মধ্যে হইতে অগ্রসর হইয়া আনন্দের আস্বাদ করে। কিন্তু তবুও এই আনন্দ এবং প্রত্যক্ষ প্রিয়-মিলনের (রতি-ভাবের) আনন্দের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি এই প্রভেদ সম্বন্ধে অবগত এবং প্রত্যেক সহৃদয়ও এই প্রভেদের সহিত পরিচিত। এই প্রভেদটি কীরূপ? জীবনগত রতির অনুভব প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের দ্বারা আবিষ্ট অতএব অপেক্ষাকৃত অধিক তীব্র। কাব্য-নিবদ্ধ রতির (শৃঙ্গার রসের) অনুভব প্রত্যক্ষ ঐন্দ্রিয় মানসিক অনুভব নয়, ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের দ্বারা আবিষ্টও নয়—অতএব তত তীব্রও নয়। এই অনুভবের স্বরূপকে স্পষ্ট করিবার জন্য কাব্যাস্বাদন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ আবশ্যক। যখন আমি উক্ত পংক্তিগুলি পাঠ করি তখন সর্বপ্রথম শব্দ ও লয়ের সঙ্গীত আমার চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে, এবং ইহার পরে প্রায় অসংলক্ষক্রম রীতিতে অর্থ-বোধ হয়; তারপরে কাব্য-ভাষার কল্পনাত্মক তত্ত্বের (লক্ষণা-ব্যঞ্জনা) প্রভাব স্বরূপ আমার কল্পনা সক্রিয় হইয়া ওঠে—সীমিত অর্থ-বোধের (অভিধার্থ) বন্ধন ছিন্ন হইয়া পড়িলে নানা প্রকারের সংস্কার-চিত্র প্রকট হইতে লাগে। বিভিন্ন সঞ্চারীর দ্বারা পরিবৃত আমার নিজস্ব রতি-ভাব উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পড়ে যাহা কোন বাস্তবিক ব্যক্তির প্রতি উন্মুখ না থাকার জন্য বৈয়ক্তিক রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হয় এবং শেষে এই সম্পূর্ণ অনুভব-প্রক্রিয়া একটি সুখজনক অনুভূতিতে পরিণত হইয়া যায়। ইহা স্পষ্ট যে এই সুখজনক অনুভূতি প্রত্যক্ষ রতি-ভাবের আনন্দ নয়, পরোক্ষ রতি-ভাব অর্থাৎ রতি-ভাবের স্মৃতির আনন্দও নয়

কারণ কল্পনাগত অনুভূতি হইলে পরেও স্মৃতি ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ দ্বারা নিশ্চিতই আপ্লাবিত থাকে এবং সেইজন্য স্বরূপের দিক দিয়া সুখদুঃখাত্মক হয়—এই সঙ্গে ইহা রতি ভাবের সফল বিবেচনারও আনন্দ নয়, কারণ ইহা মূলতঃ বুদ্ধির ক্রিয়া নয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি সংশ্লিষ্ট আস্বাদবিশেষ যাহার মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভাবাবেগ এবং বুদ্ধি তত্ত্বের লবণ-নীর সংযোগ বিদ্যমান থাকে। "এখন একটি এমন শব্দ আছে —অনুভূতি—যাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। অনুভূতির বিশ্লেষণ করিলে আমাদের কাছে কেবল সংবেদন (Sensation) অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এগুলিকে আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মনোজগতের অণু-পরমাণু বলিতে পারি। শারীরিক রূপে এই সংবেদনগুলি প্রত্যক্ষ এবং স্থূল, মানসিক রূপে সূক্ষ্ম ও প্রতিবিম্ব-রূপ এবং বৌদ্ধিক স্তরে পৌঁছাইতে-না-পৌঁছাইতে এগুলি এত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে অর্থাৎ ইহাদের প্রতিবিম্বও এত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে যে প্রায় অরূপের মত দৃষ্টিগোচর হয়। উহাদের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল অন্বিতি সূত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ যথা, খুবই সরু চেনের আংটাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না কেবল চেনটা একটি সুতার মত অনুমিত হয়। এইরূপ, প্রকৃতপক্ষে অনুভূতি প্রত্যেক অবস্থায় মূল সংবেদন রূপ হয়, উহাতে (শারীরিক, মানসিক এবং বৌদ্ধিক প্রত্যেক ক্ষেত্রে) কেবল প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাত্রা ভেদ বিদ্যমান থাকে মূল স্বরূপের নয়। অতএব কাব্যের অনুভূতি বা আনন্দ সংবেদন রূপই কিন্তু এই সংবেদনগুলি স্থূল এবং প্রত্যক্ষ না হইয়া সূক্ষ্ম ও প্রতিবিম্বরূপ হয়। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষতা এবং তীব্রতার মাত্রা বিচারে আমরা ক্রমশঃ তিন প্রকারের সংবেদনার কল্পনা করিতে পারি—(১) প্রথম, স্থূল ও প্রাকৃতিক সংবেদন (ইহা একান্তরূপে প্রত্যক্ষ ও স্থূল হয়) যাহার, উদাহরণস্বরূপ, আমরা নিজের প্রিয়জনকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রভৃতি করিয়া উপলব্ধি করি। (২) দ্বিতীয়, সেই সব সংবেদন যেগুলি উক্ত স্পর্শাদির স্মরণে উপলব্ধ হয়—এগুলি, যেন, প্রথম প্রকারের সংবেদনার প্রতিবিম্বরূপ। স্বভাবতঃ এই সংবেদনগুলি প্রত্যক্ষ ও স্থূল কম এবং আন্তরিক ও সূক্ষ্ম অধিক। (৩) তৃতীয়, সেই সব সংবেদন যেগুলি এই স্মৃতির বিশ্লেষণ বা বৌদ্ধিক অধ্যয়নের দ্বারা উপলব্ধ হয়। এই সংবেদনগুলি যেন প্রতিবিম্বেরও প্রতিবিম্ব—এবং স্বভাবের দিক দিয়া অত্যন্ত আন্তরিক ও সূক্ষ্ম। প্রকৃতপক্ষে, ইহাদের স্থূল শারীরিক অংশ প্রায় নষ্টই হইয়া যায়। এগুলিকে আমরা বৌদ্ধিক সংবেদন বলিতে পারি। সকল প্রকারের বৌদ্ধিক ক্রিয়ায় আমরা এইরূপ সংবেদনার উপলব্ধি করি। প্রত্যক্ষ জীবনে প্রায় এই তিন রকম সংবেদনার মধ্যবর্তী একটি চতুর্থ রকমের সংবেদনা বিদ্যমান আছে যার উপলব্ধি স্মৃতির ভাবনের দ্বারা (ক্রোচের ভাষায় সহজানুভূতির দ্বারা এবং সাধারণ ব্যবহারিক ভাষায় কাব্যরূপে উপস্থিত বা গ্রহণের দ্বারা) করা হয়। এই ভাবনের অনুভব স্মৃতির প্রত্যক্ষ অনুভব নয়, উহার বিশ্লেষণ প্রভৃতির বৌদ্ধিক অনুভবও নয়, কারণ স্মৃতির অনুভবের অপেক্ষা ইহা অধিক সূক্ষ্ম এবং বৌদ্ধিক অনুভবের অপেক্ষা ইহা অধিক স্থূল এবং এই অনুপাতে ইহার সংবেদনগুলি স্মৃতির সংবেদনা হইতে অধিক

সূক্ষ্ম এবং বৌদ্ধিক সংবেদনা হইতে অধিক স্থূল হয়। এইরূপে কাব্য হইতে প্রাপ্ত সংবেদনাগুলি প্রত্যক্ষ মানসিক (বা স্মৃতি জন্য) সংবেদনা হইতে সূক্ষ্মতর এবং বৌদ্ধিক সংবেদনা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রত্যক্ষ বা স্থূল প্রমাণিত হয়। এই-জন্যই তো' কাব্যানুভূতিতে একদিকে ইন্দ্রিয় অনুভূতির স্থূলতা এবং তীব্রতা (ইন্দ্রিয়তা এবং কটুতা) বিদ্যমান থাকে না এবং অপর দিকে বৌদ্ধিক অনুভূতির অরূপতাও থাকে না; এবং এই কারণে—ইহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অপেক্ষা অধিক শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত এবং বৌদ্ধিকানুভূতির অপেক্ষা অধিক সরস হয়।"[১]

■ ■ ■

১. রীতিকাব্যের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত

(গ) করুণ রসের আস্বাদ

রসাস্বাদ অনিবার্যতঃ আনন্দময় ইহার প্রমাণ দেওয়ার পরে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক রূপে মনে আসে যে করুণাদি রসের আস্বাদ কেমন করিয়া প্রীতিকর হইতে পারে?—ইহা কাব্যশাস্ত্রের একটি অত্যন্ত মৌলিক এবং গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্ন। যদিও ভারতীয় আচার্যদের পক্ষে এই প্রশ্নটি খুব অধিক বিবাদপূর্ণ ছিল না, তবুও এই সম্বন্ধে নিশ্চিত-রূপে তাঁহারা খুবই সজাগ ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ রূপে নিজেদের বিচারানুসারে ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই সকল বিশ্লেষণের অধ্যয়নান্তে এই প্রশ্ন-সম্বন্ধে অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমাধান উপলব্ধ হয়ঃ

(১) কাব্যের সৃষ্টি নিয়তিকৃত নিয়ম হইতে ভিন্ন নানাচমৎকারময়ী সৃষ্টি; কাব্য-রস অলৌকিক অতএব লৌকিক কার্য-কারণ-সম্বন্ধ উহার জন্য অনিবার্য নয়। দুঃখ হইতে দুঃখের উৎপত্তি লৌকিক নিয়ম অনুসারে হয় কিন্তু কবির অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শে কাব্যে দুঃখ হইতে সুখের উৎপত্তিও সহজে সম্ভবপর হয়—ইহাই কাব্যের অলৌকিকতাঃ

(ক) হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ ॥
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ ॥
সুখং সংজায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোঃ হপীতি কা ক্ষতিঃ ॥

—সাহিত্যদর্পণ ৩.৬—৭

—অর্থাৎ লোক বা জগতের সংশ্রয়ের দ্বারা শোকহর্ষাদির কারণ রূপে প্রসিদ্ধ, বনবাসাদি হইতে লোকে লৌকিক শোক উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কাব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে এই কারণগুলি অলৌকিক বিভাব বলিয়া কথিত হয়। অতএব ইহাদের দ্বারা সুখই প্রাপ্ত হয়, ইহা স্বীকার করিতে কি কোন ক্ষতি আছে?

(বিমলা টীকা, পৃ০ ৫২-৫৩)

(খ) অযং হি লোকোত্তরস্য কাব্যব্যাপারস্য মহিমা, যৎ প্রয়োজ্যা অরমণীয়া অপি শোকাদয়ঃ পদার্থা আহ্লাদমলৌকিকং জনয়ন্তি।

—ইহা অলৌকিক ব্যাপারের (ব্যঞ্জনা) মহিমা। উহার দ্বারা অভিব্যক্ত অরমণীয় শোকাদি পদার্থও অলৌকিক আনন্দ উৎপন্ন করে।

(রসগঙ্গাধর—চৌখম্বা বিঃ ভঃ, প্রঃ আঃ পৃ০ ১০৯)

ইহা মূলতঃ সেই চিন্তাধারা যাহার পশ্চিমের শিল্প কলাবাদী—ব্র্যাডলে, ক্লাইব

বেল প্রভৃতিরা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—প্রথমতঃ এই অনুভবের উদ্দেশ্য অনুভব স্বয়ং, এই অনুভবের জন্যই এই অনুভব কামনা করা যাইতে পারে, ইহার নিজস্ব মূল্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, কাব্যের আলোকে ইহার নিজস্ব মূল্যেরই গুরুত্ব সর্ব-প্রধান। × × কারণ সামান্য অর্থে বস্তু জগতের একটি অঙ্গ হওয়া বা উহার অনুকৃতি হওয়া ইহার স্বভাব নয়, এই অনুভব নিজেই একটি স্বতন্ত্র জগৎ—স্বতঃপূর্ণ এবং স্বায়ত্ত।

—ব্র্যাডলে, অক্সফোর্ড লেক্‌চর্স, পৃ০ ৫

ইহা সত্য যে এই আলোচকেরা 'আনন্দ'-এর প্রয়োগ না করিয়া 'আস্বাদ' (অনুভব) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু পূর্বেই আমি স্পষ্টভাবে বলিয়াছি[১] যে এই কলাবাদী বা সৌন্দর্যবাদী আলোচকেরা মূলতঃ আনন্দবাদীই ছিলেন।

উল্লিখিত সমাধানটি রসের অলৌকিকতা-মতবাদের উপরই আশ্রিত এবং উহার প্রমাণ বা অপ্রমাণের উপর এই সমাধানের সত্যতা নির্ভরশীল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে পুরাকাল হইতে কবির ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভা, তজ্জন্য কাব্য এবং উহার আস্বাদ-রস—প্রত্যেকের জন্য, ব্যবহারের দিক দিয়া 'অলৌকিক' বিশেষণেরই প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাচীনকালে গ্রীকদেশে, রোম প্রভৃতি স্থানে এবং অপর দিকে ভারতেও কবিকে দৈব শক্তির দ্বারা বিভূষিত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে—স্বয়ং প্লেটো শিল্পকে দৈব প্রেরণার ফল বলিয়াছেন। কিন্তু আজ আমরা ইহাকে লক্ষ্যার্থরূপে গ্রহণ করি, বাচ্যার্থ রূপে নয়। প্রকৃতপক্ষে কবি-প্রতিভা ও সামান্য মানব-প্রতিভা, কাব্য ও অন্য বৌদ্ধিক কর্ম এবং কাব্য-রস ও জীবন রসের অন্য রূপের মধ্যে—বিশেষভাবে মানসিক এবং বৌদ্ধিক রসে গুণের দৃষ্টিতে প্রভেদ বিদ্যমান আছে যদিও প্রকৃতিগত কোন প্রভেদ নাই। অতএব ইহা সর্বথা মান্য যে কাব্যগত শোক স্থায়ী ভাবের অনুভব লৌকিক লোকের অনুভব হইতে ভিন্ন—কিন্তু উহা অলৌকিক নয়, প্রত্যক্ষ শোকানুভব না হইলে পরেও লৌকিক অনুভবের পরিধির মধ্যেই উহার স্থান বর্তমান। এইরূপ উহা কোন অলৌকিক শক্তির চমৎকার নয় যেহেতু যে কাব্য প্রতিভা সামান্য শোককে কাব্যগত 'শোক স্থায়ী'তে পরিণত করে সেই কবি প্রতিভা কোন অপার্থিব শক্তি নয়।

(২) অপর সমাধানটি অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। ভট্টনায়ক নিজের পূর্ববর্তী আচার্য—বিশেষভাবে ভট্টলোল্লটের সিদ্ধান্ত-প্রতীতিবাদের খণ্ডনে ইহা বলিয়াছিলেন যে

—স্বগতত্বেন হি প্রতীতৌ করুণে দুঃখিত্বং স্যাৎ।

—অর্থাৎ যদি রসের স্বগত রূপে (সামাজিকের দ্বারা) প্রতীতিকে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে করুণ রসে দুঃখের অনুভূতিকে স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার তাৎপর্য এই যে করুণ রসের আস্বাদ দুঃখাত্মক হইতে পারে না। অতএব প্রতীতির সিদ্ধান্ত ভুল। যদি ইহা মানিয়া লওয়া হয় যে রসের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে

১. দ্রষ্টব্য, অরস্তুকা কাব্যশাস্ত্র—ভূমিকা, পৃ০ ৫০-৫১

করুণ রসের সুখময় আস্বাদ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। এইরূপ পূর্ব মতের স্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করিবার পরে ভট্টনায়ক নিজের মতানুসারে উক্ত সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হন :

তস্মাৎ কাব্যে দোষাভাবগুণালঙ্কারময়ত্বলক্ষণেন নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ, নিবিড়নিজমোহসংকটতানিবারণকারিণা বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনাঽভিধাতো দ্বিতীয়াংশেন ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানো রসো......ভোগেন পরং ভুজ্যতে।[১]

কাব্যে ভাবকত্বের অর্থ শব্দার্থের দোষমুক্তি এবং গুণালঙ্কার যুক্তকারী ব্যাপার অর্থাৎ 'কাব্য-কৌশল' এবং নাট্যে ইহার অর্থ, চতুর্বিধ অভিনয় সম্পন্ন করে যে ব্যাপার অর্থাৎ 'নাট্য কৌশল'। অভিধার দ্বারা বাচ্যার্থের বোধ হইবার পরে এই ব্যাপারের কার্যকরিতা সুরু হয়। ইহার দুইটি কার্য—(১) সামাজিকের চেতনাকে 'নিবিড়নিজ-মোহসংকট' হইতে মুক্ত করা—স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের প্রভাব হইতে মুক্ত করা এবং (২) বিভাবাদির সাধারণীকরণ সম্পাদণ করা। এই ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারা ভাব্যমান রসের সহৃদয় ভোগ=সুখদ চর্বণা করেন। অভিপ্রায় এই যে কাব্যাস্বাদনের সময় সহৃদয়, লোকানুভবের অনুরূপ, শোকাদি স্থায়ী ভাবের দুঃখময় অনুভূতি করেন না—অতএব করুণ রসের আস্বাদ দুঃখাত্মক নয়। কাব্যে কবি ভাবকত্ব নামক ব্যাপারের দ্বারা শব্দার্থকে দোষ হইতে মুক্ত এবং গুণালঙ্কারের দ্বারা সম্পন্ন করিয়া—(বিম্ববিধায়িনী কল্পনার চমৎকারের দ্বারা), শোকাদি স্থায়ী ভাবগুলিকে উহাদের আশ্রয়—আলম্বনাদির সহিত একসঙ্গে সাধারণীকৃত রূপে উপস্থিত করেন। এই দুইটি ক্রিয়ার ফলে শোকাদি কটুভাব ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের সংসর্গ হইতে মুক্ত হইয়া রস রূপে ভাব্যমান হয়—অর্থাৎ সুখদ চর্বণার যোগ্য হইয়া পড়ে। অতএব কবির নিকট দুঃখকে সুখে পরিণত করিবার দুইটি উপায় আছে যেগুলি পরস্পর সম্বদ্ধও—কাব্য-কৌশল বা কল্পনার চমৎকারিতা এবং সাধারণীকরণ : যদিও ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব বিদ্যমান তবুও, সাধারণীকরণের ক্রিয়া যেহেতু কল্পনার দ্বারা সম্পন্ন হয় অতএব, ইহারা পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্তও। কল্পনার চমৎকারিতার দ্বারা সাধারণীকৃত হইয়া শোকাদির বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়—ব্যক্তি সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া শোকাদির স্থূল লৌকিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া পড়ে, অর্থাৎ উহাদের রূপ সামান্য জীবনগত অনুভূতির অপেক্ষা অধিক উদাত্ত ও অবদাত হইয়া পড়ে। ভারতীয় দর্শনের অনুসারে ব্যক্তিবদ্ধ 'অল্প' চেতনায় সুখ নাই; কিন্তু ব্যক্তিগত সীমা হইতে মুক্ত ভূমার চেতনায় পরম সুখের উপলব্ধি হয়। এই যুক্তি অনুসারে কাব্যে শোকাদি অপ্রিয় ভাবও সাধারণীকৃত হইয়া ব্যক্তি-সম্বন্ধ-জন্য দোষ হইতে মুক্ত রসময় হইয়া পড়ে। পণ্ডিত ৺কেশব প্রসাদ মিশ্র যোগের 'মধুমতী ভূমিকার' আশ্রয়ে ইহাকে 'রসবতী ভূমিকা' বলিয়াছেন।

এই বিচার-যুক্তির সংকেত এরিষ্টটলের বিবেচনায়ও পাওয়া যায়, কিন্তু উহা

১. হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃ০ ৪৬৪-৬৫

অত্যন্ত অবিকসিত রূপে বিদ্যমান—অধ্যাপক বুচার যে ভাষায় ইহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন সেই ভাষা ইউরোপের বিকাশশীল আলোচনাশাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত আধুনিক ভাষা : দুঃখে নিহিত দংশন, অশান্তি ও বৈকল্যের জন্ম স্বার্থ-ভাবনা হইতে হয় যাহা বাস্তবিক জীবনে এই সকল মনোবেগের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত থাকে। অহংভাব নষ্ট হইলে পরে দুঃখও নষ্ট হইয়া যায়।[১] লেখক স্বয়ংও এই কথাটি স্বীকার করিয়াছেন : যদি কেউ আপত্তি করেন যে মনোবেগের সাধারণীকরণের বিচার একটি আধুনিক বিচার × × × × তাহা হইলে উত্তরে বলিতে পারি যে এরিস্টটল যাহা বুঝিয়াছিলেন, ইহা যদি তাহা নাও হয়, তবে ইহা অন্ততঃ তাঁহার অভিমতের স্বাভাবিক পরিণাম, তাঁহার কাব্য-বিষয়ক সাধারণ মতবাদ এই সিদ্ধান্তই নির্দ্দেশ করিতেছে।[২]

ইংরাজ আলোচক এলরডাইস নিকল দুঃখাস্বাদনের নানা কারণের উল্লেখ করিয়া সার্বভৌম ভাবনার প্রতিপাদন প্রায় এই অর্থেই করিয়াছেন—ইহার কারণ অংশতঃ সেই সার্বভৌম বিচার-চিন্তা যাহাকে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির মূল গুণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে—ইহার অর্থ হইতেছে অসীমের সহিত সম্পর্ক স্থাপন। যদি আমরা আস্তিক হই, তাহা হইলে বলিব যে ইহা দিব্য-শক্তির সহিত সম্পর্ক স্থাপন এবং যদি নাস্তিক হই তাহা হইলে বলিব যে ইহা বিশ্বের বিরাট অসীম সত্তার সহিত সম্পর্ক স্থাপন। উত্তম ট্র্যাজেডিতে সর্বত্রই এইরূপ উদ্‌গতিকরণের বিচারটি বিদ্যমান থাকে।[৩]

এই দৃষ্টিতে ভট্টনায়কের মহিমা অসংদিগ্ধ—তিনি গভীর যুক্তি-তর্ক এবং তাত্ত্বিক ভাষার আশ্রয়ে সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তের দ্বারা 'করুণ' প্রভৃতির আস্বাদ-ভোগের প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(৩) তৃতীয় সিদ্ধান্তটি অভিব্যক্তিবাদিদের। তাঁহাদের মতানুসারে রসের উৎপত্তি হয় না, ভুক্তিও হয় না। রসের অর্থ হইতেছে শব্দার্থ প্রভৃতির মাধ্যমে বিশুদ্ধ ভাব-ভূমিকার আশ্রয়ে আত্মার আস্বাদ এবং আত্মার আস্বাদ আনন্দময়। উহাতে দুঃখের আশঙ্কা কেমন করিয়া হইতে পারে? কেবল উহার বৈচিত্র্যের জন্য রতি, শোকাদি সংস্কারের (স্থায়ী ভাবের) ব্যাপার হয়—

অস্মন্মতে তু সংবেদনমেবানন্দঘনমাস্বাদ্যতে। তত্র কা দুঃখাশঙ্কা। কেবলং তস্যৈব চিত্রতাকরণে রতিশোকাদিবাসনাব্যাপারঃ।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৫০৭)

অতএব করুণ রসে ব্যক্তিবদ্ধ শোকের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ অনুভব হয় না, বরং সাধারণীকৃত (ব্যক্তি-সম্বন্ধ হইতে মুক্ত) শোকের আশ্রয়ে বা উহার নিমিত্তে আনন্দঘন

---

১. এরিস্টটেল্‌স থিওরি অব পোয়েট্রি এণ্ড ফাইন আর্ট—(চঃ সঃ), পৃ০ ২৬৮

২. ঐ, পৃ০ ২৬৮

৩. থিওরি অব ড্রামা (১৯৩১), পৃ০ ১৩১

আত্মার আস্বাদ হয়, যাহা সহজ আনন্দরূপ হয়। এই যুক্তি অনুসারে কাব্য (বস্তু+শিল্প) রসের উৎপাদক নয়, কারণ উৎপাদন যাহার হয় তাহা অসৎ এবং আত্মানন্দ রূপ রস সৎ। কাব্য ত' নিমিত্ত মাত্র অর্থাৎ ইহা স্বীয় বস্তু তত্ত্ব এবং শিল্পজনিত সৌন্দর্যের দ্বারা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে উৎপন্ন বিঘ্নের অপাকরণ করিয়া আত্মাকে সহজ রস-ময়রূপে ব্যক্ত করে—আত্মাস্বাদের বিঘ্নকে দূর করিয়া দেয়। শৃঙ্গার কাব্যেরও ইহাই কর্তব্যকর্ম এবং করুণ কাব্যেরও; রতি প্রভৃতি মধুর ভাবের বর্ণনাও যদি দেশ-কালের বন্ধন হইতে মুক্ত না থাকে, তাহা হইলে উহার দ্বারা রসাভিব্যক্তি হইতে পারে না এবং অপর দিকে শোকাদি কটুভাবের বর্ণনা যদি শিল্পের দিক দিয়া সফল হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে উহাও পরম রসময় হইয়া পড়ে। ব্যক্তি-সম্বন্ধ বা রাগ-দ্বেষ রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাধান্য বিদ্যমান যাহা নানাবিঘ্নময়ী। রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে মুক্তি পাওয়ার অর্থ ইহাদের দমন এবং সত্ত্বের উদ্রেক অর্থাৎ আত্মার সহজ আনন্দ-রূপের প্রকাশ। নানা ভাবের দ্বারা সমৃদ্ধ কাব্য মানুষকে রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার—আনন্দঘন রসানুভূতিতে প্রবৃত্ত করে অতএব কাব্যে ভাবের লৌকিক স্বরূপের কোন গুরুত্ব নাই, ভাবের সকল (শিল্পময়) অভি-ব্যক্তিরই গুরুত্ব সুস্পষ্ট যাহা সহৃদয়কে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত করিয়া আত্মা-নন্দরূপ রসের অনুভূতিতে প্রবৃত্ত করে। এই সিদ্ধান্তটি অদ্বৈত—বিশেষ করিয়া শৈবাদ্বৈত সিদ্ধান্ত হইতে গৃহীত—এই মত অনুসারে আত্মা পরমরস-রূপ ঃ রসো বৈ সঃ।

(৪) এই সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে শারদাতনয় এই প্রশ্নটির সমাধান প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে যদিও এই সংসার দুঃখমোহাদির দ্বারা কলুষিত, তবুও জীবাত্মা রাগ, বিদ্যা ও কলা নিজের এই তিনটি তত্ত্বের দ্বারা এই সংসার ভোগ করে। ইহাদের মধ্যে রাগ সুখত্বের অভিমান স্বরূপ, বিদ্যা রাগের সেই উপাদন যাহার দ্বারা অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন চৈতন্য-জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়, এবং কলা আত্মাকে প্রদীপ্ত করিবার হেতু। এই বিচারানুসারে প্রেক্ষকও শোক, ভয়, গ্লানি প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পন্ন করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতির স্বীয় 'চর্বণ' আত্মস্থ তিনটি তত্ত্ব—রাগ, বিদ্যা ও কলার দ্বারা করেন—

রাগবিদ্যাকলাসংজ্ঞৈঃ পুংসস্তত্ত্বৈস্ত্রিভিঃ স্বতঃ।
প্রবৃত্তিগোচরোৎপন্না বুদ্ধ্যাদিকরনৈরসৌ॥
ভোগং নিষ্পাদ্য নিষ্পাদ্য বাসনাত্মৈব তিষ্ঠতি।
দুঃখমোহাদিকলুষমপি ভোগ্যং প্রতীয়তে॥
যৎসুখত্বাভিমানেন স রাগ ইতি কথ্যতে।
বিদ্যা নামেতি তত্ত্বং যদ্ রাগোপাদানমুচ্যতে॥
তয়াংভিব্যজ্যতে জ্ঞানং পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
চৈতন্যস্য মলেনৈব সংরুদ্ধস্য স্বভাবতঃ॥
অভিজ্বলনহেতুর্যা সা কলেত্যভিধীয়তে।

সুখদুঃখাত্মিকা বুদ্ধের্বৃত্তির্গোচর উচ্যতে ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তৈর্ভাবৈর্বিষয়তাং গতৈঃ ।
বুদ্ধ্যাদিকরণৈর্ভোগাননুভুংক্তে, রসাত্মনা ॥

(ভাবপ্রকাশন, পৃ০ ৫৩)

এই যুক্তির ভিত্তি এই যে আত্মা নিত্য আনন্দরূপ। উহার আনন্দময়ী প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে সংসারের দুঃখ-মোহাদি মায়াজন্য কলুষের উপর উহা অনিবার্যরূপে বিজয়ী হয় এবং সকলকে নিজের ভোগ্য করিয়া লয়। করুণ রসের আস্বাদ্যময়তার মূল কারণ এই আনন্দময়ী প্রবৃত্তি। এই সমাধানটি শুদ্ধ ভারতীয় আনন্দবাদের উপর আশ্রিত—করুণপ্রধান ক্রিষ্টান দর্শনের উপর আশ্রিত পরবর্তী পাশ্চাত্য কাব্য-শাস্ত্রে উহার প্রতিধ্বনিও প্রায় পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধে কেবল ল্যুকাস ভৌতিক স্তরে অনেকটা এইরূপ ট্র্যাজেডির আনন্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "ট্র্যাজেডির কাজ এক ধরণের আনন্দ প্রদান করা—আর কিছু না। × × অনুভব—আরও অনুভব, ইহাই আমরা কামনা করি।[১] ......অতএব আমরা ট্র্যাজেডি দেখিতে যাই—কিন্তু নিজেদের আবেগ হইতে কোন রূপেই মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়, বরং এই জন্য যে আমরা প্রচুর মাত্রায় (জীবনের) অনুভব করিতে চাই; সেইজন্য আমাদের লক্ষ্য (ভাবের) ভোগ ক্যাথারসিস নয়।"[২] বলা বাহুল্য যে উল্লিখিত মন্তব্যের আধারভূত দর্শন ভিন্ন, তবুও সমস্যার সমাধান উভয়ের প্রায় সমান: একজন আত্মরসকে আনন্দের মূল কারণ বলিয়াছেন, অপরে জীবন রসকে।

শারদাতনয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাববাদীদের পরিধির মধ্যেই থাকিয়া গিয়াছেন: কিন্তু রুদ্রভট্ট এবং তাঁহার চেয়েও অধিক রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র উভয়েই শাস্ত্রীয় ধারার বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইহা বলিয়াছেন—সুখদুঃখাত্মকো রসঃ। (নাট্যদর্পণ শ্লোক ১০৯, পৃ০ ১৫৮)। অর্থাৎ রসানুভূতি সর্বত্রই সুখাত্মক হয় না, দুঃখাত্মকও হয়।

তাঁহাদের মতানুসারে—

তত্রেষ্টবিভাবাদিপ্রথিতস্বরূপসম্পত্তয়ঃ শৃঙ্গার-হাস্য-বীরাদ্ভুতশান্তাঃ পঞ্চসুখাত্ম-নোহপরে পুনরনিষ্টবিভাবাদ্যুপনীতাৎমানঃ করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়ানকাশ্চত্বারো দুঃখাত্মানঃ। (নাট্যদর্পণ, পৃ০ ১০৯)

—অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, অদ্ভুৎ ও শান্ত (ইষ্ট বিভাবাদির উপর আশ্রিত থাকার জন্য) সুখাত্মক এবং করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক (অনিষ্ট বিভাবাদি হইতে উপনীত হওয়ার জন্য) দুঃখাত্মক।

তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে যে এমন হইলে পরে সামাজিক করুণাদির প্রেক্ষণ বা শ্রবণ কেন করেন? নাট্যদর্পণে ইহার বিস্তৃত রূপে উত্তর দেওয়া হইয়াছে—

---

১. ট্র্যাজেডি (১৯৫৩), পৃ০ ৫১

২. ঐ, পৃ০ ৫২

যৎ পুনরেভিরপি চমৎকারো দৃশ্যতে স রসাস্বাদবিরামে সতি যথাবস্থিতবস্তু-প্রদর্শকেন কবিনটশক্তিকৌশলেন, বিস্ময়ন্তে হি শিরশ্ছেদকারিণাহপি প্রহারকুশলেন বৈরিণা শৌণ্ডীরমানিনঃ। অনেনৈব চ সর্বাঙ্গাহ্লাদকেন কবিনটশক্তিজন্মনা চমৎ-কারেণ বিপ্রলব্ধাঃ পরমানন্দরূপতাং দুঃখাত্মকেষপি করুণাদিষু সুমেধসঃ প্রতিজানতে। এতদাস্বাদলৌল্যেন প্রেক্ষকা অপি এতেষু প্রবর্তন্তে। কবয়স্তু সুখদুঃখাত্মকসংসারানু-রূপ্যেণ রামাদিচরিতং নিবধ্নন্তঃ সুখদুঃখাত্মকরসানুবিদ্ধমেব গ্রথ্নন্তি। পানকমাধুর্যমিব চ তীক্ষ্ণাস্বাদেন দুঃখাস্বাদেন সুতরাং সুখানি স্বদন্তে ইতি।

—হিন্দী নাট্যদর্পণ, পৃ০ ২৯২

—অর্থাৎ ইহার দ্বারাও (করুণাদি রসের দ্বারা) যে সহৃদয় চমৎকারিতার অনুভব করেন তাহা রসাস্বাদের সমাপ্তির পরে কবি ও নটেদের দ্বারা পদার্থকে যথাস্থিত ভাবে প্রদর্শিত করিবার কৌশলের জন্য। কারণ নিজের বীরত্বের সম্বন্ধে অভি-মানীরও (একই প্রহারে) মস্তক ছেদনকারী প্রহার-কুশল-শত্রুর (কৌশল দেখিয়া, উহার) দ্বারা বিস্ময়ের (ও তজ্জন্য চমৎকারিতার) অনুভূতি হয়। সম্পূর্ণ অঙ্গের পক্ষে আনন্দ-কারী (সকল ইন্দ্রিয়ের আহ্লাদক) কবি ও নটের শক্তি (কৌশল) হইতে উৎপন্ন চমৎ-কারিতার দ্বারা ভ্রমে পড়িয়া বুদ্ধিমান লোকও দুঃখাত্মক করুণাদি রসকেও পরমানন্দরূপ ভাবিতে থাকেন। এবং করুণাদির আস্বাদন করিবার লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ প্রেক্ষক সামাজিকও ইহাদের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হন। কবিরা সুখদুঃখাত্মক সংসারের অনু-রূপই রামাদির চরিত্র-রচনা করিবার সময় সুখদুঃখাত্মক রসের দ্বারা যুক্তই (কাব্য, নাটকাদির) রচনা করেন। পানকের মাধুর্য যেরূপ (উহার সহিত মিশ্রিত লঙ্কার) তীক্ষ্ণ আস্বাদের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া আরও অধিক সুস্বাদু হয়, সেইরূপ (করুণাদি দুঃখপ্রধান রসে) দুঃখের (তীক্ষ্ণ) আস্বাদের সহিত সংযুক্ত সুখানুভূতি আরও অধিক আনন্দদায়িনী হয়।

উল্লিখিত বিবেচনানুসারে জৈন আচার্যদের সমাধান এইরূপ ঃ

(৫) করুণ রসের দ্বারা প্রাপ্ত আনন্দ (চমৎকার) কাব্য-কৌশল অথবা কাব্য ও নাট্য উভয়ের সমবেত কৌশলের উপর আশ্রিত। প্রেক্ষক বা শ্রোতা করুণ রসে আনন্দ অনুভব করেন না, বরং কবি ও অভিনেতা যাঁহারা ইহার অভিব্যক্তি করেন তাঁহাদের কলা-নৈপুণ্য দ্বারা চমৎকৃত হন। এই চমৎকারিতার দ্বারাই করুণ রসে আনন্দের ভ্রান্তি বা আভাস হয় অর্থাৎ শিল্পগত সৌন্দর্য শোকের উদ্বেগকে চমৎকারিত্বে পরিণত করে। (কলার কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত হইতেছে সামঞ্জস্য—বিভিন্নতার মধ্যে একতার স্থাপনা। অন্তর্বৃত্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত করে বলিয়া এই প্রক্রিয়ার নিজস্ব রূপ সুখদ; ইহাকেই কলা-সৃজন বা সৌন্দর্য সৃষ্টির আনন্দ বলে। কলা-সৃষ্টির সময় কবি ও কলানুভূতির সময় সহৃদয়ের চিত্ত এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাহিত হইয়া উক্ত আনন্দের অনুভূতি করে। ইহা ব্যতীত সমৃদ্ধ অভিব্যঞ্জনা, বিশিষ্ট পদ-রচনা, সঙ্গীত-গুণ ও নাটকে নাট্য-প্রসাধন প্রভৃতি 'কাব্যালঙ্কার-জনিত' আহ্লাদ ও করুণের কটুতাকে নষ্ট করিতে সহায়ক হয়।

ইউরোপের আলোচনা-শাস্ত্রেও কয়েকজন আলোচক এই মত স্থাপনা করিয়াছেন—সেখানে ইহাকে 'কাব্যরূপ-সিদ্ধান্ত' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাব্যশিল্পের সৌন্দর্য করুণ রসের কটুতাকে নষ্ট করিয়া দেয় এবং সহৃদয়ের চিত্ত চমৎকারিতার অনুভব করে :

ইহা ব্যতীত উত্তম ট্র্যাজেডিতে এইরূপ অন্য তত্ত্বও বিদ্যমান থাকে যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কাহিনীর নিবিড় অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সহায়ক হয়। যেমন, নাট্যকারের সৃজনাত্মক শিল্প-প্রতিভা—এবং ইহার পরে ছন্দের লয়, বিশেষ করিয়া গ্রীক ও এলিজাবেথের সময়কার নাটকে, যাহা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের হৃদয়কে ট্র্যাজেডির অন্ধকারময়ী পরিস্থিতি হইতে জোর করিয়া দূরে লইয়া যায়। ট্র্যাজেডিতে ছন্দের প্রয়োগ ও উহার গুরুত্বের বিবেচনা আমরা পরে করিব, কিন্তু এখানে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, ছন্দ অনেক সময় আমাদের ইন্দ্রিয়ের পক্ষে সম্মোহক ঔষধির মত কাজ করে। এস্কিলস্ ও শেক্সপীয়ারের নাটকে ভাষাগত সৌন্দর্যের জন্য দুঃখের দংশন কম হইয়া যায় এবং যদিও ইহা অন্যরূপে কখন-কখন অধিক তীব্র হইয়া ওঠে কিন্তু তবুও উহার স্থূল ও নিকৃষ্ট তত্ত্বগুলি নষ্ট হইয়া যায়।[১]

করুণ রসের আস্বাদের বিষয়ে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রূপে (প্রায় অপ্রত্যক্ষ রূপেই) উল্লিখিত পাঁচটি সমাধান উপস্থিত করা হইয়াছে। অপর দিকে পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রে প্রারম্ভ হইতেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নরূপে ইহার বিবেচনা হইয়াছে এবং এরিস্টটল ও তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যদের সময় কাল হইতে এখন পর্যন্ত সুবিস্তৃত রূপে, নানা ভাবে, ট্র্যাজেডির আস্বাদন ব্যাপারে বিভিন্ন সমাধানের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সর্বপ্রথম এরিস্টটলের প্রসিদ্ধ ক্যাথারসিস সিদ্ধান্তের কথা ওঠে :

ট্র্যাজেডি গুরুত্বপূর্ণ সমগ্র এবং বিশেষ আয়তনের ঘটনার অনুকরণ—যাহার উদ্দেশ্য করুণ এবং ভয় উদ্রিক্ত করা ও উক্ত আবেগগুলির মোক্ষণ করা। (কাব্যশাস্ত্র, পৃ০ ১৯)। ইহার অর্থ এই যে ট্র্যাজেডিতে শোক, ভয় প্রভৃতি ভাবের অতিরঞ্জিত রূপের আস্বাদ করিয়া প্রেক্ষকের নিজস্ব শোক, ভয় প্রভৃতি ভাব উদ্‌বুদ্ধ এবং অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে—বাহ্য উত্তেজনার দ্বারা (তাহার নিজস্ব বাসনার বিদ্যমান) কটু মনোবিকার সহসা উত্তেজিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং এইরূপে এইভাব সমূহের দংশনাত্মক শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহার ফলে প্রেক্ষকের হৃদয় নির্মল হইয়া পড়ে। কবিরাজ পুত্র এরিস্টটলের এই সমাধানের ভিত্তি চিকিৎসা শাস্ত্র : যেইরূপ বিরেচক ঔষধি অশুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর পদার্থের নিষ্কাশন করিয়া রোগীর শরীর-ব্যবস্থাকে শুদ্ধ এবং সুস্থ করে, সেইরূপ ট্র্যাজেডি চিত্তে (বাসনা রূপ) বিদ্যমান মনোবিকারগুলিকে উদ্‌বুদ্ধ ও অভিব্যক্ত করিয়া প্রেক্ষকের চেতনাকে নির্মল করে। আমাদের হৃদয়ে নানা প্রকারের

---

১. থিওরি অব ড্রামা (নিকল), পৃ০ ১৩২

বিকার নিরন্তর ঘুরিতে থাকে ও ফলে চেতনা প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। এই বিকারগুলি হইতে মুক্তি পাওয়ার দুইটি উপায় আছে—(১) পরিশমন (প্লেটো যাহার নির্দেশ দিয়াছেন), এবং (২) অভিব্যক্তি (প্লেটোর উত্তরে যাহার উল্লেখ এরিস্টটল করিয়াছেন); ট্র্যাজেডি দ্বিতীয় উপায়টির আশ্রয় গ্রহণ করে যাহা প্রথমটির অপেক্ষা তাহার প্রকৃতির অধিক অনুকূল। এইরূপ ট্র্যাজিক প্রসঙ্গের প্রেক্ষণ অথবা শ্রবণ মননের দ্বারা চিত্ত নির্বিকার হইয়া যায় এবং চিত্তের নির্বিকার স্থিতি নিশ্চিত শান্তিময় ও সুখময়। এই সিদ্ধান্তের বিবেচনা আমরা বিস্তৃত ভাবে 'অরস্তুকা কাব্যশাস্ত্র'১-এ করিয়াছি। ইহার সর্বপ্রমুখ দোষ এই যে ইহা কেবল কাব্যাস্বাদের অভাবাত্মক রূপেরই পরিচয় দেয়ঃ নিষ্পন্ন অনুভব শান্তিময় হওয়ার জন্য অবশেষে সুখদায়ক হয়, ইহা ঠিক, কিন্তু আনন্দের ইহা নঞর্থক রূপ এবং ইহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে যে প্রেক্ষক কেবল চিত্তকে শান্ত করিবার জন্য—কেবল এই নঞর্থক উপলব্ধি জন্য—প্রেক্ষাগৃহ বা কাব্যের প্রতি উন্মুখ হয়। পাশ্চাত্য আলোচকেরাও এই ভিত্তিতে ইহার খণ্ডন করিয়াছেন—ল্যুকাস স্পষ্ট বলিয়াছেন যে প্রেক্ষক ভাবের মোক্ষণের জন্য নয় বরং ভোগের জন্য নাটক বা কাব্যের প্রতি সাগ্রহে প্রবৃত্ত হন কারণ প্রেক্ষাগৃহ তো কোন হাস্পাতাল নয়।

ক্যাথারসিস সিদ্ধান্ত ব্যতীত আরও অনেক সমাধান পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং আলোচকের সমর্থ ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন। রুশোর মতানুসারে প্রেক্ষক বা পাঠক ট্র্যাজেডি হইতে এক প্রকার দ্বেষজনিত আনন্দ লাভ করে যাহার ভিত্তি পর-পীড়ন অথবা স্ব-পাড়নের সহজ মানববৃত্তির উপর নিহিত। অপরের দুঃখ দেখিয়া আমরা প্রচ্ছন্ন সুখ পাই—মানবের ইহা আদিম পাশব সংস্কার, সেইজন্য রঙ্গমঞ্চে নায়ক-নায়িকাকে বিপত্তির মধ্যে দেখিয়া সামাজিক অনেকটা সেইরূপ আনন্দ পায় যেইরূপ কোন বালক প্রজাপতির পাখা ছিঁড়িয়া পায়। পর-পীড়নের অন্যরূপ হইতেছে স্ব-পীড়নঃ নিজেকে দুঃখ পৌঁছাইয়া মানুষ এক ধরণের আনন্দ পায়—দুঃখও এক ধরণের বিলাসিতা। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি প্রবৃত্তিই অসাধারণ বা অবসাধারণ মনঃস্থিতির পরিচায়ক, সামান্য বা সুস্থ চিত্তবৃত্তিতে পর-পীড়ন বা স্ব-পীড়নের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব অনেক বিচারকেরা ইহার স্থানে মানব-সহানুভূতির উল্লেখ করিয়াছেনঃ তাঁহাদের বক্তব্য এই যে কারুণিক দৃশ্যে মানব-সহানুভূতির সুখ পাওয়া যায়। ইহার পর আর একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রমাণিত করেন যে পর-সহানুভূতি প্রকৃতপক্ষে আত্মসহানুভূতিরই একটি রূপ। এই বা এই ধরণের বিচারের সহিত ইংরাজি কবি শেলি বা ফরাসী বিচারক ফোন্তানেলের নাম জড়িত যাঁহাদের মতানুসারে সুখ ও দুঃখ সহোদর রূপে আবদ্ধ। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেন-হায়ার এই বিচারটিকে দার্শনিক ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন যে ট্র্যাজেডি

১. ডঃ নগেন্দ্র দ্বারা রচিত এরিস্টটলের পোয়তিক্সের সমীক্ষা।

জীবনের গম্ভীর ও দুঃখময় রূপের গুরুত্বকে উদ্‌ভাসিত করে—জীবনের ব্যর্থতা ও জাগতিক প্রপঞ্চের অসারতাকে ব্যক্ত করিয়া চরম সত্যের উদ্‌ঘাটনই উহার উদ্দেশ্য। জার্মানির আর একজন দার্শনিক শ্লেগেল এই বিচারটিকে অন্য ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে ট্র্যাজেডির দ্বারা আমাদের মনে এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে পার্থিব জীবনের সঞ্চালন কোন অদৃষ্ট শক্তি (নিয়তি) করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে মানবের সমস্ত বল-বৈভব তুচ্ছ। এই বিচার একদিকে অহমিকার পরিশমন করে এবং অপর দিকে দুঃখে আমাদের ধৈর্য প্রদান করে। জীবনের এই অলৌকিক বিধানের অনুভূতি নিশ্চিতই একটি উদাত্ত অনুভূতি, যাহাতে মানুষ শান্তি লাভ করে —এবং ইহাই 'ট্র্যাজিক আনন্দের' রহস্য। এই সমস্ত সমাধান দুঃখবাদের উপর আশ্রিত অর্থাৎ এই সমাধানগুলিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সাহায্যে দুঃখরসকেই ট্র্যাজেডির মূল আস্বাদ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যদিও অল্পবিস্তর সত্যের অংশ প্রায় সমস্ত বিচার চিন্তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং এই সকল বিচারগুলিতেও বিদ্যমান আছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব বিচারতর্কের দ্বারা আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, পর-পীড়নের সুখ মানুষের বর্বরোচিত সংস্কারের পরিচায়ক এবং ইহার বিপরীতে কলার চরম উদ্দেশ্য চেতনার পরিষ্কার। প্রাচীন বর্বরোচিত বিনোদ-উৎসবের প্রমাণ দিয়া উহার সহিত কলার ঐকাত্ম্য স্থাপন সংগত নয়। এইরূপ স্বপীড়নের প্রবৃত্তিও সামান্য বা সহজ মনঃস্থিতির সূচক নয়। মানব-সহানুভূতির যুক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক সঙ্গত, কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে বাস্তবিক জীবনে করুণ দৃশ্য দেখিয়া মানব-করুণা বা সহানুভূতিরই উদ্রেক হয়, কিন্তু উহাতে সুখ থাকে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের উদাত্ত বিচারগুলি প্রকট হয়, কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের চেতনা সাত্ত্বিক হইয়া ওঠে। তবুও, এই অনুভব সুখময় হয় না এবং ইহার প্রমাণ এই যে এইসব অনুভবের পুনরাবৃত্তি কামনা আমরা করি না; অপর দিকে আমরা সুখের পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা সর্বদাই করিতে থাকি। এমন অবস্থায় মানব-সহানুভূতি, মানব-করুণা, আত্মকরুণা প্রভৃতির আশ্রয়ে করুণ রসের আস্বাদ-সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। শোপেনহায়ারের দার্শনিক সমাধান দুঃখবাদের উপর আশ্রিত এবং ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শন এই সিদ্ধান্তের প্রেরক বা পোষক। বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে দুঃখ পরম সত্য। ইহার সম্যক্ জ্ঞান জীবনের প্রথম সিদ্ধি, যাহার উপর অন্য সিদ্ধিগুলি আশ্রিত। অতএব করুণ রস জীবনের আদ্য রস। সত্যের উপলব্ধিতে যে আনন্দ নিহিত থাকে, সেই আনন্দ যে সব কাব্য, জীবনে করুণার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে, সেই কাব্যে উপলব্ধ হয়। ভারতে দুঃখবাদের প্রতিপাদন প্রধানতঃ বৌদ্ধ দর্শনে হইয়াছে, অতএব করুণ রসের আস্বাদের এই দুঃখবাদী সমাধান কেবল সেখানেই উপলব্ধ হইতে পারে। ভারতীয় মননশীলদের নিকট শ্লেগেলের বিচারধারাও অজ্ঞাত ছিল না—সাহিত্যে এই ভাগ্যবাদের সম্বন্ধে অনেক গভীর তত্ত্ব কথার উল্লেখ হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভক্তিকাব্য ও আধুনিক সাহিত্যে

ইহার অভিব্যক্তি নানা স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। না জানি কত কাল হইতে ভারতবাসী এই গান গাহিয়া-গাহিয়া নিজের ধৈর্য ঠিক রাখিয়াছে—

করম গতি টারৈ নাহিঁ টরী।
মুনি বসিষ্ট সে পণ্ডিত জ্ঞানী সোধি কে লগন ধরী।
সীতা-হরণ, মরণ দশরথ কো বন মেঁ বিপতি পরী॥

কিন্তু প্রভেদ কেবল ইহাই যে কাব্যশাস্ত্রে এই চিন্তাধারাটি প্রবেশ করিতে পারে নাই, কারণ এই চিন্তাধারাটির ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের প্রাণ রস-সিদ্ধান্তের সহিত কোথাও মিল নাই।

নঞর্থক সিদ্ধান্ত দুই-একটি আরও আছে, কিন্তু উহাদের সহিত কোন গম্ভীর বিচার বা তর্ক সংযুক্ত নাই। উদাহরণস্বরূপ, হ্যুম এবং ড্যুবায়ের মতানুসারে প্রেক্ষক ট্র্যাজেডির প্রেক্ষণ বা অধ্যয়ন দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য করে। ট্র্যাজেডির দ্বারা উহার জীবনে এক ধরণের উত্তেজনা দেখা দেয়—যদিও ভয় ও শোক উহার ভিত্তিস্বরূপ কিন্তু তাহাও ভাল যেহেতু "একঘেয়েমির অপেক্ষা এই দুঃখভোগে অধিক রস বিদ্যমান থাকে।" এই মন্তব্যটি উত্তেজনা সিদ্ধান্তের উপর আশ্রিত : উত্তেজনা, কটু হইলে পরেও, একটি বিশেষ প্রকারের আনন্দ। বলা বাহুল্য যে এই বিচারে সার তত্ত্বের অভাব আছে, যেহেতু ইহা উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে বর্তমান স্পষ্ট প্রভেদের কথা স্বীকার করে না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে আমরা কখন-কখন প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য উত্তেজিত ক্ষণের কামনা করি, কিন্তু ইহা স্বীকার করা সম্ভবপর নয় যে জীবনে বাস্তবিক উত্তেজনা এতই অল্প যে মানবকে কাল্পনিক উত্তেজনার জন্য প্রেক্ষাগৃহে যাইতে হয় এবং ইহাও ঠিক নয় যে উত্তেজনা আনন্দের সমার্থক—অন্ততঃ শোক এবং ভয়জনিত উত্তেজনায় আনন্দের কল্পনা করা সুস্থ মনঃস্থিতিতে সম্ভবপর নয়। অন্য যুক্তির অনুসারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে কাব্য ও নাটকের শোক ও ভয় প্রভৃতি ভাব ও উহার সহিত সম্পৃক্ত পরিস্থিতি অবাস্তব বলিয়া ধরা হয় অতএব উহাদের জন্য আমরা ক্লেশ অনুভব করি না, বরঞ্চ শিল্প-কৌতুকের দ্বারা এক ধরণের চমৎকারিত্ব লাভ করি। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাটি কলাকে কৌতুকের স্তরে নামাইয়া লইয়া যায় এবং সাধারণীকরণের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে। যদি সামাজিক কাব্য অথবা নাট্যের অবাস্তবিকতার প্রতি নিরন্তর প্রবুদ্ধ থাকে তাহা হইলে একাত্মত সম্ভবই হইতে পারে না—এবং একাত্মতা ব্যতীত রসের নিষ্পত্তি কেমন করিয়া সম্ভব?

এখন এমন কতকগুলি সমাধানের উল্লেখ করা যাক্ যেগুলি সদর্থক বিচারধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। নিকলের একটি সমাধান এই যে ট্র্যাজেডিতে মানব-হৃদয়ের শৌর্য এবং ঔদার্য প্রভৃতি ভব্যতর গুণের প্রদর্শন হয়—বীরত্বের পতনেও একটি গরিমা বিদ্যমান থাকে, যাহা শোক ও ভয়কে দিব্য আভার দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেয়। এইরূপ প্রসঙ্গের সহিত সাক্ষাৎকার আমাদের মনে ক্লেশ উপস্থিত করে না,

বরং একটি উদাত্ত অনুভূতিকে জন্ম দেয়, যাহা নিশ্চিতরূপে সুখদ ও প্রীতিকর হয়। নীৎসের মত ইহা হইতে কিছু ভিন্ন। তাঁহার অনুসারে ট্র্যাজেডিতে জীবনের প্রকাশ ও অন্ধকার উভয়েরই গম্ভীর বর্ণনা হইয়া থাকে। প্রেক্ষক জীবনের এই দ্বন্দ্বাত্মক শক্তির অনুভব করিয়া ট্র্যাজেডির রস গ্রহণ করে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হীগেলও এই দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহার জন্য এই দ্বন্দ্ব সিদ্ধি নয় সাধন মাত্র—অর্থাৎ আনন্দের মূল কারণ এই দ্বন্দ্ব নয় বরং চেতনায় সেই ভব্যতর সমাহিতিই আনন্দের মূল কারণ, যাহা অবশেষে এই দ্বন্দ্বের দ্বারাই প্রকাশ লাভ করে। বিংশ শতকে আই. এ. রিচার্ড্‌স হীগেলের এই 'রহস্যবাদী কাব্য-সিদ্ধান্তের' উপর ব্যঙ্গ করিলেও প্রায় এই বিচার তত্ত্বের অনুসারে মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় নিজস্ব মত প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে কাব্যের উদ্দেশ্য বিভিন্ন অন্তর্বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন এবং যে কাব্যরূপ বিভিন্ন অন্তর্বৃত্তির মধ্যে যতখানি সামঞ্জস্য স্থাপনে সমর্থ হয় তাহার সেই অনুপাতে শিল্পগত মূল্য স্বীকার করা উচিত। ট্র্যাজেডির ভিত্তিস্থানীয় অন্তর্বৃত্তিগুলি হইতেছে—করুণা ও ভয়, এইগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, কারণ করুণার ধর্ম আকর্ষণ এবং ভয়ের ধর্ম বিকর্ষণ। স্বভাবতঃ ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত কঠিন কিন্তু সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলে পর সেই অনুপাতে ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করে। অতএব ইহা স্পষ্ট যে ট্র্যাজেডিতে অন্তর্বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত করার সর্বাধিক শক্তি বিদ্যমান আছে এবং যেহেতু অন্তর্বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলে পরে নিশ্চিতরূপে আনন্দলাভ হয় সেইজন্য ট্র্যাজেডির প্রভাব ক্লেশজনক না হইয়া আনন্দজনকই হয়।

যদিও এই সমাধানগুলি অপেক্ষাকৃত সঙ্গত এবং বিশেষ অর্থযুক্ত তবুও ইহাদের দ্বারা কোনও সঠিক সমাধান হয় না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে কোন বীরের আত্মবলিদান আমাদের হৃদয়ে অবসাদ ও নিরাশার স্থানে প্রায় উদাত্ত ভাববিচার উদ্‌বুদ্ধ করে কিন্তু, কেবল এই একমাত্র যুক্তির দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় যেহেতু প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ইহা খাপ খায় না এবং অপর দিকে ট্র্যাজেডিতে বীরের কেবল বলিদানই নয় নিরীহ এবং সরল-সুন্দর ব্যক্তির উপর নির্মম পীড়ন এবং উহার মৃত্যুও প্রদর্শিত হয়। ইহা সত্য যে মহাপুরুষের জন্য সকলের মনে দয়া থাকে না কিন্তু উহাদের শোক ও পতনে কোন প্রকারেই আমাদের হৃদয় আনন্দ লাভ করে না ঃ আমাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়—উদাত্ত ভাবনা আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে কিন্তু আমাদের শোক নিবারিত হয় না। আধুনিক যুগের ইংরাজ লেখক ল্যুকাস অন্য মত খণ্ডন করিয়া নীৎসের মতকে অংশতঃ স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহার যুক্তি এই যে ট্র্যাজেডি জীবনের উত্থান ও পতনের উদাত্ত চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, যাহার আশ্রয়ে আমরা জীবন-সত্যের ভব্যতম রূপের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই।[১]

---

১. দ্রষ্টব্য—ট্র্যাজেডি ঃ ল্যুকাস, পৃ০ ৫৫

এই সমাধানটিকেও আমরা আংশিক রূপেই স্বীকার করিতে পারি কারণ জীবন-সত্যের সমগ্ররূপে রসাস্বাদন করিবার ক্ষমতা সামান্য সহৃদয়ের নাই। জীবনের উত্থানের সহিত পতনকেও কেবল উহা উদাত্ত বলিয়া প্রীতিকর রূপে স্বীকার করিয়া লওয়ার কোন পর্য্যাপ্ত কারণ নাই কারণ বাস্তবিক জীবনে এই ধরণের প্রসঙ্গ হইতে প্রেরণা গ্রহণ করিলেও আমরা উহার পুনরাবৃত্তির কামনা করি না কিন্তু অপর দিকে সাহিত্যে এইরূপ প্রসঙ্গের প্রেক্ষণ ও মনন করিবার ইচ্ছা আমাদের বারম্বার হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা আমি নিজের মন্তব্যটিকে স্পষ্ট করিতে পারি। গান্ধির বলিদান আধুনিক ভারতীয় জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণাদায়ক ঘটনা—কিন্তু ইহা প্রীতিকর হইতে পারে না ঃ উহার পুনরাবৃত্তির কামনাও আমরা করি না। উহার উদাত্ত রূপ দুঃখের দংশন অবশ্যই স্তিমিত করিয়া দেয়, কিন্তু নষ্ট তো করিতে পারে না—সুখে পরিণত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ইহার অপেক্ষা হীগেলের তর্ক অধিক প্রত্যয়কারী। ট্র্যাজেডির দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ জীবনের জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বের অনুভূতি আমাদের চেতনার পরস্পর বিরোধী বৃত্তিগুলিকে জাগরিত করিয়া অবশেষে সংহতি প্রদান করে—পরিণামে আমাদের আত্মা সমাহিত হইয়া যায়। মূল দ্বন্দ্ব যত প্রবল ও তীব্ররূপে দেখা দেয়, আত্মার এই সমাহিতি ততই গভীর ও পরিপূর্ণতা লাভ করে—অতএব অন্য কাব্যরূপের অপেক্ষা ট্র্যাজেডি হইতে প্রেক্ষকের আত্মা অধিক পরিতোষ লাভ করে। রিচার্ড্‌স আত্মার স্থানে চেতনা শব্দের ব্যবহার করিয়া এই সমাধানটিকে অধিক ন্যায় সঙ্গতরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। যদিও ল্যুকাস লিখিয়াছেন যে এরিষ্টটলের অভিমতকে শুদ্ধ রূপে উপস্থিত করিতে রিচার্ড্‌স সমর্থ হন নাই, তবুও তাঁহার বিবেচনা অমান্য নয়। আমার মতে, ইহার সর্বপ্রমুখ দোষ এই যে এই বিবেচনায় 'কেমন করিয়া'র অপেক্ষা 'কি'র বিবেচনা বেশী। ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণরূপে আকর্ষক ও বিকর্ষক বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত করিয়া চেতনাকে সমাহিত করে। অতএব উহার প্রভাব তৃপ্তিকর—ইহা সত্য; কিন্তু কেমন করিয়া এই সামঞ্জস্য সম্ভবপর তাহার সমাধানও তো দরকার, যেহেতু মূল সমস্যাই এই যে দুঃখ আনন্দে কেমন করিয়া পরিণতি লাভ করে?

এইরূপ প্রায় দুই বা আড়াই সহস্র বৎসর হইতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও নবীন মনীষিগণ এই প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও আজ পর্য্যন্ত উহার কোন সুরাহা করিতে পারেন নাই—অন্ততঃ কোন অকাট্য বা সর্বমান্য সমাধান আজও উপলব্ধ হয় না। উল্লিখিত বিচারগুলির বিশ্লেষণ করিলে পরে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত উপলব্ধ হয় ঃ

(১) প্রায় প্রত্যেকটি বিচারযুক্তিতে সত্যের অংশ নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান আছে—পরহিংসা রসের সিদ্ধান্তেও। ভেদ কেবল মাত্রার; কয়েকটি যুক্তি অপর বিচারযুক্তির অপেক্ষা অধিক গ্রাহ্য, বাস্ এই পর্য্যন্ত।

(২) কোন একটি সমাধানও সর্বথা পূর্ণ নয় যাহা সম্পূর্ণরূপে জিজ্ঞাসাকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম। যদি আপনি পুরাপুরি আস্তিক—অর্থাৎ আত্মার আনন্দরূপতায়

আপনার মনঃপ্রাণে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে অবিনবগুপ্তের সমাধানই যথেষ্ট। কিন্তুএই 'যদি'—এই অনুবন্ধ—খুব সরল নয় কারণ আজ কতজনে ইহা বিশ্বাস করেন এবং কেমন করিয়া এই বিশ্বাস আসিতে পারে? তর্কশাস্ত্র ও মনো-বিজ্ঞানের অনুসরণে ভট্টনায়কের যুক্তি (সংবিদ্ বিশ্রান্তি এবং সত্ত্বোদ্রেকের ধারণাগুলি ছাড়িয়া দিলেও) অত্যন্ত গম্ভীর প্রতীত হয়ঃ পাশ্চাত্য বিচারকেরা নানা প্রকারে এবং নিজস্ব ভঙ্গিমায় ইহার অভিব্যক্তি বা ইহাকে নিজেদের বিবেচনায় প্রতিধ্বনিত করিয়া-ছেন। এই সিদ্ধান্তে প্রকৃতপক্ষে শিল্পগত সামঞ্জস্য এবং সাধারণীকরণ(Universality) সিদ্ধান্তের সমন্বয় বিদ্যমান, যাহা বোধ হয় প্রস্তাবিত প্রশ্নের সর্বাধিক বিশ্বস্ত সমাধান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।

(৩) প্রকৃতপক্ষে জিজ্ঞাসার সম্যক্ পরিনিবৃত্তির জন্য আমাদের কয়েকটি সিদ্ধা-ন্তের আশ্রয়ে একটি মিশ্র সমাধান প্রস্তুত করিতে হইবে যেহেতু নানা কারণ মিলিয়া দুঃখকে সুখে পরিণত করে। (ক) কাব্যগত শোক প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় নয় কল্পনাত্মক অনুভবের বিষয়; অতএব উহার দংশন কল্পনার প্রভাবে অনেক কমিয়া যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (খ) কাব্যের এই শোক ব্যক্তিগত না থাকিয়া সাধারণীকৃত হইয়া যায়, অতএব মমত্বজন্য কুণ্ঠা বা নিরাশা ইহাতে বিদ্যমান থাকে না। ব্যক্তি সংসর্গ হইতে—ব্যক্তির রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া চেতনা বিশদতা লাভ করে এবং চিত্তের বৈশদ্য লাভকে নিশ্চিতরূপে একটি সুখকর মনঃস্থিতি বলা যাইতে পারে। (গ) করুণ কাব্যে করুণা প্রায় মহান্ ব্যক্তিদের সহিত সংযুক্ত থাকে—মহত্ত্বের সংসর্গে আসিয়া শোকাদির লঘুতা নষ্ট হয় এবং এই সকল ভাব উদাত্তগুণের দ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়া পড়ে। এই করুণ দৃশ্যে প্রায় মানব-শৌর্য্য এবং গরীমার ভব্য নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় এবং ইহা সামাজিকের চেতনার উৎকর্ষ সাধন করে। 'উত্তররামচরিতে' রামের উদাত্তকর্তব্য ভাবনা তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখকে বিশেষ গরিমায় পরিমণ্ডিত করিয়াছে। এই ধরণের প্রসঙ্গ জীবনের গম্ভীর রূপটিকে সম্মুখে উপস্থিত করে। ইহার দ্বারা সহৃদয় জীবনের গহন তথ্যগুলির সাক্ষাৎকারের অবসর লাভ করে এবং সত্যের সাক্ষাৎকার নিশ্চিতরূপে জীবনের একটি সিদ্ধি যাহার দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয়। এইরূপ করুণ কাব্যের দ্বারা গম্ভীর জীবনরসের প্রাপ্তি ঘটে। (ঘ) এবং, শেষে শিল্পগত প্রক্রিয়া অবশিষ্ট দুঃখাদি নষ্ট করিয়া দেয়। শিল্পগত প্রক্রিয়া বৈবিধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত করে—ছড়ানো উপকরণগুলিকে সংহত করিয়া শিল্পী অনেকতার মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিরূপকে রূপ প্রদান করেন। ইহারই নাম কলাত্মক অন্বিতি যাহার ভাবাত্মক আধারশিলা হইতেছে ভেদের মধ্যে অভেদের প্রতীতি—এবং ভেদের মধ্যে অভেদের প্রতীতি নিশ্চিত একটি সুখকর অনুভূতি। এই সন্দর্ভে আমার নিজস্ব একটি উদ্ধরণ উপস্থিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—"অনুভূতির আধার হইতেছে সংবেদন এবং অনুভূতিতে কোন একটি পৃথক সংবেদন থাকে না, ইহাতে সংবেদনের একটি বিধান বিদ্যমান থাকে। যখন সংবেদনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য

স্থাপিত হয় এবং সংহতি দেখা দেয় তখন আমাদের অনুভূতি প্রীতিকর হয় এবং যখন বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয় তখন অনুভূতি অপ্রীতিকর হয়। কাব্য হইতে প্রাপ্ত সংবেদন প্রত্যক্ষ না হইয়া সূক্ষ্ম বিম্বরূপ হয়। এইজন্য একেতো উহাদের কটুতা এমনিই ক্ষীণ হইয়া আসে এবং দ্বিতীয়তঃ কবির দ্বারা ইহার 'ভাবন' হওয়ার জন্য অনিবার্য্যরূপে উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া যায়, কারণ কাব্যে ভাবনের অর্থ হইতেছে, অব্যবস্থার মধ্যে ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং অব্যবস্থার মধ্যে ব্যবস্থার অর্থই হইতেছে আনন্দ। এইরূপ জীবনের কটু অনুভবও কাব্যে নিবদ্ধ হইয়া, উহার ভিত্তি-স্থানীয় সংবেদনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলে পর, আনন্দপ্রদ হইয়া যায়।"

(রীতিকাব্য কি ভূমিকা, তৃ০ সং, পৃ০ ৬৪)।

করুণ রসের সুখময় আস্বাদের বিষম সমস্যাটির সমাধান এইরূপে করা যাইতে পারে—অন্ততঃপক্ষে এই সমাধানের সাহায্যে আমার জিজ্ঞাসা তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

■ ■ ■

তৃতীয় অধ্যায়

(ক) রসের নিষ্পত্তি

(খ) রসের অবস্থান

(গ) সাধারণীকরণ

(ক) রসের নিষ্পত্তি

রসনিষ্পত্তি ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতপক্ষে রসের বিবেচনা রসনিষ্পত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কারণ ভরত মূলতঃ রসের স্বরূপের নয় রসনিষ্পত্তিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংয়োগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ

(নাট্যশাস্ত্র— কাব্যমালা, ১৯৪৩, পৃ০ ৯৩)

—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি (ভাবের) সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়।

এই সূত্রে 'সংযোগ' এবং 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ অস্পষ্ট এবং ইহাদের লইয়াই পরবর্তী আচার্যদের মধ্যে গভীর বিচার বিতর্ক হইয়াছে। ভরত স্বয়ং 'নিষ্পত্তি'র ব্যাখ্যা এই ভাবে করিয়াছেন :

—যথা হি নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংয়োগাদ্রসনিষ্পত্তির্ভবতি, যথাহি গুড়াদিভির্দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরোষধিভিশ্চ ষাডবাদয়ো রসা নির্বর্ত্যন্তে, তথা নানাভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তীতি।

—অর্থাৎ যেমন বিবিধ ব্যঞ্জন, ওষধি ও দ্রব্যের সংযোগে (ভোজ্য) রস নিষ্পন্ন হয়, যেমন গুড়াদি দ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ঔষধির দ্বারা 'ষাডবাদি' রস তৈরি হয়, ঠিক সেই ভাবে নানা ভাবের সংযোগে স্থায়িভাবই (নাট্য) রসে পরিণত হয়।

এখানে প্রথম উপবাক্যে 'রস নিষ্পন্ন হয়', দ্বিতীয়ে 'রস তৈরি হয়' এবং তৃতীয়ে 'রসে পরিণত হয়' অর্থাৎ রসত্ব প্রাপ্ত হয়—এই তিনটি পরস্পর সম্বদ্ধ ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে। এই প্রয়োগ অনুসারে নিষ্পত্তির অর্থ নিষ্পন্ন বা তৈরি হওয়া, স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করা। ইহার সামান্য অপারিভাষিক আভিধানিক অর্থ এই : নিস্+পদ্ (গতৌ) +ক্তিন্=সম্পূর্ণরূপে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত করিবার—হইবার ক্রিয়া : হওয়া, স্থায়িত্ব প্রাপ্ত করা, অস্তিত্ব লাভ, সিদ্ধি।[১]

পরবর্তী আলোচনায় ভরত সংযোগ শব্দের অর্থ আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন :

যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসনাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগংগসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি।

১. মোনিয়র উলিয়মস্, আপ্তে প্রভৃতি

—অর্থাৎ যেমন বিবিধব্যঞ্জনোপস্কৃতান্ন ভোজনকারী জনগণ রসাস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করেন, তেমনই বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক (মানসিক) অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়িভাবের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া সহৃদয় দর্শক আনন্দাদি লাভ করেন।

উল্লিখিত উদ্ধরণের অনুযায়ী সংযোগের অর্থ স্থায়ী ভাবের সহিত সম্যক্ যোগ = সঙ্গম। দৃষ্টান্তের 'উপগত' এবং 'উপেত' শব্দের দ্বারাও এই অর্থেরই পুষ্টি হয়।[১]

এই দৃষ্টান্তানুসারে:

নাট্যরস = ভোজ্য রস (ষাড়বাদি)

স্থায়ী ভাব = অন্ন

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী = দ্রব্য, ব্যঞ্জন, ঔষধি প্রভৃতি।

যেমন দ্রব্য, ব্যঞ্জন, ঔষধি প্রভৃতির সহিত অন্ন সংযুক্ত হইলে পর ষাড়বাদি অর্থাৎ ভোজ্যরস প্রস্তুত হয়, তেমনই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত স্থায়ীভাব সংযুক্ত হইলে নাট্যরসের নিষ্পত্তি বা সিদ্ধি হয়। অতএব স্বয়ং ভরতের মতানুসারে রস সূত্রের অর্থ এই যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত স্থায়ী ভাবের সংযোগ বা সংসর্গ হইলে পরে রসের সিদ্ধি হয়। সংযোগের অর্থ এখানে সংসর্গ। সিদ্ধির দুইটি অর্থ হইতে পারে—(১) উৎপত্তি বা অভাবে ভাবের কল্পনা; (২) নির্মিতি। ভরত যদিও রস প্রসঙ্গে উৎপত্তি[২] শব্দের প্রয়োগ বহুবার করিয়াছেন, কিন্তু দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে এই প্রয়োগটি আনুষ্ঠানিক প্রয়োগমাত্র—অভাবে ভাবের সৃষ্টির বাচক নয়। নির্মিতির অর্থ প্রাপ্ত উপকরণের সংযোগে নবরূপ রচনা, যাহা ভিত্তিস্থানীয় উপকরণগুলির পরিণতি রূপ হইলেও এই সকল উপকরণ হইতে ভিন্ন। রসের নিষ্পত্তির এই অর্থ ভরত স্বীকার করেন। রস এমন কোন নূতন পদার্থ নয় প্রথমে যাহা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য থাকে: এবং—'নানা ভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি'—অর্থাৎ বিভাবাদির দ্বারা উপগত হইয়া স্থায়ী ভাবই রস রূপ গ্রহণ করে। রস স্থায়ী হইতে ভিন্ন, যেমন ষাড়বাদি অন্ন হইতে ভিন্ন, কিন্তু ভিত্তি তাহার স্থায়ীই যাহা রসরূপে পরিণতি লাভ করে—অতএব রসরূপে কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় না, বিদ্যমান স্থায়ী ভাবরূপ পদার্থই অন্য উপকরণের সহযোগে নবীনরূপ ধারণ করে। নির্মিতির অর্থ নূতন সৃষ্টি নয়—সংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়া এবং ব্যঞ্জন প্রভৃতি পদার্থের সংযোগে 'নবরূপ-প্রাপ্তি'ই নির্মিতি। দৃষ্টান্তের অনুসরণে নিষ্পত্তির ভরত-সম্মত ইহাই অর্থ। 'ষাড়বাদয়ো রসা নির্বর্ত্যন্তে' এ নির্বর্ত্যন্তের

---

১. মোনিয়র উলিয়ম্‌স্‌, আপ্তে প্রভৃতি

২. স চ····আদিভিঃ উৎপদ্যতে (নাট্যশাস্ত্র পৃ° ৯৯, ১০০ ১০১ : রৌদ্র, বীর, ভয়ানক রসের বর্ণনা)

স্পষ্ট অর্থ হইতেছে—প্রস্তুত হয়।[১]

ভট্টলোল্লট

পরবর্তী কাব্যশাস্ত্রে ভরতের এই মৌলিক সূত্রের নানা প্রকার ব্যাখ্যান বিবেচনা শুরু হইয়া যায় এবং রস-সিদ্ধান্ত ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। ভরত-সূত্রের ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে প্রথম ভট্টলোল্লট। ভট্টলোল্লটের গ্রন্থ উপলব্ধ নয়ঃ তাঁহার রসতত্ত্ববিষয়ক উদ্ধরণগুলির প্রাথমিক উল্লেখ অবিনবগুপ্ত-(১১শ শতক)-এর গ্রন্থ 'অভিনব ভারতী'তে এবং কিছু তাঁহারই অপর গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোকলোচনে' পাওয়া যায়; যদিও এই উদ্ধরণগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অভিনবগুপ্ত নিজের দৃষ্টিকোণের অনুসারে ইহা উপস্থিত করিয়াছেন, সেইজন্য ইহা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং বোধ হয় খুব প্রামাণিকও নয়। তথাপি, লোল্লটের মতের জন্য আজও এই উদ্ধরণগুলিরই উল্লেখ করা হয়। ইহা ব্যতীত মম্মটের কাব্যপ্রকাশে লোল্লটের মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা আরও সংক্ষিপ্ত এবং অভিনবভারতীতে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এই বিষয়ে দুইটি সম্ভাবনা হইতে পারে—প্রথম, মম্মটও লোল্লটের গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন এবং গ্রন্থের আশ্রয়ে উল্লিখিত মন্তব্যগুলিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন; দ্বিতীয়, অভিনবগুপ্তের গ্রন্থে উদ্ধৃত তদ্বিষয়ক উদ্ধরণেরই সাহায্য তিনি লইয়াছিলেন কিন্তু নিজের সময় কাল পর্যন্ত বিকসিত রস-সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যাকে কিঞ্চিৎ সংশোধিত করিয়াছিলেন। বিচার করিলে দ্বিতীয় মতটি গ্রাহ্য বলিয়া প্রতীত হয়। পরবর্তী প্রায় সমস্ত আচার্যগণ মম্মটের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

এইরূপ অত্যন্ত অল্প সামগ্রীর ভিত্তিতে লোল্লটের মতবাদের ব্যাখ্যা ও বিবেচনা করিতে হইবে।

(১) অভিনবগুপ্তের দ্বারা উদ্ধৃত লোল্লটের মত

(ক) অভিনব ভারতীতে ঃ

"অত্র ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়স্তাবদেবং ব্যাচখ্যুঃ — বিভাবাদিভিঃ সংযোগোঽর্থাৎ স্থায়িনস্ততো রসনিষ্পত্তিঃ। তত্র বিভাবশ্চিত্তবৃত্তেঃ স্থায্যাত্মিকায়া উৎপত্তৌ কারণম্। অনুভাবাশ্চ ন রসজন্যা অত্র বিবক্ষিতাঃ, তেষাং রসকারণত্বেন গণনানর্হত্বাৎ। অপি তু ভাবানামেব যেऽনুভাবাঃ। ব্যভিচারিণশ্চ চিত্তবৃত্ত্যাত্মকত্বাৎ যদ্যপি ন সহভাবিনঃ স্থায়িনা, তথাপি বাসনাত্মনেহ তস্য বিবক্ষিতাঃ। দৃষ্টান্তেऽপি ব্যঞ্জনাদিমধ্যে কস্যচিদ্বাসনাত্মকতা স্থায়িবৎ, অন্যস্যোদ্ভূততা ব্যভিচারিবৎ। তেন স্থায্যেব বিভাবানু-

১. দ্রষ্টব্য, মোনিয়র উলিয়ম্‌স্ ঃ (সংস্কৃত ইংরাজি অভিধান, নবীন সংস্করণ) পৃ° ৫৮০

—অর্থাৎ যেমন বিবিধব্যঞ্জনোপস্কৃতায় ভোজনকারী জনগণ রসাস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করেন, তেমনই বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক (মানসিক) অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়িভাবের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া সহৃদয় দর্শক আনন্দাদি লাভ করেন।

উল্লিখিত উদ্ধরণের অনুযায়ী সংযোগের অর্থ স্থায়ী ভাবের সহিত সম্যক্ যোগ = সঙ্গম। দৃষ্টান্তের 'উপগত' এবং 'উপেত' শব্দের দ্বারাও এই অর্থেরই পুষ্টি হয়।[১]

এই দৃষ্টান্তানুসারে :

নাট্যরস = ভোজ্য রস (ষাড়বাদি)

স্থায়ী ভাব = অন্ন

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী = দ্রব্য, ব্যঞ্জন, ঔষধি প্রভৃতি।

যেমন দ্রব্য, ব্যঞ্জন, ঔষধি প্রভৃতির সহিত অন্ন সংযুক্ত হইলে পর ষাড়বাদি অর্থাৎ ভোজ্যরস প্রস্তুত হয়, তেমনই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত স্থায়ীভাব সংযুক্ত হইলে নাট্যরসের নিষ্পত্তি বা সিদ্ধি হয়। অতএব স্বয়ং ভরতের মতানুসারে রস সূত্রের অর্থ এই যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত স্থায়ী ভাবের সংযোগ বা সংসর্গ হইলে পরে রসের সিদ্ধি হয়। সংযোগের অর্থ এখানে সংসর্গ। সিদ্ধির দুইটি অর্থ হইতে পারে—(১) উৎপত্তি বা অভাবে ভাবের কল্পনা; (২) নির্মিতি। ভরত যদিও রস প্রসঙ্গে উৎপত্তি[২] শব্দের প্রয়োগ বহুবার করিয়াছেন, কিন্তু দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে এই প্রয়োগটি আনুষ্ঠানিক প্রয়োগমাত্র—অভাবে ভাবের সৃষ্টির বাচক নয়। নির্মিতির অর্থ প্রাপ্ত উপকরণের সংযোগে নবরূপ রচনা, যাহা ভিত্তিস্থানীয় উপকরণগুলির পরিণতি রূপ হইলেও এই সকল উপকরণ হইতে ভিন্ন। রসের নিষ্পত্তির এই অর্থ ভরত স্বীকার করেন। রস এমন কোন নূতন পদার্থ নয় প্রথমে যাহা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য থাকে : এবং—'নানা ভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি'—অর্থাৎ বিভাবাদির দ্বারা উপগত হইয়া স্থায়ী ভাবই রস রূপ গ্রহণ করে। রস স্থায়ী হইতে ভিন্ন, যেমন ষাড়বাদি অন্ন হইতে ভিন্ন, কিন্তু ভিত্তি তাহার স্থায়ীই যাহা রসরূপে পরিণতি লাভ করে—অতএব রসরূপে কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় না, বিদ্যমান স্থায়ী ভাবরূপ পদার্থই অন্য উপকরণের সহযোগে নবীনরূপ ধারণ করে। নির্মিতির অর্থ নূতন সৃষ্টি নয়—সংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়া এবং ব্যঞ্জন প্রভৃতি পদার্থের সংযোগে 'নবরূপ-প্রাপ্তি'ই নির্মিতি। দৃষ্টান্তের অনুসরণে নিষ্পত্তির ভরত-সম্মত ইহাই অর্থ। 'ষাড়বাদয়ো রসা নির্বর্ত্যন্তে' এ নির্বর্ত্যন্তের

---

১. মোনিয়র উলিয়মস্, আপ্তে প্রভৃতি

২. স চ····আদিভিঃ উৎপদ্যতে (নাট্যশাস্ত্র পৃ০ ৯৯, ১০০ ১০১ : রৌদ্র, বীর, ভয়ানক রসের বর্ণনা)

স্পষ্ট অর্থ হইতেছে—প্রস্তুত হয়।[১]

ভট্টলোল্লট

পরবর্তী কাব্যশাস্ত্রে ভরতের এই মৌলিক সূত্রের নানা প্রকার ব্যাখ্যান বিবেচনা শুরু হইয়া যায় এবং রস-সিদ্ধান্ত ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। ভরত-সূত্রের ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে প্রথম ভট্টলোল্লট। ভট্টলোল্লটের গ্রন্থ উপলব্ধ নয়ঃ তাঁহার রসতত্ত্ববিষয়ক উদ্ধরণগুলির প্রাথমিক উল্লেখ অবিনবগুপ্ত-(১:শ শতক)-এর গ্রন্থ 'অভিনব ভারতী'তে এবং কিছু তাঁহারই অপর গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোকলোচনে' পাওয়া যায়; যদিও এই উদ্ধরণগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অভিনবগুপ্ত নিজের দৃষ্টিকোণের অনুসারে ইহা উপস্থিত করিয়াছেন, সেইজন্য ইহা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং বোধ হয় খুব প্রামাণিকও নয়। তথাপি, লোল্লটের মতের জন্য আজও এই উদ্ধরণগুলিরই উল্লেখ করা হয়। ইহা ব্যতীত মম্মটের কাব্যপ্রকাশে লোল্লটের মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা আরও সংক্ষিপ্ত এবং অভিনবভারতীতে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এই বিষয়ে দুইটি সম্ভাবনা হইতে পারে—প্রথম, মম্মটও লোল্লটের গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন এবং গ্রন্থের আশ্রয়ে উল্লিখিত মন্তব্যগুলিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন; দ্বিতীয়, অভিনবগুপ্তের গ্রন্থে উদ্ধৃত তদ্বিষয়ক উদ্ধরণেরই সাহায্য তিনি লইয়াছিলেন কিন্তু নিজের সময় কাল পর্যন্ত বিকসিত রস-সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যাকে কিঞ্চিৎ সংশোধিত করিয়াছিলেন। বিচার করিলে দ্বিতীয় মতটি গ্রাহ্য বলিয়া প্রতীত হয়। পরবর্তী প্রায় সমস্ত আচার্যগণ মম্মটের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

এইরূপ অত্যন্ত অল্প সামগ্রীর ভিত্তিতে লোল্লটের মতবাদের ব্যাখ্যা ও বিবেচনা করিতে হইবে।

(১) অভিনবগুপ্তের দ্বারা উদ্ধৃত লোল্লটের মত

(ক) অভিনব ভারতীতে ঃ

"অত্র ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়স্তাবদেবং ব্যাচখ্যুঃ— বিভাবাদিভিঃ সংযোগোঽর্থাৎ স্থায়িনস্ততো রসনিষ্পত্তিঃ। তত্র বিভাবশ্চিত্তবৃত্তেঃ স্থায্যাত্মিকায়া উৎপত্তৌ কারণম্। অনুভাবাশ্চ ন রসজন্যা অত্র বিবক্ষিতাঃ, তেষাং রসকারণত্বেন গণনানর্হত্বাৎ। অপি তু ভাবানামেব যেऽনুভাবাঃ। ব্যভিচারিণশ্চ চিত্তবৃত্ত্যাত্মকত্বাৎ যদ্যপি ন সহভাবিনঃ স্থায়িনা, তথাপি বাসনাত্মনেহ তস্য বিবক্ষিতাঃ। দৃষ্টান্তেঽপি ব্যঞ্জনাদিমধ্যে কস্যচিদ্বাসনাত্মকতা স্থায়িবৎ, অন্যস্যোদ্ভূততা ব্যভিচারিবৎ। তেন স্থায্যেব বিভাবানু-

১. দ্রষ্টব্য, মোনিয়র উলিয়ম্স্ঃ (সংস্কৃত ইংরাজি অভিধান, নবীন সংস্করণ) পৃ° ৫৩০

ভাবাদিভিরূপচিতো রসঃ। স্থায়ী ত্বনুপচিতঃ। স চোভয়োরপি। মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্যে, অনুকর্তরি চ নটে রামাদিরূপতানুসন্ধানবলাদিতি।"

—অর্থাৎ ভট্টলোল্লট প্রভৃতি ব্যাখ্যাতাগণ (এই সূত্রের) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে বিভাবাদির সংযোগ অর্থাৎ স্থায়িভাবের সহিত (বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের) সংযোগ হইলে পরে রসের নিষ্পত্তি (অর্থাৎ উৎপত্তি) হয়। উহাদের (বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের) মধ্যে বিভাব স্থায়িভাবরূপ চিত্তবৃত্তির উৎপত্তির কারণ। অনুভাব বলিতে এখানে রসজন্য (কটাক্ষাদি রূপ) অনুভাব গ্রহণ করা হয় নাই, কারণ তাহাদের (রসজন্য অনুভাবের) গণনা রসের কারণের মধ্যে করা সম্ভবপর নয় (সেইগুলি তো রসের কার্যভূত বা পরিণতি)। যদিও (এখানে রসের কারণভূত অনুভাবের মধ্যে রত্যাদি স্থায়ী) ভাবেরই যে সকল (পরে উৎপন্ন হইবার জন্য) অনুভাব বিদ্যমান আছে (তাহাদেরই গ্রহণ করিবার উল্লেখ আছে)। এবং (নির্বেদ প্রভৃতি) ব্যভিচারীভাব চিত্তবৃত্তি-স্বরূপ হওয়ার জন্য) ('যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্' এই নিয়মানুসারে রতি রূপ বা নির্বেদাদি রূপ দুই ধরণের চিত্তবৃত্তি এক সময়ে যুগপৎ থাকিতে পারে না এইজন্য) যদিও স্থায়িভাবের সঙ্গে থাকিতে পারে না, কিন্তু এখানে তাহার (স্থায়িভাবের) সংস্কার রূপে উল্লেখ আছে। (এইজন্য) রসরূপে বিদ্যমান রত্যাদি স্থায়িভাবের সহিত সংস্কার রূপে নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাব থাকিতে পারে।)

—(রসের উপপাদনের জন্য ইহার পরে উল্লিখিত ব্যঞ্জনাদি রূপ) দৃষ্টান্তেও ব্যঞ্জনাদির মধ্যে কোন রস-এর স্থায়িভাবের অনুরূপ অনুদ্‌ভূত (বাসনাত্মক) রূপে অবস্থান হয়, এবং অপর দিকে ব্যভিচারিভাবের অনুরূপ উদভূত রূপে হয়। এইজন্য 'বিভাব অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট স্থায়ীভাবই রস।' এবং অপরিপুষ্ট (স্থায়ীভাব রস হইতে ভিন্ন) স্থায়িভাব (কথিত) হয়। (ইহাই রসের সঙ্গে স্থায়িভাবের প্রভেদ)। ইহা (রস, অনুকার্য রামাদি ও অনুকর্তা নট) উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। মুখ্যতঃ (যাহার নট অনুকরণ করে সেই) অনুকার্য রামাদির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এবং রামাদিরূপতার প্রতীতি হওয়ার জন্য (গৌণরূপে) নটেও রসের প্রতীতি হয়। রস-সূত্রের এই ব্যাখ্যা ভট্টলোল্লট প্রভৃতি করিয়াছেন।)

—হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৪২—৪৩

(খ) ধ্বন্যালোকলোচনে:

তথাহি পূর্বাবস্থায়াং য স্থায়ী সএব ব্যভিচারিসম্পাতাদিনা প্রাপ্তপরিপোষোহনু-কার্যগত এব রসঃ। নাট্যে তু প্রযুজ্যমানত্বান্নাট্যরস ইতি কেচিৎ।

(ধ্বন্যালোকলোচন, চৌখম্বা, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ, পৃ০ ১৮৪)

—ইহা এইরূপ—পূর্বাবস্থায় যাহা স্থায়ী তাহা ব্যভিচারী ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অনুকার্যেই রসরূপ গ্রহণ করে। ইহাকে নাট্যরস এইজন্য লোকেরা বলেন যেহেতু নাটকে ইহার প্রয়োগ হয়।

যদিও এখানে লোল্লটের নাম দেওয়া হয় নাই, তবুও নিশ্চিতরূপ ইহা তাঁহারই মত। বালপ্রিয়া টীকার দ্বারা তৎক্ষণাৎ সন্দেহের নিবারণ হইয়া যায়।

(২) মম্মটের দ্বারা উদ্ধৃত লোল্লটের মত

বিভাবৈর্ললনোদ্যানাদিভিরালম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ; অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ; ব্যভিচারিভির্নির্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো; মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্যে; তদ্রূপতানুসন্ধানান্নর্ত্তকেঽপি প্রতীয়মানো রস ইতি ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়ঃ।

—অর্থাৎ, বিভাবো—ললনা প্রভৃতি আলম্বন ও উদ্যান প্রভৃতি উদ্দীপন কারণের দ্বারা, রতি প্রভৃতি (স্থায়ী) ভাব উৎপন্ন হয়; (রতি প্রভৃতির উৎপত্তির) কার্যভূত কটাক্ষ, ভুজাক্ষেপ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা প্রতীতি যোগ্য হয়; এবং সহকারী রূপ নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবগুলির দ্বারা পুষ্ট হয়; মূলরূপে অনুকার্য রূপ রামাদিতে এবং উহাদের স্বরূপের অনুসন্ধানের আশ্রয়ে নটে প্রতীয়মান রত্যাদি স্থায়ীভাবই রস (হইয়া যায়) হয়। ইহা ভট্টলোল্লট প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অভিমত।

(কাব্যপ্রকাশ—চতুর্থ উল্লাস)

এই উদ্ধরণগুলির অনুসরণে ভট্টলোল্লটের রসতত্ত্ব বিষয়ক মতবাদের সহিত সংযুক্ত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া যায়ঃ

(১) সংযোগের সেই অর্থ যাহা ভরত করিয়াছিলেন—অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের সহিত সংযোগ।

(২) স্থায়ী ভাবের আশ্রয় হইতেছে অনুকার্য্য—রামাদি।

(৩) সীতাদি আলম্বনের দ্বারা উহা অনুকার্যের চিত্তে উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে 'উৎপত্তি' এবং 'উদ্‌ভূততা' দুইটি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে যাহার অনুসরণে মম্মট 'জনিতঃ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে যে উৎপত্তির অর্থ এখানে 'অভাবে ভাবের কল্পনা' বা কেবল মাত্র 'উদ্‌বুদ্ধি।' যদি 'কস্যচিদ্বাসনাত্মকতা স্থায়িবৎ' লোল্লটেরই মন্তব্যের অংশ হয় অভিনবের টিপ্পনী নয়, তাহা হইলে তো বিবাদ কেবল শব্দের। যখন স্থায়ী ভাব বাসনারূপে বিদ্যমান আছে এবং বিভাব উহাকে উদ্‌বুদ্ধ করে তখন উদ্‌বুদ্ধি এবং অভিব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদই অবশেষ থাকে না। কিন্তু যদি এই টিপ্পনীটি অভিনবগুপ্তের হয় তাহা হইলে অসৎকার্যবাদকেই উৎপত্তির ভিত্তিরূপে স্বীকার করিতে হইবে।

(৪) অনুভাবের অর্থ রস-জন্য চেষ্টা প্রভৃতি নয় অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে বিভোর রামের চেষ্টা নয় বরং ভাবের অনুবর্তী বিকার অর্থাৎ উপচিত স্থায়ী ভাবের নয় অনুপচিত স্থায়ী ভাবের—এবং ব্যভিচারী ভাবেরও—অনুবর্তী বিকারই অনুভাব। উপচিত স্থায়ী ভাবই রস অতএব তাহার অনুবর্তী বিকার কার্যরূপে গৃহীত হইবে,

কারণরূপে নয়। ডঃ কান্তিচরণ পাণ্ডের এবং তাঁহার সরণি অবলম্বন করিয়া (?) ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্ত 'ভাবানাম্' এর অর্থ করিয়াছেন 'বিভাবের' অর্থাৎ আলম্বনের অনুভাব যাহা আশ্রয়রূপ অনুকার্যের দ্বারা অনুভূত রসের কারণস্বরূপ। যদিও ভরতের উক্তিতে 'ভাবে' 'বিভাবের'ও অন্তর্ভাব বিদ্যমান আছে, তবুও এখানে এইরূপ বিশেষ অর্থ উপস্থিত করিবার কোন দরকার বোধ হয় না, কারণ যদি ইহাই অভীষ্ট অর্থ তাহা হইলে কেন অভিনবগুপ্ত স্বয়ংই ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই। —ইহার বিপরীতে মম্মট 'তেষাং রসকারণত্বেন গণনানর্হত্বাৎ' এর উপেক্ষা করিয়া এগুলিকে প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী ভাবের কার্যরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(৫) ব্যভিচারী ভাবগুলি স্থায়ী ভাবের সহভাবী। কিন্তু 'যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম'—অর্থাৎ হৃদয়ে একসঙ্গে দুইটি চেতনা থাকিতে পারে না—এই নিয়মানুসারে স্থায়ী ও ব্যভিচারীর সহভাবীতাকে কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর ইহাই যে ব্যভিচারী সংস্কার রূপে স্থায়ীর সহিত বিদ্যমান থাকে কিন্তু যুগপৎ রূপে নয়। এবং যদি, স্থায়ীর বাসনাত্মকতা—বিষয়ক উপযুক্ত ধারণটিকে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে সহভাবই প্রমাণিত হয়—স্থায়ী ভাবের বাসনারূপে অবস্থিতি এবং সঞ্চারীর উদ্‌ভূত বা উদ্‌বুদ্ধ রূপে অবস্থিতি প্রমাণিত হয়।

(৬) রস মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ অনুকার্যগত এবং গৌণরূপে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নটনিষ্ঠও। অভিনবগুপ্তের দ্বারা উদ্ধৃত বাক্যের অনুসারে নটই অনুসন্ধানকর্তা—অনুসন্ধানের বলে তাহার মধ্যেও রসের উৎপত্তি হয়। এখানে 'অনুসন্ধান' শব্দটির ব্যাখ্যা আবশ্যক। "অনুসন্ধান" শব্দটির সংস্কৃত পণ্ডিতেরা নানা অর্থ করিয়াছেন: (১) আরোপ; (২) অভিমান; (৩) যোজন। ঐ মত অনুসারে অভিনবগুপ্ত দ্বারা উদ্ধৃত বাক্যে আরোপের অর্থ হইবে নটের দ্বারা নিজের উপর 'রামত্বাদি'র আরোপ; অভিমানের অর্থ হইবে নটের সেই সময়কার জন্য নিজেকে রামাদিরূপে চিন্তা এবং যোজন বা যোজনার অর্থ হইবে 'প্রথমে যে আমি নট ছিলাম সেই আমি এখন রাম' (অশুদ্ধানুসন্ধান) এবং ইহার পরে "আমি রাম" (শুদ্ধানুসন্ধান)[১] এই তিনটি অর্থের মধ্যে স্থূল দৃষ্টিতে বিশেষ কোন ভেদ নাই—কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভেদ স্পষ্ট হইয়া যায়। দার্শনিক তত্ত্বকথার আবর্তে না পড়িয়া সহজ কথায় আমরা যা বুঝি তাহা এই যে এই তিনটি শব্দই তাদাত্ম্যের সূচক কেবল তাদাত্ম্যের মাত্রাভেদের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আরোপে তাদাত্ম্য অনেকটা বাহ্য, 'অভিমানে' ইহা আন্তরিক তাদাত্ম্যের রূপ ধারণ করে—বোধ হয় ইহা শৈব-দর্শনের' অশুদ্ধানুসন্ধান পর্যন্তই পৌঁছাইতে সক্ষম হয় এবং 'যোজনে' ইহা পূর্ণ তাদাত্ম্য লাভ করে, অর্থাৎ শৈব

১. হিন্দী কাব্য প্রকাশ—(ডঃ সত্যব্রত সিংহ, পৃ. ৬৮) এবং কম্পারেটিভ্ এস্থেটিক্স, খণ্ড ১ (ডঃ কান্তিচন্দ্র পাণ্ডের, পৃ. ৩০)

দর্শনের 'শুদ্ধানুসন্ধানের' স্তরে পৌঁছাইয়া যায়। ডঃ কান্তিচন্দ্র পাণ্ডের লোল্লটকে শৈব পণ্ডিতরূপে স্বীকার করিয়া তৃতীয় মতেরই স্থাপনা করিয়াছেন। লোল্লটের বাস্তবিক মত কি ছিল এবং ডঃ পাণ্ডেয়ের অভিমত ঠিক কি না ইহার বিবেচনার জন্য এখন পর্যন্ত কোন প্রামাণিক আধার পাওয়া যায় নাই। তথাপি, ভারতীয় নাট্যকলার সূক্ষ্ম-অধ্যয়নের জন্য উল্লিখিত ব্যাখ্যানটি অত্যন্ত রুচিকর ও গুরুত্বপূর্ণ ইহাতে সন্দেহ নাই এবং এইজন্য এই স্থলে সংক্ষেপে ইহার উল্লেখ করা হইল।

মম্মট উল্লিখিত উদ্ধরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া এই মত উপস্থিত করিয়াছেন ; তদ্রুপতানুসন্ধানান্নর্ত্তকেঽপি প্রতীয়মানো রস ইতি···অর্থাৎ রামাদি অনুকার্যের স্বরূপের অনুসন্ধানের আশ্রয়ে নটে প্রতীয়মান স্থায়ী ভাবই রস রূপ ধারণ করে। এই উদ্ধরণের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে সামাজিক নটের মধ্যে রসের প্রতীতি করেন—এবং বোধ হয় অনুসন্ধানের কর্তাও সামাজিকই (যদিও অনুসন্ধান ব্যাপারের সহিত নটও সংযুক্ত থাকিতে পারেন)। উল্লিখিত অর্থের তিনটি বিকল্পের অনুসারে অনুসন্ধানের সামাজিক-নিষ্ঠ অর্থগুলি এইরূপ ঃ

(১) সামাজিক রামকে নটে আরোপিত করিয়া রামনিষ্ঠ রসের প্রতীতি করেন। আরোপ শব্দটির মধ্যে এই সংকেত বিদ্যমান আছে যে সামাজিকের হৃদয় হইতে নটের চেতনা লুপ্ত হইয়া যায় না—তাঁহার অল্প বিস্তর রূপে এই জ্ঞান অবশ্যই থাকে যে এ ব্যক্তি নট, এখন রামের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে।

(২) সামাজিক নটে রামের 'অভিমান' করিয়া রামনিষ্ঠ রসের প্রতীতি করেন। ইহার অর্থ এই যে সামাজিকের মনে সেই সময়কার জন্য নটের প্রতি রাম-ভাবনা উৎপন্ন হইয়া যায়—রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জার দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া সামাজিক নটের বাস্তবিক রূপকে ভুলিয়া তাহার মধ্যে রামের প্রতীতি করেন। অভিমান শব্দ হইতে এই অর্থই বুঝা যায় যে নটের বাস্তবিক রূপকে ভুলিয়া উহাকেই রামরূপে চিন্তা করা এক ধরণের ভ্রান্তিই যাহা নাট্যকলার চমৎকারিতার আশ্রয়ে কিছু সময়ের জন্য উৎপন্ন হয় ঃ এই প্রতীতি যদিও মিথ্যা তবুও ইহা ভিন্ন সামাজিকের নটের মধ্যে নায়কনিষ্ঠ রসের প্রতীতি সম্ভবপর নয় এবং তাঁহার সহিত নাট্যরসের কোনরূপ সম্বন্ধ হওয়াও সম্ভব নয়।

(৩) অনুসন্ধানের যোজনাপরক অর্থটি প্রমাণিত হয় না কারণ 'নটই রাম' এইরূপ শুদ্ধানুসন্ধান হইয়া গেলে নটগত রস 'প্রতীয়মান' থাকিবে না 'সিদ্ধি' হইয়া যাইবে কিন্তু ইহার বিপরীতে উল্লিখিত উদ্ধরণটির বৈশিষ্ট্যই রসের 'প্রতীয়মানতার' উপর নির্ভরশীল।

উপরোক্ত তথ্যগুলির অনুসরণে লোল্লটের রস-বিষয়ক মতবাদের পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে তাঁহার দৃষ্টিকোণ যথার্থবাদী এবং বস্তুগত, আত্মবাদী ও ব্যক্তিগত নয় এবং এই দৃষ্টি অনুসারে ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি অনুসরণেও, অভিনবগুপ্তের উদ্ধরণগুলিকেই অপেক্ষাকৃত অধিক প্রামাণিক বলিয়া

স্বীকার করিতে হইবে; পরবর্তী আত্মবাদী রস-কল্পনার পরিণামস্বরূপ মম্মট ইহার সংশোধন করিয়াছিলেন।

লোল্লটের মতানুসারে লোক-জীবনে কণ্বের আশ্রমের রমণীয় পরিস্থিতিতে, অপূর্ব সুন্দরী শকুন্তলার সাক্ষাৎকারে দুষ্মন্তের হৃদয়ে সহসা রতিভাব উৎপন্ন হয়। (এই রতিভাব যদিও দুষ্মন্তের চিত্তে বাসনারূপে বিদ্যমান ছিল তবুও কারণভূত শকুন্তলার সম্পর্কে আসিয়া ইহার প্রকাশ লাভ করার জন্য, ইহার উৎপত্তি হয় ইহা স্বীকার করা উচিত।) আলম্বন রূপ শকুন্তলার অনিন্দ্য লাবণ্য এবং আকর্ষক ব্যবহারের দ্বারা বন-প্রদেশের সেই রমণীয় পরিস্থিতিতে (উদ্দীপন বিভাবের দ্বারা) আশ্রয়-রূপ দুষ্মন্তের চিত্তে এই স্থায়ী রতিভাব আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। দুষ্মন্তের অঙ্গ সকল স্পন্দিত হইয়া উঠিল—রোমাঞ্চে তাঁহার শরীর পুলকিত হইল (অনুভাব)। একদিকে শকুন্তলার রূপ-লাবণ্যের দ্বারা তাঁহার চিত্তে হর্ষ উদ্রিক্ত হইল, এবং অপর দিকে বরণীয়তা প্রভৃতি প্রশ্নের জন্য চিন্তাদি ব্যভিচারী ভাব অনায়াসে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। যদিও ইহার দ্বারা রতিভাব ক্ষয় না হইয়া আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপ দুষ্মন্ত রূপ আশ্রয়ের হৃদয়ে শকুন্তলা রূপ আলম্বনের দ্বারা যে রতি স্থায়ী ভাব উৎপন্ন হইয়া শকুন্তলার হাবভাব ও পরিবেশের প্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহা দুষ্মন্তের পুলক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিল—অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার দ্বারা স্থায়ী ভাবের পূর্ণ পরিপাক সম্ভব হইল এবং ইহা 'রসত্ব' লাভ করিল।

'লোকবৃত্তানুকৃতির্নাট্যম্' এর অনুসারে নাট্যে এই প্রসঙ্গের অনুকরণ করা হইয়াছে। নট দুষ্মন্তের ও নটী শকুন্তলার রূপ ধারণ করিল, আশ্রমের পার্শ্বভূমি যবনিকার দ্বারা প্রদর্শিত হইল। নট নিজের শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা দুষ্মন্তের অভিমান বা যোজনা—সোজা কথায় তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য স্থাপিত করিল এবং ঠিক তাঁহার অনুরূপ ব্যবহার (ব্যবহারের অভিনয়) করিতে লাগিল, অর্থাৎ এইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল যেন সে স্বয়ং দুষ্মন্ত এবং নটী শকুন্তলাকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যেন রতিভাব উৎপন্ন হইয়াছে এবং শরীর রোমাঞ্চিত হৃদয়ে হর্ষ, চিন্তা প্রভৃতি ভাবের সঞ্চার হইতেছে। এইরূপ সম্পূর্ণ রস-সামগ্রী এখানেও বিদ্যমান; স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবও—অতএব এখানেও স্থায়ী ভাব বিভাবের দ্বারা উদ্ভূত হইয়া এবং অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা ক্রমশঃ ব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া 'রসে' পরিণতি লাভ করে। প্রভেদ কেবল এই যে প্রথম প্রসঙ্গটি বাস্তবিক এবং অপরটি উহার শৈল্পিক অনুকরণ—অতএব প্রথম প্রসঙ্গে বাস্তবিক দুষ্মন্তের চিত্তে যে রসের নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাই মুখ্য বা মুখ্য ছিল এবং নাট্য প্রসঙ্গে যে রসের নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা গৌণ।—নানা দোষগুণ যুক্ত থাকা সত্ত্বেও অভিনব-গুপ্তের মতানুসারে লোল্লটের অভিমত বোধ হয় এইরূপই ছিল।

ব্যাখ্যা—কয়েকটি শঙ্কার সমাধান

এই অভিমতের সম্বন্ধে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে এই রসের সহিত সামাজিকের সম্বন্ধ কি ? ইহার উত্তরে বলা যায়, সামাজিক নটনিষ্ঠ রস বা নাট্যরসের সাক্ষাৎকার করিয়া চমৎকৃত হন। কেবলমাত্র বাহ্য সৌন্দর্য বা পরিবেশ, বেশভূষা, অনুভাব প্রভৃতির সফল অভিনয় এই চমৎকারিতার আধারমূল নয়, ইহার মূল ভিত্তি হইতেছে স্থায়ীভাব, কারণ ইহাই উপচিত হইয়া রসত্ব লাভ করে। অতএব এই চমৎকারিতা কুতূহল-জন্য মনোরঞ্জন মাত্র নয়, ইহা এক ধরণের ভাবাত্মক অনুভূতি। লোল্লট-বিষয়ক উদ্ধরণে এই তথ্যের উল্লেখ নাই কিন্তু ব্যঞ্জনার দ্বারা এই অর্থই স্পষ্টরূপে প্রকট হয়। কারণ অন্ততঃ অনুকার্য ও অনুকর্তার মধ্যে রসের সার্থকতাকে সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে না। যখন সম্পূর্ণ নাট্য-প্রপঞ্চের আয়োজন সামাজিকেরই জন্য তখন এই নাট্য-প্রপঞ্চের প্রাণভূত রসের সার্থকতাও সামাজিক ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না—অর্থাৎ সামাজিকের চমৎকারিতাতেই ইহারও সার্থকতা নিহিত। ইহা স্বতঃস্পষ্ট ব্যবহারিক তথ্য : ইহার জন্য তর্কশাস্ত্র বা দর্শন আবশ্যক নয়। ভরতের মতও ইহাই ছিল ; লোল্লট তাঁহার সরণি অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ওঠে যে অনুকার্যের কি অর্থ : মূল ঐতিহাসিক রাম, দুষ্মন্তাদি বা কবি-নিবদ্ধ রামাদি ? লোল্লটের উত্তর মূল ঐতিহাসিক রামাদি কারণ কবি-নিবদ্ধ রামাদির চিত্তে রত্যাদি ভাবের উদ্‌ভূতির প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মূল পাত্রের অস্তিত্ব কোথায় উহাদের অনুকরণ নট কেমন করিয়া করিবে ; নট প্রকৃতপক্ষে কবি-নিবদ্ধ পাত্রেরই লোক জ্ঞান ও ব্যক্তিগত অনুভাবের আশ্রয়ে অনুকরণ করে। ইহার উত্তর এই যে বস্তুগত দৃষ্টিকোণের জন্য লোল্লট মূল পাত্র ও উহার কবি-নিবদ্ধ রূপের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারেন নাই : মূল পাত্র হইতে কাব্য ও নাটকের পাত্র কবির ভাবধারার সংসর্গে আসিয়া নিশ্চিত রূপে অল্প-বিস্তর ভিন্ন হইয়া যায়, এই রহস্যটি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। অতএব তাঁহার মনে এই প্রশ্নই ওঠে নাই যে রামাদির অনুকরণ কেমন করিয়া সম্ভব ?

মূল রসের স্থিতিকে অনুকার্যনিষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিবার উদ্দেশ্যই এই যে মূল রসের আস্বাদ ঐতিহাসিক রামাদিই করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগত অনুভব হওয়ার জন্য ইহা প্রত্যক্ষ—ঐন্দ্রিয়-মানসিক-অনুভবই ছিল। গৌণরূপে রসের স্থিতি অনুকর্তার মধ্যেও স্বীকার করার অর্থ এই যে অনুকর্তাও রত্যাদি স্থায়ী ভাবের পরিপাকরূপ রসের অনুভব করে, কিন্তু উহা তাহার নিজের রত্যাদি ভাবের পরিপাকের সরাসরি অনুভব নয় বরং অপরের অনুভবের শৈল্পিক সমানুভব। অতএব মূল রসের (অনু-কার্যগত রসের) ধারণা বর্তমান রস ধারণা হইতে যে পরিমাণে ভিন্ন সেই পরিমাণে অশুদ্ধ এবং গৌণ (নটগত) রসধারণা, অনেক প্রাচীন আচার্যদের (যাঁহারা নটে রসের স্থিতিকে অস্বীকার করেন) মতে ভিন্ন হইলেও, আধুনিক সৌন্দর্যশাস্ত্রের মতানুকূল।

ভরতের অনুরূপ লোল্লটের দৃষ্টিকোণও বিষয়নিষ্ঠ—তিনিও সহৃদয়ের দৃষ্টিতে রসকে আস্বাদরূপে স্বীকার না করিয়া আস্বাদ্য রূপে স্বীকার করিয়াছেন ঃ সহৃদয়ের নাট্যাস্বাদের নাম রস নয়, রস নাটকের মূল পাত্র এবং নটেই বিদ্যমান থাকে যাহার ভোগ সহৃদয় করেন। ভরতের অনুরূপ লোল্লটও ইহা স্বীকার করেন যে স্থায়ী ভাবই বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সহযোগে রস রূপে পরিণত হয় ঃ

(১) নানাভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি

(ভরত, না০ শা০, পৃ০ ৯৩)

(২) তেন স্থায্যেব বিভানুভাবাদিভিরুপচিতো রসঃ

(লোল্লট, হি০ অ০ ভা০, পৃ০ ৪৪৩)

উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আসিয়া পড়ে তখনি যখন 'ভাবের' বাস্তবিক অর্থের খোঁজ করা হয়। ভরতের মতানুসারে ভাবের—স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর—সত্তা বস্তুগতই। এই সমস্ত ভাব-ভেদগুলি মূল পাত্র: নট অথবা সামাজিক কোন ব্যক্তিরই প্রত্যক্ষ অনুভব না হইয়া সামান্য ভাব-স্বরূপ মাত্র অর্থাৎ ভাব-সম্বন্ধী (মনোবৈজ্ঞানিক) ধারণার অনুসরণে—আধুনিক আলোচনা-শাস্ত্রের ভাষায় নির্বৈয়ক্তিক ভাববিশেষ (Impersonal Emotions)। কবি ও নট স্বকীয় উপকরণের দ্বারা প্রতিভা, লোকজ্ঞান, শিক্ষা অভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা এক বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে ইহাদের সমবায়ে নাট্যরসের সৃষ্টি করেন। লোল্লট বোধ হয় ইহা স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না—এমন কি অনেক আধুনিক আলোচকেরা ভাবের নির্বৈয়ক্তিক স্থিতিকে গ্রাহ্য করেন না। অতএব তিনি বুদ্ধি-বিবেকের দ্বারা ইহাকে স্পষ্ট করিবার প্রযত্ন করিয়াছেন এবং সরাসরি বিচার-প্রক্রিয়ার সরণি গ্রহণ করিয়া স্থায়ী ভাবের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ মূল পাত্রের সহিত ও পরোক্ষ সম্বন্ধ অনুকর্তা নটের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। তিনি কবির দিকেও অগ্রসর হইতে পারিতেন ; ভরতের গ্রন্থে এরূপ প্রমাণও বিদ্যমান আছে ঃ কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবযন্ ভাব উচ্যতে ; কিন্তু বোধ হয় এইদিকে তাঁহার দৃষ্টি যায় নাই। এইরূপ রসের স্থিতি নাট্যের স্থানে অনুকার্য এবং অনুকর্তার মধ্যে স্বীকার করিবার—এবং রসকে অনুভূতিরূপ এবং ভাবপ্রধান শৈল্পিক স্থিতি রূপে গ্রহণ করিবার স্থানে মনোভাব রূপ বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য—ভরতের অপেক্ষা লোল্লটের দৃষ্টিকোণ নিশ্চিত রূপে অধিক আত্মগত এবং ভাবগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সহৃদয়ের দৃষ্টিতে এখনও ইহা বিষয়গত কারণ লোল্লট-কল্পিত রস সহৃদয়ের জন্য আস্বাদ্য ব্যতীত আর কিছু নয়। লোল্লটের মতানুসারে সহৃদয় নিজে যাহা আস্বাদ করেন তাহা রস নয়, রসের পরিণাম। ভরত ও লোল্লটের রসবিষয়ক মতবাদের মধ্যে এই সূক্ষ্ম ভেদাভেদটি দৃষ্টিগোচর করা যায়।

বিবেচনা ঃ শক্তি ও সীমা

লোল্লটের অভিমতের (বা অনুমানিত অভিমতের) সীমা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংস্কৃত

কাব্যশাস্ত্রে বিস্তারের সহিত বিবেচিত হইয়াছে, কিন্তু উহার শক্তি বা গুণের উল্লেখ কোন প্রাচীন আচার্য করেন নাই।

শক্তি বা গুণ—(১)ইহার প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে ভরত সূত্রের সবগুলি ব্যাখ্যানের মধ্যে ইহা মূলের সর্বাধিক নিকট।

(২) রসকে অনুকার্যনিষ্ঠ রূপে গ্রহণ করার কারণ এই যে কাব্য ও নাট্য-সৌন্দর্য মূল পাত্রের ভাবের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং মূল পাত্রের ভাব এবং উহার দ্বারা প্রেরিত কার্যের দ্বারাই কাব্য ও নাট্যের বিষয়-বস্তুর (Theme) নির্মাণ হয়। অতএব এই বিচারানুসারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কাব্য ও নাট্যের মূল সৌন্দর্য উহার বিষয়-বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকে। এইরূপ প্রকারান্তরে লোল্লট শিল্পে বস্তুর গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তটি অন্য নানা মতবাদ থাকা সত্ত্বেও উপেক্ষণীয় নয়। বিশ্ব সাহিত্যের প্রাচীন ও নবীন অনেক আচার্য এই মতটিকে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছেন।

(৩) রসের বিষয়িগত ব্যাখ্যার এখান হইতেই সূত্রপাত—কলাত্মক স্থিতি হইতে অগ্রসর হইয়া মনঃস্থিতি পর্যন্ত রসের প্রসার ঘটে যদিও এই মনঃস্থিতি সহৃদয়ের নয় তথাপি এখানে ব্যক্তির সত্তা বিশেষরূপে স্পষ্ট।

(৪) অভিনেতার দ্বারা রসানুভূতির ঘোষণা করিয়া লোল্লট নাট্য-কলার বিকাশে একটি নূতন দিশার পরিচয় দিয়াছেন। অভিনয়-কলা প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান ক্রিয়া'র অনুসন্ধানটি, লোল্লটের একটি মহৎ সিদ্ধি। ইহার দ্বারা নাট্য-কলার সূক্ষ্ম অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত উপযোগী সূত্র পাওয়া যায়।

সীমা—সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে লোল্লটের মতের ত্রুটি সর্ববিদিত। 'অভিনব ভারতী' অনুসারে শঙ্কুক ইহার বিরুদ্ধে আটটি অভিযোগ করিয়াছেন— (১) বিভাবাদ্যযোগে স্থায়িনো লিঙ্গাভাবেনাবগত্যনুপপত্তেঃ, (২) ভাবানাং পূর্বমভিধেয়তাপ্রসঙ্গাৎ (৩) স্থিতিদশায়াং লক্ষণান্তরবৈয়র্থ্যাৎ, (৪) মন্দতরতমমাধ্যস্থ্যাদ্যানন্ত্যাপত্তেঃ, (৫) হাস্যরসে ষোঢাত্বাভাবপ্রাপ্তেঃ, (৬) কামাবস্থাসু দশস্বসংখ্যরসভাবাদিপ্রসঙ্গাৎ, (৭) শোকস্য প্রথমং তীব্রত্বং কালাৎ তনুমান্দ্যদর্শনং, (৮) ক্রোধোৎসাহরতীনাং অমর্ষস্থৈর্যসেবাবিপর্যয়ে হ্রাসদর্শনমিতি বিপর্যযস্য দৃশ্যমানত্বাচ্চ।[১]

(হিন্দী অভিনবভারতী, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ০ ৪৪৫)

---

১ অর্থাৎ—(১) বিভাবাদির সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত (বা উহার অভাবে স্থায়ীভাবের দ্বারা অনুমাপক হেতুর অনুপস্থিতিতে (স্থায়ী ভাবের) প্রতীতি সম্ভবপর হয় না (এইজন্য স্থায়ী ভাবকে রস বলা চলে না। এবং যদি, শব্দের দ্বারা স্থায়ীভাবের পরোক্ষ প্রতীতিকে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে বিভাবাদির প্রয়োগের) (২) প্রারম্ভে ভাবগুলিকে (শব্দের ভিত্তিতে) অভিধেয় রূপে স্বীকার করিতে হইবে (এই পরোক্ষাত্মক জ্ঞানকে আস্বাদ রূপ সাক্ষাৎকারাত্মক না হওয়ার জন্য রস-বলা চলিতে পারে না।)

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উক্ত অভিযোগগুলির মধ্যে প্রথম ছয়টিতে স্থায়ী ও রসের অভিন্ন স্থিতির স্থায়ীই রস-স্থায্যেব: রসঃ—বিরোধিতা করা হইয়াছে এবং অন্তিম দুইটিতে স্থায়ী ভাবের উপচিতির—স্থায়ী ভাব উপচিত হইয়া রসরূপ গ্রহণ করে—'স্থায্যেব উপচিতো রসঃ'—বিরোধ করা হইয়াছে। প্রথম ছয়টি তর্কের সারাংশ এই যে বিভাবাদির সহিত সংযুক্ত হইবার পূর্বে স্থায়ী ভাবের সত্তা কেবলমাত্র বিচারগত থাকে, উহার জ্ঞান হইতে পারে কিন্তু সাক্ষাৎকারাত্মক বা রসনাত্মক প্রতীতি সম্ভব নয়। অতএব বিভাবাদির দ্বারা সংযুক্ত হইলে পর, প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী ভাব নিজের স্বরূপত্বই লাভ করে—রসরূপত্ব লাভ করে না। ইহা ব্যতীত স্থায়ী ভাবে তারতম্য বিদ্যমান থাকে—মাত্রা-ভেদে স্থায়ী ভাবের অনুভূতি বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু ইহার বিপরীতে রসে তারতম্যের কল্পনাই অসঙ্গত, অতএব উভয়ের স্থিতি অভিন্ন প্রমাণিত হয় না। শেষ দুইটি অভিযোগের সারাংশ এই যে স্থায়ী ভাবের উপচয় সর্বত্র সম্ভব নয়: শোকের স্বভাবতঃই উপচয় না হইয়া অপচয় হয় এবং ক্রোধ, উৎসাহ ও রতির ক্ষেত্রে ভাবের পরিপোষক সামগ্রীর অভাবে অপচয় ঘটে। অতএব 'স্থায়ী ভাব উপচিত হইয়া রস রূপ গ্রহণ করে' এই সিদ্ধান্তটিকে, উপচিতি সম্পর্কে সন্দেহ থাকাতে; প্রমাণিত করা সম্ভবপর নয়।

(৩) (বিভাবাদির প্রয়োগের পূর্বেও রসের) স্থিতিকে স্বীকার করিয়া লইলেও ('বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংয়োগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ' ইত্যাদি রূপ যে রসের উৎপত্তির প্রক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—(সেই) অস্তু লক্ষণের আর দরকার হয় না। (৪) (যদি রত্যাদি স্থায়ী ভাবগুলিকে রসরূপে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে রত্যাদির মাত্রায় ন্যূনাধিক্য অথবা তারতম্যের সম্ভাবনা থাকার জন্য রসও) মন্দ তর-তম-মধ্যম প্রভৃতি অনন্ত ভেদ হইতে থাকিবে। (কিন্তু রসের কেবল একটি রূপ থাকার জন্য উহাতে মাত্রাকৃত তারতম্য স্বীকার করা হয় না। এবং যদি স্থায়ী ভাবকেই রস বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে রসের অনুরূপ স্থায়ী ভাবকেও তারতম্য বা মাত্রাকৃত ভেদ হইতে যুক্ত স্বীকার করিতে হইবে, এমন অবস্থায়) (৫) হাস্য রসে (স্থায়িভাবের মাত্রার তারতম্যের অনুসারে যে ছয়টি ভেদ করা হইয়াছে সেই) ছয়টি ভেদের অভাব দেখা দিবে। (এবং যদি স্থায়ী ভাবের তারতম্যের আশ্রয়ে রসের ভেদ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে) (৬) কামের দশ অবস্থায় অসংখ্য রস, ভাব প্রভৃতি স্বীকার করিতে হইবে। (যাহা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এই জন্য স্থায়ী ভাবকে রসরূপে গ্রহণ করা উচিত নয়, এবং তিনি স্থায়ী ভাবকে উপচয় অথবা উপচিত স্থায়ী ভাবকে রস বলিয়াছেন, কিন্তু শোকাদি স্থায়ী ভাবে) (৭) শোক প্রারম্ভে তীব্র হয়, উহার পরে কালক্রমে কম হইয়া যায় (অতএব উহার উপচয় সম্ভব না হওয়ার জন্য করুণ রসের উৎপত্তি হইবে না। এইরূপ) (৮) ক্রোধ, উৎসাহ ও রতি (প্রভৃতি অন্য স্থায়ী ভাবে) অমর্ষ, বৈর ও সেবার (প্রভৃতি পরিপোষক সামগ্রীর) অভাবে হ্রাস দৃষ্টিগোচর হয় অতএব (উপচয়ের স্থানে তাহার অপচয় রূপ) বিপর্যয়ের জন্য (উপচিত স্থায়ী ভাব রস ইহা বলা উচিত নয়।)

শঙ্কুকের এই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য নয়। স্থায়ী ভাবই রসে পরিণত হয়—এই সিদ্ধান্তটি প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে। ভরতের[১] মত ইহাই ছিল; পরবর্তী রসবাদিরাও[২] এই মতটিকে যথাবৎ স্বীকার করিয়াছেন। প্রভেদ স্থায়ী ভাবের অর্থের বিষয়ে থাকিয়া গিয়াছিল: ভরত যেখানে অব্যক্তিগত স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেখানে অভিনবাদি সহৃদয়ের স্থায়ী ভাবকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোল্লট এই দুইটি অর্থ হইতে ভিন্ন একটি তৃতীয় অর্থ করিয়াছিলেন—অনুকার্যের স্থায়ী ভাব কিন্তু অনুকার্যের বিষয়ে তিনি মূল পাত্র ও কবি-নিবদ্ধ পাত্রের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট করিতে পারেন নাই। এই অক্ষমতাই তাঁহার বিবেচনার সর্বাধিক দুর্বল অঙ্গ এবং এখান হইতে তাঁহার সিদ্ধান্তের খণ্ডন শুরু হয়।

এই ত্রুটি হইতে আর একটি ত্রুটি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ত্রুটির জন্য রসের স্থিতি প্রত্যক্ষ ঐন্দ্রিয় মানসিক ভাব রূপ বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং তদনুসার সুখ-দুঃখাত্মক হইয়া পড়ে যাহা কোনমতেই স্বীকার্য নয়। লোল্লটের মতের এই দুইটিই প্রমুখ দোষ।

উপসংহার

উল্লিখিত বিবেচনানুসারে নিম্নলিখিত সার-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়—(১) লোল্লটের মতানুসারে নিষ্পত্তির সরল অর্থ উপচিতি, কারণ স্থায়ীর উপচিত অবস্থার নামই রস। এই উপচিতি একটি মিশ্র প্রক্রিয়া যাহার মধ্যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী আসিয়া যোগ দেয়। (ক) বিভাবের দ্বারা স্থায়ী ভাব উদ্‌বুদ্ধ হয়। এই উদ্‌বুদ্ধিকে উৎপত্তিও বলা যাইতে পারে কিন্তু এখানে উৎপত্তির অর্থ হইবে অরূপকে রূপ প্রদান করা—অভাবে ভাবের কল্পনা নয়; স্থায়ী ভাব বাসনা রূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই কেবল শব্দের দ্বারা অভিধেয় হয়, উহার সাক্ষাৎকারাত্মক প্রতীতি হয় না—বিভাবের জন্যই উহা নিজের রসাত্মক রূপ লাভ করে। (খ) অনুভাবের দ্বারা উহার (স্থায়ী ভাবের) প্রতীতি হয়: মম্মট ইহা ভালভাবেই স্পষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু অভিনবগুপ্তের উদ্ধরণেও ইহার স্পষ্ট সংকেত পাওয়া যায়। (গ) ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা ইহার পুষ্টি হয়—এই তিনটি ক্রিয়ার মধ্যে প্রারম্ভে ক্রমিক যোগ বিদ্যমান থাকে এবং অবশেষে তিনটি একত্রিত হইয়া উপচিতির প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে ভরত, এবং তাঁহার নিকটতম বলিয়া লোল্লটও, "ষাড়বাদি রস" সৃজনের প্রক্রিয়াকেই আধাররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেরূপ নিমিত্ত কারণ হইতে নিসৃত পদার্থ-বিশেষের দ্রব অন্য দ্রব্য ও ঔষধির মিশ্রণে 'ষাড়বাদি রস' এ পরিণত হয় তেমনি বিভাবের দ্বারা উদ্‌ভূত

---

১. নানাভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি। (ভরত, না০ শা০, পৃ০ ৯৩)

২. রসতামেতি রত্যাদি: স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্। সা০ দ০ ৩।১

স্থায়ী ভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব একত্রিত হইয়া (পরিপোষিত হইয়া) নাট্যরস রূপে পরিণতি লাভ করে। অতএব নিষ্পত্তির অর্থ—নির্মিতি (ইংরাজিতে যাহার জন্য Preparation শব্দ ব্যবহার হয়)। ইহার জন্য উৎপত্তি শব্দের প্রয়োগ কেবল এই অর্থেই করা যাইতে পারে যে রসের দ্বারা স্থায়ী ভাব বিভাবাদি হইতে উপচিত হইয়া একটি নবীন রূপ গ্রহণ করে : রসরূপে কোন অদ্ভুত পদার্থের উদ্ভব হয় না।

'নিষ্পত্তির' অর্থ স্পষ্ট হইলে পরে 'সংযোগের' অর্থ করা নিশ্চিত সরল হইয়া পড়ে। সংযোগের সোজাসুজি অর্থ বিভাবাদির সহিত স্থায়ী ভাবের সংযোগ : বিভাবাদিভিঃ সংযোগোঽর্থাৎ স্থায়িনস্ততো রসনিষ্পত্তিঃ। এই বিভাবাদি স্থায়ী ভাবকে উপচিত করিয়া রসরূপে পরিণত করে—অতএব বিভাবাদি উপচায়ক এবং স্থায়ী ভাব উপচেয়, অর্থাৎ স্থায়ী ভাব ও বিভাবাদির মধ্যে উপচেয়-উপচায়ক সম্বন্ধ বর্তমান। এইরূপ 'সংযোগের' অর্থ : উপচেয়-উপচায়ক সম্বন্ধ। ইতিপূর্বে আমি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, উপচয় বা উপচিতি একটি সংযুক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ যাহা উৎপত্তি, প্রতীতি ও পুষ্টি এই তিনটি অঙ্গভূত ক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করে। বিভাব হইতে স্থায়ী ভাবের উৎপত্তি হয়, অতএব বিভাবের সহিত উহার উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধ থাকে, অনুভাবের দ্বারা উহার প্রতীতি হয়, অতএব অনুভাবের সহিত উহার গম্য-গমক সম্বন্ধ থাকে এবং ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা উহার পুষ্টি হয় অতএব ব্যভিচারীর সহিত উহার পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ উপচেয়-উপচায়ক সম্বন্ধ উৎপাদ্য-উৎপাদক + গম্য-গমক + পোষ্য-পোষক সম্বন্ধেরই সমবায়রূপ। এইরূপ সূত্র হইল :

সংযোগ = উপচেয়-উপচায়ক সম্বন্ধ = উৎপাদ্য-উৎপাদক + গম্য-গমক + পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ।

দার্শনিক পৃষ্ঠভূমি

লোল্লটের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত যে তিনি মীমাংসক ছিলেন। এখন পর্যন্ত এই সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—এবং ইহার ইতিহাসও খুব প্রাচীন নয়, কারণ অভিনবগুপ্ত, মম্মট ও জগন্নাথ প্রভৃতিরা এই তথ্যের উল্লেখ করেন নাই, সর্বপ্রথম বোধ হয় কাব্য প্রকাশের ভাষ্যকার বামন ঝলকীকার ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নিজের বালবোধিনী টীকায় ইহার আভাষ দিয়াছিলেন যে লোল্লট ভট্ট-মতোপজীবী মীমাংসক[১] ছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেখান হইতে প্রেরণা গ্রহণ করিয়া ডঃ পী. বী. কাণে[২] অভিনবভারতীর একটি উদ্ধরণের আশ্রয়ে লোল্লটকে পূর্বমীমাংসক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই দুইটি উল্লেখের ভিত্তিতে গতানুগতিকতার বশে

১. কাব্য প্রকাশ : বামন ঝলকীকার, পৃ০ ২২৫

২. হিস্ট্রী অব সংস্কৃত পোইটিক্স, পৃ০, ৪৯

হিন্দী-সংস্কৃতের আধুনিক বিদ্বানেরা লোল্লটের রস-বিবেচনাকে মীমাংসার উপর আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—সেঠ কন্হৈয়ালাল পোদ্দার, ডঃ শ্যামসুন্দর দাস, ডঃ গুলাবরায়, পণ্ডিত রামদহিন মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিঃসঙ্কোচে এই তথ্যটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য বিশ্বেশ্বরও প্রচলিত ধারার সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন : "এই ব্যাখ্যাকে টীকাকারেরা মীমাংসা-সিদ্ধান্তের অনুসরণে রচিত ব্যাখ্যা বলিয়াছেন। 'মীমাংসা' বলিতে এখানে 'উত্তরমীমাংসা' অর্থাৎ 'বেদান্ত' বুঝিতে হইবে। বেদান্তে জগতের আধ্যাত্মিক প্রতীতিকে স্বীকার করা হইয়াছে। যেমন রজ্জুতে সর্পের আধ্যাত্মিক বা আরোপীত প্রতীতির সময় সর্পের অবর্তমানেও উহার দ্বারা ভয়াদি কার্যের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অভিনয়াদির সময় রামাদি নিষ্ঠ সীতা-বিষয়নী অনুরাগাদিরূপা রতির অবর্তমানেও, নটে বিদ্যমান রূপে উহার প্রতীতি এবং উহার দ্বারা সহৃদয়ে চমৎকারানুভূতি প্রভৃতি কার্যের উৎপত্তি হয়। এই সাদৃশ্যের জন্য এই সিদ্ধান্তকে মীমাংসা অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা বা 'বেদান্তে'র অনুগামী সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যার ব্যাখ্যাতা ভট্টলোল্লট মীমাংসক পণ্ডিত ছিলেন।" (কাব্য প্রকাশ—টীকা পৃ০ ১০১-১০২)। কিন্তু বর্তমান[১] অনুসন্ধানকর্তারা যখন ইহার মূল স্রোতের খোঁজ করিলেন তখন তাঁহারা এইরূপ কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাইলেন না। প্রমাণের অভাবে কোন প্রাচীন প্রবাদের আবৃত্তি করা অনুসন্ধানের নিয়মের বিরুদ্ধে। অতএব আজ ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যে লোল্লট পূর্ব মীমাংসক, উত্তর মীমাংসক অথবা ভট্টমতোপজীবী মীমাংসক ছিলেন।

অপর দিকে ডঃ কান্তিচন্দ্র পাণ্ডেয় ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে লোল্লট শৈব ছিলেন। দুইটি আধার—ভিত্তির আশ্রয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তটির প্রচার করিয়াছেন : (১) বসুগুপ্তের স্পন্দকারিকার উপর কোন এক লোল্লটের একটি বৃত্তি পাওয়া যায় এবং (২) শৈবদর্শনের অনুসরণে লোল্লট 'অনুসন্ধান' শব্দের 'যোজন' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।[২] ইহাতে সন্দেহ নাই যে এই কল্পনা উপরোক্ত কল্পনার অপেক্ষা অধিক সারগর্ভ কিন্তু ইহাকেও সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক মানিয়া লওয়া সহজ নয় কারণ, প্রথমতঃ 'অনুসন্ধান' শব্দের প্রয়োগ লোল্লট 'যোজন' অর্থে করিয়াছিলেন ইহার কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই এবং দ্বিতীয়তঃ লোল্লটের বিবেচনার সহিত শৈবাদ্বৈতের কোন প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে না। অতএব এই বিকল্পটিও সন্দিগ্ধই।—শেষে, ডঃ তারকনাথ বালী নিজের অনুসন্ধান-প্রবন্ধে স্থায়ী ভাবের 'উৎপত্তি'র ভিত্তিতে 'অসৎকার্যবাদের' সহিত লোল্লটের রস-বিবেচনার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন[৩] কিন্তু

---

১. ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্ত (রসগঙ্গাধর, শা০ আ০ পৃ০ ১২৬)

২. হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়ন এস্থেটিক্স, পৃ০ ২৮

৩ রস-সিদ্ধান্ত কা দার্শনিক তথা নৈতিক বিবেচন, পৃ০ ৩৭

আমি উল্লিখিত বিবেচনায় এই স্থলে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে লোল্লট 'উৎপত্তি' শব্দের প্রয়োগ 'অভাবে ভাবের কল্পনার' জন্য করেন নাই—তিনি ভাবের বাসনা রূপ স্থিতির সহিত পরিচিত ছিলেন : স্থায়ী এবং ব্যভিচারী উভয় প্রসঙ্গে তিনি 'বাসনার' প্রয়োগ করিয়াছেন—(১) কস্যচিদ্বাসনাত্মকতা স্থায়িবৎ, (২) ব্যভিচারিণশ্চ....যদ্যপি ন সহভাবিনঃ স্থায়িনা তথাপি বাসনাত্মনেহ তস্য বিবক্ষিতাঃ। প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে যদি ইহা মানিয়া লওয়া হয় যে বাসনা-বিষয়ক টিপ্পনী অভিনবের দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে, তবুও বোধ হয় ইহা কল্পনা করা ঠিক হইবে না যে ভারতীয় দর্শনের এই অত্যন্ত প্রচলিত ধারণার সম্বন্ধে লোল্লট সজ্ঞান ছিলেন না—অথবা ইহা স্বীকার করিতেন না, অতএব অসৎকার্যবাদের বিচারও যুক্তিযুক্ত প্রতীত হয় না এবং শেষে সিদ্ধান্তরূপে আমরা কেবল ইহাই বলিতে পারি যে উপলব্ধ সামগ্রীর অনুসরণে লোল্লটের রস-বিবেচনার দার্শনিক ভূমিকা-নির্ণয় সম্ভবপর নয়। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে তাঁহার দৃষ্টি ভরতেরই অনুরূপ ব্যবহারিক ছিল। তথাস্তু!

শ্রী শঙ্কুক

শঙ্কুক ভরত সূত্রের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা। ইঁহারও ভট্টলোল্লটের অনুরূপ কেবল নামই অবশেষ আছে। ইঁহার মতের সহিত সম্বদ্ধ কতিপয় উদ্ধরণ 'অভিনব-ভারতী' ও 'ধ্বন্যালোকলোচনে' এবং একটি উদ্ধরণ 'কাব্যপ্রকাশে' উপলব্ধ হয়। হেমচন্দ্র ও প্রদীপকারের রস-বিবেচনাতে উদ্ধৃত শঙ্কুকের মত প্রায় এই সব উদ্ধরণের উপরই আশ্রিত।

'অভিনবভারতী'তে উদ্ধৃত শ্রী শঙ্কুকের মত ঃ

তস্মাৎ হেতুভির্বিভাবাখ্যৈঃ, কার্যৈরনুভাবাত্মভিঃ, সহচারিরূপৈশ্চ ব্যভিচারিভিঃ প্রযত্নার্জিততয়া কৃত্রিমৈরপি তথানভিমন্যমানৈঃ, অনুকর্তৃস্থত্বেন লিঙ্গবলতঃ প্রতীয়মানঃ স্থায়িভাবো মুখ্যরামাদিগতস্থায্যনুকরণরূপঃ। অনুকরণত্বাদেব চ নামান্তরেণ ব্যপ-দিষ্টো রসঃ।

বিভাবা হি কাব্যবলানুসন্ধেয়াঃ। অনুভাবাঃ শিক্ষাতঃ। ব্যভিচারিণঃ কৃত্রিমনিজানুভাবার্জনবলাৎ। স্থায়ী তু কাব্যবলাদপি নানুসন্ধেয়ঃ। 'রতিঃ শোকঃ' ইত্যাদয়ো হি শব্দা রত্যাদিকমভিধেয়ীকুর্বন্ত্যভিধানত্বেন ন তু বাচিকাভিনয়রূপতয়াহব-গময়ন্তি। × × ×

× × × অতএব স্থায়িপদং সূত্রে ভিন্নবিভক্তমপি নোক্তম্।

তেন 'রতির্নুক্রিয়মাণা শৃঙ্গারঃ' ইতি তদাত্মকত্বং তৎপ্রভবত্বং চাযুক্তম্।

অর্থক্রিয়াপি মিথ্যাজ্ঞানদৃষ্টা—

মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।

মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ॥ ইতি ॥

ন চাত্র নর্তক এব সুখীতি প্রতিপত্তিঃ। নাপ্যয়মেব রাম ইতি। ন চাপ্যয়ং ন সুখীতি। নাপি রামঃ স্যাদ্বা না চায়মিতি। নাপি তৎসদৃশ ইতি। কিন্তু সম্যঙ্‌-মিথ্যাসংশয়সাদৃশ্য প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণা চিত্রতুরগাদিন্যায়েন, যঃ সুখী রামঃ অসাবয়মিতি প্রতীতিরস্তীতি।

তদাহ—

প্রতিভাতি ন সন্দেহো, ন তত্ত্বং, ন বিপর্যয়ঃ।
ধীরসাবয়মিত্যস্তি নাসাবেবায়মিত্যপি॥
বিরুদ্ধবুদ্ধিসম্ভেদাদ্ অবিবেচিত সম্প্লবঃ।
যুক্ত্যা পর্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্ননুভবঃ কয়া॥

—অর্থাৎ এইজন্য (রসের) কারণ-রূপ বিভাব (উহার) কার্যরূপ অনুভাব (কটাক্ষাদি শারীরিক ব্যাপার), ও সহচারীরূপ (নির্বেদাদি) ব্যভিচারী ভাবের (মানসিক ব্যাপার বা চিত্তবৃত্তি) সাহায্যে নটের দ্বারা নিজের শিক্ষা, অভ্যাস ইত্যাদি রূপ) (চেষ্টার্জিত হওয়ার জন্য কৃত্রিম হইলে পরেও সেইরূপ (কৃত্রিম) প্রতীত হয় না এমন (কারণ কার্য সহকারীরূপ পূর্বোক্ত বিভাবাদি হইতে) লিঙ্গের সামর্থ্যানুসারে সেই স্থায়ীভাব অনুকর্তার (নটের) মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হয়; এইজন্য মুখ্য (অনুকার্য) রামাদিতে অবস্থিত (রত্যাদি) স্থায়িভাবের অনুকরণ রূপই (নটনিষ্ঠ স্থায়িভাবই) রস এবং অনুকরণ-রূপ হওয়ার জন্যই (স্থায়িভাব নামে কথিত না হইয়া) রস এই ভিন্ন (রস এই) নামে বুঝাতে হয়।

(এইরূপ রসের অনুভূতিতে কারণভূত) বিভাব কাব্যের দ্বারা উপস্থিত হয়। (কটাক্ষ, ভূজাক্ষেপ প্রভৃতি) অনুভাব (নটের) শিক্ষার (অভ্যাসাদি) দ্বারা ও ব্যভিচারী ভাব কৃত্রিম অনুভাবের দ্বারা অর্জিত হইয়া (উপস্থিত হয়)। স্থায়িভাব (ইহাদের মধ্যে কোন সাধনের দ্বারাই উপস্থিত হয় না)। কাব্যের বলেও প্রতীতিযোগ্য হয় না। (ইহা পূর্ব হইতে বিদ্যমান থাকে। কেবল বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব-রূপ লিঙ্গের দ্বারা নটগত রূপে অনুমিত হয়। তাহাও রামাদিনিষ্ঠ রত্যাদির অনুকরণাত্মক রূপে অনুমিত হয়। এইজন্য অনুকরণাত্মক হওয়াতে স্থায়িভাব নামের স্থানে 'রস' নামে কথিত হয়)। রতি, শোক প্রভৃতি শব্দ 'রতি' ইত্যাদির আভিধানিক (শব্দ প্রক্রিয়ার অনুসারে পরোক্ষ রূপে) অর্থই বোধ করায়। বাচিক অভিনয় রূপে বোধিত হয় না। × × × × এইজন্য (স্থায়িভাবের প্রতীতি কাব্য শক্তিতে না হইয়া কেবল অভিনয় দ্বারা হওয়ার জন্য সূত্রকার রসের লক্ষণে যেখানে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির উল্লেখ হইয়াছে সেখানে) স্থায়ী শব্দটির ভিন্ন বিভক্তির দ্বারাও প্রয়োগ করেন নাই।

এইজন্য অনুক্রিয়মাণ (যাহার অভিনয়ের দ্বারা অনুকরণ করা হইতেছে এইরূপ নটনিষ্ঠ) রতিই (স্থায়িভাব) শৃঙ্গার রস। অতএব (রসকে ভট্টলোল্লট যে তদাত্মক অর্থাৎ) স্থায়িভাব-রূপ অথবা (উৎপত্তিবাদের দ্বারা) স্থায়িভাব জন্য (তৎপ্রভাব) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারাও (রসাস্বাদাদি রূপ) অর্থক্রিয়া (ফল প্রাপ্তি) দৃষ্ট হয়।

মণির প্রভা ও প্রদীপের প্রভা দেখিয়া এবং (তাহাদের) মণি ভাবিয়া (কুড়াইবার জন্য) ধাবিত দুই ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যাজ্ঞান সমান হইলে পরেও অর্থক্রিয়া—(অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তিতে) ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এবং এখানে (১) নটই সুখী (শৃঙ্গার রসযুক্ত রাম), এই বোধ হয় না। এবং (২) ইনিই রাম, এইরূপ প্রতীতও হয় না। (৩) এবং ইনি সুখী (রাম) নন, এই প্রতীতিও হয় না। এবং (৪) ইনি রাম না কি, রাম নয়—এই রূপ (সংশয়াত্মক) বোধ হয় না। কিন্তু চিত্রতুরগাদি ন্যায়ের দ্বারা (অর্থাৎ আঁকা অশ্বের চিত্র দেখিয়া যেইরূপ প্রতীতি হয়, সেইরূপ) সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় ও সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রতীতি হইতে স্বতন্ত্র রূপ, অর্থাৎ যে সুখী রাম তিনি এই (নট), এইরূপ, প্রতীতি হয়। (অতএব ইহাকে নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তি বলা হইতে পারে না)। এইজন্য (নিম্ন কারিকাতে) বলা হইয়াছে—

(নাটকে নটকে রামাদিরূপে দেখিবার সময়) সন্দেহের প্রতীতি হয় না, যথার্থতার এবং ভ্রান্তিরও হয় না। এই (নট) তিনি (রামরূপ) এইরূপ ধারণা হয় এবং এই (নট বাস্তবে) তিনি (রামাদিরূপ) নন এইরূপও ধারণা হয়।

এইজন্য বিরুদ্ধ প্রকারের বুদ্ধির সংমিশ্রণের জন্য পৃথকরূপে ভ্রম প্রভৃতির সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন ধারণা হয় না। ফলে এই প্রত্যক্ষাত্মক অনুভবকে কী (ভ্রমাদিরূপে) বলা হইবে (ইহার সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা সম্ভব হয় না)।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৪৬—৫০)

(ধ্বন্যালোকলোচনের দ্বিতীয় উদ্যোতে শঙ্কুকের নাম উল্লেখ না করিয়াই অভিনবগুপ্ত তাঁহার রস বিষয়ক মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন :

অন্যে তু—অনুকর্তরি যঃ স্থায্যবভাসোঽভিনয়াদিসামগ্র্যাদিকৃতো ভিত্তাবিব হরিতালাদিনা অশ্বাবভাসঃ, স এব লোকাতীততয়াস্বাদাপরসঙ্গয়া প্রতীত্যা রস্যমানো রস ইতি নাট্যাদ্রসা নাট্যরসাঃ।

—অর্থাৎ অপর আচার্যরা বলেন যে যেইরূপ ভিত্তির উপর হরিতাল প্রভৃতির সাহায্যে অশ্বের চিত্র তৈয়ারি করা হয় এবং ঐ চিত্রে অশ্বের 'আভাস' হইতে লাগে, সেইরূপ অভিনয় ইত্যাদি সামগ্রীর সহকারে অনুকরণকারী নটে স্থায়িভাবের 'আভাস' হয়। ইহা একটি অনন্য প্রতীতি যাহার তুলনা ইহলোকের অন্য কোন প্রতীতির সহিত সম্ভবপর নয়। অতএব এই প্রতীতিতে এক ধরণের আস্বাদ উৎপন্ন করিবার শক্তি উৎপন্ন হইয়া যায়। এই প্রতীতির অপর নাম আস্বাদও হইয়া পড়ে। এই রসন বা আস্বাদনকে রস বলে। এই রসন বা আস্বাদন নাট্য হইতে হয়। অতএব ইহাকে নাট্যরস বলা হয়।

মম্মটের কাব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত শঙ্কুকের মত :

কাব্যানুসন্ধানবলাচ্ছিক্ষাকাভ্যাসনির্বর্তিতস্বকার্যপ্রকটনেন চ নটেনৈব প্রকাশিতৈঃ কারণকার্যসহকারিভিঃ কৃতিমৈরপি তথাঽনভিমন্যমানৈর্বিভাবাদিশব্দব্যপদেশ্যৈঃ

'সংযোগাৎ 'গম্যগমকভাবরূপাৎ, অনুমীয়মানোঽপি বস্তুসৌন্দর্যবলাদ্রসনীয়ত্বেনান্যানু-মীয়মানবিলক্ষণঃ স্থায়িত্বেন সংভাব্যমানো রত্যাদির্ভাবস্তত্রাসন্নপি সামাজিকানাং বাসনয়া চর্ব্যমাণো রস ইতি শ্রী শঙ্কুকঃ।

—অর্থাৎ—কাব্যের অনুশীলন এবং শিক্ষার অভ্যাসে নিষ্পন্ন নিজের (অনুভাব ইত্যাদি) কার্যের দ্বারা আস্বাদমানকেই রস বলা হয়, যাহা নটেরই দ্বারা প্রকাশিত, কৃত্রিম হইলেও যাহা অকৃত্রিম প্রতীত হয়। ইহা বিভাবাদি শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, কারণ, কার্য ও সহকারীর সহিত 'সংযোগ' অর্থাৎ গম্যগমকভাবরূপে অনুমেয় হইলেও বস্তুর সৌন্দর্যের জন্য ও আস্বাদের বিষয় হওয়ার জন্য অন্য অনুমেয় অর্থ হইতে বিলক্ষণ স্থায়ী রূপে সম্ভাব্যমান রতি প্রভৃতি ভাব সেখানে (অর্থাৎ নটে বাস্তবিক রূপে) না থাকিলেও সামাজিকের সংস্কারের দ্বারা (স্বাত্মগতত্বেন) আস্বাদমানকেই 'রস' বলা হয়। ইহা শঙ্কুকের মত।

শঙ্কুকের অভিপ্রায়

(১) নটের দ্বারা অনুকার্যগত স্থায়ী ভাবের অনুকৃত রূপকে রস সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়—অর্থাৎ স্থায়ী ভাব প্রকৃতপক্ষে অনুকার্য রামাদিতেই অবস্থান করে। নট নিজের কৌশলের দ্বারা উহার অনুকরণ করে এবং এমন ধারণা হয় যে সেও স্থায়ী ভাবের অনুভূতি করিতেছে। স্থায়ী ভাবের এই নাট্যানুকৃতিই রস।

(২) বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব নাট্যে উপস্থিত থাকে, কিন্তু স্থায়ী ভাব উপস্থিত থাকে না। শব্দ প্রভৃতির দ্বারা কেবল উহার বোধ হইতে পারে প্রতীতি নয়—উহার উপস্থাপন কেবল অভিনয়ের দ্বারাই হইতে পারে, এইজন্য ভরতসূত্রে ভিন্ন বিভক্তিতেও ইহার উল্লেখ হয় নাই। অতএব সামাজিক বিভাদি লিঙ্গের দ্বারা উহার অনুমান করেন—নট দ্বারা অনুক্রিয়মাণ রামাদি স্থায়ী ভাবের অনুমান করেন।

(৩) অনুকরণের প্রক্রিয়া: (ক) বিভাদির অনুকরণ কাব্যের আশ্রয়ে হয়—অর্থাৎ কবি বিভাবাদির চিত্রণ যেমন নাটকে করিয়াছেন, অনুকর্তা সেই অনুসারে ব্যবহার করে। (খ) অনুভাবের অনুকরণ অভিনয়-কলার শিক্ষার দ্বারা সম্ভবপর হয়। (গ) ব্যভিচারী ভাবের অনুকরণ নট নিজের কৃত্রিম অনুভাবের ভিত্তিতে করিত সমর্থ হয়। লোকানুভবে নট চিন্তা, হর্ষ প্রভৃতির যেরূপ মুদ্রা দেখে তেমনি চিন্তা, হর্ষ প্রভৃতি মুদ্রা বাস্তবিক অনুভবব্যতীতই কৃত্রিম রূপে তৈয়ারি করিয়া উক্ত ব্যভিচারির অভিনয় এমন কৌশলের সহিত করে যে কৃত্রিম হইলে পরেও বাস্তবিক প্রতীত হয়।

এই বিবেচনা অভিনয়-কলার দৃষ্টিতে খুবই উপযোগী। এবং ইহা ব্যতীত এই সিদ্ধান্তটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার ভিত্তিতে অনুকার্যের বাস্তবিক স্বরূপ কি, তাহার বোধ হয় প্রথমবার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় এবং ইহা স্পষ্ট হইয়া পড়ে যে অনুকার্যের অভিপ্রায় বাস্তবিক দৃষ্টিতে কাব্যনিবদ্ধ রামাদিই, ঐতিহাসিক

রামাদি নয়। মূলতঃ ঐতিহাসিক রামাদিই অনুকার্য কিন্তু তাঁহারা কবির অনুকার্য নটের নয়—নটের অনুকার্য কবিনিবদ্ধ রামাদি।

(৪) এখানে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে যখন নটনিষ্ঠ স্থায়ী ভাব অবাস্তবিক তখন প্রেক্ষকের দ্বারা উহার অনুমান মিথ্যাজ্ঞানের পর্যায় পড়িবে এবং এই মিথ্যা-জ্ঞানের আশ্রয়ে প্রেক্ষকের নাট্যরসাস্বাদনকে কীরূপ ভাবে বাস্তবিক স্বীকার করা হইবে? ইহার সমাধান দুইরূপে হইতে পারে:

নটে রামের প্রতীতি কেবল মাত্র ভ্রান্তি নয় কারণ নাট্যে নটকে রামরূপ দেখিয়া সন্দেহের অনুভব হয় না, যথার্থতারও অনুভব হয় না এবং ভ্রান্তিও হয় না—নট রাম এই ধারণা হয় এবং নট রাম নয় এও ধারণা হয়। এমন অবস্থায় নটে রামের প্রতীতি একটি বিচিত্র (কলা জন্য) প্রতীতি, যাহা সন্দেহ, যথার্থজ্ঞান, ভ্রান্তি—কোন প্রকারেই বাস্তবিক অনুভবের অনুরূপ হয় না। অতএব নাট্যের প্রতীতি একটি বিশেষ কলা জন্য প্রতীতি যাহাকে শুদ্ধ ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত নয়।

কলার এই বিশিষ্ট প্রতীতিকে 'চিত্রতুরগন্যায়ের' ভিত্তিতে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে। নটে রামের প্রতীতি সম্যক্ বা যথার্থজ্ঞান নয়, কারণ নট বাস্তবে রাম নয়; ইহা মিথ্যাজ্ঞানও হয়—যেহেতু নটে রামত্বের আরোপ সেই দৃষ্টিতে নিরাধার নয় যেই দৃষ্টিতে রজ্জুতে সর্পভ্রম নিরাধার; ইহা সংশয় জ্ঞানও নয়, অর্থাৎ নাটক দেখিবার সময় সামাজিকের মনে এই সন্দেহ হয় না যে সামনে নট কি রাম যেহেতু সন্দেহ কলা প্রতীতির সর্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন—সংশয়গ্রস্ত মন কলার আনন্দ গ্রহণ করিতে পারে না; এবং শেষে, এই প্রতীতি সাদৃশ্য জ্ঞানও নয় অর্থাৎ দর্শকের এই বোধ হয় না যে সম্মুখে নটই উপস্থিত কিন্তু সে রামের সদৃশ। অতএব এই প্রতীতি সামান্য নয়, বিলক্ষণ—কী রূপ বিলক্ষণ? যেরূপ অশ্বের চিত্রে অশ্বের প্রতীতি অর্থাৎ এই প্রতীতি কলাগত প্রতীতি যাহা সামান্য প্রতীতির বিভিন্ন ভেদ হইতে ভিন্ন। এইরূপ শঙ্কুক নিজের বিচারে কলানুভূতির বিলক্ষণতারই ব্যাখ্যান করিয়াছেন—যাহা সর্ব-সম্মত না হইলে পরেও বিশ্বের প্রাচীন ও নবীন সৌন্দর্যশাস্ত্রের একটি বহুমান্য সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত।

উল্লিখিত বিবেচনার সারাংশ এই যে কাব্য, নাটকের আঙ্গিক, অভিনয়-কলা প্রভৃতির সাহায্যে রাম-সীতা রূপে, ব্যবহার প্রভৃতির (বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী) অভিনয়কারী নট-নটী যখন তাঁহাদের প্রেমের (রতি স্থায়ী অভিনয় করিতে সফল হন—অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের প্রণয়ের দৃশ্য উপস্থিত করেন তখন রস নিষ্পন্ন হয়। অতএব রস-নিষ্পত্তির অর্থ কাব্য, নাটকের আঙ্গিক প্রভৃতির সাহায্যে নটের দ্বারা স্থায়ী ভাবের অনুকৃতি—সোজা কথায়, স্থায়ী ভাবের অভিনয়। এইরূপ শঙ্কুকের মতে রসের ভিত্তি নট: তাঁহার মতানুসারেও রস ভাবের উপর আশ্রিত একটি কলাত্মক স্থিতি বিশেষ যাহাতে অভিনয় প্রধান-তত্ত্ব ও কাব্য-তত্ত্ব গৌণ কারণ কাব্য অভিনয়ের সহায়ক মাত্র। এই দৃষ্টিতে এই মতটিও ভরত-সম্মত মতেরই অনুরূপ কারণ ইহাতেও

রসকে অনুভূতি-রূপ স্বীকার না করিয়া স্থিতি-রূপই স্বীকার করা হইয়াছে—প্রভেদ কেবল এই যে ভারতের মতে যেখানে কাব্য ও নাট্য উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে সেখানে শঙ্কুকের মতে অভিনয় তত্ত্বেরই প্রাধান্য। লোল্লটের মত হইতে ইহার প্রভেদ এই যে লোল্লট রসকে অনুভূতি-রূপ স্বীকার করিয়াছেন; যদিও এই অনুভূতি সহৃদয়ের অনুভূতি নয় অনুকার্য অর্থাৎ মূল পাত্রের অনুভূতিই।

প্রেক্ষকের সহিত রসের কি সম্বন্ধ? শঙ্কুকের মতানুসারে নাট্যশালায় প্রদর্শিত বিভাব, অনুভাব বা ব্যভিচারীর দ্বারা প্রেক্ষক এই রসের অনুমান করেন। অভিনব-গুপ্তের উদ্ধরণে কেবল এই অংশটিরই উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহাতে এই অর্থও উদ্দিষ্ট যে এইরূপ অনুমানের দ্বারা সহৃদয় চমৎকারিতা লাভ করেন, অন্যথা প্রেক্ষক সেখানে যাইবে কেন? মম্মট সহৃদয়ের দিকটাকে আরও স্পষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাব বক্তব্য এই যে সহৃদয় একদিকে বস্তু-সৌন্দর্য ও অপর দিকে বাসনার প্রভাবে এই রসের, পক্ষান্তরে রস-রূপ এই কলাত্মক স্থিতির চর্বণা করেন। সামান্যতঃ অনুমান এক ধরণের পরোক্ষ জ্ঞান, কিন্তু প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে এই অনুমান উল্লিখিত কারণগুলির দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং আস্বাদ্য হইয়া যায়। হেমচন্দ্র এই প্রক্রিয়াটিকে সুব্যক্ত করিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন: কোন ব্যক্তি একটি কষায় ফল খাইতেছে। উহার মুখাকৃতি এবং চেষ্টা আমাদের ইহাই সূচিত করে যে সে কষায় ফল খাইতেছে। এবং সেই সময় আমাদের মুখে সেইরূপই জল ভরিয়া আসে যেইরূপ সেই কষায় ফল ভক্ষণকারী ব্যক্তির মুখে ভরিয়া আসিতে ছিল, অথবা কষায় ফল খাইতে গিয়া আমাদের মুখ যেরূপ ভরিয়া আসিতে পারিত। ঠিক এইরূপ রাম-রূপে মনোনীত নটের স্থায়ী ভাব দেখিয়া সামাজিকের বাসনার স্থায়ীতেও চর্বণার সুযোগ হয়।" (রসগঙ্গাধরের শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন, পৃ০ ১৩২)। অভিনবের উদ্ধরণে এই সব কোন কথা নাই—প্রকৃতপক্ষে মম্মট পরবর্তী বিচার-তর্কের আশ্রয়ে বাসনা প্রভৃতিকে কারণরূপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

রস প্রক্রিয়ার ত্রিকোণ চিত্র এইরূপ হয়:

অনুকার্যগত স্থায়ী ভাব

নট দ্বারা অনুক্রিয়মাণ স্থায়ী ভাব=রস  সহৃদয়ের দ্বারা রসের অনুমিতি

এই ত্রিকোণ অনুসারে স্পষ্টতঃ অনুকর্তাই রসের ভিত্তি রূপ এবং নিষ্পত্তির অর্থ অনুকৃতি কারণ স্থায়ী ভাব অনুকৃত হইয়াই রসরূপে নিষ্পন্ন হয়। প্রেক্ষক,

যেহেতু, বিভাবাদির দ্বারা এই রসের অনুমান করেন, এইজন্য তাঁহার দৃষ্টি অনুসারে রসের অনুমিতি হয়—অতএব নিষ্পত্তির অর্থ 'অনুমিতি' এবং 'সংযোগ' গম্য-গমক ভাবের বাচক রূপ। মূল কথা এই যে শঙ্কুকের রস-ব্যাখ্যায় নটের* স্থিতি প্রধান হওয়ার জন্য নিষ্পত্তির প্রাথমিক অর্থ অনুকৃতিই; অনুমিতি তো ইহার গৌণ ও আরোপিত অর্থ যাহা প্রেক্ষকের সন্দর্ভে অন্য অবস্থানে প্রমাণিত হয়।

ভট্ট তোতের দ্বারা শঙ্কুকের অনুকরণবাদের খণ্ডন

শঙ্কুকের মতের খণ্ডন অভিনবগুপ্ত স্বীয় আচার্য ভট্ট তোতের মাধ্যমে করিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার-তর্ক ভট্ট তোতের নিজস্ব কি না বা অভিনবের বিচার-তর্কও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত আছে কি না, ভট্ট তোতের গ্রন্থের অভাবে ইহা নির্ণয় করা আজ অত্যন্ত কঠিন। এই বিচার-তর্কের সারাংশ এই যে প্রেক্ষকের দৃষ্টিতে স্থায়ী ভাবের অনুকরণ প্রমাণিত হয় না, নটের দৃষ্টিতেও নয়, এবং তত্ত্ব-বিবেচকের দৃষ্টিতেও ইহা প্রমাণিত হয় না—এবং ভরতও এইরূপ কোন আভাস দেন নাই।

প্রেক্ষকের দৃষ্টিতে

প্রমাণের অভাবে প্রেক্ষক ইহা কেমন করিয়া অনুভব করিতে পারে যে নট রামের অনুকরণ করিতেছে? অনুকরণের প্রতীতির জন্য অনুকার্য ও অনুকর্তার ক্রিয়া—উভয়ের জ্ঞান আবশ্যক; যে রামাদিকে দেখিয়াছে সেই তাঁহাদের রূপ-ব্যবহার প্রভৃতির অনুকরণের বোধ করিতে পারে, কিন্তু রামাদিকে কে দেখিয়াছে? বিভাবাদির অনুকরণের প্রতীতির মাধ্যম যেখানে ইন্দ্রিয়, সেখানে স্থায়ী ভাবের অনুকরণের প্রতীতি মনের (আত্মার) বিষয় অতএব মূর্ত বিভাবাদির ইন্দ্রিয় প্রতীতির দ্বারা অমূর্ত ভাবের মানসিক প্রতীতির কল্পনা অসঙ্গত। যদি ইহা বলা হয় যে যেরূপ লোক-জীবনে নরনারীর বাস্তবিক ব্যবহার দেখিয়া সামাজিকের রতির প্রতীতি হয় সেইরূপ রঙ্গমঞ্চেও নট-নটীর কৃত্রিম ব্যবহার দেখিয়া উহার কৃত্রিম বা অনুকৃত রতির প্রতীতি হয়—ইহাও তর্কের দৃষ্টিতে ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ যদি প্রেক্ষক নট-নটীর ব্যবহারকে কৃত্রিম ভাবে তাহা হইলে উহার রতির ভ্রান্তি মাত্র হইতে পারে—কৃত্রিম বা অনুকৃত রতির প্রতীতি নয়, এবং যদি সে নট-নটীর ব্যবহারকে বাস্তবিক ভাবিয়া লয় তাহা হইলে উহার বাস্তবিক রতির প্রতীতি হইবে—রতির অনুকরণের নয়। শেষ, যদি এই কথা বলা হয় যে প্রকৃতপক্ষে নট ক্রুদ্ধ না হইলে পারেও সামাজিকের মনে হয় যে সে যেন ক্রুদ্ধ এবং স্থায়ী ভাবের সদৃশ এই প্রতীতিই তাহার অনুকরণের প্রতীতি তাহা হইলেও তথ্যটি প্রমাণিত হয় না কারণ সাদৃশ্যের প্রতীতিকে স্বীকার করিয়া লইলেও নটের সম্বন্ধে সামাজিকের ভাবাবেশ—রহিত প্রতীতি হইবে, অর্থাৎ নটের ভাবের কল্পনাই সে করিতে পারিবে না। এইরূপ প্রেক্ষকের দৃষ্টিতে স্থায়ী ভাবের অনুক্রিয়মানতা প্রমাণিত হয় না।

নটের দৃষ্টিতে

নটের দৃষ্টিতেও স্থায়ীর অনুকরণ প্রমাণিত হয় না। যদি অনুকরণের অর্থ সদৃশ্যকরণ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে মূল ব্যক্তিকে না দেখিয়া ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এবং যদি ইহার অর্থ পশ্চাৎকরণ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কেবল নটই নয় যে কোন ব্যক্তি, নিজের রত্যাদি অনুভবের আশ্রয়ে স্থায়ী ভাবের অনুকরণে সমর্থ হইতে পারে—তখন লৌকিক ভাবানুভূতিই রস হইয়া পড়িবে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে নট শোকাদি স্থায়ী ভাবের অনুকরণ কিসের দ্বারা করে?—নিজের শোকাদির দ্বারা। তাহা হইলে এই অনুকরণ প্রত্যক্ষ শোকানুভূতি হইতে ভিন্ন কীরূপে? অশ্রুপাত প্রভৃতি রূপে। কিন্তু নটের অশ্রুপাতের দ্বারা অনুকার্যের অশ্রুপাতের অর্থাৎ অনুভবের অনুকরণ হইতে পারে, স্থায়ী ভাবের নয়। শঙ্কুকের পক্ষ হইতে আর একটি বিকল্প উপস্থিত করা যাইতে পারে:—নট লোক-জীবনের অভনুবের ভিত্তিতে নিজের রত্যাদি ভাবের আলম্বনাদির স্মরণ করিয়া তদনুরূপ অনুভব প্রকাশিত করিয়া উচিত কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে কাব্যের উচ্চারণ করিয়া স্থায়ী ভাবের অনুকরণ করে। কিন্তু ইহাকেও তো স্থায়ী ভাবের অনুকরণ বলা যাইতে পারে না—অতএব নটের দৃষ্টিতেও স্থায়ীর অনুকরণ প্রমাণিত হয় না।

বস্তুস্থিতির বিবেচকদের দৃষ্টিতে

তত্ত্ব-দৃষ্টির দ্বারা বস্তুস্থিতির বিবেচনা করিলেও রসের অনুকরণরূপতা প্রমাণিত হয় না। কেন? অভিনবগুপ্তের যুক্তি এই যে পশ্চাতে যাহা অনুভূত হয় তাহাকে বস্তুবৃত্ত বলা যাইতে পারে না।' এই বাক্যের বাস্তবিক অর্থ কি, ইহা স্পষ্ট নয়। অভিনবগুপ্ত এখানে আরও বলিয়াছেন যে 'আর যাহা বাস্তবে বস্তুবৃত্ত তাহার সম্বন্ধে আমরা পরে বিবেচনা করিব।' আচার্য বিশ্বেশ্বর, ডঃ কান্তিচন্দ্র পাণ্ডেয়, ডঃ প্রেম-স্বরূপ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে অনুকরণ একটি পরবর্তী ঘটনা—ঘটনা ঘটিয়া গেলে পরে উহার অনুকরণ সম্ভবপর হয়। অতএব অনুকরণের প্রতীতি 'অনুসংবেদ্যমান' রূপ এবং পক্ষান্তরে রস সদ্যঃপরনির্বৃতিরূপ প্রমাণিত হয়। এইরূপ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রস অনুকরণ রূপ বলিয়া স্বীকার্য নয়।

ভরতের মতে

শেষে ভরতের মতানুসারেও রসানুকরণবাদ প্রমাণিত হয় না কারণ নাট্য-শাস্ত্রে এমন সূত্র নাই এবং ইহার বিপক্ষে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ভরতের এই উক্তি যে 'নাটকে সপ্তদ্বীপের অনুকরণ হইবে' উক্ত মতের সপক্ষে নয়। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যখন নাটকে সমস্ত জগতের অনুকরণ হয় তখন স্থায়ী ভাবের অনুকরণকেই কেন স্বীকার করা হয় না? ইহার উত্তর এই যে: যদি স্বীকার করাও হয় যে স্থায়ী ভাবেরও অনুকরণ হয়, তবুও ইহা প্রমাণিত হয় না যে স্থায়ী ভাবের এই অনুকরণই রস।

এইরূপ শঙ্কুকের এই অনুকৃতিবাদ সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণিত সিদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বেশ্বর বলিয়াছেন যে উল্লিখিত বিবেচনার দ্বারা ইহাও স্পষ্ট হইয়া যায় যে শঙ্কুকের সিদ্ধান্তটিকে অনুমিতিবাদের অপেক্ষা মূলতঃ অনুকৃতিবাদ বলিয়া গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত হইবে, কারণ অভিনবগুপ্ত নিজের সম্পূর্ণ শক্তি অনুকৃতিবাদেরই খণ্ডনে সংযোজিত করিয়াছেন। পরে মম্মট সহৃদয়ের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিয়া রসের অনুমিতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুসরণে শঙ্কুকের সিদ্ধান্ত অনুমিতিবাদ নামে প্রসার লাভ করে কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মম্মটের অপেক্ষা অভিনবগুপ্তের মতই প্রকৃতপক্ষে অধিক প্রামাণিক।

শঙ্কুকের মতের সীমা ও শক্তি

সীমা—শঙ্কুকের এই সিদ্ধান্তে গুণের অপেক্ষা দোষ অধিক স্পষ্ট। অভিনবগুপ্ত নিজের সম্পূর্ণ বুদ্ধি-বলের সাহায্যে তাঁহার অনুকরণবাদের ন্যূনতার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুকরণ শব্দের অর্থগত অসমর্থতা এই সব অভিযোগের মূলে বিদ্যমান। শঙ্কুক হইতে দেড়-সহস্র বৎসর পূর্বে যবন আচার্য এরিষ্টটল কাব্য এবং অন্য ললিত কলা প্রসঙ্গে এই শব্দের উল্লেখ করিয়া অনুকরণ সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুসারে কাব্যাদি কলা কেবল মূর্ত পদার্থেরই নয় ভাব ও বিচারেরও অনুকরণ করে। অনুকরণের এইরূপ ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ হওয়ার জন্য উহার নানা ব্যাখ্যা করা হয় এবং অবশেষে ইহার অর্থ কল্পনাত্মক পুনঃসৃজন গৃহীত হয়। অর্থের এই বিস্তার—অনুকরণকে সৃজনের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিবার এই প্রচেষ্টা, প্রকৃতপক্ষে, এই শব্দের অসমর্থতাকেই ব্যক্ত করে: অভিপ্রেত অর্থের মধ্যে কোন ত্রুটি নাই কিন্তু শব্দের মধ্যে ইহাকে অভিব্যক্ত করিবার শক্তিও নাই। এই দুর্ঘটনাই শঙ্কুকের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে: তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে নট রামাদির ব্যবহারের অনুকরণ করিবার সময় কল্পনার দ্বারা একাত্মতা স্থাপিত করিয়া তাঁহাদের রত্যাদি স্থায়ীরও কল্পনাত্মক অনুভূতি করে। এই কল্পনাত্মক অনুভূতি যথার্থ না হওয়ার জন্য এক অর্থে কৃত্রিম অনুভূতিই। কথাটির মধ্যে খুব বেশী ত্রুটি নাই, কিন্তু অনুকরণ ও কৃত্রিম উভয় শব্দের আভিধানিক অসমর্থতার জন্যই এই বিভ্রম দেখা দিয়াছে।

শঙ্কুকের সিদ্ধান্তের অপর দোষ তাঁহার দ্বারা রসের অনুমানের কল্পনা। লিঙ্গের দ্বারা লিঙ্গীর অনুমান বুদ্ধির ক্রিয়া অতএব উহা পরোক্ষই হইতে পারে—উহার প্রত্যক্ষ এবং আস্বাদাত্মক ক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। শঙ্কুক ইহা জানিতেন সেইজন্য তিনি এই ক্রিয়াকে সামান্য হইতে বিলক্ষণ বলিয়াছিলেন। মম্মট এই চর্বণার সামাজিকের নিজস্ব বাসনার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহার উল্লেখ অভিনবগুপ্তের উদ্ধরণে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত গণ্ডগোল রসের অনুমানের কল্পনার জন্য দেখা দিয়াছে। তত্ত্বগত দৃষ্টিতে এই সকলই ভ্রান্ত ধারণা। ভাবের

অনুমানই হয় কিন্তু ইহা পরোক্ষ বা বিচাররূপই হয়—অনুভূতিরূপ হয় না। ইহার বিপরীতে রসের আস্বাদ সাক্ষাৎ এবং নিশ্চয়ই অনুভূতি-রূপ হয়; অতএব রসের অনুমিতির ধারণা অনুভবের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ।

এই সিদ্ধান্তের তৃতীয় দোষ এই যে রসে অভিনয়-তত্ত্ব প্রধান ও কাব্য-তত্ত্ব গৌণ হইয়া পড়ে যাহা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্য-চিন্তাধারার অনুসারে অসঙ্গত। ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে অভিনয়ের অপেক্ষা কাব্যকে নিশ্চিত রূপে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অভিনয় মাত্র কলা অর্থাৎ উপবিদ্যা এবং কাব্য বিদ্যা। পশ্চিমেও কাব্যকেই কলার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। শঙ্কুক রসকে নট-কৃত অনুকরণের সমরূপ ও কাব্যকে নট-কৌশলের কেবল সহায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া এই চিরাচরিত অনুক্রমের মধ্যে পরিবর্তন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রস-পরিপাকের মূল কারণ কাব্যই, অভিনয় উহার পোষক মাত্র।

শক্তি—লোল্লট রসকে অনুকার্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি রূপ স্বীকার করিয়া নাট্যগত ভাব ও প্রত্যক্ষ ভাবের মধ্যে যে ভ্রান্তির প্রচার করিয়াছিলেন শঙ্কুক নিজের মতবাদের দ্বারা তাহার নিরাকরণ করেন। তিনি ইহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে নাট্যগত ভাবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় না, উহার অনুকরণ অর্থাৎ কল্পনাত্মক অনুভূতি হয়। কলার মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং রসের স্বরূপ-বিশ্লেষণে ইহার উপযোগিতা অসন্দিগ্ধ।

অনুকার্যের বাস্তবিক রূপও শঙ্কুক স্পষ্ট করিয়াছেন। লোল্লট অনুকার্যের প্রসঙ্গে মূল পাত্র ও কবি-নিবদ্ধ পাত্রের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার প্রচার করিয়াছিলেন। শঙ্কুক এই ভ্রান্তি দূর করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন যে নাট্যে অনুকার্যের অর্থ কবি-নিবদ্ধ পাত্র।

সামান্য প্রতীতি হইতে কলা-প্রতীতির বিলক্ষণতাকে স্পষ্ট করিবার ব্যাপারেও শঙ্কুকের সূক্ষ্ম চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাদাস্পদ হইলেও ইহা কলাশাস্ত্রের একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং বহুমান্য সিদ্ধান্ত এবং আজও ইহার সমর্থকদের সংখ্যা কম নয়।

রসের প্রক্রিয়ায় শঙ্কুকের দর্শক লোল্লটের দর্শকের অপেক্ষা অধিক সক্রিয় রূপে অংশ গ্রহণ করে—সে নাট্যে উপস্থিত বিভাবাদি লিঙ্গের দ্বারা, নটের দ্বারা অনুক্রিয়মাণ স্থায়ী ভাব—রসের অনুমিতি করে। লোল্লট দর্শকদের সম্পূর্ণরূপে অনুল্লিখিত রাখিয়াছেন—অন্ততঃপক্ষে উপলব্ধ উদ্ধরণে ইহার কোনরূপ উল্লেখ নাই। যখন সমস্ত নাট্য-প্রপঞ্চের বিধান প্রেক্ষকেরই জন্য তখন উহার উপেক্ষা কেমন করিয়া করা সম্ভব? শঙ্কুক এই স্বতঃসিদ্ধ তথ্যের অর্থ বুঝিয়া প্রেক্ষকের সপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন এবং রসের সন্দর্ভে দর্শকের স্থিতিকে উচিত গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ রসের ব্যক্তিনিষ্ঠ ধারণার বিকাশে শঙ্কুকের অবদান স্পষ্ট।

অবশেষে, রস-বিবেচনাকে সুস্থির দার্শনিক ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার শ্রেয়াংশ সর্বপ্রথম শঙ্কুকেরই প্রাপ্য—তাঁহার পর রসের স্বরূপ-বিশ্লেষণে দার্শনিক

চিন্তাধারার নিশ্চিতরূপে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল, যাহাতে কিছু হানি অবশ্যই ঘটিয়াছে কিন্তু তথাপি ইহার দ্বারা উন্নত আলোচনার বিবর্ধনা সম্ভব হইয়াছে।

দার্শনিক পৃষ্ঠভূমি

শঙ্কুকের সিদ্ধান্তের দার্শনিক পৃষ্ঠভূমি অপেক্ষাকৃত অধিক স্পষ্ট। ভরতের দৃষ্টি-কোণ ব্যবহারিকই ছিল—তিনি মূলতঃ নাট্য-ব্যবসায় এবং গৌণরূপে সামাজিকের ভিত্তিতে রসের ব্যবহারিক বিবেচনা করিয়াছিলেন যাহাতে দর্শনের বিতণ্ডা ছিল না। লোল্লটের বিবেচনায় দার্শনিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এই চিন্তাধারা তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই এবং ভরতের অনুরূপ তিনিও অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যবহারিক বিচারধারারই আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে খুবই মতভেদ আছে এবং প্রকৃতপক্ষে উচিত প্রমাণের অভাবে তাহার সঠিক নির্ণয় অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শঙ্কুকের বিষয়ে এইরূপ সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ নাই। প্রাপ্ত উদ্ধরণের ভিত্তিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে তাঁহার দর্শনের প্রতি আগ্রহ সুনিশ্চিত ছিল—তিনি তাঁহার রস-বিবেচনায় দর্শনের সাহায্য লইয়াছেন এবং ন্যায় দর্শন নিশ্চিতরূপে তাঁহার বিবেচনার ভিত্তি স্থানীয়। লিঙ্গের দ্বারা লিঙ্গীর অনুমান ও 'চিত্রতুরগন্যায়' প্রভৃতি ধারণা ও শব্দসমূহ ইহার প্রমাণ। আমার পূর্বে রস-বিষয়ের নবীন অনুসন্ধাতা ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্ত অত্যন্ত কুশলতা পূর্বক, তর্ক-প্রমাণ পুরঃসর ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে শঙ্কুক বৈদিক ন্যায়ের অপেক্ষা বৌদ্ধ ন্যায়ের প্রতিই অধিক আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে রস-সিদ্ধান্তের প্রতি একজন বৌদ্ধ দার্শনিকের আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি আছে? বৈদিক দর্শন—বিশেষ করিয়া শৈবদর্শন প্রভৃতির সহিত রস-সিদ্ধান্তের যেরূপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে তেমনি অন্য অবৈদিক দর্শনের সহিত নাই। রস-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দুই-চারিটি অবৈদিক দার্শনিক—গুণচন্দ্র-রামচন্দ্র প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা উল্লিখিত অনুমানকে বিশেষ প্রোৎসাহন দেন নাই: গুণচন্দ্র-রামচন্দ্রের সুখ-দুঃখাত্মক রস-কল্পনা সম্পূর্ণরূপে একটি নূতন সিদ্ধান্ত ছিল। যদিও ইহার দ্বারা এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে শঙ্কুক অবৈদিক নৈয়ায়িকই ছিলেন। তবুও আমার বিশ্বাস যে বৈদিক ও অবৈদিক ন্যায়ের প্রপঞ্চে না পড়িয়া শঙ্কুককে কেবল নৈয়ায়িক বলিয়া স্বীকার করা অধিক সমীচীন হইবে।

সাংখ্যবাদী ব্যাখ্যাকার

শঙ্কুকের পরে অভিনব গুপ্ত কোন নামের উল্লেখ না করিয়াই এক সাংখ্যবাদী ব্যাখ্যাকারের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অভিনবভারতীতে নিম্নলিখিত

কতিপয় পংক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

যেন ত্বভ্যধায়ি সুখদুঃখজননশক্তিযুক্তা বিষয়সামগ্রী বাহ্যৈব, সাংখ্যদৃশা সুখঃদুখস্বভাবো রসঃ। তস্যাং চ সামগ্র্যাং দলস্থানীয়া বিভাবাঃ, সংস্কারকা অনুভাবব্যভিচারিণঃ। স্থায়িনস্তু তৎসামগ্রীজন্যা আন্তরাঃ সুখদুঃখস্বভাবা ইতি।

তেন 'স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ' ইত্যাদাবুপচারমঙ্গীকুর্বতা গ্রন্থবিরোধং স্বয়মেব বুধ্যমানেন দূষণাবিষ্করণমৌর্খ্যাৎ প্রামাণিকো জনঃ পরিরক্ষিত ইতি কিমন্যোচ্যতে। যত্ত্বন্যৎ প্রতীতিবৈষম্যপ্রসঙ্গাদি তৎ কিয়দত্রোচ্যতাম্।

—অর্থাৎ যিনি (ব্যাখ্যাকার) ইহা বলিয়াছেন যে (যেহেতু) সুখ-দুঃখ-মোহের উৎপন্নকারী শক্তির দ্বারা যুক্ত (রসের বিভাবাদি রূপ) বিষয়-সামগ্রী বাহ্যই, এই সাংখ্য সিদ্ধান্তের অনুসারে (সংসারের সকল পদার্থ ত্রিগুণাত্মক হওয়ার জন্য) রস (ও) সুখ-দুঃখমোহাত্মক এবং সেই সামগ্রীতে (যেমন পূর্বের ব্যঞ্জন প্রভৃতির উদাহরণে ডাল প্রভৃতি ব্যঞ্জনে সম্বরাদির দ্বারা শোধিত হইলে পরে রসের উৎপত্তি হয় সেইরূপ এখানে) ডাল প্রভৃতির স্থানে বিভাব এবং উহাদের সংস্কারক অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাব হয়। এবং (বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারি ভাব প্রভৃতি) সামগ্রী হইতে আন্তরিক সুখ-দুঃখ-মোহ-রূপ স্থায়ী ভাবের জন্ম হয়।

(যিনি উল্লিখিত সাংখ্য-সিদ্ধান্তের অনুসারে রসের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন) তিনি "স্থায়ী ভাবগুলিকে রসত্ব লাভ করাইব" (স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ) ইত্যাদি (ভরত মুনির বাক্যে) উপচারের (লক্ষণার) অঙ্গীকার করিয়া (এই) গ্রন্থের সহিত (নিজস্ব মতের) বিরোধটি স্বয়ং বুঝিয়া (আমাদের মতন) প্রামাণিক পুরুষদের (সেই ভরতমুনি-বিরোধী সিদ্ধান্তে মূর্খেরাও বুঝিতে পারে এমন কুৎসিত) দোষ প্রদর্শনের মূর্খতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাকে কি বলা যাইতে পারে—(কীরূপ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে।)

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৬১)

এই মতের সারাংশ এই যে ঃ

(১) রসের বিষয় সামগ্রী (বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব) বাহ্যই। (২) প্রাকৃতিক পদার্থ হওয়ার জন্য ইহার মধ্যে সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন করিবার শক্তি বিদ্যমান থাকে। সাংখ্য মতানুসারে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ গুণের দ্বারা যুক্ত ত্রিগুণাত্মিকারূপী। সত্ত্ব সুখরূপ, রজস্ দুঃখ-রূপ ও তমস্ মোহ-রূপ। অতএব প্রত্যেক প্রাকৃত পদার্থে সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন করিবার শক্তি বিদ্যমান থাকে। (৩) এই বিচারানুসারে রসও, যাহার বিষয়-সামগ্রী প্রাকৃত বা বাহ্য, পদার্থ-রূপ ও ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাত্মক রূপ। (৪) এই সামগ্রীতে বিভাব ডাল প্রভৃতি ব্যঞ্জন অর্থাৎ মূল পদার্থরূপ হয় ও অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব উহার সংস্কারক। এইরূপ বিভাবাদিই অনুভাব ও ব্যভিচার ভাবের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি ভরতের মত হইতে ভিন্ন কারণ তিনি ইহা স্পষ্ট

বলিয়াছেন : স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ—অর্থাৎ স্থায়ী ভাবই রসত্ব লাভ করে। ব্যাখ্যাকার এই কথাটি জানিতেন, কিন্তু তিনি ভরতের এই কথাটিকে বাহ্য বলিয়া নিজের মন্তব্যটিকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (৫) অতএব রত্যাদি স্থায়ী ভাব রসের বাহ্য বিষয়-সামগ্রী (বিভাবাদি) হইতে উৎপন্ন আন্তরিক ও সুখদুঃখমোহাত্মক। উল্লিখিত রস-সামগ্রীর অবলোকনে সামাজিকের চিত্তে রত্যাদি স্থায়ী ভাব উৎপন্ন হয় যাহা উৎপাদক সামগ্রীর অনুরূপ সুখদুঃখমোহাত্মকই হয়। অর্থাৎ স্থায়ী ভাব রসের ভিত্তি স্বরূপ না হইয়া প্রভাব-রূপ। (৬) রস ভাব-রূপ না হইয়া পদার্থ-রূপই হয় এবং উহার অনুভূতি আনন্দময়ী হয় না বরং সুখদুঃখমোহাত্মক হয়। রাম ও সীতার রূপ ধারণকারী নট-নটী যখন তাঁহাদের অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবেরও সফল অভিনয় করেন তখন (রঙ্গমঞ্চে) রসের সৃষ্টি হয়। রসের সমস্ত বিষয়-সামগ্রী অর্থাৎ রাম-সীতা, তাঁহাদের অনুকর্তা নট-নটী, তাঁহাদের শারীরিক চেষ্টা ও মনোবিকারের অভিনয়—সব কিছুই প্রাকৃত এবং বাহ্য, অতএব পরিণামে রসও প্রাকৃত পদার্থ-রূপ ও ত্রিগুণাত্মক রূপ এবং অন্য প্রাকৃত পদার্থের অনুরূপ উহার আস্বাদও সুখদুঃখমোহাত্মকই, কেবল আনন্দ-ময় নয়। (৭) সংযোগের অর্থ এখানে বিভাবাদির সহিত অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংস্কারক-সংস্কার্য সম্বন্ধ এবং নিষ্পত্তির অর্থ সৃষ্টি (নির্মিতি) যাহা সাংখ্যের সৎকার্যবাদ সিদ্ধান্তের অনুসারে অভাবে ভাবের কল্পনা নয় বরং বিদ্যমান তত্ত্বের নবীনরূপে পরিণতিমাত্র।

এই মতের সমস্ত দোষ এতই অধিক স্পষ্ট যে অভিনবগুপ্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে উহার খণ্ডন করিবারও দরকার অনুভব করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এখানে রসের বস্তুনিষ্ঠ বিবেচনার সর্বাধিক স্থূলরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে রসকে রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত বাহ্য অভিনয় মাত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে যাহাতে ভাবতত্ত্ব প্রায় শূন্য—ব্যভিচারী ভাবও অভিনীত হইয়া দৃশ্য-রূপই হইয়া পড়ে। ভরতের দৃষ্টিও বস্তুনিষ্ঠ ছিল, কিন্তু তাঁহার মতানুসারে অনিবার্যরূপে স্থায়ী ভাবই রসের ভিত্তিরূপ। অতএব এই মত প্রথমতঃ ভরতের মতের বিপরীত এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা বিবেকসম্মতও নয়। এই মত অনুসারে নাটকের সরস অভিনয় দেখিয়া সামাজিকের নিজের প্রকৃতির অনুসারে সুখ, দুঃখ অথবা মোহের অনুভূতি হয়। এইরূপ—প্রত্যক্ষ জীবনগত অনুভব ও কলাগত অনুভবের মধ্যে কোন ভেদ অবশেষ থাকে না—প্রকৃতির, গুণের এবং মাত্রারও ভেদ থাকে না, কলানুভূতি শুদ্ধ ইন্দ্রিয় অনুভূতি হইয়া পড়ে।

ভট্টনায়ক

ভরত-সূত্রের তৃতীয় প্রমুখ ব্যাখ্যাকার ভট্টনায়ক। অভিনব গুপ্ত অভিনবভারতী ও ধ্বন্যালোকলোচনে ভট্টনায়কের মতের বিস্তার ও সম্মানের সহিত বিবেচনা করিয়াছেন, যদ্যপি এই মতের তিনি খণ্ডনই করিয়াছেন।

অভিনবভারতী ঃ ভট্টনায়কস্ত্বাহ রসো ন প্রতীয়তে নোৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে। স্বগতত্বেন হি প্রতীতৌ করুণে দুঃখিত্বং স্যাৎ। ন চ সা প্রতীতির্যুক্তা। সীতাদেরবিভাবত্বাৎ। স্বকান্তাস্মৃত্যসংবেদনাৎ। দেবতাদৌ সাধারণীকরণাযোগ্যত্বাৎ। সমুদ্রলঙ্ঘনাদেরসাধারণ্যাৎ।

ন চ তদ্বতো রামস্য স্মৃতিরনুপলব্ধত্বাৎ। ন চ শব্দানুমানাদিভ্যস্তৎপ্রতীতৌ লোকস্য সরসতা যুক্তা প্রত্যক্ষাদিব। নায়কযুগলাবভাসে হি প্রত্যুত লজ্জাজুগুপ্সাস্পৃহাদিস্বোচিতবৃত্ত্যন্তরোদয়ঃ। অব্যগ্রতয়াকাশরসত্বমপি স্যাৎ। তন্ন প্রতীতিরনুভবস্মৃত্যাদিরূপা রসস্য যুক্তা। উৎপত্তাবপি তুল্যমেতদ্ দূষণম্।

শক্তিরূপত্বেন পূর্বং স্থিতস্য পশ্চাদভিব্যক্তৌ বিষয়ার্জনতারতম্যাপত্তিঃ। স্বগতপরগতত্বাদি চ পূর্ববদ্ বিকল্প্যম্।

তস্মাৎ কাব্যং দোষাভাবগুণালংকারময়ত্বলক্ষণেন, নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ নিবিড়নিজমোহসংকটতানিবারণকারিণা বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনা, অভিধাতো দ্বিতীয়েনাংশেন ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানো রসো, অনুভবস্মৃত্যাদিবিলক্ষণেন রজস্তমোঽনুবেধবৈচিত্র্যবলাদ্ দ্রুতিবিস্তারবিকাসলক্ষণেন সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময়নিজসংবিদ্বিশ্রান্তিলক্ষণেন পরব্রহ্মাস্বাদসবিধেন ভোগেন পরং ভুজ্যত ইতি। (পৃ০ ৪৬২-৪৬৫)

—অর্থাৎ ভট্টনায়ক (রস-সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া) বলেন যে—রস প্রতীত হয় না, উৎপন্ন হয় না এবং অভিব্যক্তও হয় না (যেহেতু পরগতত্বেন উহার উৎপত্তি, প্রতীতি বা অভিব্যক্তি যে কোনটাই স্বীকার করা হউক না কেন, সবই ব্যর্থ। সামাজিকেরই রসের প্রতীতি হওয়া উচিত। যদি রসের অনুভূতি সামাজিকের না হইয়া কোন অন্য নট প্রভৃতির হয় তাহা হইলে উহা সামাজিকের জন্য ব্যর্থ। এইজন্য পরগতত্বেন উৎপত্তি প্রভৃতির বিচার ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার স্বগতত্বেন অর্থাৎ সামাজিকের মধ্যে রসের উৎপত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন।) স্বগত (অর্থাৎ সামাজিকের মধ্যে করুণাদি রসের) প্রতীতিকে স্বীকার করিলে করুণ রসের দ্বারা (সামাজিকের) দুঃখই হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা প্রতীতিযুক্ত নয়। (দুঃখের মূল কারণ বাস্তবিক) (১) সীতা প্রভৃতির বিভাবত্ব (উপস্থিত) ঘটে না বলিয়া। (২) নিজের স্ত্রী প্রভৃতির স্মৃতি (অভিনয় কালে) না হওয়ার জন্য (দুঃখ হওয়ার কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ যদি সামাজিকের করুণ রসের প্রতীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উহার অনুভবকালে তাহার দুঃখ হওয়া উচিত। এইজন্য ভট্টনায়কের মতানুসারে সামাজিকগতত্বেন রসের প্রতীতি সম্ভব নয়। তৃতীয় কথা এই যে সীতাদি বা পার্বতী প্রভৃতি) (৩) দেবতা প্রভৃতির (বিভাব হওয়ার জন্য তাঁহাদের) সাধারণীকরণ সম্ভব না হওয়ার জন্য (হনুমান প্রভৃতির অনুরূপ বিভাবের দ্বারা (৪) সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি কার্যের (সাধারণীকরণ অসম্ভব হওয়ার জন্য) অসাধারণ হওয়াতে (সামাজিকের স্বগতরূপে রসের প্রতীতি সম্ভবপর নয়।

এবং উহার (রত্যাদি) দ্বারা যুক্ত রামের (প্রভৃতি বিভাবের) স্মৃতি (রূপ উহার

রস-প্রতীতি) নয় (যেহেতু পূর্ব উপলব্ধ অর্থেরই স্মৃতি সম্ভব। রত্যাদি যুক্ত রাম) প্রথম হইতে না থাকার জন্য (রসানুভূতিকে রত্যাদিমান্ রামের স্মৃতিরূপও বলা যাইতে পারে না।) শব্দ, অনুমান প্রভৃতি (পরোক্ষ জ্ঞানের জনক প্রমাণের) দ্বারা উহার (রসের) প্রতীতিকে স্বীকার করিলে (সেই জ্ঞানের পরোক্ষ রূপ হওয়ার এবং সাক্ষাৎকারাত্মক না হওয়ার জন্য উহাতে) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনুরূপ সরসতা থাকিতে পারে না। (সেইজন্য শব্দ অথবা অনুমান প্রমাণের দ্বারাও রসের পরিজ্ঞানকে স্বীকার করা যাইতে পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা রসের প্রতীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়াও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ প্রত্যক্ষ রূপে সম্ভোগাদিতে রত) নায়ক-নায়িকাকে দেখিলে পরে (রসের জায়গায় লজ্জা, ঘৃণা এবং ইচ্ছা প্রভৃতি নিজের-নিজের স্বভাবের অনুরূপ) অন্য ধরণের চিত্তবৃত্তির উদয়ের সম্ভাবনা থাকে। ইহা ব্যতীত (লজ্জা, জুগুপ্সা প্রভৃতি অন্য বৃত্তির উদয় হইলে পরে অব্যগ্রতা অর্থাৎ) তন্ময়তার অভাবে (আকাশ কুসুমের অনুরূপ আকাশ-রস অর্থাৎ) রস-প্রতীতিরও অভাব হইবে। এইজন্য (লৌকিক প্রত্যক্ষাদি রূপ) অনুভব, স্মৃতি (পরোক্ষ জ্ঞান) প্রভৃতি রূপ রসের প্রতীতিকে স্বীকার করা ঠিক নয়। (এইজন্য ভট্টনায়কের মতে 'রসো ন প্রতীয়তে' ইহা বলা হইয়াছে। এবং রসের) উৎপত্তিকে স্বীকার করিয়া লইলেও এইসব দোষ সমানই থাকে। (এইজন্য রসের স্বগত বা পরগত উৎপত্তি হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে না। এখন তৃতীয় অর্থাৎ অভিব্যক্তি-পক্ষের বিবেচনা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে ভট্টনায়ক পরে বলিয়াছেন যে):

শক্তি রূপে প্রথম হইতে বিদ্যমান (রসের) (পরে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা) অভিব্যক্তিকে স্বীকার করিলে (যেমন অল্প আলোকে বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না, অধিক প্রকাশে অধিক স্পষ্ট দেখা যায়, সেই রূপ বিভাবাদি) বিষয়ের বৃদ্ধির অনুসারে (রসানুভূতিতেও ন্যূনাধিক্য রূপে) তারতম্য দেখা দিবে (যাহা রসের অখণ্ড, একরস এবং আত্মস্বরূপ হওয়ার জন্য ঠিক হইবে না।) এবং সেই অভিব্যক্তি সামাজিকের স্বগতরূপে হয় অথবা পরগত (অর্থাৎ নটাদিনিষ্ঠ) রূপে হয় কিনা ইহা প্রাথমিক বিবেচনার (প্রতীতি এবং উৎপত্তি পক্ষের) অনুরূপ বিবেচ্য।

এইজন্য কাব্যে দোষাভাব এবং গুণালংকারময়ত্ব রূপ লক্ষণের জন্য (অর্থাৎ দোষরহিত, গুণ ও অলংকার যুক্ত শব্দ এবং অর্থকে কাব্য বলা হয়, এই কাব্য-লক্ষণানুসারে) এবং নাটকে (আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক এবং আহার্য) চার রকমের অভিনয়ের দ্বারা (সামাজিকের) নিজের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত অজ্ঞানতা প্রভৃতির নিবারক এবং বিভাবাদির সাধারণীকরণ রূপ অভিধার পরে (দ্বিতীয় অংশে) কার্যকরী ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারা ভাব্যমান (সাধারণীকৃত) রস, অনুভব, স্মৃতি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন প্রকারের রজোগুণ ও তমোগুণের সংমিশ্রণের জন্য দ্রবীমান, বিস্তার ও বিকাশ রূপ, সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের দ্বারা প্রকাশ এবং আনন্দময় সাক্ষাৎকারে বিশ্রান্তিরূপ এবং পর ব্রহ্মের আস্বাদ সদৃশ (ভোগ) ভোজকত্ব ব্যাপারের দ্বারা অনুভূত (ভোগ) হয়। (ইহা

ভট্টনায়কের নিজস্ব সিদ্ধান্ত।)

ধ্বন্যালোকলোচনেও ভট্টনায়কের মতের প্রায় ৩২টি পংক্তিতে বিবেচনা করা হইয়াছে।[১] কিন্তু মুখ্যতঃ উহার খণ্ডনই করা হইয়াছে—ভট্টনায়কের সিদ্ধান্তের কথন অত্যন্ত অল্প হইয়াছে এবং অভিনবভারতীর অপেক্ষা উহাতে কোন নূতনত্বও নাই। অতএব এই প্রসঙ্গে উহা উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু, কাব্যপ্রকাশের উদ্ধরণটি নিশ্চয় খুবই উপযোগী। যদিও ইহা খুব সংক্ষিপ্ত, তবুও অভিনবভারতীর উদ্ধরণ হইতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্থলে ইহাতে মতান্তর দৃষ্ট হয়, যাহা ভট্টনায়কের মতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে খুবই উপযোগী:

ন তাটস্থ্যেন নাত্মগতত্বেন রসঃ প্রতীয়তে, নোৎপদ্যতে, নাভিব্যজ্যতে অপি তু কাব্যে নাট্যে চাভিধাতো দ্বিতীয়েন বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনা ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ স্থায়ী, সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময়সংবিদ্বিশ্রান্তিসতত্ত্বেন ভোগেন ভুজ্যতে। (হি০ কাব্যপ্রকাশ, পৃ০ ১০৬-১০৭)[২]

—অর্থাৎ না তটস্থ (নটগত বা অনুকার্যগত রূপে) এবং না স্বগতরূপে রসের প্রতীতি, উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয়। বরং কাব্য ও নাটকে অভিধার দ্বারা দ্বিতীয় (উহার পরে তৎক্ষণাৎ যাহা কার্যকারী হয়), বিভাবাদির সাধারণীকরণরূপ ভাবকত্ব নামক ব্যাপারের দ্বারা ভাব্যমান (সাধারণীকৃত ?) স্থায়ী ভাব, সত্ত্বের উদ্রেকে প্রকাশিত এবং আনন্দময় সংবিদ্‌বিশ্রান্তির (আত্মাস্বাদ বা ব্রহ্মাস্বাদের) অনুরূপ, ভোগের দ্বারা (ভোজকত্ব ব্যাপারের দ্বারা) আস্বাদিত হয়—ইহা ভট্টনায়কের মত।

ভট্টনায়কের মতের সারাংশ

ভট্টনায়কের মতের দুইটি পক্ষ আছে—নিষেধ পক্ষ ও বিধি পক্ষ।

নিষেধ পক্ষ—নিষেধ পক্ষে তিনি রসের প্রতীতি, উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতীতি বা উৎপত্তির ফলিতার্থ প্রায়ঃ সমানই এবং উহা লোল্লটের মতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; আনন্দবর্ধনের ধ্বনি এবং ব্যঞ্জনা-সিদ্ধান্তের সহিত অভিব্যক্তির সম্বন্ধ আছে যাহা ভট্টনায়কের মতে কোন প্রকারেই গ্রাহ্য ছিল না। প্রতীতির সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে উহা পরগত হয় কি স্বগত হয়? যদি ইহা পরগত হয় অর্থাৎ অনুকার্য অথবা নট রসের প্রতীতি করেন তাহা হইলে সামাজিকের ইহার সহিত সম্বন্ধ কি? যদি ইহা স্বগত হয় অর্থাৎ যদি ইহা স্বীকার করা হয় যে স্বয়ং সামাজিক রসের প্রতীতি করেন তখন নানা বাধা আসিয়া পড়ে। প্রতীতির দুইটি রূপ হইতে পারে: প্রত্যক্ষ এবং

---

১. কাব্যপ্রকাশ (আচার্য বিশ্বেশ্বর) পৃ০ ১০৬-১০৭

২. ধ্বন্যালোকলোচন (চৌখম্বা সং০ সী০ ১৯৯৭) পৃ০ ১৮৬-১৯০ কাব্যেঽপি চ ....তস্মাৎস্থিতমেতৎ—অভিব্যজ্যন্তে রসাঃ প্রতীত্যৈব চ রস্যন্ত ইতি।

পরোক্ষ। রসের প্রত্যক্ষ প্রতীতি স্বীকার করিলে করুণাদি রসে নায়ক-নায়িকার শোকের দ্বারা সামাজিকেও শোকের অনুভূতি হইবে এবং অপরদিকে শৃঙ্গারাদি রসে অপরের প্রেম-ক্রীড়া সাক্ষাৎকার করিয়া সহৃদয়ের চিত্তে লজ্জা, জুগুপ্সা প্রভৃতির উদয় হওয়ার জন্য চিত্তের অব্যগ্রতা (তন্ময়তা) নষ্ট হইয়া রসানুভূতির সম্ভাবনাই থাকিবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমনটি তো হয় না—প্রেক্ষক দুঃখ বা লজ্জা প্রভৃতি কিছুই অনুভব করেন না। ইহার কারণ স্পষ্ট। প্রথমতঃ প্রেক্ষক বাস্তবিক রাম সীতার, যাঁহারা দুঃখ বা সংভোগ-সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎকার করেন না। তাঁহারা রসের বিভাব নন, রাম-সীতার কল্পনাত্মক রূপই রসের বিভাব, অতএব প্রত্যক্ষ প্রতীতির—দুঃখ হইতে দুঃখ এবং রতি-ক্রীড়া হইতে লজ্জা প্রভৃতির উদয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এক্ষেত্রে যখন কারণই যথার্থ নয় তখন কার্য কেমন করিয়া যথার্থ হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রেক্ষকের প্রিয়ার কথা মনে পড়িতে পারে। কিন্তু, ইহাও সঙ্গত নয় কারণ তাহা হইলে চিত্তের সমাহিতি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত কাব্যগত বিভাব—সীতা, পার্বতী প্রভৃতির জন্য সহৃদয়ের মনে পূজ্য বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে; তাঁহারা সামান্য কান্তা নন যাঁহাদের প্রতি সহৃদয়ের মনে সহজ রতিভাব আসিতে পারে। এবং, ইহা ব্যতীত অলৌকিক কার্য সম্বন্ধে আর কি বলা যাইতে পারে? সহৃদয় হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘনের অনুভূতি কেমন করিয়া করিবেন? কারণ অলৌকিক এবং অসাধারণ পাত্রের তো সাধারণীকরণই হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষ প্রতীতি অসম্ভব। পরোক্ষ প্রতীতিরও দুইটি রূপ আছে—(১) শব্দার্থ জ্ঞান ও (২) স্মৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিতে সাক্ষাৎকারাত্মক অনুভূতির কোন সম্ভাবনাই নাই কারণ কেবল অর্থ বোধের দ্বারা আস্বাদানুভূতি হইতে পারে না। অপর দিকে স্মৃতির কল্পনাও সার্থক নয়, কারণ স্মরণ তাহারই হইতে পারে যাহার আমরা প্রথমে প্রত্যক্ষ দর্শন বা অনুভব করিয়াছি: রাবণের বন্দীগৃহে শোকসন্তপ্তা সীতা বা সীতার বিয়োগে কাতর রামকে আমরা কখনই দেখি নাই, অতএব আমরা তাঁহাদের কেমন করিয়া স্মরণ করিতে পারি? এইরূপ পরোক্ষ প্রতীতির কথাটিও প্রমাণিত হয় না।

উৎপত্তির বিরুদ্ধেও উল্লিখিত সবগুলি তর্কও এইরূপ ভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এখন থাকিয়া গেল অভিব্যক্তি। উহার বিরুদ্ধে প্রথমে পরগতত্ব ও স্বগতত্বেরই প্রশ্ন ওঠে। যদি অনুকার্য্য বা নটের চিত্তে পূর্বস্থিত রসের অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উত্তর হইবে যে সহৃদয়ের জন্য তাহা ব্যর্থই। যদি রসের অভিব্যক্তি সহৃদয়ের চিত্তেহয় তাহা হইলে বিভাবাদি অভিব্যঞ্জক কারণগুলির ন্যূনাধিক্যের অনুসারে রসাভিব্যক্তিতেও তারতম্যের অনুমান করিতে হইবে। যেইরূপ অভিব্যঞ্জক দীপক প্রভৃতির প্রকাশ প্রখর হইলে পরে পদার্থের রূপ অধিক ব্যক্ত হয় এবং মন্দ হইলে পরে কম, এইরূপ কাব্যে ও অভিব্যঞ্জক বিভাবাদির শক্তির ন্যূনাধিক্যের অনুসারে রসাভিব্যক্তিতেও তারতম্যের কথা স্বীকার করিতে হইবে—যাহা রসের অখণ্ডতার প্রতিরোধ হওয়ার জন্য স্বীকার্য নয়। অতএব রসের অভিব্যক্তির কল্পনাও সঙ্গত নয়।

বিধিপক্ষ—ভট্টনায়কের মতানুসারে রসের ভুক্তি হয় এবং এই মতটিকে প্রমাণিত করার জন্য তিনি কাব্যের তিনটি ব্যাপারের কল্পনা করিয়াছেন : অভিধা, ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব।

অভিধা শব্দার্থের সামান্য ও প্রথম ব্যাপার যাহার দ্বারা কাব্যে শব্দার্থের বোধ হয়—ইহা কাব্য, ইতিহাস-পুরাণ ও শাস্ত্রাদি সমস্ততেই সমান রূপে পরিব্যাপ্ত থাকে। অভিধার এই স্বরূপ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সেই জন্য ভট্টনায়ক ইহার বিবেচনা করেন নাই।

ভাবকত্ব দ্বিতীয় ব্যাপার। (১) কেবল কাব্য ও নাট্যে ইহার সত্তা বিদ্যমান; কাব্যে দোষাভাব ও গুণ এবং অলংকারের সদ্‌ভাবের জন্য এবং নাটকে চতুর্বিধ অভিনয়ের জন্য শাস্ত্রাদি হইতে ভিন্ন প্রভাব-ক্ষমতা উৎপন্ন হইয়া পড়ে। যেখানে শাস্ত্রাদিতে শব্দার্থ হইতে অভিধার দ্বারা কেবল অর্থ-বোধ হয় সেখানে কাব্যে ভাবকত্বের ফলে অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হইয়া যায় : যেমন (ক) সহৃদয়ের চিত্তের ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ-জন্য অজ্ঞানতা দূর হয়—অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া যান, নিজের ও পরের ভাবনা, যাহা আনন্দানুভূতির প্রমুখ অন্তরায়, তাহা আর সেই সময় থাকে না; (খ) বিভাবাদির সাধারণীকরণ হইয়া যায়—যাহা এই ব্যাপারের মূল গুণ; এবং শেষে (গ) রস ভাবিত হইয়া যায়—অর্থাৎ যাহা মম্মট নিজের উদ্ধরণে বলিয়াছেন, স্থায়ী ভাব ভাবিত হইয়া রসে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহাই রস নিষ্পত্তি : নিষ্পত্তির অর্থ স্থায়ী ভাবের ভাবিত হওয়া। এখানে ভাবিত শব্দের অর্থ বিচার্য। কাব্য প্রকাশের নানা টীকার ভিত্তিতে আচার্য বিশ্বেশ্বর ইহার সরলার্থ করিয়াছেন, সাধারণীকৃত। কিন্তু ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্ত উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন········"ভট্টনায়কের বক্তব্য, তিনি ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারা ভাবিত হন। অর্থাৎ ভাবকত্ব বলিতে তাঁহার মতানুসারে সাধারণীকরণ নয় বরং 'ভাবন'ই বুঝায়।" কিন্তু উভয়ের মধ্যস্থিত অর্থগত বৈশম্যটিকে তিনি স্পষ্ট করেন নাই। মোনিয়ার উলিয়ম্‌স্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বিভিন্ন অভিধানে 'ভাবনের' নানা অর্থ পাওয়া যায়—উহাদের মধ্যে প্রসঙ্গানুকূল দুই-চারটি অর্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা 'চিন্তনের বিষয় হওয়া', 'কল্পনার বিষয় হওয়া', 'অভিব্যক্ত হওয়া' প্রভৃতি। এই সকল অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটি—অর্থাৎ 'কল্পনার বিষয় হওয়া'ই—ভাবকত্ব ব্যাপারের সর্বাধিক নিকট। অতএব আধুনিক ভাষায় ভাবনের অর্থ কল্পনাত্মক প্রতীতি এবং স্থায়ী ভাবের 'ভাবনের' অর্থ, ভাবকত্ব ব্যাপারের ফলে রত্যাদির প্রত্যক্ষ প্রতীতির কল্পনাত্মক প্রতীতিতে পরিণতি। আমরা এখানে প্রাচীনের স্থানে আধুনিক কাব্যশাস্ত্রীয় ভাষা প্রয়োগ করিতেছি। পরিণামে স্থায়ী ভাবের 'কল্পনাত্মক' প্রতীতি এবং উহার 'সাধারণীকরণের' মধ্যে কোন প্রভেদ আর অবশেষ থাকে না, কারণ ব্যক্তিবদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রতীতি কল্পনার বিষয় হইয়া স্বতন্ত্র এবং সাধারণীকৃতই হইয়া যায় : কল্পনার কার্য বিম্বনির্মাণ এবং বিম্বরূপ হওয়া মাত্রই বিশিষ্ট অনুভূতি ব্যক্তি সংসর্গ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বগম্য হইয়া পড়ে।

এইরূপ শব্দার্থে দোষের অভাব ও গুণালংকারের সদ্ভাব ভাবকত্ব ব্যাপারের কারণস্বরূপ। আধুনিক ভাষায় ইহাকে বলা যাইতে পারে কল্পনাতত্ত্বের সমাবেশ এবং কার্য কাব্যসামগ্রীর সাধারণীকরণ, পরিণামতঃ সহৃদয়ের চিত্তের ব্যক্তিগত সংসর্গ হইতে মুক্তি (অন্য কথায় চিত্তের বৈশদ্য) এবং শেষে এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ সহৃদয়ের স্থায়ী ভাবের, ভাবিত হইয়া, রসে পরিণতি।

তৃতীয় ব্যাপারটি ভোজকত্ব যাহার দ্বারা সহৃদয় ভাবকত্বের দ্বারা সিদ্ধ রসের ভোগ করেন। এই ভোগ অনুভব ও স্মৃতি প্রভৃতি হইতে—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ লৌকিক অনুভব হইতে বিলক্ষণ। এই সময় সত্ত্বের উদ্রেক হওয়ার জন্য যদিও সহৃদয়ের চিত্ত চৈতন্যের প্রকাশের দ্বারা পরিপূর্ণ ও আনন্দমগ্ন হইয়া যায়, তবুও উহাতে রজোগুণ ও তমোগুণ সংমিশ্রিত থাকার ফলে দ্রুতি, বিস্তার ও বিকাশের স্থিতিও বর্তমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা নিজসংবিদ্বিশ্রান্তি অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের অবস্থা যাহা ব্রহ্মাস্বাদের অনুরূপ—অনুরূপই তদ্রূপ নয় কারণ ইহাতে রজোগুণ ও তমোগুণের স্পর্শও থাকে।

রস ভোগ্য বা আস্বাদ্য, আস্বাদ্যরূপ নয়। ভাবিত হইয়া বা কল্পনার বিষয় হইয়া সহৃদয়ের স্থায়ী ভাব রসে পরিণতি লাভ করে—ইহাই রসের নিষ্পত্তি এবং তখন তিনি তাহার ভোগ অর্থাৎ আনন্দময় আস্বাদন করেন। এখানে রস ক্রমশঃ সহৃদয়ের অত্যন্ত নিকট আসিয়া যায়—উহা তাঁহার নিজের স্থায়ী ভাবেরই কল্পনাত্মক প্রতীতি, কিন্তু তখনও তাহা আনন্দময়ী চেতনারূপ লাভ করে নাই – বিষয়ই থাকিয়া গিয়াছে। (রস ও আনন্দের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধের স্থানে কারণ-কার্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে।) অতএব প্রস্তাবিত রস-কল্পনাতেও বস্তু-তত্ত্ব (বিষয় তত্ত্ব) বিদ্যমান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ ভট্টনায়কের দৃষ্টিকোণ তাঁহার পূর্ব্ববর্তী আচার্যদের অপেক্ষা অধিক ব্যক্তিনিষ্ঠ বা আত্মনিষ্ঠ হইলে পরেও তুলনাগত ভাবে অভিনব গুপ্তের আত্মনিষ্ঠতার আধিক্য অনস্বীকার্য।

উল্লিখিত বিবেচনানুসারে নিষ্পত্তির অর্থ ভাবিত হওয়া বা ভাবিতি। বিভাবাদির সহিত সংযোগ হইলে পরে স্থায়ী ভাব ভাবিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়—ইহাই রসের নিষ্পত্তি। বিভাবাদি ভাবন ক্রিয়ার কারণ বা ভাবক এবং স্থায়ী ভাব ভাব্য। অতএব সংযোগের অর্থ ভাবক-ভাব্য সম্বন্ধ। পরম্পরাগত ভোজক-ভোজ্য সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না কারণ স্থায়ী ভাব ভাবিত হইলে পরে রসের সিদ্ধি বা নিষ্পত্তি হয়। এই সিদ্ধ-নিষ্পন্ন রসের সহৃদয়ের দ্বারা ভুক্তি নিষ্পত্তির পরের ঘটনা। এইরূপ রস সহৃদয় চিত্তে অবস্থান করে। কতিপয় পণ্ডিতগণের এই মত যে রসের স্থিতি ভট্টনায়ক শব্দার্থে স্বীকার করিয়াছেন—প্রারম্ভে আমাদেরও এই ধারণা ছিল, কিন্তু ইহার খুব বেশী গুরুত্ব নাই। অভিনবভারতী প্রভৃতিতে উদ্ধৃত ভট্টনায়কের মন্তব্যের বিশ্লেষণ করিলে ও অভিনব গুপ্তের দ্বারা উহার খণ্ডনে এই ধারণার নিশ্চিতরূপে নিরাকরণ হইয়া যায়। উল্লিখিত উদ্ধরণের অনুসারে ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব শব্দার্থের

ব্যাপার ; ভাবকত্বের দ্বারা একদিকে বিভাবাদির সাধারণীকরণ হয় এবং অপর দিকে সহৃদয়ের চিত্ত ব্যক্তি সংসর্গ হইতে মুক্ত হয়—বিশদতা লাভ করে এবং উভয়ের ফলে স্থায়ী ভাব ভাবিত হইয়া রসে পরিণত হয় । এই মত অনুসারে আমরা দুইটি সার-কথা পাই । প্রথমতঃ, শব্দার্থ ভোগের বিষয় নয় ; শব্দার্থের ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব ব্যাপার রসের ভাবন ও ভোগে সাহায্য করে—অতএব শব্দার্থ হেতুই হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, ভোগের বিষয় রস এবং রসের অর্থ ভাবিত স্থায়ী ভাব, কারণ ভট্টনায়কের মতানুসারে স্থায়ী ভাবই ভাবিত হইয়া রসে পরিণত হয়; অতএব শেষে ইহাই প্রমাণিত হয় যে স্থায়ী ভাবই ভোগের বিষয় বা রস । স্থায়ী ভাবের সত্তা ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান থাকিতে পারে শব্দার্থের মধ্যে নয়—শব্দার্থ তো মাধ্যম বা প্রতীক মাত্র, ভিত্তি স্থানীয় নয় ; অব্যক্তিগত বা সামান্য স্থায়ী ভাবেরও ভিত্তি কবিই শব্দার্থ নয়, কারণ কবি লোকানু-ভাবের ভিত্তিতে, নিজ বাসনা বলে, উহা অনুভব করিয়া শব্দার্থের মাধ্যমে উহাকে ব্যক্ত করেন । এমন পরিস্থিতিতে রসের ভিত্তিও শব্দার্থ বা কাব্য হইতে পারে না ; কাব্যে রসের স্থিতি কেবল উপচারের দ্বারাই সিদ্ধ হয় । এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে স্থায়ী ভাব বলিতে ভট্টনায়কের কি অভিপ্রায় ছিল—কাহার স্থায়ী ভাব ? ভরত, লোল্লট ও শঙ্কুকের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে স্থায়ী ভাবের কল্পনা প্রায় বিষয়গতই ছিল । ভরতের অভিপ্রেত স্থায়ী ভাব লোকের স্থায়ীভাব ছিল, লোল্লট অনুকার্যের স্থায়ী ভাবের কথা বলিয়াছেন এবং শঙ্কুক স্থায়ী ভাব বলিতে অনুকার্যগত এবং প্রত্যক্ষতঃ নটগত স্থায়ী ভাবকে গ্রহণ করিয়াছেন—স্থায়ী ভাবের এই তিনটি রূপ সহৃদয়ের দৃষ্টিতে বিষয়-নিষ্ঠ; তিনি (নাট্যে উপস্থিত) ইহার আনন্দ গ্রহণ করেন, অনুভব করেন না । ভট্টনায়কও স্থায়ী ভাবের ভোগের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু এই স্থায়ী ভাব বিষয়নিষ্ঠ নয়—'নিবিড নিজমোহসঙ্কটতানিবারণকারিণা' সূত্রের 'নিজ' শব্দের দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে সহৃদয়ের চিত্ত ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া (নিজের) স্থায়ী ভাবের সাধারণীকৃত রূপের আস্বাদন করে । রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত চিত্তের দ্বারা নিজের শুদ্ধ স্থায়ী ভাবের এই অনুভব বা আস্বাদনই রস—এই তথ্যটিকে অভিনব গুপ্ত ভট্টনায়কের মতের খণ্ডনের জন্য কাজে লাগাইয়াছেন । তাঁহার বক্তব্যে ইহাই রসের ভোগও অতএব ভোজকত্ব ব্যাপারের পৃথক কল্পনা অনাবশ্যক । এইরূপ ভট্টনায়ক সহৃদয়ের স্থায়ী ভাবের কথা বলিয়া-ছেন—সহৃদয় ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারা নিজে স্থায়ী ভাবের সাধারণীকৃত রূপে—রস রূপে উপলব্ধি করেন এবং পরে এইরূপ সিদ্ধ রসের ভোজকত্ব ব্যাপারের দ্বারা ভোগ করেন—ভট্টনায়কের স্পষ্টতঃ ইহাই অভিপ্রায় ছিল । অতএব তাঁহার মতানুসারে রসের স্থান শব্দার্থে না হইয়া সহৃদয়ের চিত্তেই; উহাই কাব্যের ভাবকত্ব ভোজকত্ব ব্যাপারের ক্রিয়াভূমি ।

বিবেচনা ঃ শক্তি ও সীমা

সীমা—অভিনব গুপ্ত ভট্টনায়কের মতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপন

করিয়াছেন। প্রথমতঃ রস ও রস-ভোগের মধ্যে কোন প্রভেদ অভিনব গুপ্ত স্বীকার করেন না। ভাবিত স্থায়ী ভাবই রস, এই কথায় তাঁহার কোন আপত্তি নাই। তিনিও ইহা স্বীকার করেন যে 'সর্বথা রসনাত্মক ও বীতবিঘ্ন প্রতীতির দ্বারা গ্রাহ্য ভাবই রস'— কিন্তু এই ভাব অবশেষে আস্বাদ রূপই অতএব আস্বাদ্য এবং আস্বাদ বা রস ও রস-ভোগের মধ্যে যে প্রভেদের কল্পনা ভট্টনায়ক করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে প্রতীতি ও ভুক্তির মধ্যেকার প্রভেদটি অলীক; ভুক্তিও প্রতীতি, কারণ প্রতীতি ব্যতীত কোনরূপ ব্যবহার সম্ভবপর নয়।[১] অতএব রস-প্রতীতির খণ্ডন করিয়া রস-ভুক্তির স্থাপনা সঙ্গত নয়।

তৃতীয় আপত্তি এই যে ভট্টনায়কের 'ভোগের' স্বরূপের ব্যাখ্যা তাত্ত্বিক নয়। তাঁহার মতে ভোগের অর্থ সত্ত্বোদ্রেকের স্থিতিতে চিত্তের আত্মার মধ্যে বিশ্রান্তি যাহা প্রকাশানন্দময়ী কিন্তু রজস্ ও তমসের অনুবন্ধ থাকার জন্য সেই স্থিতিতেও চিত্তে দ্রুতি, বিকাশ ও বিস্তারের প্রবৃত্তি উপস্থিত থাকে। রস-ভোগের ব্যাপারে চিত্তের এই তিনটি দশার স্থিতি অভিনব গুপ্ত অমান্য করিয়াছেন। তাঁহার তর্ক এই যে যতগুলি রস ততগুলি রস-প্রতীতি সম্ভবপর—কেবল ইহাই নয়, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের অনুপাত-ভেদে প্রত্যেক ভাবের অনুভূতিতে চিত্তের দশা ভিন্ন হইতে পারে, অতএব রসাস্বাদনে দ্রুতি, বিস্তার ও বিকাস—চিত্তের এই তিনটি দশার কথাই কেন স্বীকার করা হইবে? এই উদ্ধরণে 'কা ত্রিত্বেনেয়ত্তা'র[২] অর্থ আচার্য বিশ্বেশ্বর এইরূপ করিয়াছেন—অভিধা, ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব—কেবল এই তিনটি ব্যাপারকেই কি জন্য স্বীকার করা হইবে? কিন্তু ইহা ঠিক নয়ঃ ত্রিত্বের অভিপ্রায় এখানে (যেরূপ ডঃ প্রেম-স্বরূপ গুপ্ত স্বীকার করেন) দ্রুতি প্রভৃতি তিনটি দশাই অভিধা, ভাবকত্ব প্রভৃতি তিনটি ব্যাপারের চর্চা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

চতুর্থ আপত্তি এই যে রসের উৎপত্তি এবং অভিব্যক্তি উভয়কে অস্বীকার করিলে রসকে নিত্য বা অসৎ[৩] বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ যাহা নিত্য তাহার উৎপত্তি হয় না এবং যাহা অসৎ তাহার অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। এই কথাটিকে অন্য ভাবে বলা যাইতে পারে যে এমন কোন বস্তু নাই যাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয় না— সৎ হইলে পরে বস্তুর অভিব্যক্তি হওয়া উচিত এবং যদি অসৎ হয় তাহা হইলে উহার উৎপত্তি হওয়া উচিত। সংসারে যত তত্ত্ব আছে তাহাদের অস্তিত্বের উল্লেখ উল্লিখিত দুইটি পদ্ধতির যে কোন একটির দ্বারা হওয়া প্রয়োজনীয়ঃ ইহা প্রমাণিত করার জন্য দর্শনের সৎকার্য্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ সিদ্ধান্তের উদ্‌ভাবনা হইয়াছে অতএব রসের অভি-ব্যক্তি এবং উৎপত্তি উভয়কে অমান্য করিলে পরে উহার অস্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

---

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৬৫
২. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৬৬
৩. ঐ, পৃ০ ৪৬৬

এবং, শেষে কথা এই যে ভাবকত্ব এবং ভোজকত্বের কোন শাস্ত্রীয় ভিত্তি নাই। ইহাদের কাজ প্রমাণ-সিদ্ধ ব্যঞ্জনার দ্বারাই সম্ভবপর।[১]

শক্তি—রস সিদ্ধান্তের বিকাশে ভট্টনায়কের অবদান অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। তাঁহার সিদ্ধান্তের ত্রুটি কেবল তর্ক শাস্ত্রের যুক্তির মধ্যেই পরিবদ্ধ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

রসাস্বাদের স্বরূপের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার শ্রেয়াংশ সর্বপ্রথম ভট্টনায়কেরই প্রাপ্য। তাঁহার পূর্বে কাব্যাস্বাদ প্রসঙ্গে হর্ষ (ভরত), প্রীতি (ভামহ-বামন), আহ্লাদ (আনন্দবর্ধন), চমৎকার (লোল্লট), আনন্দ (ধনঞ্জয়)--প্রভৃতি শব্দের সাধারণরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছিল; রসাস্বাদ বা রস-ভোগের জন্যও এই শব্দগুলি ব্যবহার হইত। কিন্তু রসাস্বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ তখন পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই। ভট্টনায়ক সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে প্রযত্নশীল হইলেন এবং সফলতা লাভ করিলেন। চিত্তের আত্মার মধ্যে বিশ্রান্তিরই নাম রসাস্বাদ বা কাব্যানন্দ। এই বিশ্রান্তি সত্ত্বগুণের উদ্রেকাবস্থাতেই সম্ভবপর যখন রজস্ ও তমস্-এর প্রশমন হয় কিন্তু সর্বথা অভাব হয় না; অতএব ইহা বিশুদ্ধ আত্মবিশ্রান্তি হইতে হীনতর অর্থাৎ ব্রহ্মাস্বাদসবিধ কিন্তু ব্রহ্মাস্বাদ নয়। এই-রূপ আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের সহিত ইহার সাম্য-বৈষম্য স্পষ্ট করিয়া কাব্যাস্বাদ বা রসাস্বাদের স্বরূপ-নির্ণয় ভট্টনায়কই সর্বপ্রথম করিয়াছেন। এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত যথাযথ ভাবে সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

রসের আনন্দরূপতার নির্ভুল বিবেচনা সর্বপ্রথম ভট্টনায়কই করিয়াছিলেন; আত্মবিশ্রান্তি ও সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তের দ্বারা তিনি করুণাদির আনন্দরূপতার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।

ভট্টনায়কের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান সাধারণীকরণ সিদ্ধান্ত। কাব্যাস্বাদনের মৌলিক প্রশ্ন কাব্যে অভিব্যক্ত ব্যক্তির ভাব—কবির অথবা কবি নিবদ্ধ পাত্রের ভাব—সহৃদয়ের আস্বাদ্য কীরূপে হয়, কেবল সহৃদয়েরই নয় সমস্ত সহৃদয় সমাজের কিরূপে হইয়া যায়? ইহার সমাধান সর্বপ্রথম ভট্টনায়কই সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তের উদ্ভাবনার দ্বারা করিয়াছেন। বাস্তবে এই প্রশ্নটি সাহিত্যালোচনের মূলাধার এবং ভট্টনায়ক ইহার সমাধান করিয়া আলোচনা শাস্ত্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আমার ধারণা এই যে বিশ্বের আলোচনাশাস্ত্রে ভট্টনায়কের পূর্বে এই মূল প্রশ্নটির এই রূপ প্রামাণিক ভাবে কোন আচার্যই সমাধান উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

অভিনব গুপ্তের মত

পূর্বসূরী ব্যাখ্যাতাগণের মতের পূর্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার পরে অভিনব গুপ্ত

১, হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ॰ ৪৬৭

নিজের মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিষয়ে প্রথম জ্ঞাতব্য কথা এই যে তিনি উল্লিখিত আলোচনার জন্য খণ্ডন শব্দটির স্থানে সংশোধন শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন—তাঁহার বক্তব্য এই যে আমরা পূর্ববর্তী বিদ্বানদের বিচারের বিশ্লেষণ করিবার পরে সে সকল বিচারের কেবল সংশোধন করিয়াছি—খণ্ডন নয়। কারণ পূর্ববর্তী আচার্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের যথাযথ ভাবে অর্থসংস্থান করিলে মৌলিক সিদ্ধান্তের স্থাপনার অনুরূপ ফল পাওয়া যায়; 'পূর্বপ্রতিষ্ঠাপিতযোজনাসু মূলপ্রতিষ্ঠাফলমামনন্তি।' তাঁহার এই বক্তব্যটি কাব্যশাস্ত্রের বিভিন্ন আচার্যদের নানা মতের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ---শাস্ত্র বা কাব্যশাস্ত্রের সেই সব আচার্যরাই কেবল উদ্‌ভাবক আচার্য নহেন যাঁহারা নবীন সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করিয়াছেন—ব্যাখ্যাতা বা পুনরাখ্যাতাকার গম্ভীর প্রকৃতি আচার্যদেরও এই শ্রেয়াংশ প্রাপ্য। স্বয়ং অভিনব গুপ্তের সম্বন্ধেও এই কথাটি প্রযোজ্য। অভিনবগুপ্তের রসনিষ্পত্তি বিষয়ক বিচার সমষ্টি অভিনবভারতী ও ধ্বন্যা-লোকলোচন—উভয় গ্রন্থেই উপলব্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান প্রসঙ্গের বিবেচনা 'লোচনে' আরও অধিক স্পষ্ট, কারণ ধ্বনির (ব্যঞ্জনা) সন্দর্ভে উহাকে স্পষ্ট করিবার তিনি অধিক সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

অভিনবভারতী

তৎকাব্যার্থো রসঃ। × × × কাব্যাৎমকাদপি শব্দাদধিকারিণোঽধিকাস্তি প্রতিপত্তিঃ। অধিকারী চাত্র বিমলপ্রতিভানশালিহৃদয়ঃ। তস্য চ 'গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্' ইতি (শাকু০১), 'উমাপি নীলালক' ইতি (কুমার০৩-৬২), 'হরস্তু কিঞ্চিৎ' (কুমার০ ৩-৬৭) ইত্যাদিবাক্যেভ্যো বাক্যার্থপ্রতিপত্তেরনন্তরং মানসী সাক্ষাৎকারাত্মিকা অপহসিত-তত্তদ্বাক্যোপাত্তকালাদিবিভাগা তাবৎপ্রতীতিরূপজায়তে।

তস্যাং চ যো মৃগপোতকাদির্ভাতি তস্য বিশেষরূপৎবাভাবাদ্ ভীত ইতি, ত্রাস-কস্যাপারমার্থিকৎবাদ্ ভয়মেব পরং দেশকালাদ্যনালিঙ্গিতং, তত এব ভীতোঽহং ভীতোঽয়ং শত্রুর্বয়স্যো মধ্যস্থো বা ইত্যাদিপ্রত্যয়েভ্যো দুঃখসুখাদিকৃতবুদ্ধ্যন্তরোদয়নিয়-মবত্তয়া বিঘ্নবহুলেভ্যো বিলক্ষণং নির্বিঘ্নপ্রতীতিগ্রাহ্যং, সাক্ষাদিব হৃদয়ে নিবিশমানং, চক্ষুষোরিব বিপরিবর্তমানং, ভয়ানকো রসঃ। তথাবিধে হি ভয়ে নাৎমাৎযন্তং তির-স্কৃতো, ন বিশেষতঃ উল্লিখিতঃ। এবং পরোঽপি।

তত এব ন পরিমিতমেব সাধারণ্যমপি তু বিততম্। ব্যাপ্তিগ্রহ ইব ধূমাগ্ন্যো-র্ভয়কম্পয়োরিব বা। তদত্র সাক্ষাৎকারায়মাণত্বেন পরিপোষিকা নটাদিসামগ্রী। যস্যাং বস্তুসতাং কাব্যার্পিতানাং চ দেশকালপ্রমাত্রাদীনাং নিয়মহেতুনামন্যোন্যপ্রতিবন্ধ-বলাদত্যন্তমপসারণে স এব সাধারণীভাবঃ সুতরাং পুষ্যতি। অতএব সর্বসামাজিকা-নামেকঘনতয়ৈব প্রতিপত্তিঃ সুতরাং রসপরিপোষায়। সর্বেষামনাদিবাসনাচিত্রীকৃত-চেতসাং বাসনাসংবাদাৎ। সা চাবিঘ্না সংবিৎ চমৎকারঃ। × × × সর্বথা রসনাৎমকবীত-

বিঘ্নপ্রতীতিগ্রাহ্যো ভাব এব রসঃ। তত্র বিঘ্নাপসারকা বিভাবপ্রভৃতয়ঃ।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৭০-৪৭৩)

—অর্থাৎ সেই কাব্যার্থ রস। × × × কাব্যময় শব্দ হইতেও (কাব্য হইতে) যোগ্য সহৃদয় ব্যক্তির (সামান্য বাক্যার্থ-জ্ঞানের অপেক্ষা) অতিরিক্ত (রসাত্মক ব্যঙ্গ্যার্থের) প্রতীতি হয়।

এখানে নির্মল প্রতিভাশালী হৃদয়যুক্ত (সহৃদয়) পুরুষ (কাব্যার্থ জ্ঞানের) 'অধিকারী' অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তি। এবং উহার (কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে উল্লিখিত) 'গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্', (কুমারসম্ভবের) 'উমাপি নীলালক' প্রভৃতি, এবং 'হরস্তু কিঞ্চিৎ' প্রভৃতি শ্লোক বাক্যের দ্বারা বাক্যার্থের প্রতীতির পরেই সেই সব বাক্যে কাল ইত্যাদির বিচ্ছিন্নতা দূরে সরাইয়া দিয়া (সাধারণীকরণ) মানসী এবং সাক্ষাৎকারাত্মিকা প্রতীতির অনুরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয়।

এবং সেই প্রতীতিতে মৃগ-শাবক প্রভৃতি যাহা বিষয়রূপে প্রতিভাসিত হয় তাহার (সাধারণীকরণ হওয়ার জন্য) বিশেষরূপ না থাকার জন্য (মৃগপোত) বিষয়ক 'ইহা ভীত, এই জ্ঞান, এবং (ভয়ের জন্য) ত্রাসিক (দুষ্মন্তাদি) বাস্তবিক রূপে না থাকার জন্য (অর্থাৎ কল্পিত হওয়ার জন্য) ভয়ই, দেশকাল প্রভৃতি হইতে সর্বথা অসম্বদ্ধ (রূপে প্রতিভাসিত হয়), এইজন্য আমি ভীত অথবা ইহা ভীত, অথবা ইহা শত্রু, মিত্র বা মধ্যস্থ ইত্যাদি সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রসারক অন্য জ্ঞানের নিয়মের দ্বারা উৎপন্ন অতএব বিঘ্নবহুল জ্ঞান হইতে ভিন্ন, নির্বিঘ্ন প্রতীতির দ্বারা (গ্রাহ্য ভয়রূপ স্থায়ী ভাবই) সাক্ষাৎ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, চোখের সম্মুখে ঘূর্ণিত অবস্থায় 'ভয়ানক রস' হইয়া যায়। এইরূপ ভয়ে (সামাজিকের) আত্মা অত্যন্ত উপেক্ষিত হয় না এবং বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় না। এইরূপ অন্য (রস) ও হয়।

এইজন্য সেই সব বিভাবাদির সেই দেশ-কালে পরিমিত রূপেই সাধারণীকরণ হয় না, যদিও ধূম ও অগ্নির ব্যাপ্তিগৃহে, অথবা ভয় ও কম্প প্রভৃতির ব্যাপ্তিগৃহের সমান অত্যন্ত বিস্তৃত রূপে (সাধারণীকরণ) হয়। এবং ইহাতে সাক্ষাৎকারাত্মক রূপে পরিপোষিকা নটাদি সামগ্রী বিদ্যমান থাকে। যাহাতে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান এবং কাব্যে বর্ণিত দেশ, কাল, প্রমাতা প্রভৃতির নিয়ামক হেতুর (নিয়মের) বন্ধন হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া দিলে পরে সেই সাধারণীকরণ ব্যাপার অত্যন্ত পুষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য সমস্ত সামাজিকদের এক ঘনতারূপেই প্রতীতি হয় যাহা রসকে অত্যন্ত পরিপুষ্ট করে। অনাদি সংস্কারের দ্বারা চিত্রিত চিত্তের দ্বারা সংযুক্ত সমস্ত সামাজিকগণের এক ধরণের বাসনার জন্য (সকলের এক ধরণেই প্রতীতি হয়)। এবং সেই বিঘ্ন হইতে সর্বথা মুক্ত প্রতীতিকেই 'চমৎকার' বলা হয়। × × × প্রত্যেক অবস্থায় (সর্বথা) আস্বাদাত্মক এবং নির্বিঘ্ন প্রতীতি হইতে গ্রাহ্য 'ভাব'ই রস। উহাতে যে সব বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের অপসারক বিভাবাদি হয়।

ধ্বন্যালোকলোচন

তস্মাদনুত্থানোপহতঃ পূর্বপক্ষঃ। রামাদিচরিতং তু ন সর্বস্য হৃদয়সংবাদীতি মহৎসাহসম্। চিত্রবাসনাবিশিষ্টৎবাচ্চেতসঃ। যদাহ—"তাসমনাদিত্বং আশিষো নিত্যত্বাৎ। জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারযোরেকরূপত্বাৎ" ইতি। তেন প্রতীতিস্তাবদ্রসস্য সিদ্ধা। সা চ রসনারূপা প্রতীতিরুৎপদ্যতে। বাচ্যবাচকয়োস্তত্রাভিধাদিবিবিক্তো ব্যঞ্জনাত্মা ধ্বননব্যাপার এব। ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যস্য রসবিষয়ো ধ্বননাত্মৈব, নান্যৎকিঞ্চিৎ। ভাবকত্বমপি সমুচিতগুণালংকারপরিগ্রহাত্মকমস্মাভিরেব বিতত্য বক্ষ্যতে। কিমেতদপূর্বম্? কাব্যং চ রসান্ প্রতি ভাবকমিতি যদুচ্যতে, তত্র ভবতৈব ভাবনাদুৎপত্তিপক্ষ এব প্রত্যুজ্জীবিতঃ। ন চ কাব্যশব্দানাং কেবলানাং ভাবকত্বম্, অর্থা-পরিজ্ঞানে তদভাবাৎ। ন চ কেবলানামর্থানাম্, শব্দান্তরেণার্প্যমানত্বে তদয়োগাৎ। দ্বয়োস্তু ভাবকত্বমস্মাভিরেবোক্তম্। 'যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থ ব্যংক্তঃ' ইত্যত্র। তস্মাদ্ব্যঞ্জকত্বাখ্যেন ব্যাপারেণ গুণালঙ্কারৌচিত্যাদিকয়েতিকর্তব্যতয়া কাব্যংভাবকং রসান্ ভাবয়তি, ইতি ত্র্যংশায়ামপি ভাবনায়াং করণাংশে ধ্বননমেব নিপততি। ভোগোহপি ন কাব্যশব্দেন ক্রিয়তে, অপি তু ঘনমোহান্ধসঙ্কটতানিবৃত্তিদ্বারেণাস্বাদাপরনাম্নি অলৌকিকে দ্রুতিবিস্তরবিকাসাৎমনি ভোগে কর্তব্যে লোকোত্তরে ধ্বননব্যাপার এব মূর্ধাভিষিক্তঃ। তচ্চেদং ভোগকৃত্বং রসস্য ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধম্। রস্যমানতোদিতচমৎকারানতিরিক্তত্বাদ্ ভোগস্যেতি। সত্ত্বাদীনাং চাঙ্গাঙ্গিভাববৈচিত্র্যস্যানন্ত্যাদ্ দ্রুতাদিত্বেনাস্বাদগণনা ন যুক্তা। পরব্রহ্মাস্বাদ সব্রহ্মচারিত্বং চাস্ত্বাস্য রসাস্বাদস্য। ব্যুৎপাদনং চ শাসনপ্রতিপাদনাভ্যাং শাস্ত্রেতিহাসকৃতাভ্যাং বিলক্ষণম্। যথা রামস্তথাহমিত্যুপমানাতিরিক্তাং রসাস্বাদোপায়স্বপ্রতিভাবিজৃম্ভারূপাং ব্যুৎপত্তিমন্তে করোতিতি কমুপালভামহে। তস্মাস্থিতমেতৎ—অভিব্যজ্যন্তে রসাঃ প্রতীত্যৈব চ রস্যন্ত ইতি।"

(ধ্বন্যালোক-চৌখম্বা সং০ সী০ ১৯৯০; পৃষ্ঠ ১৮৩—১৯০)

—সুতরাং যে পূর্ব্বাপক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহা উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়া গেল। যদি বলা হয় যে রসাদি চরিত্রের সঙ্গে সকলের হৃদয়সম্মিলন হইতে পারে না তাহা হইলে অবিমৃষ্যকারিতা হইবে, কারণ মনুষ্যচিত্তে বিচিত্র বাসনা থাকে। এইজন্যই বলা হইয়াছে—"বাসনাসমূহ অনাদি, কারণ আত্মা নিত্য। জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধান থাকিলেও স্মৃতি ও সংস্কার একই থাকে বলিয়া তাহারা অব্যবহিতই রহে।" সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে রস প্রতীত হয়। সেই প্রতীতি আস্বাদরূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হয় এইরূপ বলা যাইতে পারে। সেই প্রতীতিতে বাচ্যবাচকস্থলে (অর্থাৎ কাব্যে) অভিধাব্যতিরিক্ত ব্যঞ্জনাত্মা ধ্বননব্যাপারই বর্ত্তমান থাকে। যে ভোগীকরণ ব্যাপারের কথা বলা হইয়াছে তাহা কাব্যাত্মক রসের বিষয় এবং তাহা ধ্বননাত্মকই, অন্য কিছু নহে। আমরা বিস্তারিত ভাবে ইহাই দেখাইব

যে ভাবকত্বব্যাপারও সমুচিতগুণালঙ্কারগ্রহণাত্মক। ইহা এমন কি অপূর্ব্ব বস্তু? কাব্যও রসসমূহের ভাবক এই কথা বলিয়া ভট্টনায়ক রসের উৎপত্তি হয় এই মতবাদই পুনরুজ্জীবিত করিলেন। কাব্যে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় কেবল তদ্দ্বারা ভাবকত্ব আসিতে পারে না; যেহেতু অর্থ সম্যক্‌রূপে না জানা হইলে ভাবকত্বের অভাব হইবে। কেবল অর্থেরও ভাবকত্ব হয় না, কারণ কাব্য ছাড়া অন্য শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ হইলে ভাবকত্বের সংযোগ হইবে না। দুইয়েরই যে ভাবকত্ব হয় এই কথা তো আমরাও বলিয়াছি—যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থংব্যংক্তঃ" কারিকায়। সুতরাং ব্যঞ্জনা নামক ব্যাপারের দ্বারা এবং গুণ ও অলঙ্কারের ঔচিত্যের সহকারিতার দ্বারা কাব্য ভাবকত্ব লাভ করিয়া রসগুলিকে ভাবিত করে। এইরূপে ভাবনার তিন অংশ থাকিলেও করণাংশে ধ্বননই রহিল। ভোগও কাব্যের শব্দের দ্বারা করা হয় না। বরং যে ভোগের অপর নাম আস্বাদ, যাহা চিত্তের অলৌকিক বিগলন—বিস্তার-বিকাশাত্মক এবং যাহা ঘনমোহান্ধকাররূপ আচ্ছাদনের অপসারণ করিয়া প্রবৃত্ত হয় সেই লোকোত্তর যেখানে সম্পাদনীয় সেইখানে ধননব্যাপারকেই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। রসের ধ্বননীয়ত্ব সিদ্ধ হইল তাহার দ্বারা যে চমৎকৃতির উদয় হয় ভোগ তাহার অতিরিক্ত নহে। সত্ত্বাদিগুণের অঙ্গাঙ্গিভাবের বৈচিত্র্যের অবধি নাই; সুতরাং হৃদয়ের দ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা আস্বাদের গণনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই রসাস্বাদ পরব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ হয়তো হউক। অপিচ ইহার ব্যুৎপাদন শাস্ত্রও ইতিহাসের ব্যুৎপাদন হইতে বিভিন্ন। যদি কেহ বলেন যে "যেমন রাম তেমনি আমি হইব"—এইরূপ সাদৃশ্য বুঝাইবার পরে এই উপমানের অতিরিক্ত, রসাস্বাদের উপায় স্বরূপ, স্বীয় প্রতিভার বিকাশরূপ দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে কাহাকে তিরস্কার করিব? অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল—রস প্রতীতির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, রস্যমান হয়।

(ধ্বন্যালোক: ভাষ্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত,
অনুবাদকের দ্বারা গৃহীত, পৃ০ ১০৩—১০৪)

অভিনব গুপ্তের মতের সারাংশ

(১) সর্বথা আস্বাদাত্মক এবং নির্বিঘ্ন প্রতীতির দ্বারা গ্রাহ্য ভাবই রস। অর্থাৎ নাটক অথবা কাব্যের উপকরণের দ্বারা সাধারণীকৃত হইয়া—দেশকাল, স্ব-পর, ব্যক্তিগত রাগদ্বেষাদির চেতনা হইতে মুক্ত হইয়া, রত্যাদি ভাব আস্বাদ্য অথবা সুখময় প্রতীতির বিষয় হইয়া যায়। এই আস্বাদ্য ভাব এবং উহার সুখময় প্রতীতিই রস। অভিনব গুপ্তের মতে—বিশুদ্ধ অদ্বৈত ভাবনার দৃষ্টিতে—সুখময় প্রতীতিই প্রকৃতপক্ষে রস, কিন্তু এই সুখময় প্রতীতির বিষয়—সাধারণীকৃত ভাব-কেও রস বলা যাইতে পারে।

(২) রসাস্বাদনে সহৃদয়ের আত্মা সর্বথা উপেক্ষিত থাকে না এবং বিশেষরূপে

উল্লিখিতও হয় না—অর্থাৎ রসের প্রতীতি সহৃদয়ের আত্মাই করে, কিন্তু এই প্রতীতি ব্যক্তিগত হয় না।

(৩) এই সাধারণীকরণ কেবল ব্যষ্টিমূলকই হয় না, সমষ্টিগতও হয়ঃ কাব্য ও নাটোর উপকরণের চমৎকার হইতে আত্ম-তত্ত্বগত অদ্বৈততার জন্য সকল সামাজিক ভাবের সমানরূপে প্রতীতি করেন। ইহার জন্য সাধারণীকরণ ব্যাপার অত্যন্ত পুষ্ট হইয়া যায় এবং প্রতীতি সর্বথা নির্বিঘ্ন হইয়া পড়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগত সংসর্গের একান্ত অভাব হওয়ার জন্য আস্বাদন পূর্ণতঃ আনন্দময় হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদী অভিনব গুপ্ত নিজের গ্রন্থ তন্ত্রালোকে এই সমষ্টিগত রসানুভূতির অত্যন্ত সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য ঃ 'রসগঙ্গাধরের শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন', ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্ত; পৃষ্ঠ ১৭৫।)

(৪) স্থায়ী ভাব প্রত্যেক সহৃদয়ের চিত্তে সংস্কার রূপে বিদ্যমান থাকে; সংস্কার রূপ হওয়ার জন্য উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও থাকে না—কারণ অনাদি সংস্কারের দ্বারা চিত্রিত প্রত্যেক সামাজিকের চিত্তে এক রকমের বাসনা বিদ্যমান থাকে।

(৫) কাব্যাত্মক শব্দের দ্বারা (বাক্যের দ্বারা) সহৃদয় ব্যক্তির সামান্য অর্থ-বোধের (বাচ্যার্থ-জ্ঞানের) অপেক্ষা অধিক প্রতীতি হয়। এই অর্থবোধ ও সামান্য অর্থ-বোধের মধ্যে ইহাই প্রভেদ যে এই প্রতীতি বাক্যে গৃহীত কালাদি বিভাগ হইতে মুক্ত—সাধারণীকৃত হয় এবং সাক্ষাৎকারাত্মিকা হয়, অর্থাৎ ইহার দ্বারা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যেন (কল্পনায়) একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। আধুনিক ভাষায় অর্থ-বোধ ধারণা-রূপ এবং এই প্রতীতি বিম্ব-রূপ হয়।

(৬) শব্দার্থের মধ্যে গুণালংকারের উচিত সমাবেশ এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিরূপ। ভট্টনায়ক ইহাকে ভাবকত্ব ব্যাপারের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি ব্যাপারের তিনটি অঙ্গ হয়ঃ করণ, ফল, এবং ইহাদের মধ্যবর্তিনী ইতিকর্তব্যতা। অভিনব গুপ্তের মতানুসারে এই ব্যাপারের ফল সাধারণীকরণ, গুণালংকারের সমাবেশ ইতি-কর্তব্যতা এবং করণ হইতেছে ধ্বনন অর্থাৎ শব্দার্থের ব্যঞ্জনা শক্তি। এইরূপ যখন ভাবকত্ব ব্যাপারেরও প্রাণ ধ্বনন বা ব্যঞ্জনাই তখন এই নবীন কল্পনার আবশ্যকতা কি ছিল?

(৭) ভোজকত্বের শক্তি শব্দার্থে স্বীকার করা যাইতে পারে না; উহা তো চিত্তের ক্রিয়া—বস্তুতঃ রসাস্বাদ ও ভোগ উভয়ের স্থিতি অভিন্ন। শব্দার্থ এই ক্রিয়ার প্রেরক মাত্র এবং ব্যঞ্জনা হইতেই শব্দার্থ এই শক্তি লাভ করে। এইজন্য বিভাবাদির সাধারণী-করণ হইলে পর সহৃদয়ের চিত্ত 'নিজমোহসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া ভাবের ভোগে সমর্থ হয়—অতএব এই অলৌকিক কর্তব্যেও ধ্বনন ব্যাপারই মূর্ধাভিষিক্ত; অর্থাৎ ব্যঞ্জনাই প্রধান কারণ রূপে অভিষিক্ত হয়। এইরূপ ভোজকত্ব কাব্যের কোন পৃথক্ ব্যাপার নয়। রসকে ধ্বননীয় মানিয়া লইলে পর ভোজকত্ব দৈবসিদ্ধ হইয়া যায়—উহার পৃথক্ কল্পনা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে।

(৮) রস ব্রহ্মাস্বাদের অনুরূপ, ইহা অভিনব গুপ্তও স্বীকার করেন।

(৯) ইহা নির্বিবাদে বলা চলে যে রসের অভিব্যক্তি হয়। আস্বাদাত্মক এবং

নির্বিঘ্ন প্রতীতির দ্বারা গ্রাহ্য স্থায়ী ভাবই রস এবং স্থায়ী ভাব অনাদিবাসনা রূপে প্রমাতার চিত্তে বিদ্যমান থাকে। নাট্য এবং কাব্যে বিভাবাদির সম্পর্কে থাকার জন্য উহা অভিব্যক্ত হইয়া রসনীয় হইয়া যায় বা রসে পরিণতি লাভ করে। এইরূপ বিভাবাদি হইতেছে ব্যঞ্জক এবং (রসরূপে পরিণত) স্থায়ী ভাব ব্যঙ্গ—অর্থাৎ অন্য ভাবে বলিতে গেলে রসও ব্যঙ্গ। অতএব নিষ্পত্তির অর্থ অভিব্যক্তি এবং সংযোগের অর্থ ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ।

(১০) শৈবাদ্বৈত দর্শন অভিনব গুপ্তের মূলাধার—এই বিষয়ে কোনরূপ বিবাদ নাই। তিনি প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠাপকদের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া খ্যাত।

বিবেচনা

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে অবশেষে অভিনব গুপ্তের মতটি সর্বমান্য রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। শৈবাদ্বৈতের আশ্রয়ে প্রতিপাদিত আনন্দবাদের পুষ্ট ভিত্তির উপর তিনি যে আত্মাস্বাদ-রূপ রসের প্রকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা রস-সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণরূপে আবেষ্টিত করিয়াছে। পরিণামে ভরতের মূল সিদ্ধান্তটিও উহার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং পরবর্তী আচার্যগণ ভরতকে ভুলিয়া গিয়া—বা ভরতের নামে, অভিনব গুপ্তের মতটিরই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে অভিনব গুপ্তের বিবেচনা অত্যন্ত পরিপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ কিন্তু গুণের সঙ্গে-সঙ্গে ইহার মধ্যে দুর্বলতাও বিদ্যমান আছে।

শক্তি—অভিনব গুপ্তের মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে পূর্ববর্তী সকল আচার্যদের সিদ্ধান্তগুলির অপেক্ষা ইহার দার্শনিক ভিত্তি অত্যধিক গম্ভীর ও প্রামাণিক। যেরূপ ভারতে অধিকাংশ দার্শনিক মতবাদের পর্যবসান অদ্বৈতের মধ্যে হইয়াছে, সেইরূপ রস-বিষয়ক সকল মতবাদও আত্মাস্বাদের কল্পনার মধ্যে অন্তর্লীন হইয়াছে।

সর্বপ্রথম অভিনব গুপ্তই রসের একান্ত সহৃদয়-নিষ্ঠ রূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভট্টনায়কের মতেও রস ভোজ্যই থাকিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ উহার বস্তু-নিষ্ঠ সত্তা বর্তমান ছিল—কিন্তু অভিনব গুপ্ত বিবেকযুক্ত ভাষায় উহার আস্বাদরূপতার সর্বপ্রথম প্রতিপাদন করিয়াছেন।

রসাস্বাদ আনন্দময়ই হয়—এই তথ্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার শ্রেয়াংশ ভট্টনায়কেরই প্রাপ্য, কিন্তু অভিনব গুপ্ত শৈব আনন্দবাদের দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করিয়া ইহাকে সর্বথা প্রামাণিক সিদ্ধ করিয়াছেন। পরিণামে নিরানন্দবাদী জৈনাদি আচার্য্যদের সবগুলি বিকল্পের প্রস্তাব ব্যর্থ হইয়াছে।

অদ্বৈত সিদ্ধান্তের আত্মানন্দের সহিত আনন্দবর্ধনের ব্যঞ্জনা-বাদের সহজ সমন্বয় করিয়া অভিনব গুপ্ত রসের অনুভূতি ও অভিব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত ও ব্যঞ্জনার অনিবার্য সম্বন্ধ বর্তমান: যখন কেবল একটি তত্ত্বেরই সত্তা বিদ্যমান আছে তখন এই সম্পূর্ণ বিশ্বপ্রপঞ্চ উহার কৃতি না হইয়া

অভিব্যক্তিই প্রমাণিত হয়। অভিনব গুপ্তের তত্ত্বদর্শিনী প্রজ্ঞা এই তথ্যটিকে সহজে উপলব্ধি করিয়া উভয়ের সমন্বয়ের দ্বারা রস সিদ্ধান্তের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করিয়াছেন।

সমষ্টিগত রসের প্রকল্পনা অভিনব গুপ্তের রস-বিবেচনার একটি প্রমুখ সিদ্ধি। অভিনব গুপ্তের দর্শন মূলতঃ ব্যক্তিবাদী, কিন্তু বিবেচনা-শেষে তিনি সামূহিক রস-চেতনার দ্বারা রস-চক্রের পূর্ণতা প্রমাণিত করিয়াছেন। সমাজগত যে কলানুভূতির স্থাপনা আধুনিক যুগে সাম্যবাদ বা সমাজবাদের প্রভাব-সূত্রের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, অভিনব গুপ্ত স্বীয় চেষ্টায় উহার অপূর্ব ব্যাখ্যান করিয়াছেন। উহার স্পষ্টীকরণের জন্য এখানে আমরা (ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্তের গ্রন্থে উদ্ধৃত) তন্ত্রালোক হইতে উদ্ধরণ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না ঃ

(১) তথা হৈকাগ্রসকলসামাজিকজনঃ খলু।
নৃত্তং গীতং সুধাসারসাগরত্বেন মন্যতে ॥
তত এবোচ্যতে মল্লনটপ্রেক্ষোপদেশনে।
সর্বপ্রমাতৃতাদাত্ম্যং পূর্ণরূপানুভাবকম্ ॥

তন্ত্রালোক ১০. ৫. ৮৫.

—অর্থাৎ ইহা এইরূপ—নিঃসন্দেহ, একাগ্র মন যাঁদের সেই সকল সামাজিক ব্যক্তি নৃত্য (আঙ্গিক অভিনয়) ও গীতকে অমৃতের সাগর ভাবিয়া গ্রহণ করেন। এই জন্য মল্লযুদ্ধের দর্শনে ও নটের অভিনয় দর্শন প্রসঙ্গে সকল প্রমাতার তাদাত্ম্যকে পূর্ণ-রূপের (রসের) অনুভাবক বলা হয়।

(২) সংবিৎসর্বাত্মিকা দেহভেদাদ্ যা সঙ্কুচিতা তু সা।
মেলকোন্যোন্যসংঘট্টপ্রতিবিম্বাদ্বিকস্বরা ॥
উচ্ছলন্নিজরশ্ম্যোঘঃ সংবিৎসু প্রতিবিম্বতঃ।
বহুদর্পণবদ্দীপ্তঃ সর্বাযেতাপ্যযত্নতঃ ॥
অতএব নৃত্যগীতপ্রভৃতৌ বহুপর্ষদি।
যঃ সর্বতন্ময়ীভাবো হ্লাদো নত্বেকৈকস্য সঃ ॥
আনন্দনির্ভরা সংবিৎ প্রত্যেকং স তথৈকতাম্।
নৃত্তাদৌ বিষয়ে প্রাপ্তা পূর্ণানন্দত্বমশ্নুতে ॥

—যে চেতনা সর্বাত্মক চেতনা; (কিন্তু) দেহ-ভেদে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তাহা (অনেকের সহিত) সম্মিলিত হইয়া (বা একত্রিত হইয়া) একে-অপরের সংঘট্ট রূপ প্রতি-বিম্বের জন্য বিকাশ লাভ করে। (সেই সর্বাত্মক চেতনার) উচ্ছল কিরণের সমূহ সংবেদনায় প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক দর্পণের (প্রতিবিম্বিত সূর্যের প্রকাশের) সমান কোন প্রযত্ন ব্যতীতই সর্বান্বিত (অর্থাৎ সর্বাত্মক রূপে পরিণত)-ও হইতে পারে।। সেই-জন্য অনেকের উপস্থিতিতে নৃত্য, গীত ইত্যাদিতে সকলের তন্ময়তা রূপে যে আনন্দ (উপলব্ধ) হয়, তাহা এক-একজনের পৃথক্-পৃথক্ ভাবে হয় না। (অর্থাৎ যতটুকু আনন্দ

সামূহিক রূপে রস জমিলে পরে অধিগত হয় ততখানি আনন্দ এক-একজনের পৃথক্-পৃথক্ আস্বাদনে হয় না।) এইরূপ আনন্দ-নির্ভর চেতনা নৃত্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ রূপে একত্ব প্রাপ্ত করিয়া পূর্ণ আনন্দরূপতার আস্বাদন করে।

পরিসীমা—পরমমাহেশ্বর অভিনবগুপ্তপাদাচার্যের ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের উপর তৎকালে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল, অতএব তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই—উহা সর্ববিদিত এবং সর্বমান্যই ; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের নানা দোষ দৃষ্টিগোচর হয় এবং উহা উল্লিখিতও হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিনি ভরতের মতটিকে নিজের বিচারের দ্বারা এতই অধিক অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন যে পরবর্ত্তী কাব্যশাস্ত্রে উহার বাস্তবিক রূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে দুইটি বিকল্পের অনুমান করা যাইতে পারে—(১) অভিনব গুপ্ত নিজের সিদ্ধান্তের পূর্বাগ্রহের জন্য ভরতের অভিমতকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই ; এবং (২) তিনি স্বীয় বিচারধারা অনুসারে ভরতের মতের পুনরাখ্যান করিয়াছেন—যেরূপে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ সাংখ্যাদির বস্তুনিষ্ঠ স্থাপনার পুনরাখ্যান করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় বিকল্পটি অধিক গ্রাহ্য মনে হয়—তবুও মূলকে আত্মসাৎ করিয়া উহার রূপই পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া বৈজ্ঞানিক বিবেচনার দৃষ্টিতে খুব কাম্য নয়।

ভরতের ব্যাখ্যাতাদের মতামতও তিনি এই রূপেই ব্যবহার করিয়াছেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অবস্থা আরও করুণার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা লোল্লট প্রসঙ্গে বলিয়াছি, অত্যন্ত বিরল উদ্ধরণের ভিত্তিতেও ইহা স্বীকার করা কঠিন নয় যে লোল্লটের মত ভরতের মতের খুবই সন্নিকট ছিল—কিন্তু অভিনব গুপ্ত উহাকে এইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। শ্রী শঙ্কুকের বিবেচনাতেও কলা সম্বন্ধী নানা মূল্যবান্ তথ্য বিদ্যমান আছে, কিন্তু অভিনব গুপ্ত ভট্টতোতের সাহায্যে দর্শনের যুদ্ধে তাঁহাকে এইরূপ ভাবে ধরাশায়ী করিয়াছেন যে তাঁহার গুণও ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। ভট্টনায়কের সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণে ইহা স্পষ্ট হয় যে তিনি অত্যন্ত পুষ্ট-গম্ভীর আধারশিলার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; কাব্য-চিন্তার বিকাশে তাঁহার যোগদান অভূতপূর্ব; স্বয়ং অভিনব গুপ্ত তাঁহার আধারভূত সিদ্ধান্ত-গুলিকে যথাবৎ স্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু তবুও তাঁহাকে এইরূপ নাজেহাল করিয়াছেন যে এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভট্টনায়কের বলিতে গেলে কোনো গুরুত্বই ছিল না।

এই সিদ্ধান্তের অপর দোষ এই যে ইহাতে কাব্যাস্বাদ ও আত্মাস্বাদ প্রায় এক পর্যায়ে পড়ে, যাহা অন্ততঃপক্ষে বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। এই দোষের জন্যই কাব্যাস্বাদ বা রসের উপর অলৌকিকতার এমন গভীর প্রলেপ পড়িয়াছে যে আধুনিক যুগের বিচারকেরা অনেক কাল পর্য্যন্ত রস-সিদ্ধান্তের অবহেলনা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই।

রসের স্বরূপকে একান্ত ভাবে আত্মনিষ্ঠ মানিয়া লইলে সম্পূর্ণ গুরুত্ব সহৃদয়তার উপর আসিয়া পড়ে এবং কাব্যের সত্তা গৌণ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অভিনব গুপ্ত কবির আত্ম-তত্ত্বের আশ্রয়ে কাব্যেরও আত্মনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী

যুগে ইহার প্রায় উপেক্ষাই হয়, পরিণামে সিদ্ধান্তটির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া পড়ে। যদিও অবশেষে রসের সত্তা ব্যক্তিনিষ্ঠই স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে কবিও অন্তর্ভুক্ত। কেবল সহৃদয়কে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিলে পর কাব্যের মূল্যাঙ্কন-পদ্ধতি বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে।

অভিনব গুপ্তের প্রতিভা যেমন প্রখর ও পারদর্শিনী, তদপেক্ষা তাঁহার রচনারীতি অত্যন্ত জটিল ও প্রায় বাগাড়ম্বরযুক্ত। আনন্দবর্দ্ধন, বামন প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলে এই বৈষম্যটি খুব স্পষ্ট হইয়া যায়। ধ্বন্যালোকের বৃত্তির ভাষ্যে একদিকে যেমন তাঁহার মেধা দার্শনিক তথ্যের সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ করিয়াছে, তেমনি অপর দিকে রচনারীতির নিবিড়তা কখনো-কখনো তথ্যগুলির মধ্যে অস্পষ্টতা আনিয়াছে। কুন্তকের বিষয়েও এই কথাটি খাটে। কিন্তু পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ইঁহাদের বিপরীত ছিলেন। গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর দার্শনিক তথ্যের বিবেচনায় তাঁহার রচনারীতিতে কোথাও অস্পষ্টতা দেখা যায় না। যদি কোথাও দুরূহতা দেখা যায় তাহাও অভিব্যক্তির দুরূহতা নয় ন্যায়ের সূক্ষ্মতাকেই প্রকাশ করে।

পরবর্তী আচার্য

পরবর্তী যুগে অভিনব গুপ্তের মতই প্রায় সর্বমান্য হয়; পরবর্তী সকল আচার্যগণ মূল তত্ত্বটিকে যথাযথ রূপে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল কয়েকজন একাধিক স্থানে অল্প-বিস্তর শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ধনঞ্জয় ও ধনিক রসের স্থিতি সহৃদয়গতই স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে সহৃদয়গত স্থায়ী ভাবই রসত্বকে প্রাপ্ত হয় ঃ

(১) ক্রীডতাং মৃন্ময়ৈর্যদ্বদ্‌বালানাং দ্বিরদাদিভিঃ।
স্বোৎসাহঃ স্বদতে তদ্বচ্ছ্রোতৃণামর্জ্জুনাদিভিঃ॥

দশরূপক ৪।৪১-৪২

—মাটির হাতীর সহিত ক্রীড়ারত বালকদের অনুরূপ, সামাজিক অর্জ্জুনাদির বর্ণনা পড়িয়া বা অভিনয় দেখিয়া স্বীয় উৎসাহাদি স্থায়ী ভাবের আস্বাদন করেন ঃ

(২) বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
আনীয়মানঃ স্বাদ্যত্বং স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ॥ দশরূপক ৪।১

—অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা আস্বাদ্য হইয়া স্থায়ী ভাবই রসে পরিণত হয়।

কিন্তু তিনি ব্যঞ্জনা বৃত্তিকে স্বীকার করেননাই—অতএব তিনি কাব্য অথবা উহাতে বর্ণিত বিভাবাদির সহিত রসের, অভিনবগুপ্তের অনুরূপ ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জক সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া ভট্টনায়কের অনুরূপ ভাব্য-ভাবক সম্বন্ধকেই স্বীকার করিয়াছেন ঃ অতো ন রসাদীনাং কাব্যেন সহ ব্যঙ্গ ব্যঞ্জকভাবঃ, কিং তর্হি ভাব্যভাবকসম্বন্ধঃ। কাব্যং হি

ভাবকং ভাব্যা রসাদয়ঃ। (দশরূপকাবলোকঃ পৃ০ ১৫৮।) পরিণামে, তাঁহার মতানুসারে সংযোগের অর্থ ভাব্য-ভাবক সম্বন্ধ এবং নিষ্পত্তির অর্থ ভাবিত হওয়া বা ভাবিতি—যাহা বাস্তবিক দৃষ্টিতে ভট্টনায়কেরই মত।

মহিমভট্ট রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন ঃ কাব্যস্যাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্বিমতিঃ (ব্যক্তিবিবেক—চৌখম্বা সং০ সী০ পৃ০ ১০৫)। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে সহৃদয়ের মধ্যেই রস বিদ্যমান থাকে। সহৃদয়ই স্থায়ী ভাবের রসরূপে আস্বাদন করেন; কিন্তু এই স্থায়ী ভাবগুলি বাস্তবিক পক্ষে চিত্তে বাসনারূপে বিদ্যমান থাকে না, বরং রঙ্গমঞ্চে নটের দ্বারা প্রদর্শিত স্থায়ী ভাবের প্রতিবিম্বকল্পরূপ হয় ঃ

তৈরেব কারণাদিভিঃ কৃত্রিমৈর্বিভাবাদ্যভিধানৈরসন্ত এব রত্যাদয়ঃ প্রতিবিম্বকল্পাঃ স্থায়িভাবব্যপদেশভাজঃ কবিভিঃ প্রতিপত্তৃপ্রতীতিপথমুপনীয়মানা হৃদয়সংবাদাদাস্বাদ্যত্ব মুপযন্তঃ সন্তো রসা ইত্যুচ্যন্তে।

(ব্য০ বি০ পৃ০ ৩৯)

—ইহার ভাবার্থ এই যে রত্যাদির বাস্তবিক স্থিতি প্রমাতার মধ্যে হয় না, উহা কেবল রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত বা কাব্যে বর্ণিত স্থায়ী ভাবের প্রতিবিম্ব হয়। কবি কৃত্রিম কারণ রূপ বিভাবাদির দ্বারা এইগুলিকে প্রমাতার প্রতীতির বিষয় রূপে উপস্থিত করেন এবং তখন সহৃদয়তার জন্য আস্বাদ্য হইয়া এই (বস্তুতঃ অবিদ্যমান, প্রতিবিম্ব-কল্প) স্থায়ী ভাব সকলই রস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু, ব্যঞ্জনা এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিস্থানীয় নয়, রস অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া যায়; বিভাবাদির অর্থ হইতেছে গমক এবং যেগুলি অবশেষে রসে পরিণত হয় সেই সকল রত্যাদি ভাব হইতেছে গম্য ঃ

ত এব হি লৌকিকা বিভাবাদয়ো হেতুকার্যসহকারিরূপা গমকাঃ। ত এব চ রত্যাদয়োঽবস্থাবিশেষরূপা ভাবা গম্যাঃ।

(ব্য০ বি০ পৃ০ ৬৬)

অতএব মহিমভট্টের মতানুসারে নিষ্পত্তির অর্থ অনুমিতি এবং সংযোগের অর্থ অনুমাপ্য-অনুমাপক সম্বন্ধ। এইরূপ রসের স্বরূপ বিষয়ে মহিমভট্টের মত যেখানে অভিনবগুপ্তের অনুকূল যেখানে প্রক্রিয়ার বিষয়ে তিনি শঙ্কুকের সহিতই একমত।

মম্মট এই সকল তর্কের উত্তরে অভিনব গুপ্তের মতেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাব্যশাস্ত্রের রচনাই মম্মটের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল অতএব তাঁহার দৃষ্টি কাব্যের বিবেচনার উপরই সর্বদা কেন্দ্রীভূত থাকিয়াছে—দর্শনের প্রয়োগও তিনি যথাস্থানে করিয়াছেন কিন্তু কোথাও তিনি অস্পষ্ট ভাবে মত প্রকাশ করেন নাই। পরিণামে তাঁহার গ্রন্থে কোন বিশেষ মৌলিক সিদ্ধান্তের উপস্থাপনা হয় নাই—তিনি নিজের মতানুসারে স্বচ্ছ ভাবে কিন্তু সংক্ষেপে—দার্শনিক জটিলতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া—অভিনব গুপ্তের মতের আলোকে রস-নিষ্পত্তির কেবল আখ্যানমাত্র করিয়াছেন ঃ সংযোগের অর্থ ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ এবং নিষ্পত্তির অর্থ অভিব্যক্তি। মম্মট ও অভিনব গুপ্তের

মধ্যে প্রভেদ শুধু এই যে মম্মট লোল্লট প্রভৃতি পূর্ববর্তী আচার্যদের মতগুলিকেও সহৃদয়গত দৃষ্টির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মম্মটের গ্রন্থ এতই লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে উহা অভিনবগুপ্তের মূল সিদ্ধান্ত-গুলিকেও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল এবং রস-প্রসঙ্গ ক্রমশঃ উহার আধারভূত দর্শন শৈবাদ্বৈত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অন্যদিকে এই সময় ভারতে শাঙ্কর বেদান্তের প্রচার ও প্রসার বাড়িতেছিল এবং ইহার প্রভাব সাহিত্য ও সাহিত্যশাস্ত্রের উপরও পড়িতেছিল। পরিণামে রস-সিদ্ধান্তের উপর শৈবাদ্বৈতের প্রভাব কম ও শাঙ্করা-দ্বৈতের প্রভাব অধিক প্রসার লাভ করিতে লাগিল। এই পরিবর্তনের সংকেত অল্প-বিস্তর বিশ্বনাথেও পাওয়া যায়, যদিও বিশ্বনাথ দার্শনিকের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাহিত্য-রসিকই ছিলেন; কিন্তু চরম পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের বিবেচনায়। তিনি অভিনব গুপ্তের রস-সিদ্ধান্তকে নব্যন্যায়ের দ্বারা পরি-পুষ্ট শাঙ্কর বেদান্তে সর্বথা নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ অভিনব গুপ্তের স্বরেই বলিয়াছেন:

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্॥

—অর্থাৎ সহৃদয় পুরুষের হৃদয়ে বর্তমান, বাসনারূপ, রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবই বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া রস রূপে পরিণতি লাভ করে। (সাহিত্যদর্পণ, বি০ টী০, পৃ০ ৪৬-৪৭)

কিন্তু 'ব্যক্ত' এর তিনি অর্থ করিয়াছেন—"দুধ হইতে দধি প্রভৃতির অনুরূপ অন্য রূপে পরিণত হওয়া। 'ব্যক্ত' পদের অর্থ—দীপকের দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত ঘটের ন্যায় নহে, এইরূপ প্রথম হইতে বিদ্যমান রস ব্যক্ত হয় না।" পৃ০ ৪৭। অভিপ্রায় এই যে নিষ্পত্তির বাস্তবিক অর্থ বিশ্বনাথের অনুসারে পরিণতিই যদিও ব্যক্তি বা অভিব্যক্তি শব্দের প্রয়োগ তিনি সকল সময়েই করিয়াছেন এবং অভিনব গুপ্তের উদ্ধরণের দ্বারাই নিজের মন্তব্যটিকে পুষ্ট করিয়াছেন: তদুক্তং লোচনকারৈঃ 'রসাঃ প্রতীয়ন্ত ইতি ত্বোদনং পচতীতিবদ্ ব্যবহারঃ।' ইতি।

—অর্থাৎ এই কথাই অভিনব গুপ্ত লোচনে বলিয়াছেন; রস প্রতীত হয়, যেমন পাক করিলে চাউল রূপান্তরিত হইয়া ভাত রূপে ব্যবহৃত হয়।

(সা০ দ০, বি০ টী০, পৃ০ ৪৭)

ইহার পরে বিশ্বনাথ রসের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন:

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদর॥
লোকোত্তরচমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎপ্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥

(সা০ দ০, বি০ টী০, পৃ০ ৪৮-৪৯)

—এই রসের, যাহা অখণ্ড, স্বপ্রকাশরূপ, আনন্দময়, চিন্ময়, অন্য জ্ঞানের স্পর্শ হইতে শূন্য এবং ব্রহ্মাস্বাদের অত্যন্ত সমকক্ষ এবং লোকোত্তর চমৎকার প্রাণ, কেউ (পুণ্যবান্) বাসনাখ্য সংস্কারের দ্বারা যুক্ত সহৃদয় ব্যক্তি নিজের স্বরূপের অনুরূপ, অভিন্নতঃ, আস্বাদন করেন।

বলা বাহুল্য ইহা মূলতঃ ভট্টনায়কেরই কথা—

সত্ত্বোদ্রেকস্ব প্রকাশানন্দময়ঃ··পরব্রহ্মাস্বাদসবিধেন ভোগেন পরং ভুজ্যত ইতি, ইহাতে অভিনব গুপ্তের সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধন 'সত্ত্বোদ্রেক' এর ব্যাখ্যায় এবং 'স্বাকারবৎ' এবং 'অভিন্নত্বেন' পদের প্রয়োগে নিহিত। ভট্টনায়ক যেখানে রসের স্থিতিতে রজোগুণ ও তমোগুণের অনুবন্ধও স্বীকার করিয়াছেন, সেখানে বিশ্বনাথ 'রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ'-কে অনিবার্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ রসের আস্বাদন আত্মার নিজরূপের আস্বাদন হইতে অভিন্ন— অর্থাৎ রসাস্বাদ আত্মাস্বাদেরই প্রতিরূপ। অতএব এই দুইটি সংশোধন অভিনব গুপ্তের মতানুসারেই হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর একটি স্পষ্ট প্রভেদ,—বিশ্বনাথের মতানুসারে চমৎকারের অর্থ 'বিস্ময়'। এই অর্থটি অনধিকৃত ও পূর্বাগ্রহের পরিণাম মাত্র। বিশ্বনাথ অভিনবগুপ্তের শৈবসিদ্ধান্তের পারিভাষিক শব্দ সমষ্টির উল্লেখও করেন নাই (বোধ হয় এই শব্দ সমষ্টির সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্ত এই কথাই বলিয়াছেন) এবং সামান্য বৈদান্তিক শব্দ সমষ্টির প্রয়োগ করিয়াছেন।

রস-প্রসঙ্গে সর্বশেষ প্রসিদ্ধ নাম পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের। পণ্ডিতরাজের রস-গঙ্গাধরের প্রথম আননে রস-বিষয়ক এগারোটি মতের উল্লেখ এবং বিবেচনা আছে। অভিনব গুপ্তের মতের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল ইহা তাঁহার বিবেচনায় স্পষ্ট। অভিনব গুপ্তের রস সিদ্ধান্ত অদ্বৈতের উপর আশ্রিত, কিন্তু ইহা প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে প্রতিপাদিত শৈবাদ্বৈত। আত্মতত্ত্বের সহিত উহার আভাসরূপ প্রকৃতিকেও ইহা সত্য এবং আনন্দময় বলিয়া স্বীকার করে। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অভিনবের অদ্বৈত এবং উহার পরিণামী আনন্দ-সিদ্ধান্তকে যথাবৎ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উহার উপর শাঙ্কর বেদান্তের প্রলেপ চড়াইয়া দিয়াছেন। এই পার্থক্য বিচার তিনিই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

ইত্থং চাভিনবগুপ্ত মম্মটভট্টাদিগ্রন্থস্বারস্যেন ভগ্নাবরণচিদ্বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস ইতি স্থিতম্। ' বস্তু তস্তু বক্ষ্যমানশ্রুতিস্বারস্যেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।

—অর্থাৎ ইহাতে স্থির হইল যে অভিনব গুপ্ত মম্মট প্রভৃতির গ্রন্থের স্বারস্য অর্থাৎ স্বাভাবিক তাৎপর্য অনুসারে ভগ্নাবরণ চৈতন্যের দ্বারা বিশিষ্ট স্থায়ী ভাবই রস। বস্তুতঃ 'রসো বৈ সঃ' তিনিই রসস্বরূপ ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব দ্বারা অবচ্ছিন্ন ভগ্নাবরণ চৈতন্যেই রস। (রসগঙ্গাধর প্রথম আনন পৃ০ ৮৮)

রসের স্বরূপের বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। উভয়

মতে রসের নিত্যতা এবং স্বপ্রকাশ্যতা সিদ্ধ হয়। প্রভেদ কেবল এই যে অভিনব-গুপ্তের মতে চৈতন্য বিশেষণ এবং স্থায়ী ভাব বিশেষ্য। অপর দিকে পণ্ডিতরাজের মতে স্থায়ী ভাব বিশেষণ এবং চৈতন্য বিশেষ্য। এবং ইহাই শৈবাদ্বৈত ও শাঙ্করাদ্বৈতের মধ্যে প্রভেদ। শৈবাদ্বৈতে প্রকৃতির অংশ রত্যাদি স্থায়ী ভাবের মধ্যেও চৈতন্যের প্রতিভাস থাকার জন্য উহাতে আনন্দের স্থিতি স্বীকার্য; কিন্তু শুদ্ধ (শাঙ্কর) অদ্বৈত সিদ্ধান্তে কেবল চৈতন্যকেই আনন্দরূপ স্বীকার করা হয়। এইরূপ, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অভিনবগুপ্তের মতকে তত্ত্বরূপে স্বীকার করিলেও নিজের বিবেচনায় বেদান্তের অনুসারে উহাতে সংশোধন করিয়াছেন।

অভিনব গুপ্তের মত ভিন্ন আরও দুইটি মত বিদ্যমান আছে—'নব্যমত', যাহার প্রতি পণ্ডিতরাজের আস্থা স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। যদিও তিনি কোন স্থানে এইরূপ সংকেত দেন নাই তবুও যেরূপ আগ্রহের সহিত তিনি ইহার সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে এই নবীন মতগুলি—বিশেষ করিয়া প্রথম মতটি পণ্ডিতরাজের নিজেরই মত। এই মতটি এইরূপ:

কাব্যে নট্যে চ, কবিনা নটেন চ প্রকাশিতেষু বিভাবাদিষু, ব্যঞ্জনব্যাপারেণ দুষ্মন্তাদৌ শকুন্তলাদিরতৌ গৃহীতায়ামনন্তরং চ সহৃদয়তোল্লাসিতস্য ভাবনাবিশেষরূপস্য দোষস্য মহিম্না, কল্পিতদুষ্মন্তত্বাবচ্ছাদিতে স্বাত্মন্য জ্ঞানাবচ্ছিন্নে শুক্তিকাশকল ইব রজতখণ্ডঃ সমুৎপদ্যমানোঽনির্বচনীয়ঃ সাক্ষিভাস্যশকুন্তলাদি বিষয়করত্যাদিরেব রসঃ।

—অর্থাৎ কাব্যস্থলে কবিকর্তৃক এবং নাট্যস্থলে নটকর্তৃক বিভাবাদি প্রকাশিত হইলে ব্যঞ্জনাব্যাপার দ্বারা দুষ্মন্ত প্রভৃতিতে শকুন্তলাদিবিষয়ক রতি গৃহীত হয়। অনন্তর সহৃদয়তাজনিত ভাবনাবিশেষরূপ দোষের প্রভাবে (সামাজিকের) নিজস্বরূপ দুষ্মন্তত্বের দ্বারা অর্থাৎ দুষ্মন্তের স্বরূপ দ্বারা অবচ্ছাদিত হইলে. (অর্থাৎ সামাজিক স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া দুষ্মন্তরূপে নিজেকে জ্ঞান করিলে) অজ্ঞান দ্বারা অবচ্ছিন্ন স্বস্বরূপে শুক্তিকাখণ্ডে রজতোৎপত্তির ন্যায় অনির্বচনীয় শকুন্তলাবিষয়ক রতি সাক্ষীভাস্য হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। (রসগঙ্গাধর, পৃ০ ১০১-১০২)

সারাংশ এই যে—

(১) স্থায়ী ভাবই রস রূপে আস্বাদিত হয়।

(২) ব্যঞ্জনা ব্যাপারেরই সাহায্যে সহৃদয়ের বিভাবাদির দ্বারা স্থায়ী ভাবের অবগতি হয়।

এই দুইটি তথ্য অভিনব গুপ্তের মতেরই অনুকূল।

(৩) এক দিকে কাব্যের নিজস্ব গুণ ও অপর দিকে স্বীয় হৃদয়ের গুণের জন্য প্রমাতার চিত্তে একটি বিশেষ ভাবনা-রূপ দোষের আবির্ভাব হয় যাহার প্রভাব স্বরূপ তাহার আত্মা কল্পিত দুষ্মন্তত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ আশ্রয়ের সহিত তাহার তাদাত্ম্য হইয়া যায়। এখানে দুইটি নবীন তথ্য স্পষ্ট হইয়াছে—(ক) ভাবনা-রূপ দোষের কল্পনা এবং (খ) আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্যের কল্পনা।

(ক) নব্যন্যায়ের দ্বারা পুষ্ট বেদান্তেই ভাবনা রূপ দোষের কল্পনার মূল ভিত্তিরূপ। বস্তুতঃ নিজেকে দুষ্মন্তরূপে চিন্তা করাটা যথার্থ চিন্তা নয়, সেইজন্য ইহাকে দোষ বলা হইয়াছে। এই বিচারধারাটি প্রকৃতপক্ষে আধুনিক আলোচনাশাস্ত্রের 'সমানুভূতির' (Empathy) সমতুল্য যাহাতে কল্পনা ও অনুভূতি উভয়েরেই সংযোগ বিদ্যমান। ইহাকে কেবল কল্পনা বলা পর্যাপ্ত হইবে না কারণ ইহার আধার ভাব। মনো-বিজ্ঞানের অনুসরণে ইহাই যথার্থ, ভ্রম নয়। কিন্তু মায়াবাদী শাঙ্কর বেদান্ত কেবল আত্মানুভূতিকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করে—বস্তুতঃ আত্মনই সত্য, অনুভূতিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। এই মত অনুসারে যখন প্রত্যক্ষ জাগতিক অনুভূতিও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভ্রম তখন কল্পিত রত্যাদির অনুভূতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না অর্থাৎ উহাও ভ্রম। এই নব্য মতানুসারে কাব্যের অনুভব কল্পিত ভাবের অনুভব যাহা বিদ্যমান না থাকার জন্য অসৎ এবং অনুভূয়মান হওয়ার জন্য সৎ বলিয়া ধরা হয়—ফলে ইহা অনির্বচনীয় এবং স্বপ্রামাণ্যের দ্বারা সুখময় প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক অনুভূতি এবং কাব্যানুভূতি উভয়ই, এই দর্শন অনুসারে, অজ্ঞানরূপ। ভেদ কেবল মাত্রার কারণ কাব্যানুভূতিতে অজ্ঞানের আবরণ অংশতঃ ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে দর্শন সকল বিদ্যার ভিত্তিস্থানীয় এবং দর্শনের মধ্যে শাঙ্কর বেদান্ত সর্বাধিক সূক্ষ্ম-গভীর এবং বুদ্ধি-সম্মত। কিন্তু কেবল বুদ্ধির আশ্রয় লইলে সাহিত্য এবং সাহিত্যশাস্ত্রের যে কি দুর্গতি হইতে পারে তাহার প্রমাণ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের অনুরূপ রসজ্ঞ ভক্তির এই 'দার্শনিক রস-আলোচনায়' পাওয়া যায়, অন্ততঃ পক্ষে তাহাতে সহৃদয় সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

উল্লিখিত ব্যাখ্যাদ্বয়ের অনুসারে নিষ্পত্তির দুইটি অর্থ স্পষ্ট হয়। প্রথম অর্থটি অভিনব গুপ্ত অথবা মম্মটের দ্বারা প্রতিপাদিত। এই মতের অনুসারে নিষ্পত্তি অভি-ব্যক্তি বা ব্যক্তি। ব্যক্তির অর্থ পণ্ডিতরাজ লিখিয়াছেন, ব্যঞ্জনা নয়; ব্যক্তির অর্থ আবরণ হইতে মুক্ত চৈতন্যের প্রকাশঃ ব্যক্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিৎ, (পৃঃ ৮৩)। যখন স্থায়ী ভাব এই শুদ্ধ চৈতন্যের বিষয় হইয়া যায় তখন রস নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ নিষ্পত্তির অর্থ আবরণ মুক্ত শুদ্ধ চৈতন্যের বিষয় হওয়া। আরও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে যে পণ্ডিতরাজের বৈদান্তিক মন্তব্যানুসারে নিষ্পত্তির অর্থ 'ভাবের মাধ্যমে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ।' বলা বাহুল্য যে এই অর্থ সামান্য কাব্যশাস্ত্রীয় অর্থ হইতে ভিন্ন, শুদ্ধ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নবীন মতে রস-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার দুইটি অঙ্গ বর্তমানঃ প্রথম, ব্যঞ্জনা ব্যাপারের সাহায্যে বিভাবাদির দ্বারা আলম্বনের প্রতি আশ্রয়ের স্থায়ী ভাবের জ্ঞান উদিত হওয়া "দুষ্মন্তঃ শকুন্তলাবিষয়করতিমান্ অর্থাৎ দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহিত প্রেম করিতেন" এবং দ্বিতীয়, ভাবনা-দোষের উদয়ের ফলে কল্পিত দুষ্মন্তত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত সহৃদয়ের আত্মার, যে আত্মা কাব্যগুণ প্রভৃতির জন্য অংশতঃ আবরণমুক্ত হইয়া যায়, শকুন্তলা বিষয়ক রতির আস্বাদন লাভ। এইরূপ ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রথমে আশ্রয়গত স্থায়ী ভাব প্রকট হয় এবং পরে তদাত্মভূত সহৃদয়ের

আত্মার দ্বারা আস্বাদিত হইয়া রস রূপে পরিণতি লাভ করে। এই স্থানেও নিষ্পত্তির মৌলিক অর্থে কোন প্রভেদ নাই—ইহা ব্যক্তিরই বাচক যাহার অর্থ চিৎ শক্তির বিষয় হওয়া। কেবল প্রক্রিয়ায় দার্শনিক ব্যাখ্যাতেই প্রভেদ দেখা যায়।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের পরবর্তী কালে মৌলিক চিন্তাধারা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। উত্তর ভারতে রস-বিশ্লেষণের ধারা হিন্দী রীতি-আচার্যদের উপর আসিয়া পড়ে যাহার ফলে অনেক শতাব্দী পর্যান্ত মূলের অপেক্ষা শাখা-প্রশাখারই বর্ণনা ও আলোচনা চলিতে থাকে। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমের ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদই হইতে থাকে যদিও ইহার সংখ্যা খুবই কম। আধুনিক যুগে বিশেষ করিয়া বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় চরণে অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মারাঠী ও বিশেষ করিয়া হিন্দীতে শাস্ত্রীয় পরম্পরার পুনরুত্থান হইয়াছে। প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিস্তৃত ভাবে আখ্যান ও পুনরাখ্যান হইয়াছে এবং রস-সিদ্ধান্তের বিভিন্ন দিকের, যেমন রস-স্বরূপ, রস-নিষ্পত্তি প্রভৃতির প্রাচীন ও নবীন জ্ঞানের আলোকে গভীর বিচার-বিনিময় হইয়াছে ও হইতেছে।

রস-নিষ্পত্তির সার-চিত্র

(১) পরম্পরাগত

আচার্য	ভিত্তিস্থানীয় দর্শন	নিষ্পত্তির অর্থ	সংযোগের অর্থ
ভট্টলোল্লট	মীমাংসা	উৎপত্তি	উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধ
শ্রীশঙ্কুক	ন্যায়	অনুমতি	অনুমাপ্য-অনুমাপক ,,
ভট্টনায়ক	সাংখ্য	ভুক্তি	ভোজ্য-ভোজক ,,
অভিনব গুপ্ত	বেদান্ত	অভিব্যক্তি	ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জক ,,

(২) সংশোধিত

ভট্টলোল্লট		উপচিতি	উপচয়-উপচায়ক ,,
শ্রীশঙ্কুক	ন্যায় (বৌদ্ধ)	অনুকৃতি	অনুকার্য-অনুকারক ,,
		সহৃদয়ের দৃষ্টিতে অনুমিতি	অনুমাপ্য-অনুমাপক ,,
ভট্টনায়ক	শৈব-দ্বৈতবাদ, মীমাংসা	ভাবিতি	ভাব্য-ভাবক ,,
অভিনব গুপ্ত	শৈবাদ্বৈতবাদ	অভিব্যক্তি	ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জক ,,

■ ■ ■

(খ) রসের স্থান

নিষ্পত্তির আলোচনার অঙ্গ হিসাবে রসের স্থান নির্ণয়ের কথা ওঠে এবং প্রত্যেক আচার্যের মতের ব্যাখ্যার অন্তর্গত এই প্রসঙ্গের উল্লেখও যথাস্থানে করা হইয়াছে, তবুও পৃথক্ আলোচনার দ্বারা বোধ হয় ইহার স্থিতি আরও স্পষ্ট হইতে পারিবে।

ভরতের মতানুসারে রসের স্থান নাট্যে। রঙ্গমঞ্চে যখন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর সহিত স্থায়ী সম্বন্ধযুক্ত হয়—অথবা বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা সংযুক্ত স্থায়ী ভাবের সফল প্রদর্শন বা উপস্থাপন হয় তখন রসের সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ ভরতের মতানুযায়ী রস নাট্য-উপকরণের দ্বারা রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত একটি ভাবমূলক কলাত্মক স্থিতি বিশেষ। ইহার অর্থ,—রসের সত্তা বিষয়গত এবং উহার স্থান নাট্যে—স্পষ্ট ভাষায় রঙ্গমঞ্চে যেখানে ইহা ঘটিত হয়। রস আস্বাদ্য, আস্বাদ নয়। উহার স্থান সহৃদয়ের চিত্তে নয়, সে উহার আস্বাদ করিয়া হর্ষাদির অনুভব করে। অতএব ভরতের মতে রসের স্থান নাট্য বা রঙ্গমঞ্চে এবং তজ্জন্য হর্ষাদির স্থান সহৃদয়ের চিত্তে।

ভরতের পরবর্তী সংস্কৃত আচার্যদের দৃষ্টি নাট্য হইতে সরিয়া কাব্যে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। অলঙ্কারবাদীরা রসের অন্তর্ভাব অলঙ্কারের মধ্যে করিলেন কিন্তু রসের পরিভাষা একই থাকিয়া গেল—অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের দ্বারা পুষ্ট স্থায়ী ভাবকেই রসরূপে গ্রহণ করা হইল যদিও উহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা আর অবশিষ্ট থাকিল না, উহা রসবদ্ অলঙ্কারের পোষক তত্ত্ব রূপে স্বীকৃতি লাভ করিল। রসবদ্ অলঙ্কারের অর্থ সেই অলঙ্কার যাহা রসের সহিত যুক্ত। এই মতানুসারে রসের স্থিতি অলঙ্কারে এবং এই অলঙ্কার মূলতঃ শব্দ-অর্থেরই ধর্ম। অতএব রসের স্থিতি শব্দ-অর্থের মধ্যেই প্রসার লাভ করিল এবং অলঙ্কারবাদীগণের মতে এই শব্দ-অর্থই কাব্য: শব্দার্থৌ কাব্যম্ বলিয়া গৃহীত হইল। এইরূপ ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি অলঙ্কারবাদীদের মতানুসারে কাব্যেই রসের স্থান প্রমাণিত হয়। সহৃদয় এই রসের আস্বাদন করিয়া প্রীতি বা আনন্দ লাভ করে: প্রীতিং করোতি কীর্তিচ। অর্থাৎ রসের স্থান কাব্যে এবং প্রীতির (আনন্দ) স্থান সহৃদয়ের চিত্তে।

অপর দিকে রসবাদী ধারাও নিরন্তর প্রবাহিত ছিল এবং লোল্লট, শঙ্কুক প্রভৃতি বিদ্বানগণ ভরতের সিদ্ধান্তের বিকাশ করিতেছিলেন। লোল্লট অনুকার্যে রসের স্থান

স্বীকার করিলেন। এই অনুকার্য্যের বাস্তবিক অর্থ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সন্দেহ হইতে পারে, তবুও পূর্বাপর-প্রসঙ্গ প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিলে পরে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে অনুকার্য্য বলিতে লোল্লটের অভিপ্রায় কবি-নিবদ্ধ পাত্র ছিল না বরং মূল পাত্র ছিল। তাঁহার মত এই যে রসের আস্বাদয়িতা রামাদি মূল পাত্রই, গৌণরূপ নটও নিজের মধ্যে রামাদির 'অভিমান' করিয়া উহার আস্বাদন করেন। সহৃদয় এই রসের অনুভূতি করেন না—ইহার দ্বারা চমৎকৃত হন—অর্থাৎ এইরূপ রসাত্মক স্থিতির সাক্ষাৎকার করিয়া চমৎকারিতার অনুভব করেন। অতএব রসের বাস্তবিক স্থান মূল (ঐতিহাসিক) পাত্রের চিত্তে (বর্তমান বা বর্তমানস্থিল) এবং গৌণরূপে, আরোপিত হইয়া, নটের চিত্তে এবং তজ্জন্য চমৎকার অর্থাৎ কলাত্মক প্রতীতির স্থান সহৃদয়ের চিত্তে।

শ্রী শঙ্কুক ভট্টলোল্লটের এই অকার্যকর সিদ্ধান্তটির খণ্ডন করিয়াছেন। রামাদি মূল পাত্রের যখন অস্তিত্বই থাকিল না তখন উহাদের দ্বারা অনুভূত রসের সত্তা কিরূপ-ভাবে বর্তমান যুগেও বিদ্যমান থাকিতে পারে? অতএব মূল পাত্রের চিত্তে রসের স্থান—এই কল্পনা অমূলক। শঙ্কুকের মতে অনুকৃত স্থায়ীভাবই রস: যখন নট নিজের কৌশল ও অভ্যাসের দ্বারা স্থায়ী ভাবের অনুকরণে সফল হন, অর্থাৎ নটের অভিনয় দেখিয়া সহৃদয় অনুকার্য স্থায়ী ভাবের অনুমান করিতে সমর্থ হন তখন রস নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ নট স্থায়ী ভাবের অনুকর্তা এবং রসের কর্তা, আস্বাদয়িতা বা অনুভব-কর্তা নয়। অতএব রসের স্থান নটে—কিন্তু নটের চিত্তে নয়; নটের কার্য্যে অর্থাৎ অভিনয়তেই রসের অবস্থান। এইরূপে শঙ্কুক লোল্লটকে সরাইয়া পুনরায় ভরতের নিকটে রসধারাকে লইয়া আসেন কারণ ভরতও রসের স্থান প্রকারান্তরে নাট্যেই স্বীকার করিয়াছেন। ভরত ও শঙ্কুকের মধ্যে প্রভেদ আপেক্ষিক গুরুত্বের। শঙ্কুকের বিচারে অভিনয়ের গুরুত্ব অধিক, অপরদিকে ভরত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকেই অর্থাৎ কবি-কর্ম ও নট-কর্ম, উভয়ের সমন্বিত প্রক্রিয়াকেই রসের ভিত্তিরূপে স্বীকার করিয়া অভিনয়কে উহার কেবল একটি অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সহৃদয় নিজের ভাবাত্মক সংস্কার এবং নটের কার্যকলার দ্বারা রসের অনুমান করেন। রস এখানেও আস্বাদ্য এবং বিষয়গতই, কিন্তু 'অনুমান' শব্দের দ্বারা এই অর্থই প্রকট হয় যে সহৃদয় রসের কেবল পদার্থরূপে ভোগ করেন না অর্থাৎ অনুমানের বিষয় হওয়ার জন্য রসের সত্তা বিষয়িগতরূপে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। সার কথা এই যে শ্রীশঙ্কুকের মতানুসারে রসের স্থান নটে বা নটের অভিনয়ে। সহৃদয়ের চিত্তে রসের অনুমান ও তজ্জন্য প্রতিক্রিয়ার—রাগাত্মক এবং কলাত্মক প্রতীতিরই স্থান।

ভট্টনায়ক বলেন,—সাধারণীকৃত বিভাবাদির দ্বারা ভাবিত হইয়া সহৃদয়ের স্থায়ীভাবই রসরূপে পরিণত হয়। ইহার স্পষ্ট অর্থ,—রসের স্থান সহৃদয়ের চিত্তেই। কিন্তু, ভট্টনায়ক রস ও রসের ভোগের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে ভট্টনায়ক নিষ্পত্তির অর্থ ধরিয়াছেন, ভুক্তি কিন্তু এই ধারণা অশুদ্ধ। কাব্যের ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হইতে মুক্ত

হইয়া সহৃদয়ের চিত্তে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায় এবং সত্ত্বগুণ প্রাধান্য লাভ করে: এরূপ পরিস্থিতিতে উহার স্থায়ী ভাব সামান্য ইন্দ্রিয় বিকার হইতে মুক্ত হইয়া রসে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার পরিণাম আনন্দময়ী আত্মবিশ্রান্তি, যাহাকে ভট্টনায়ক কাব্যের ভোজকত্ব শক্তির দ্বারা সিদ্ধ 'ভোগ' বলিয়াছেন। এইরূপ এইমতে রসের স্থান সহৃদয়ের চিত্তে এবং যদি সূক্ষ্ম ভেদ করাও হয় তাহা হইলে সহৃদয়ের চিত্তেই রস-ভোগ বা রসাস্বাদের স্থান।

অবশেষে অভিনব গুপ্তের মত। তাঁহার মতে, রস আস্বাদ্য না হইয়া আস্বাদ-রূপ হয়: কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উহাকে আস্বাদ্য বলা হয়। এখানে রসের অর্থ আত্মানন্দ—শুদ্ধ আত্মানন্দ নয়, রত্যাদির দ্বারা বিশিষ্ট অর্থাৎ সোপাধিক আত্মানন্দ এবং উহার স্থান নিশ্চিতই সহৃদয়ের চিৎ বা আত্মায়। ভরতের প্রতি অভিনব গুপ্তের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল—বিরোধী মতের খণ্ডনের জন্য নানা কথা বলিবার পরে তিনি চূড়ান্তভাবে বলেন যে অমুক সিদ্ধান্তটি মুনির মতের বিরুদ্ধ হওয়ার জন্য স্বতঃ অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু, আমরা দেখি যে তিনি ভরতের মতের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনিয়াছেন। এই বৈষম্যের উত্তর এই যে ভরতের রস-বিবেচনা ব্যবহারিক ছিল এবং অভিনব গুপ্তের তাত্ত্বিক। ব্যবহারগত তথ্য বা পদার্থের আখ্যান অদ্বৈতদর্শনে ঠিক সেরূপ হইয়াছে, যেরূপে অভিনবগুপ্ত ভরতের মতের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। অতএব ভরতের প্রতি শ্রদ্ধার ব্যাপারে অভিনবগুপ্তকে সন্দেহ করা ব্যর্থ—তিনি ভরতের মতের বিরোধিতা না করিয়া কেবল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান করিয়াছেন। বেদান্তী পণ্ডিতরাজ আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। যেহেতু শঙ্কর-বেদান্তে বিষয়ের সত্তা সর্বথা অগ্রাহ্য সেইজন্য তিনি 'ভগ্নাবরণচিদ্বিশিষ্টো রত্যাদিঃ—অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ আবরণ হইতে মুক্ত শুদ্ধ চৈতন্যের বিষয়গত রত্যাদি স্থায়ী ভাবই রস—ইহাও স্বীকার করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আনন্দের সমরূপ রস তত্ত্বতঃ স্থায়িভাব-রূপ হইতে পারে না, তাহা কেবল শুদ্ধ আত্ম-রূপই হয়। এই বিচারানুযায়ী তিনি অভিনব গুপ্তের মতের সংশোধন করিয়াছেন—রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ—অর্থাৎ রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব হইতে বিশিষ্ট আবরণমুক্ত শুদ্ধ চৈতন্যই রস।[১] শ্রুতির প্রমাণ 'রসো বৈ সঃ'-এর সিদ্ধি এইরূপ হইতে পারে, অন্যথা নয়।

ভারতীয় রস-শাস্ত্রের এই বিবেচনা নিশ্চিতরূপে খুবই সারগর্ভ এবং তত্ত্বের দিক দিয়া বোধ হয় সর্বাঙ্গপূর্ণও। কিন্তু, দর্শনের সূক্ষ্ম প্রতিপত্তির অর্থ না বুঝিতে পারিয়া আধুনিক কাব্যমর্মজ্ঞ বা কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলনকারীদের নিকট এই সবকিছুই দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। উল্লিখিত বিবেচনানুসারে, বর্তমান আলোচনাশাস্ত্রের শব্দাবলীতে, ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের রসবিষয়ক ধারণাগুলির সারাংশ নিম্নরূপ,—

১. হিন্দী রস গঙ্গাধর, পৃঃ ৮৮

আচার্য	রসের স্বরূপ	রসের স্থান	সহৃদয়ের অনুভব
ভরত	নাট্যকলাগত ভাব-সৌন্দর্য্য	নাট্যে	হর্ষ, বিস্ময় প্রভৃতি
দণ্ডী প্রভৃতি অলঙ্কারবাদী	কাব্যকলাগত ভাব-সৌন্দর্য্য	কাব্যে (শব্দ-অর্থ)	প্রীতি (আহ্লাদ)
লোল্লট	মূলপাত্রের ভাবাস্বাদ—অর্থাৎ কাব্যবস্তুগত ভাব-সৌন্দর্য্য	মূলপাত্রে = কাব্য-বস্তুতে	চমৎকারিত্ব
শঙ্কুক	অভিনয়গত ভাব-সৌন্দর্য্য	নটে = অভিনয়ে	রসের অনুমান ও তজ্জন্য রাগাত্মক-কলাত্মক প্রতীতি সকল
ভট্টনায়ক	(সহৃদয়ের দ্বারা) ভাব-সৌন্দর্যের অনুভূতি	সহৃদয়ের চিত্তে	রস ও রসের ভোগ = রসজন্য আনন্দ
অভিনব গুপ্ত	(সহৃদয়ের দ্বারা) ভাব-সৌন্দর্য্যের আনন্দ	সহৃদয়ের চিত্তে	রস = আনন্দ

কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি কি ? রসের সত্তা কি একান্তরূপে বিষয়ীগত—কাব্যে উহার স্থিতি কি কোন মতেই স্বীকার্য নয় ?

দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দাবলীর উল্লেখ না করিয়া, সামান্য শব্দাবলীর সাহায্যে আমরা বলিতে পারি যে শব্দার্থের মাধ্যমে ভাবের কলাত্মক অভিব্যক্তি কাব্য এবং উহার আনন্দময় আস্বাদ রস, অর্থাৎ শব্দার্থের মাধ্যমে অভিব্যক্ত ভাবের আনন্দময় আস্বাদের নাম রস। ইহা নিশ্চিত যে এই আস্বাদ বিষয়গত না হইয়া বিষয়ীগত হয় কারণ ইহা তো আস্বাদয়িতারই অনুভূতি। কিন্তু সমস্যাটি এরূপ সরল নয়। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে 'রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য' অথবা 'রসই কাব্যের সার'—রসবাদিদের এই সকল অত্যন্ত প্রচলিত সূত্রের কি

অর্থ হইবে ? তাহা হইলে কি কাব্যের মূলতত্ত্বের স্থিতি কাব্যের কলেবর শব্দার্থ হইতে ভিন্ন সহৃদয়ের চিত্তে বা চৈতন্যে স্বীকার করিতে হইবে ? বস্তুবাদীদের দৃষ্টিতে রস পদার্থ-বিশেষ যাহা কাব্যের শরীরে—শব্দার্থে—সার বা আত্মারূপে বিদ্যমান থাকে। অদ্বৈত-বাদী বা ব্যক্তিবাদীর দৃষ্টিতে ইহা রস শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ মাত্র—ইহার বাস্তবিক অর্থ এই যে রস কাব্যের সেই গুণ বা শক্তি যাহা সহৃদয়ের আস্বাদের, নিমিত্ত রূপ। রসময় বাক্যের অর্থ হইতেছে, শব্দার্থের এইরূপ প্রয়োগ যাহা সহৃদয়ের চিত্তকে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত করিয়া রত্যাদি স্থায়ী ভাবের মাধ্যমে আত্মানন্দ প্রদান করে—আধুনিক শব্দাবলীতে ইহার অর্থ শব্দার্থের এরূপ প্রয়োগ যাহা সহৃদয়কে রাগাত্মক-কলাত্মক আনন্দ প্রদান করে। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী বা ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিতে রস পদার্থ নয়, আস্বাদই এবং কাব্যগত রস বলিতে কোন পদার্থ বিশেষ বুঝায় না বরং এমন গুণ বিশেষকে রস বলা হয় যাহা সহৃদয়ের আস্বাদের নিমিত্ত রূপ। কিন্তু, এই কথাগুলি বলিলেও বিশ্লেষণ পূর্ণ হয় না। এখন প্রশ্ন ওঠে যে শব্দার্থে এই গুণ বা শক্তি কোথা হইতে আসে ? কারণ শব্দার্থ তো কেবল প্রতীক মাত্র—উহাতে কেবল ব্যঞ্জনারই শক্তি বিদ্যমান থাকে। প্রমাতার চিত্তে ভাব ও আহ্লাদ জাগাইবার শক্তি ভাব মাত্রেই থাকিতে পারে এবং এই ভাব কবির, যিনি শব্দার্থকে কাজে লাগান। এইজন্য রসের আস্বাদনে কেবল সহৃদয়ের ভাবুকতাই প্রমাণ নয়, কবির ভাবুকতারও ঠিক সেইরূপ মূল্য আছে। কেবল প্রমাতার সহৃদয়তাকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া লইলে কাব্যের মূল্যাঙ্কনই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। 'যশোধরা'[১] 'ভারত ভারতী'[২] হইতে অধিক সরস—ইহার অর্থ যদি এই ভাবে গ্রহণ করা হয় যে 'ভারত ভারতী'র অপেক্ষা 'যশোধরা'র দ্বারা সহৃদয়ের চিত্ত অধিক চমৎকৃত হয় তাহা হইলে এই প্রশ্নও উঠিতে পারে যে ইহার কারণ কি ? 'সহৃদয়ের চিত্ত অধিক চমৎকৃত হয়' এই ঘটনাটি অকারণ হয় না এবং ইহার কারণ 'যশোধরা'র মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। অলংকার-বাদীরা বলিতে পারেন যে 'যশোধরা'য় শব্দার্থের প্রয়োগ 'ভারত ভারতীর' অপেক্ষা অধিক বক্রতাযুক্ত এবং সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু রসবাদীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। তাঁহাকে ইহা বলিতেই হইবে যে যশোধরার শব্দার্থে ভাব-ব্যঞ্জনার শক্তি অধিক বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই শক্তির ভিত্তি কি ? ইহার ভিত্তি নিশ্চিতই কবি। ভরত এই তথ্যের সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তের সর্বাধিক সমর্থ প্রবক্তা অভিনব গুপ্তেরও এই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান ছিল যে কাব্যগত ভাবের মূলাধার কবির অন্তর্গত ভাব—কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে ॥ (না০ শা০ ৩।২)। কবির অন্তর্গত ভাব বলিতে কবিগত রসই বুঝায় যাহা কাব্যরসের মূল ভিত্তিরূপ—তদেবং মূলবীজস্থানীয়ঃ কবিগতো রসঃ (হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃ০ ৫১৫) এবং ইহার বিশ্লেষণ করিলে রসের স্থিতির সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়।

১, ২, মৈথিলীশরণ গুপ্ত দ্বারা রচিত দুইটি কাব্যগ্রন্থ

"কাব্যের আস্বাদন ব্যাপারে মূলতঃ তিনটি সত্তার উল্লেখ হয়—কবি, বস্তু ও সহৃদয়। আধুনিক আলোচনার ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে কবি সেই ব্যক্তি যে নিজের অনুভূতিকে অনুভবযোগ্য করেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বস্তু উহার অনুভূতি এবং সহৃদয় সেই ব্যক্তি যে কবির এই সংবেদ্য অনুভূতিকে গ্রহণ করেন। বস্তুকে আমি তত্ত্ব-রূপে কবির অনুভূতি বলিয়াছি যাহার সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্রে তো, যেমনকি বস্তু শব্দের দ্বারাই স্পষ্ট, উহাকে কবির অনুভূতি হইতে পৃথক সত্তা রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। বর্তমান যুগেও প্রশ্ন উঠিতে পারে—যে ঐতিহাসিক বৃত্ত বা লোক প্রচলিত গল্প বা ঘটনা, যাহার ব্যবহার কবি কাব্যে মূল সামগ্রী রূপে করেন, তাহাকে কবির অনুভূতি কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে সেই ঐতিহাসিক বৃত্ত বা লোক-প্রচলিত গল্প বা ঘটনার বর্ণনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয় বরং উহার উপলক্ষে নিজের অনুভূতিকেই ব্যক্ত করা তাঁহার উদ্দেশ্য। অতএব সেই গল্প বা ঘটনার গুরুত্ব যা কিছু তাহা উদ্দীপন অথবা মাধ্যম হিসাবেই যেহেতু কাব্যগত অনুভূতি যাহা আমরা অনুভব করি তাহা কবিরই অনুভূতি হয়, ইতিবৃত্তের এক অণুমাত্রও নয়। অন্যের বলা কথার কেবল আবৃত্তি করিবার জন্যই কেহ কেন আবৃত্তি করিবে? সাধারণতঃ যদি অন্য কারো কথার আমরা যথা-যথভাবে আবৃত্তি করিও তো উহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদের কথাই বলি। নিজেদের বক্তব্যটিকে প্রকট করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, অন্যদের কথার আবৃত্তি নয়। এইরূপে তত্ত্বের দিক দিয়া বস্তুর সত্তা কবির ব্যক্তিত্ব হইতে স্বতন্ত্র নয়। অতএব বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে রস অন্বেষণ করা অর্থবাদ ব্যতীত আর কিছু নয়। বস্তুর অন্তর্গত ভট্টলোল্লটের নায়ক-নায়িকারও স্থান আছে। এই নায়ক-নায়িকাও (তাঁহার ঐতি-হাসিক কিংবা পৌরাণিক অথবা কল্পিতও হইতে পারে) কাব্যে কবি হইতে পৃথক্ সত্তা বজায় রাখেন না। উঁহাদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব একটি উপলক্ষ্য মাত্র এবং ব্যক্তিত্ব সর্বথা নির্বিশেষ। দেশ ও কালের সীমার মধ্যে পরিবদ্ধ শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের ব্যক্তিরূপের আমাদের সম্মুখে (নাটক-কাব্যের শ্রোতা-প্রেক্ষকের জন্য) অনন্ত পক্ষে সেই সময় কোন মূল্য থাকে না। ইহার প্রমাণ এই যে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার নামের পরিবর্তে যদি চন্দ্রমোহন বা জয়শ্রী রাখিয়া দেওয়া হয় বা আমাদের যদি ইতিহাস (মহাভারত) সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই না থাকে অথবা যদি কোন পুরাতত্ত্ববেত্তা অসন্দিগ্ধরূপে ইহা প্রমাণ করেন যে মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত তবুও 'শকুন্তলম্' পড়িয়া আমাদের কাব্য-রসের অনুভূতি অবশ্যই হইবে। কল্পনা করুন যে বাল্মীকির রাম বাস্তবে ঐতিহাসিক চরিত্র, (যদিও ইহা সম্ভব নয়।) এখন যদি বাল্মীকির ঐতিহা-সিক রাম, তুলসীর ইতিহাস-ভিন্ন ঈশ্বরাবতার রাম, মৈথিলীশরণের আধুনিক লোক-নায়ক রাম এবং মাইকেল মধুসূদনের ইতিহাস-বিপরীত রাম—সকলেই আমাদের রস-দশায় পৌঁছাইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে রসের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক রামের রামত্ব কোথায় থাকিল? এইরূপ মৈথিলীশরণ গুপ্তের এই উক্তি:

রাম তুম্‌হারা চরিত স্বয়ং হী কাব্য হৈ।
কোই কবি বন জায় সহজ সংভাব্য হৈ॥

—প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভক্তি-ভাবনারই ব্যঞ্জক, রামের রামত্বের নয়। আমরা যে রামের একটি স্বতন্ত্র রূপের প্রতীতি করি তাহা বাস্তবে আমাদের অন্তর্মনের প্রভাব-স্বরূপ। এই প্রভাব বাল্মীকি, তুলসী প্রভৃতির কাব্য হইতে প্রাপ্ত সংস্কারেরই সংঘাত মাত্র। নচেৎ রামের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে ঐতিহাসিক রাম ছিলেন—তিনি অবশ্য ছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহার বাস্তবিক রামত্বের অনুভূতি আমাদের 'রামায়ণ', 'রামচরিতমানস', 'সাকেত' প্রভৃতি পড়িয়া কখনই হইতে পারে না (এইজন্য যে কাব্যের রসানুভবের জন্য উহা আমাদের পক্ষে অবান্তর); দ্বিতীয়তঃ তিনি রসের নয়, বরং নিশ্চিতরূপে প্রকৃত ভাবেরই অনুভব করিয়াছিলেন। রাম সীতার শীল-সৌন্দর্যের উপর মুগ্ধ হইয়া অবশ্যই প্রেমানন্দের অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা রতি-ভাবের অনুভব ছিল, শৃঙ্গার রসের নয়। ইহা একটি আকস্মিক সংঘটন মাত্র যে সেই অনুভবও মধুর ছিল এবং 'রস'-ও মধুর হয়। কিন্তু এইরূপ সংঘটন সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ যখন রাম রাবণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বা সীতা-বিয়োগে বিষণ্ণ বা লক্ষ্মণের শেল লাগিয়া ক্রোধ-মূর্ছিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার অনুভব মধুরের স্থানে নিশ্চিতই কটু হইয়া ছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার নিজস্ব অনুভব কেমন করিয়া রস হইতে পারে? কিন্তু তাঁহার এই অনুভবের কথা কাব্যে পড়িয়া আমরা 'রস' লাভ করি। অতএব নায়কে রসের স্থিতির কথা সাধারণতঃ বিশ্বাসযোগ্য লাগিলে পরেও অবশেষে উহা মিথ্যাই প্রমাণিত হয়।

এখন কবি ও সহৃদয়ের প্রশ্ন থাকিয়া যায়। কবি নিজের অনুভূতিকে এরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে উহাকে গ্রহণ করিয়া সহৃদয় আনন্দ লাভ করেন। পূর্বে বলিয়াছি সহৃদয় দ্বারা রসের অনুভূতিতে কাহারও কোন সন্দেহ হইতেই পারে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই রসের স্থিতি কোথায়—কবির মধ্যে কিম্বা সহৃদয়ে? ইহার উত্তর অভিনব গুপ্তের কথায় বলা যায়—সহৃদয়ে। কারণ যখন আমরা প্রসন্ন হই তখন নিজের সহৃদয়-রসের, স্বীয় আনন্দেরই অনুভব করি। আনন্দের স্থিতি আমাদের নিজের মনেই ইহাকে স্বদেশের অধ্যাত্মবাদীর এবং বিদেশের মনস্তত্ত্ববেত্তারা সম রূপে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন সুখকে নিজের আত্মার বিস্তার বলিয়া স্বীকার করে, (সু = সুলভ + খ = আকাশ, ব্যাপ্তি)। এই দর্শনে আনন্দকে নিজেরই অস্মিতা বৃত্তির আস্বাদন বলা হইয়াছে—অনাত্মার উপলক্ষে আত্মার আস্বাদনই রস। "আমি আছি" ইহাই রসের সার তত্ত্ব।[১]

রসের স্থিতি সহৃদয়ের চিত্তেই, ইহা নিশ্চিত হইলে পরে একটি অন্য সমস্যা আসিয়া

১. ডঃ ভগবানদাস, 'রস-মীমাংসা' দ্বি০ অ০ প্র০।

পড়ে—তাহা এই যে কবি কেমন করিয়া নিজের অনুভূতিকে অনুভবযোগ্য করেন যে উঁহাকে গ্রহণ করিয়া সহৃদয়ের রস-চেতনা জাগ্রত হইয়া পড়ে? ইহার উত্তর হইবে 'নিজের হৃদয় রসে সিক্তিত করিয়া' কবি যখন স্বীয় অনুভূতিকে ব্যক্ত করেন তখন তাঁহারও আত্মাভিব্যক্তির, অস্মিতার আস্বাদনের রস লাভ হয় এবং সেই সংবেদিত অনুভূতিকে গ্রহণ করিলে পরে সহৃদয় নিজের অস্মিতার আস্বাদন লাভ করেন। এরূপ কবি নিজের অনুভূতির সঙ্গে নিজের রসও সহৃদয়ের নিকট পরিবেশন করেন। অতএব রসের স্থিতি কবির হৃদয়ে স্বীকার করা ততখানিই অনিবার্য যতখানি সহৃদয়ের চিত্তে স্বীকার করা। কারণ যদি কবির বক্তব্যে রস নাই তাহা হইলে সহৃদয়ের হৃদয়ে স্থিত রস সুপ্ত থাকিবে এবং এইরূপ যদি সহৃদয়ের হৃদয়ে রস না থাকে তাহা হইলে কবির সংবেদ্য-কথন নিষ্ফল হইবে। প্রথম তথ্যটি প্রমাণ করিবার জন্য রস-সামগ্রীর দ্বারা সম্পন্ন অনেক নীরস কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে এবং অপর তথ্যটির প্রমাণ স্বরূপ সরস কবিতা হইতে অপ্রভাবিত অনেক অরসিক ব্যক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিতার প্রথম স্ফুরণের সহিত সম্বন্ধ জনশ্রুতি, যাহা অনুসরণ করিয়া আদি কবির শোক শ্লোকত্ব লাভ করিয়াছিল বা ভট্টতোতের এই সিদ্ধান্ত যে নায়ক, কবি বা শ্রোতার অনুভব সমান হয়,[১] বা অভিনব গুপ্তের দ্বারা সমর্থিত ভরতের এই উক্তি যে 'কবির অন্তর্গত ভাবকে যাহা বাচিক, আঙ্গিক মুখরাগাদি এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা আস্বাদ যোগ্য করে, তাহাকে ভাব বলা হয়'[২] এই সকল কথা ইহারই অসন্দিগ্ধ প্রমাণ যে সংস্কৃতের আচার্যগণ কবির হৃদয়স্থিত রসের সহিত অবশ্যই পরিচিত ছিলেন কিন্তু বিধান রূপে কবির অনুভূতিকে সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রে পৃথকই রাখা হইয়াছে। ভট্টতোতের সিদ্ধান্তও প্রায় উপেক্ষিতই থাকিয়া গিয়াছে।

শ্রব্য কাব্যের সম্বন্ধে উক্ত বিচার প্রযোজ্য। কিন্তু দৃশ্য কাব্যে নট-নটীর সত্তা-কেও স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের রসাস্বাদনের সহিত কি সম্বন্ধ? রসের স্থিতি উঁহাদের হৃদয়েও স্বীকার করিতে হইবে। নট-নটীকেও অনিবার্যতঃ সহৃদয়ই হইতে হইবে। নচেৎ তাঁহাদের পক্ষে সংবেদ্য অনুভূতির উচিত মাধ্যম হওয়া সম্ভবপর নয়। যখন তাঁহারা প্রথমে সংবেদ্য অনুভূতিকে স্বয়ং গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন, তখনই তাঁহারা সহৃদয় পর্যন্ত সংবেদ্য অনুভূতিকে লইয়া যাইতে সফল হইবেন। সেইজন্য তাঁহাদের সহৃদয়তার বিরুদ্ধে সংস্কৃত আচার্যরা যে সমস্ত আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা ঠিক নয়।

শেষে আমাদের সার-কথা এই যে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে কাব্য পড়িয়া বা নাটক দেখিয়া সহৃদয় যে রসাস্বাদন করেন তাহার মূল স্থিতি তাঁহার হৃদয়ে, অর্থাৎ মূলতঃ তাহা তাঁহার নিজের অস্মিতারই আস্বাদন। কিন্তু ইহা তখনই সম্ভবপর হয়

---

১. নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ।

২. বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ। কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে। না০ শা০ ৭।২।

যখন কবি নিজস্ব অনুভূতিকে তাঁহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য স্বয়ং নিজের অস্মিতার রস গ্রহণ করেন। নাটকে নট-নটীর বিষয়েও ইহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই কথাটিকে স্পষ্ট করিবার জন্য একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গান্ধীজির ডাণ্ডি যাত্রা প্রসঙ্গটি লওয়া যাক। গান্ধীজি সেই সময় সাত্ত্বিক উৎসাহ অনুভব করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত। আমি তাঁহার সেই ভব্যরূপ দেখিলাম, সহানুভূতির দ্বারা আমার মধ্যে সেই ভাব জাগৃত হইল। কবি সিয়ারামশরণ প্রথমে একজন দর্শকরূপে সেই ভাবকে গ্রহণ করিলেন, তারপর কোন এক সময় উহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া 'বাপু' কাব্যগ্রন্থে মহামানব গান্ধীজির এই সাত্ত্বিক উৎসাহ শব্দবদ্ধ করিলেন। আমি এই কাব্যগ্রন্থ পড়িয়া সাত্ত্বিক আনন্দ অনুভব করিলাম। এইরূপ আমাদের সম্মুখে পাঁচটি অনুভব বিদ্যমান : প্রথম অনুভব স্বয়ং গান্ধীজির, তারপরের দুইটি অনুভব সিয়ারামশরণের- -প্রথমটি তিনি ব্যক্তিরূপে গান্ধীজিকে দেখিয়া লাভ করিয়াছিলেন, এবং অপরটি কবিরূপে ইহাকে কাব্যরূপ প্রধান করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। শেষের দুইটি অনুভব আমার—একটি গান্ধীজিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া এবং অপরটি 'বাপু' কাব্যগ্রন্থ পড়িয়া লাভ করা। এখন দেখিতে হইবে যে ইহার মধ্যে রস-সংজ্ঞা কাহাকে দেওয়া যাইতে পারে? গান্ধীজির অনুভবকে? না। তাহা তো কেবলমাত্র ভাব (Emotion) যাহা এই প্রসঙ্গে যদিও মধুর কিন্তু কটুও হইতে পারিত। উদাহরণস্বরূপ সীতারমৈয়ার পরাজয়ের ব্যাপারে গান্ধীজির অসন্তুষ্ট হওয়া স্পষ্টতঃ একটি কটু অনুভূতি ছিল। তাৎপর্য এই যে প্রত্যক্ষ অনুভব রস হইতে পারে না। এরূপ আমার ও সিয়ারামশরণের প্রত্যক্ষ অনুভবও রস হইতে পারে না। কেবল দুইটি অনুভব অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—কবির অনুভব এবং তাঁহার কাব্য যিনি অধ্যয়ন করেন সেই সহৃদয়ের অনুভব। কবির অনুভব, গান্ধীজির ভব্য উৎসাহ হইতে প্রাপ্ত অনুভূতিকে, যাহা পরে প্রত্যক্ষ না থাকিয়া সংস্কাররূপ ধারণ করিয়াছিল, কাব্যরূপ প্রদান করা অর্থাৎ বিম্বরূপে প্রকট করার অনুভব। কাব্যরূপ দেওয়ার সময় কবি সেই সংস্কার-শেষ অনুভূতির ভাবন করেন। ভাবনের এই প্রক্রিয়ায় একটি ক্ষণ এমন আসে যখন তাঁহার হৃদয়ের সাত্ত্বিক উৎসাহ উদ্‌বুদ্ধ হইয়া যায়। ঠিক তখনই কবির হৃদয়ে কাব্যরূপ পূর্ণতা লাভ করে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তিনি রসের অনুভবও লাভ করেন। বহির্দেশ হইতে প্রাপ্ত কোন অনুভূতির সংস্কারের ভাবন করিয়া স্বীয় হৃদয়স্থিত বাসনাকে জাগ্রত করার অর্থই রস-দশাকে প্রাপ্ত করা। ইহাই সহৃদয় করেন এবং কবিও। যদি কাব্যের অভিনয় হয় তাহা হইলে সহৃদয়ের পূর্বে এইরূপ ভাবন এবং বাসনার উদ্‌বোধন নটের জন্য অনিবার্য্য হইয়া ওঠে।

অতএব প্রারম্ভে রচনার সময় কবি এবং অভিনয়ের সময় নট (যদিও তাঁহার সত্তা অত্যন্ত গৌণ) স্বীয় হৃদয়স্থিত রসের আস্বাদন তো করেনই, ইহার সঙ্গে তাঁহাদের এই রসাস্বাদন সহৃদয়ের হৃদয়ে বাসনারূপে স্থিত স্থায়ীভাবকে জাগ্রত করিয়া রস-দশা

পর্যন্ত পৌঁছাইতে অনিবার্যরূপে সাহায্য করে। এইরূপ কবিতার বিষয়ে এই লোক-পরিচিত উক্তি যে ইহা এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে, মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও সম্পূর্ণরূপে সত্য।"১

কবিগত রসের সিদ্ধি হওয়ার পর রসের সংপ্রসারণ২ অথবা অভিব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি দেখা দেয়। সঞ্চারের অর্থ এই যে রস মূলতঃ কবিগত অনুভূতিই, কাব্যগত শব্দার্থের মাধ্যমে সামাজিকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। পাশ্চাত্য কাব্য-শাস্ত্রে ইহার সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। প্রাচীন মত এই যে, সকল মানব হৃদয়ে একই চৈতন্য তত্ত্ব অনুস্যূত আছে, অতএব প্রত্যেকটি পরিস্থিতি বা ঘটনার সকল হৃদয়ে একই প্রতিক্রিয়া হয়। বস্তুতঃ এই ধারণাটি একাত্মবাদের উপর আশ্রিত : পশ্চিমের ব্লেক প্রভৃতি রহস্যবাদী মনীষীদের এই ধারণা ছিল। আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানও সঞ্চারবাদে বিশ্বাসী কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে স্বীকার করে না। অতএব এই দুইটি মতের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। আই০ এ০ রিচার্ড্‌সের অনুসারে "আমরা ইহা বলিতে পারি যে যখন কোন ব্যক্তির মন নিজের পরিবেশের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করে যে অপর ব্যক্তির মন উহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ওঠে এবং এই অপর ব্যক্তির মনে এমন একটি ভাবের উদয় হয় যাহা প্রথম ব্যক্তির ভাবের অনুরূপ এবং অংশতঃ সেই ভাবের জন্যই উদ্‌বুদ্ধ হয় তখন তাহার সঞ্চার ঘটে। [প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌ অব লিটরেরী ক্রিটিসিজ্‌ম—১৭শ সংস্করণ, পৃ০ ১৭৭)। এই ধারণা অনুসারে কবির অনুভূতিই সহৃদয়ের চিত্তে সঞ্চারিত বা যথাবৎ স্থানান্তরিত হয় না বরং প্রত্যেক সহৃদয়ের চিত্তে ইহার অনুরূপ অনুভূতির উদয় হয়। অনেক সহৃদয়ের অনুভূতি—কবির অনুভূতির অনুরূপ হওয়ার জন্য পরস্পর সমানরূপ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমরূপতারও একটি সীমা আছে—উহাদের মধ্যে প্রভেদও থাকে, কবির অনুভূতি হইতেও এবং এক-অপরের অনুভূতি হইতেও।

উল্লিখিত বিবেচনানুসারে রস প্রসঙ্গে সঞ্চারণের দুইটি অর্থ হয় : (১) কবির হৃদয়গত রস অর্থাৎ আনন্দরূপ আস্বাদ শব্দ-অর্থের মাধ্যমে সামাজিকের হৃদয়ে যথাবৎ স্থানান্তরিত হইয়া যায়, (২) কবির হৃদয়গত রস সহৃদয়ের চিত্তে সমান আনন্দানুভূতি উদ্‌বুদ্ধ করে। ভারতীয় অভিব্যক্তিবাদ ইহা স্বীকার করে যে একই চৈতন্য তত্ত্ব কবি ও প্রত্যেক সহৃদয়ের চিত্তে অন্তর্নিহিত আছে, কিন্তু ইহার সার-ফলকে স্বীকার করে না—অর্থাৎ ইহা স্বীকার করে না যে এইজন্য কবিগত রস সহৃদয়ের চিত্তে যথাবৎ স্থানান্তরিত হইয়া যায় কারণ সহৃদয়ের রস স্বয়ং চৈতন্য অনুভব এবং ইহা তাহার নিজস্ব আবরণমুক্ত আত্মারই বিষয়, কবি দ্বারা সঞ্চারিত অনুভব নয়। কবির রস নিমিত্ত কারণ যাহা শব্দ-অর্থের মাধ্যমে সহৃদয়ের রসরূপিণী চিৎশক্তিকে অভিব্যক্ত করে,

১. গীতিকাব্যের ভূমিকা পৃ০ ৫১-৫৫

২. Communication.

স্বয়ং উহাতে প্রবিষ্ট হয় না। এই অনুভূতি (১) কবিরই অনুভূতি বা (২) উহা হইতে সর্বথা অভিন্ন বা (৩) উহার অনুরূপ সহৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি—এই তিনটি বিকল্প আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ধারণাটি অসম্ভব কারণ অনুভূতি নিজেরই হইতে পারে, অপরের নয়। দ্বিতীয় বিকল্পটির মনোবিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে কারণ মনোবিজ্ঞান ইহা কখনই স্বীকার করিবে না যে কবি এবং পাঠকের বা দুই পাঠকের অনুভূতি সর্বথা অভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অদ্বৈত দর্শন—একাত্মবাদ—ইহার পরিপোষণ করে কারণ রস যখন তত্ত্ব-রূপে আবরণমুক্ত চিদ্রূপ তখন কবিগত রস ও সহৃদয়গত রসের মধ্যে বা দুই সহৃদয়ের রসানুভূতির মধ্যে, প্রভেদ কেমন করিয়া সম্ভব? তৃতীয় বিকল্পটি মনোবৈজ্ঞানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। এই মত অনুসারে দুই ব্যক্তির অনুভূতি কখনই এক হইতে পারে না—প্রেরক আধারভূমি এক হইলে পরে উহাদের মধ্যে সমরূপতা সম্ভব কিন্তু একতা সম্ভব নয়। সহৃদয়ের অনুভূতি এবং কবির অনুভূতির ভিত্তি একই এবং অংশতঃ সহৃদয়ের অনুভূতি কবি অনুভূতির দ্বারা প্রেরিতও, অতএব উহাদের মধ্যে সমানতা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু একতা সম্ভবপর নয়। অদ্বৈত সিদ্ধান্তের উপর আশ্রিত অভিব্যক্তিবাদের সহিত এই মতের সঙ্গতি নাই: অদ্বৈতবাদ রসকে অখণ্ড স্বীকার করিয়া চলে এবং উপরোক্ত মতানুসারে কবিগত রস এবং সহৃদয়গত রসের মধ্যে বা দুইজন সহৃদয়ের দ্বারা অনুভূত রসের মধ্যে প্রকার বা মাত্রার ভেদ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই বিকল্প অনুসারেও রসের অভিব্যক্তিই হয়, সঞ্চার নয়—কবির অনুভূতির দ্বার সহৃদয়ের নিজস্ব আনন্দময়ী অনুভূতি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ সঞ্চারের নবীন অর্থ প্রায় অভিব্যক্তিরই সমরূপ এবং বস্তুতঃ ভাবের মূলে বাসনা বা সহজবৃত্তির [১] সত্তাকে স্বীকার করিয়া লইলে, যাহা ভারতীয় দর্শন বা আধুনিক মনোবিজ্ঞানে স্বীকার্য, ভাবের অভিব্যক্তি স্বতঃসিদ্ধ হইয়া যায়—অনুভবের সঞ্চরণের, অনন্তপক্ষে বাচ্যার্থরূপে, আর সম্ভাবনা থাকে না। অতএব রস সংপ্রেষ্য নয়, ব্যঙ্গই।

■ ■ ■

---

১. Instincts.

(গ) সাধারণীকরণ

রস-নিষ্পত্তির সহিত সাধারণীকরণ প্রসঙ্গটিও সম্বন্ধযুক্ত। কাব্যে বর্ণিত বিশিষ্ট রামাদি পাত্রের 'ভাব' কিরূপ ভাবে সর্বসাধারণ বা অনন্তপক্ষে 'সহৃদয়-সাধারণ' এর আস্বাদের বিষয় হইয়া যায়?—কাব্যশাস্ত্রের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্ন। কাব্য মানব-জীবনের অত্যন্ত প্রাচীন এবং মূল্যবান উপকরণ। ইহা বহু সহস্র বৎসর হইতে মানুষের আত্মাভিব্যক্তি ও আত্মাস্বাদের সুন্দর মাধ্যম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। যখন প্রথমে চিন্তনশীল মানুষ জীবন ও জগতের নানা তথ্যের সহিত কাব্যাস্বাদের বিষয়েও বিচার আরম্ভ করিল তখনই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটি তাহার মনে আসিয়াছিল যে রাম ও দুষ্মন্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? যখন দেশ ও কালের বিরাট ব্যবধান আমাদের ও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তখন তাঁহাদের ভাব আমাদের আস্বাদ্য কেমন করিয়া হইয়া যায়? এই প্রশ্নের সর্বাধিক প্রামাণিক সমাধান সাধারণীকরণ-সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তটির সংকেত নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতিতেও পাওয়া হয়—যথা 'এভ্যশ্চ সামান্যগুণযোগেন রসা নিষ্পদ্যন্তে' অর্থাৎ যখন এই ভাবগুলিকে সামান্যরূপে প্রকাশ করা হয় তখন রসের নিষ্পত্তি হয় (নাট্যশাস্ত্র, কা০ মা০ পৃ০ ১০৬)। কিন্তু ইহার স্পষ্ট উল্লেখ প্রথম ভট্টনায়কই করিয়াছিলেন।

ভট্টনায়কের উদ্ধরণের অভীষ্ট অংশ এইরূপ ঃ

বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনা × × × ভাবকত্ব ব্যাপারেণ ভাব্যমানো রসঃ × × × ভোগেন পরং ভুজ্যত ইতি।

—অর্থাৎ বিভাবাদির সাধারণীকরণ রূপ, ভাবকত্ব নামক ব্যাপারের দ্বারা ভাব্যমান স্থায়িভাব রূপ রস × × × ভোজকত্ব ব্যাপারের দ্বারা আস্বাদিত হয়।

ইহার বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য উপলব্ধ হয় ঃ

(ক) বিভাবাদির সাধারণীকরণ হয়।

(খ) এই সাধারণীকরণই প্রকৃতপক্ষে ভাবকত্ব ব্যাপারের প্রাণ—অর্থাৎ উভয়েই এক।

(গ) ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারা ভাব্যমান স্থায়ী ভাবই রসরূপে পরিণতি লাভ করে। ভাব্যমানকে কাব্যপ্রকাশের টীকাকারগণ 'সাধারণীকৃত'-এর সমার্থকরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে বিপ্রতিপত্তির কোন বিশেষ সুযোগও নাই।

(ঘ) সাধারণীকরণ রসাস্বাদের পূর্বের প্রক্রিয়া, ইহা সেই প্রক্রিয়া যাহা রসের বিভিন্ন অবয়বগুলিকে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য হইতে মুক্ত করিয়া আস্বাদরূপে প্রকাশিত করে।

অভিনব গুপ্ত ভট্টনায়কের মতে সংশোধন করিয়া সাধারণীকরণ প্রসঙ্গটিকে নিজের মতানুসারে প্রকাশিত করিয়াছেন :

তস্যাং চ যো মৃগপোতকাদির্ভাতি তস্য বিশেষরূপত্বাভাবাদ্‌ভীত ইতি, ত্রাসকস্যা-পারমার্থিকত্বাদ্ ভয়মেব পরং দেশকালাদ্যনালিঙ্গিতম্ ।

—অর্থাৎ কাব্যের সেই প্রতীতিতে মৃগ-শাবক প্রভৃতি যাহা বিষয়রূপে প্রতি-ভাসিত হয়, তাহার বিশেষ রূপ না থাকার জন্য, 'ইহা ভীত', এই জ্ঞান এবং ত্রাসক (দুষ্মন্ত প্রভৃতি) বাস্তবিক রূপে না থাকার জন্য, ভয়ই দেশকাল প্রভৃতি হইতে সর্বথা অসম্বদ্ধ রূপে প্রতিভাসিত হয়।

ইহার অভিপ্রায় এই যে আশ্রয় ও আলম্বনের সাধারণীকরণ হইলে পরে স্থায়ী ভাবই দেশকালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

এই তথ্যটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া অভিনব গুপ্ত লিখিয়াছেন :

তত এব ভীতোঽহং ভীতোঽয়ং শত্রুর্বয়স্যো মধ্যস্থো বা ইত্যাদিপ্রত্যয়েভ্যো দুঃখসুখাদিকৃতবুদ্ধ্যন্তরোদয়নিয়মবত্তয়া বিঘ্নবহুলেভ্যো বিলক্ষণং নির্বিঘ্নপ্রতীতিগ্রাহ্যং × × × ভয়ানকো রসঃ।

—এইজন্য "আমি ভীত", "সে ভীত" বা "শত্রু, মিত্র বা তটস্থ ভীত', ইত্যাদি সুখ-দুঃখকারী অন্য প্রত্যয়গুলিকে (জ্ঞান) নিয়মতঃ উৎপন্ন করিবার জন্য বিঘ্নবহুল প্রতীতি হইতে ভিন্ন, নির্বিঘ্ন প্রতীতি রূপে গ্রাহ্য (ভয় স্থায়ী ভাবই) ভয়ানক রস হইয়া যায়।

অর্থাৎ কাব্যে স্থায়ী ভাব সকল প্রকারের ব্যক্তি-সংসর্গ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এই ব্যক্তি-সংসর্গ স্বীয় পরিমিতির জন্য দুঃখাদির কারণ হয়, অতএব উহা হইতে মুক্তি পাওয়ার অর্থই দুঃখ-সুখ প্রভৃতি চেতনা হইতে মুক্তি লাভ।

ইহা সাধারণত্ব পরিমিতি না হইয়া সর্বব্যাপ্ত হয়—অনাদি সংস্কারের দ্বারা চিত্রিত চিত্তসহ সমস্ত সামাজিকদের একই ধরণের বাসনা হওয়ার জন্য সকলের একই প্রকারের প্রতীতি হয় :

তত এব ন পরিমিতমেব সাধারণ্যমপি তু বিততম্ × × × অতএব সর্বসামা-জিকানামেকঘনতয়ৈব প্রতিপত্তিঃ × × × সর্বেষামানাদিবাসনাচিত্রীকৃতচেতসাম্ বাসনাসংবাদাৎ।

—এইরূপ, একাগ্রচিত্ত হওয়ার জন্য, সমস্ত সামাজিকজনের রঙ্গমঞ্চের উপর পরিবেশিত নৃত্য, গীত প্রভৃতি সুধা-সাগরের অনুরূপ প্রতীত হয় :

তথা হ্যেকাগ্রসকলসামাজিকজনঃ খলু। নৃত্তং গীতং সুধাসারসাগরত্বেন মন্যতে ॥

এই সকল উদ্ধরণগুলির ভিত্তিতে অভিনব গুপ্তের মত এইরূপ—

(ক) সাধারণীকরণ কেবল বিভাবাদিরই হয় না, স্থায়ী ভাবেরও হয়। যেইরূপ বিভাবাদি স্থায়ী ভাবের কারণরূপ হয়, সেইরূপ বিভাবাদির সাধারণীকরণও স্থায়ী

ভাবের সাধারণীকরণের কারণরূপ হয়।

(খ) স্থায়ী ভাবের সাধারণীকরণের অর্থ দেশকালের বন্ধন, ব্যক্তি-সংসর্গ প্রভৃতি হইতে মুক্তি। ব্যক্তি-চেতনার জন্যই ভাবের প্রতীতিতে সুখ-দুঃখাত্মকতার সমাবেশ হয়, উহার অভাবে ইন্দ্রিয়গত সুখ-দুঃখের চিন্তাও মিটিয়া যায়।

(গ) কলার ক্ষেত্রে ভাবের সাধারণীকরণ্ বৈয়ক্তিক ক্রিয়া নয় বরং সামূহিক ক্রিয়া; কেবল একজন প্রমাতাই ভাবমুক্ত হয় না—বরং সকল সামাজিক একাগ্রচিত্ত হইয়া মুক্ত ভাবের সামূহিক রূপে অনুভূতি করে।

(ঘ) অতএব স্থায়ী ভাবের সাধারণীকরণই সাধারণীকরণের সারতত্ত্ব।

উল্লিখিত সংশোধনের আলোকে কাব্য প্রকাশের টীকাকার গোবিন্দ ঠক্কুর ভট্ট-নায়কের সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তকে সংক্ষিপ্ত এবং স্বচ্ছরূপে নিম্নভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন ঃ

ভাবকত্বং সাধারণীকরণম্। তেন হি ব্যাপারেণ বিভাবাদয়ঃ স্থায়ী চ সাধারণী-ক্রিয়ন্তে। সাধারণীকরণং চৈতদেব যৎসীতাদিবিশেষাণাং কামিনীত্বাদিসামান্যেনো-পস্থিতিঃ। স্থায্যনুভাবাদীনাং চ সম্বন্ধিবিশেষানবচ্ছিন্নত্বেন। (কাব্যপ্রকাশ, নির্ণয়-সাগর প্রেস, পৃ০ ৬৬)

—অর্থাৎ ভাবকত্বের অর্থ হইতেছে সাধারণীকরণ। এই ব্যাপারের দ্বারা বিভা-বাদির এবং স্থায়ী ভাবের সাধারণীকরণ হয়। সীতাদি বিশেষ পাত্রের কামিনী প্রভৃতি সামান্যরূপে উপস্থিত হওয়াকেই সাধারণীকরণ বলা হয়। স্থায়ী ভাব এবং অনুভাবের সাধারণীকরণের অর্থ হইতেছে বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ।[১]

---

১. এই প্রসঙ্গে কিছু বিপ্রতিপত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য, রসগঙ্গাধরের শাস্ত্রীয় বিবেচন, পৃ০১৫৪-১৫৮)। বিষয়ের অভ্রান্ত জ্ঞানের জন্য এই সব আপত্তির সমাধান আবশ্যক। প্রথম বিপ্রতিপত্তি এই যে সাধারণীকরণ ভাবকত্বের আত্মা বা মূল তত্ত্ব, সমার্থক নয়। ইহার সমর্থনে দুইটি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে—(১) ভট্টনায়ক 'সাধারণীকরণরূপেণ'র স্থানে 'সাধারণীকরণকরণাত্মনা' পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন; (২) ভাবকত্ব ব্যাপারের কার্য্য কেবল বিভাবাদির সাধারণীকরণ নয়, নিজমোহ-সঙ্কটতার নিবারণও। আমাদের ধারণা এই যে এত অধিক সূক্ষ্মতার মধ্যে গেলে মূল সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনে নানা বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম যুক্তিটি শাব্দিক অধিক কারণ দুইটি পদের মূল অর্থে বিশেষ কোন ভেদ নাই। দ্বিতীয় যুক্তিটির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে নিজমোহসঙ্কটতার নিবারণও তো সাধারণীকরণ ক্রিয়ারই অঙ্গরূপ যাহার আশ্রয়ে পরে স্থায়ীভাবের (নির্বিঘ্ন প্রতীতিরূপ) সাধারণীকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তিটি ভট্টনায়কেরই এমন কতকগুলি বাক্যের আশ্রয়ে উপস্থিত করা হইয়াছে যাহা প্রাগুক্ত স্থাপনার বিরোধী প্রতীত হয়। এই বাক্যগুলি এইরূপ :

ন চ সা প্রতীতির্যুক্তা। সীতাদেরবিভাবত্বাৎ। স্বকান্তাস্মৃত্যসংবেদনাৎ। দেবতাদৌ সাধারণী-করণাযোগ্যত্বাৎ। সমুদ্রলঙ্ঘনাদেরসাধারণ্যাৎ।

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এই ব্যাখ্যানুসারে বিভাব অর্থাৎ আশ্রয়, আলম্বন এবং উদ্দীপন, অনুভব, স্থায়ী ও সঞ্চারী (স্থায়ী ভাবের দ্বারা সঞ্চারীরও ব্যঞ্জনা স্পষ্ট)—সকলেরই সাধারণীকরণ হয়। একটি উদাহরণের সাহায্য লইলে স্থিতি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে :

ভূপ বাগু বর দেখেউ জাঈ। জহঁ বসন্ত রিতু রহী লোভাঈ।
লাগে বিটপ মনোহর নানা। বরন বরন বর বেলি বিতানা।
নব পল্লব ফল সুমন সুহাএ। নিজ সম্পতি সুররূখ লজাএ।
চাতক কোকিল কীর চকোরা। কূজত বিহগ নটত কল মোরা।
মধ্য বাগ সরু সোহ সুহাবা। মনি সোপান বিচিত্র বনাবা।
বিমল সলিলু সরসিজ বহুরঙ্গা। জল-খগ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গা।

× × ×

তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ। গিরিজা পূজন জননি পঠাঈ।

× × ×

কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর ধুনি সুনি। কহত লখন সন রাম হৃদয়ঁ গুনি।
মানহুঁ মদন দুন্দুভী দীহ্নী। মনসা বিশ্ব বিজয় কহঁ কীহ্নী।
অস কহি ফিরি চিতএ তেহি ওরা। সিয় মুখ সসি ভএ নয়ন চকোরা।
ভএ বিলোচন চারু অচঞ্চল। মনহুঁ সকুচি নিমি তজে দৃগঞ্চল।
দেখি সীয় সোভা সুখু পাবা। হৃদয়ঁ সরাহত বচনু ন আবা।

বাস্তবিক সীতাদির বিভাবরূপে উপস্থিত না থাকার জন্য নিজের স্ত্রী প্রভৃতির স্মৃতি অভিনয় কালে না হওয়ার জন্য, দেবতাদি সীতা, পার্বতী পূজনীয়া দেবী সকল সাধারণীকরণের অযোগ্য হওয়ার জন্য এবং সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতির কার্য অসাধারণ হওয়ার জন্য এই প্রতীতি গ্রাহ্য নয়। (হি০ অ০ ভা০, পৃ০ ৪৬২-৬৩)। উক্ত বাক্যগুলি পড়িয়া এমন ধারণা হয় যে বোধ হয় ভট্টনায়ক অলৌকিক পাত্র এবং কার্যের সাধারণীকরণ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সত্য নয়। ভট্টনায়ক তো ইহা স্বীকার করেন যেহেতু ইহাদের সাধারণীকরণ যুক্তিসিদ্ধ, সেইজন্য রসের (প্রত্যক্ষ) প্রতীতি অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়। তাঁহার যুক্তি স্পষ্ট : যদি রসের প্রত্যক্ষ প্রতীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে সীতাদি দেবী সকল ও সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি দেবকার্যের সাধারণীকরণ সম্ভব হইবে না কিন্তু যেহেতু ইহাদের সাধারণীকরণ যুক্তিসিদ্ধ সেইজন্য রসের প্রতীতি অসিদ্ধ।

× × ×

সিয় সোভা হিঅঁ বরনি প্রভু, আপনি দসা বিচারি।
বোলে সুচি মন অনুজ সন, বচন সময় অনুহারি ॥
তাত জনক তনয়া যহ সোঈ। ধনুষজজ্ঞ জেহি কারন হোঈ।
পূজন গৌরি সখী লৈ আঈ। করত প্রকাশ ফিরহিঁ ফুলবাঈ।
জাসু বিলোকি অলৌকিক সোভা। সহজ পুনীত মোর মনু ছোভা।
সো সবু কারনু জান বিধাতা। ফরকহিঁ সুভগ অঙ্গ সুনু ভ্রাতা।

× × ×

করত বতকহী অনুজ সন, মনু সিয় রূপ লোভান।
মুখ সরোজ মকরন্দ ছবি, করৈ মধুপ ইব পান।
(রামচরিতমানস, বালকাণ্ড, দোহা ২২৬ হইতে ২৩১)

এখানে রাম আশ্রয়, সীতা আলম্বন, বাসন্তী বৈভবের দ্বারা সমৃদ্ধ জনক-বাটিকা উদ্দীপন, রামের পুলক প্রভৃতি অনুভাব, রতি স্থায়ী এবং হর্ষ, বিতর্ক, মতি প্রভৃতি সঞ্চারী। প্রাগুক্ত ব্যাখ্যানুসারে এই প্রসঙ্গের রসাস্বাদন-প্রক্রিয়ায় এই সমস্তেরই সাধারণীকরণ হইয়া যায়। আশ্রয় রামের সাধারণীকরণের অর্থ এই যে তিনি রাম না থাকিয়া রতি-মুগ্ধ সামান্য পুরুষ হইয়া যান—তাঁহার দেশ ও কাল এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যের দ্বারা অভিভূত তাঁহার সামান্য কিশোর হৃদয় উদ্‌ভাসিত হইয়া ওঠে। আলম্বন সীতার সাধারণীকরণের অর্থও অনেকটা এইরূপই।—অর্থাৎ তাঁহারও দেশ-কালাবচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য সমাপ্ত হইয়া যায় এবং সামান্য কামিনী রূপ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। অনুভাবের সাধারণীকরণের অর্থ এই যে রামের চেষ্টা সকল রামের সহিত সম্বদ্ধ না থাকিয়া সামান্য মুগ্ধ পুরুষের চেষ্টা হইয়া যায়। এইরূপ রত্যাদি স্থায়ী ভাব ও হর্ষ, বিতর্ক প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবও একদিকে রাম-সীতার সহিত এবং অপর দিকে সহৃদয় এবং উহার আলম্বনের সহিত আর সম্বদ্ধ থাকে না—এই ভাবসকল বৈয়ক্তিক রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া যান। উল্লিখিত প্রসঙ্গে যে রতি স্থায়ী ভাব বিদ্যমান আছে তাহা সীতার প্রতি রামের রতি নয়, সহৃদয়ের সীতার প্রতি বা সহৃদয়ের নিজের প্রণয়-পাত্রের প্রতি নয়—ইহা নির্মুক্ত রতি ভাব যাহার মধ্যে স্ব-পরের চেতনা আর অবশিষ্ট নাই। মূলতঃ ইহা সহৃদয়েরই স্থায়ী ভাব, কিন্তু সাধারণীকৃতির জন্য ব্যক্তি-চেতনা হইতে নির্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে রসের নানা অবয়বের মধ্যে যাহা মূর্ত্ত তাহা বিশেষ হইতে সামান্য হইয়া যায় এবং যাহা অমূর্ত্ত ভাব-রূপ তাহা ব্যক্তি-সংসর্গ হইতে মুক্ত হইয়া যায়—বিভাবের দেশকালের বন্ধন হইতে এবং ভাবের স্ব-পরের চেতনা হইতে মুক্তি লাভ হয়।

সংস্কৃতের পরবর্তী আচার্যগণ প্রায় এই মতেরই আবৃত্তি করিয়াছেন—কেবল দুইজন আচার্য—বিশ্বনাথ ও জগন্নাথের বিবেচনায় বৈচিত্র্যের কিছু সংকেত পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ যদিও স্থায়ী ভাব ও বিভাবাদি সকলেরই সাধারণীকরণ স্বীকার করিয়াছেন :

সাধারণ্যেন রত্যাদিরপি তদ্বৎপ্রতীয়তে।
পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ॥ সা০ দ০—৩.১২॥
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে। ৩.১৩.-র পূর্ব্বার্ধ॥

—শৃঙ্গারাদি রসের স্থায়ী ভাব রতি প্রভৃতিও কাব্য-নাট্যাদিতে সামান্য রূপে অনুভূত হয়। বিভাবাদির আস্বাদের সময়ে উহা পরের অথবা পরের নহে, আমার অথবা আমার নহে—এই প্রকার কোন পরিচ্ছেদ বা বন্ধন থাকে না।

কিন্তু তিনি আশ্রয়ের সহিত প্রমাতার অভেদ বা তাদাত্ম্যকে অন্যদের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন :

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ ॥৩.৯॥
তৎপ্রভাবেণ, যস্যাসন্‌পাথোধিপ্লবনাদয়ঃ
প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে ॥৩.১০॥
উৎসাহাদিসমুদ্‌বোধঃ সাধারণ্যাভিমানতঃ।
নৃণামপি সমুদ্রাদিলঙ্ঘনাদৌ ন দুষ্যতি ॥৩.১১॥

—বিভাবাদির বিভাবন নামক ব্যাপারকেই সাধারণীকরণ বলা হয়, তাহারই প্রভাবে সেই সময় প্রমাতা নিজেকে সমুদ্রলঙ্ঘনকারী হনুমান প্রভৃতির সহিত অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন। (হনুমান্ প্রভৃতির সহিত) সাধারণ্যাভিমান অর্থাৎ অভেদ-জ্ঞান হইলে পরে প্রমাতাদেরও সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতিতে উৎসাহ দূষিত নয়।

ইহার সারাংশ এই যে সাধারণীকরণ ব্যাপারের প্রভাবে প্রমাতার আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্য হইয়া যায়—কেবল সামান্য আশ্রয়ের সঙ্গেই নয় বরং অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন দেবাদির সঙ্গেও। উদাহরণস্বরূপ লৌকিক পরিস্থিতিতে সামান্য ব্যক্তির পক্ষে সমুদ্রলঙ্ঘনের উৎসাহ সম্ভবপর নয়, কিন্তু কাব্য-নাট্যাদিতে, সাধারণীকরণের প্রভাব-স্বরূপ তাঁহার হনুমান প্রভৃতির সহিত তাদাত্ম্য হওয়ার জন্য, এই ধরণের উৎসাহও সহজ সম্ভব হইয়া যায়। নঞর্থকরূপে ভট্টনায়কও এই প্রসঙ্গটির উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিশ্বনাথ সদর্থকরূপে ইহাকে আরও স্পষ্ট করিয়াছেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও নব্যন্যায়ের আলোকে প্রকারান্তরে আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্যেরই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই সন্দর্ভে 'দোষ' শব্দের প্রয়োগকে তিনি অধিক শুদ্ধ বলিয়াছেন :

কাব্য নাট্যে চ, কবিনা নটেন চ প্রকাশিতেষু বিভাবাদিষু, ব্যঞ্জনব্যাপারেণ দুষ্যন্তাদৌ শকুন্তলাদিরতৌ গৃহীতায়ামনন্তরং চ সহৃদয়তোল্লাসিতস্য ভাবনাবিশেষ-রূপস্য দোষস্য মহিম্না, কল্পিতদুষ্যন্তত্বাবচ্ছাদিতে স্বাত্মন্যজ্ঞানাবচ্ছিন্নে শুক্তিকাশকল ইব রজতখণ্ডঃ সমুৎপদ্যমানোঽনির্বচনীয়ঃ সাক্ষিভাস্যশকুন্তলাদিবিষয়করত্যাদিরেব রসঃ। (হিন্দী রসগঙ্গাধর, প্র০ আ০, পৃ০ ১০১)

ইহার অভিপ্রায় এই যে কাব্যস্থলে কবিকর্তৃক এবং নাট্যস্থলে নটকর্তৃক বিভাবাদি প্রকাশিত হইলে ব্যঞ্জনাব্যাপার দ্বারা দুষ্মন্ত প্রভৃতিতে শকুন্তলাদিবিষয়ক রতি গৃহীত হয়। অনন্তর সহৃদয়তাজনিত ভাবনাবিশেষরূপ দোষের প্রভাবে (সামাজিকের) নিজস্বরূপ দুষ্মন্তত্বের দ্বারা অর্থাৎ দুষ্মন্তের-স্বরূপ দ্বারা অবচ্ছাদিত হইলে, (অর্থাৎ সামাজিক স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া দুষ্মন্তরূপে নিজেকে জ্ঞান করিলে) অজ্ঞান দ্বারা অবচ্ছিন্ন স্ব স্বরূপে শুক্তিকাখণ্ডে রজতোৎপত্তির ন্যায় অনির্ব্বচনীয় শকুন্তলাবিষয়ক রতি সাক্ষিভাস্য হইয়া রসরূপে পরিণত হয়।[১]

ইহা ঠিক সেই কথা যাহা বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার উপর দর্শনের আবরণ দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতরাজের দার্শনিক বিধানে সাধারণীকরণের জন্য কোন স্থান নাই—এখানে 'ভ্রম' আছে ঃ ভাবনাদোষ আছে। কিন্তু দর্শনের আবরণকে সরাইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইনিও আশ্রয়ের সহিত প্রমাতার তাদাত্ম্য এবং সমানুভূতিরই কথা বলিতেছেন ঃ কবির ভাবনারূঢ় কল্পনার দ্বারা সামাজিকের সহৃদয়তা (ভাবনা-কল্পনা) উদ্‌বুদ্ধ হইয়া যায় এবং তিনি আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্যের অনুভবের মাধ্যমে সমান ভাবের অনুভূতি করেন। লৌকিক-অলৌকিকের ব্যবধান এখানে উপস্থিত থাকে না—দুষ্মন্তের সহিত তাদাত্ম্য হইলে পরে তিনি যেমন সেই (কল্পিত) রতির অনুভব করেন, সেইরূপ হনুমানের ভাবনা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার জন্য তিনি সমুদ্রলঙ্ঘনের উৎসাহেরও অনায়াসই (কল্পিত) অনুভব করেন।

পণ্ডিতরাজের পশ্চাতে গম্ভীর শাস্ত্রীয় বিবেচনার ধারা প্রায় সমাপ্ত হইয়া যায়। হিন্দীর রীতি কবিদের অনুরাগ কাব্যশাস্ত্রের আকর্ষক এবং সরল প্রসঙ্গ ও কবিশিক্ষা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল—সাধারণীকরণ প্রভৃতি তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ে কোন আকর্ষণ ছিল না। অতএব কাব্যশাস্ত্রের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের বিবেচনা গতিরুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং প্রায় তিন শতাব্দী পরবর্ত্তীকালের আচার্য

১. বস্তুত: পণ্ডিতরাজ সামান্যরূপে সাধারণীকরণকে স্বীকার করেন নাই :

যদপি বিভাবাদীনাং সাধারণ্যং প্রাচীনৈরুক্তম্ তদপি কাব্যেন শকুন্তলাদিশব্দৈঃ শকুন্তলাত্বাদিপ্রকারকবোধজনকৈঃ প্রতিপাদ্যমানেষু শকুন্তলাদিষু দোষবিশেষকল্পনং বিনা দুরুপপাদম্।

—অর্থাৎ "প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বিভাবাদির যে সাধারণীকরণের কথা বলিয়াছেন তাহাও কাব্যের দ্বারা শকুন্তলাদিবিষয়ে দোষবিশেষ কল্পনা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। (শকুন্তলা স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ নায়িকারূপে প্রতীত হইতে পারেন না। কারণ বস্তুর স্বরূপ যাহা নয় বস্তু সেইরূপ প্রতীত হয় না। অবশ্য শুক্তি রজতরূপে প্রতীয়মান হয়, কারণ সেস্থলে দোষ বর্ত্তমান। শকুন্তলাদিও নিজের অসাধারণ স্বরূপ বর্জন করিয়া সাধারণ কান্তাস্বরূপ ধর্মপুরস্কারের দ্বারা প্রতীত হইতে পারে তখনই যখন সেস্থলে কোন দোষ থাকে।)"—বলা বাহুল্য এই অস্বীকৃতি কেবল শাব্দিক বা সৈদ্ধান্তিক, ব্যবহারে সাধারণীকরণের নিষেধ এখানেও করা হয় নাই।

রামচন্দ্র শুক্ল নিজের প্রসিদ্ধ নিবন্ধ[১] 'সাধারণীকরণ ও ব্যক্তি-বৈচিত্র্যবাদ'এ সহসা ইহার পুনরুদ্ধার করেন। শুক্লজির এই নিবন্ধ ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র বিষয়ক অনুসন্ধানের পরিচ্ছেদ বা অঙ্গ নয় বরং স্বতন্ত্র চিন্তনের পরিণাম। তাঁহার দৃষ্টি অতীতের প্রতি না গিয়া বর্তমানের উপরই স্থির থাকিয়াছে এবং তিনি এইপ্রাচীন সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা নিজস্ব অভিমত 'লোকধর্ম সিদ্ধান্ত'এর সমর্থন করিয়াছেন। অতএব এই নিবন্ধে সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তের শাস্ত্রীয় আলোচনার স্থানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুনরাখ্যানই হইয়াছে। সেই জন্য এই ভিত্তি অনুসরণেই তাঁহার সিদ্ধান্তের মূল্য নির্ধারণ করা উচিত।

বিবেচ্য বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ শুক্লজির উদ্ধরণগুলি এইরূপ :

(১) কোন ভাবের বিষয়কে সেই ভাবের আলম্বনরূপে যখন পর্যন্ত উপস্থিত করা না হয় তখন পর্যন্ত উহাতে রসোদ্‌বোধনের সম্পূর্ণ শক্তি প্রকাশিত হয় না। এইরূপে উপস্থিত করাকেই আমাদের এখানে সাধারণীকরণ বলা হয়।[২]

(২) (ক) কাব্যের বিষয় সর্বদা বিশেষরূপ হয়, সামান্যরূপ হয় না, উহা ব্যক্তিকে উপস্থিত করে, জাতিকে নয়।

(খ) সাধারণীকরণের অভিপ্রায় এই যে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে যে ব্যক্তি-বিশেষ বা বস্তু-বিশেষ উপস্থিত হয়, তাহা যেমন কাব্যে বর্ণিত 'আশ্রয়ের' ভাবের রূপ হয়, সেইরূপ সকল সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতার ভাবেরও আলম্বনরূপ হইয়া যায়।

(গ) কবি বা পাত্র যে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কোন ভাবের ব্যঞ্জনা করেন, পাঠক বা শ্রোতার কল্পনাতেও সেই ব্যক্তি-বিশেষই উপস্থিত থাকেন।[৪]

(৩) আমাদের কল্পনায় মূর্তির রূপ বিশেষ ব্যক্তিরই হইবে কিন্তু সেই মূর্তি এরূপ হইবে যেন তাহা বর্ণিত ভাবের আলম্বন হইতে পারে এবং সেই ভাবকে যাহার ব্যঞ্জনা কবি বা আশ্রয় করেন পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়েও জাগ্রত করিতে পারে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে সাধারণীকরণ আলম্বনত্ব ধর্মেরও হয়।[৫]

(৪) ব্যক্তি তো বিশেষই হয় কিন্তু উহার মধ্যে সামান্য ধর্ম এইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে যে উহার সাক্ষাৎকার করিয়া সকল শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ে একই ভাব অল্পাধিক বিস্তার লাভ করে। × × × 'বিভাবাদি সামান্য রূপের অনুরূপ প্রতীত হয়' ইহার তাৎপর্য এই যে রসমগ্ন পাঠকের মনে এই ভেদভাব থাকে না যে এই অবলম্বন আমার কি অপরের। অল্প সময়ের জন্য পাঠক বা শ্রোতার হৃদয় লোকের সামান্য হৃদয় হইয়া পড়ে।[৬]

(৫) সাধারণীকরণে প্রথমে আলম্বনের দ্বারা ভাবের অনুভূতি কবির মধ্যে হওয়া

১. এই নিবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে 'দ্বিবেদী-অভিনন্দন-গ্রন্থ'এ প্রকাশিত হইয়াছিল।
২. চিন্তামণি ভাগ (১) ১৯৫৭ পৃঃ ২২৭-২৩০
৪, ৫, চিন্তামণি, ভাগ (১), পৃঃ ২২৭-২৩০
৬. রসমীমাংসা, পৃঃ ৯৯

উচিত, পরে উহার দ্বারা বর্ণিত পাত্রে এবং ইহার পরে শ্রোতা বা পাঠকের মধ্যে হওয়া উচিত। বিভাবের দ্বারা যে সাধারণীকরণের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা তখনই চরিতার্থ হয়।[১]

উল্লিখিত উদ্ধরণের অনুসরণে কতিপয় তথ্য প্রকাশিত হয়:

সাধারণীকরণের বিবেচনা কালে ভট্টনায়ক এবং অভিনব গুপ্তের অভিমতের সম্বন্ধে শুক্লজি অজ্ঞাত ছিলেন—কেবল বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। সেই মতেরও তিনি শাস্ত্রীয় আলোচনা না করিয়া কেবল স্বতন্ত্র চিন্তন বা নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম তথ্যটি শুক্লজির সাময়িক অজ্ঞানতা প্রকট করে এবং অপরটি তাঁহার মৌলিক প্রতিভা।

তিনি মূলতঃ আলম্বনের সাধারণীকরণকে স্বীকার করিয়াছেন। আলম্বনের অর্থ হইতেছে ভাবের বিষয়। উহার সাধারণীকরণ এইরূপ ভাবে হয় যে প্রথমে উহা কবির ভাবের বিষয় এবং ইহার পর সহৃদয়-সমাজের ভাবের বিষয় হইয়া যায়।

আলম্বনের সাধারণীকরণের অর্থ ব্যক্তিত্বের তিরোহিতি নয়—অর্থাৎ উহা ব্যক্তি না থাকিয়া জাতি হইয়া যায়। উহার ব্যক্তিত্ব স্থির থাকে কিন্তু উহাতে এমন কিছু গুণের সমাবেশ ঘটে যাহার জন্য উহা সমস্ত সহৃদয় সমাজের সেই ভাবের বিষয় হইয়া যায়—অর্থাৎ সীতা কামিনীরূপ ধারণ করেন না, বরং তিনি নিজস্ব শীল-সৌন্দর্য প্রভৃতি সামান্য গুণের জন্য সকলের প্রেমের বিষয় হইয়া যান। আলম্বনের ব্যক্তিত্বও বজায় থাকিবে এবং উহার সাধারণীকরণও হইয়া যাইবে—এই বিষম সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ করিবার জন্য এবং ইহার সমাধানের জন্য রামচন্দ্র শুক্ল নিজের মূল সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন যে সাধারণীকরণ বস্তুতঃ আলম্বন-ধর্মেরই হয়, অর্থাৎ সেই সব সামান্যগুণের হয় যাহার জন্য সীতা রামের প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হন। এখানে অনেকগুলি কথা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে: সীতা কেবল কামিনী নন, তিনি একজন ব্যক্তি; তিনি রামের প্রিয়া, কিন্তু রামের প্রেমের ভিত্তি স্থানীয় তাঁহার শীল-সৌন্দর্য প্রভৃতি এমন কতকগুলি সামান্য গুণ আছে যাহা সমস্ত সহৃদয়-সমাজের মধ্যে রতিভাব উৎপন্ন করে: সীতা রামের প্রিয়া, কিন্তু প্রেমের ভিত্তি যেহেতু সীতার সামান্য গুণেই, অতএব তিনি সহৃদয়-সমাজেরই প্রিয়—অর্থাৎ সহৃদয় সমাজের প্রেমের বিষয় সীতার ব্যক্তিরূপ নয় বরং সেই ব্যক্তির শীল-সৌন্দর্য প্রভৃতি গুণ। রামচন্দ্র শুক্লের সম্মুখে প্রকৃতপক্ষে স্বীয় দুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল (১) কাব্যের বিষয় (আলম্বন) বিশিষ্ট হয়, এবং (২) কাব্যের আস্বাদন ভাবের সামান্য ভূমিতে হয়। এই সমস্যার সমাধান তিনি নিজের বুদ্ধিবলে নিম্ন ভাবে করিয়াছেন: আলম্বনের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সমর্থ কবি, যাঁহার লোক-হৃদয়ের সহিত পরিচয় আছে, সামান্য গুণের ভিত্তিতে

১. রসমীমাংসা, পৃ০ ৯৯

আলম্বনের সাধারণীকরণ করেন। পরিণামে, সহৃদয় সীতার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এই ভেদভাব থাকে না যে সীতা রামের প্রেমের আলম্বন কিম্বা তাঁহার নিজের প্রেমের। সহৃদয়ের চিত্ত ব্যক্তি-চেতনা হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

প্রথমে কবির হৃদয়ে সীতার প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহার পর তিনি আশ্রয়ের দ্বারা উহাকে ব্যক্ত করেন এবং অবশেষে কাব্যের আস্বাদয়িতা সমস্ত সহৃদয়-সমাজ সেই ভাবের অনুভূতি করেন। অভিনব গুপ্তের গুরু ভট্টতোতেরও এই মত ছিল—নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ।

রামচন্দ্র শুক্লের মতের সার বোধ হয় ইহাই—এখানে আমরা তাঁহার মতটিকেই স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার মতের সত্যাসত্যের নির্ণয় পরে করিব।

এই মতটি ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত হইতে সামান্য পৃথক। এইজন্য সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত কেশব প্রসাদ মিশ্র রামচন্দ্র শুক্লের এই মন্তব্যটিকে 'ভ্রম' বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন :

এখানে সাধারণীকরণের অর্থ হইতেছে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতিকে সাধারণরূপ প্রদান করিয়া উপস্থিত করা। দুইটি অর্থে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সাধারণ অথবা লোক সামান্য হওয়াকে স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রথমটি, স্বরূপতঃ সামান্য হওয়া এবং দ্বিতীয়টি পরিণামে অথবা উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে সামান্য হওয়া। স্বরূপতঃ সামান্য হওয়ার প্রতি আগ্রহ না করাই ভাল কারণ তাহা হইলে সেই অবস্থায় বিভাব অনুভাব প্রভৃতি সীমিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং কাব্যের ব্যাপকতা নষ্ট হইয়া যাইবে। পরিণামে বা অন্তিম ধ্যেয়ের সামান্য (সাধারণীকরণ) রূপকে স্বীকার করিবারও দুইটি প্রকার-ভেদ হইতে পারে। একটি তো বৌদ্ধিক বা দ্বৈতবাদীরূপ যাহা কাব্যকে নৈতিক এবং অনৈতিক দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশিত করে এবং নৈতিক পক্ষের রসাস্বাদন লাভ হয় এবং দ্বিতীয় মনোবৈজ্ঞানিক ধ্বন্যাত্মক বা কলাত্মকরূপ যাহাতে নৈতিকতার প্রশ্ন পৃথকরূপে বিদ্যমান থাকে না, 'ধ্বনিতেই' অবসিত হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রথম রূপটি ভট্টনায়কের—'ভুক্তিবাদের' অনুকূল এবং দ্বিতীয়টি অভিনব গুপ্তের ধ্বনিবাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। বলা বাহুল্য উক্ত (রামচন্দ্র শুক্ল) বিদ্বান্ প্রথম রূপের সমর্থক, কিন্তু আমরা আচার্য, অভিনব গুপ্তের মতটিকেই স্বীকার করি। সাধারণীকরণ কবি বা ভাবুকের চিত্তবৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। চিত্ত তল্লীন এবং সাধারণীকৃত হইলে পর তাঁহার সবকিছুই সাধারণ প্রতীত হয়।[১]

কেশবপ্রসাদ বক্তব্যের শেষে নিজের মতটি সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট করিয়াছেন। অভিনব গুপ্তের অনুসরণে সাধারণীকরণ বলিতে তিনি চিত্তবৃত্তির সাধারণীকরণ অর্থটিই গ্রহণ করিয়াছেন : সহৃদয়ের হৃদয় যখন তল্লীন হইয়া যায় তখন তাঁহার সবকিছুই সাধারণ প্রতীত হইতে থাকে। বিভাবের সাধারণীকরণ একাঙ্গী, ভাবের সাধারণী-

১. সাহিত্যালোচন, ডঃ শ্যামসুন্দর দাস (১৯৯৯) পৃ০ ২৮৪-৮৫ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত।

করণই বাস্তবিক এবং পূর্ণ। অভিনব গুপ্ত নিজের অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই অখণ্ড চেতনার মধ্যে সাধারণীকরণের অনুসন্ধান করিয়াছেন। বিভাবের উপর বল দেওয়ার অর্থ বিষয়ের সত্তার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ দ্বৈতকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দ্বৈতবাদী রস-কল্পনার ভিত্তি মূলতঃ বৌদ্ধিক ও নৈতিকই। এইরূপে কেশব-প্রসাদ আচার্য শুক্লের রস-দৃষ্টিকে দ্বৈতবাদী ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া সেই অনুপাতে তাহাকে অপূর্ণ বলিয়াছেন। অভিনব গুপ্তের মতানুসারে রস আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া-বিশেষ এবং কেশব প্রসাদ-ও এই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াকেই রস-দৃষ্টির পূর্ণরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগের সারাংশ এই যে বিভাব বদ্ধ বা সীমিত,ভাব মুক্ত বা অসীম; অতএব বিভাবের সাধারণীকরণ অপূর্ণ এবং সীমীত।—উহার রূপ বৌধিক বা নৈতিক। ইহার বিপরীতে ভাবের সাধারণীকরণ চিত্তের মুক্তি অথবা সংবিদ্বিশ্রান্তির সমার্থক, অতএব উহা পূর্ণ। পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্রের আলোচন অত্যন্ত তাত্ত্বিক ও সূক্ষ্ম। তিনি আচার্য শুক্লের বিভাবনিষ্ঠ দৃষ্টি ও নৈতিক চেতনার মধ্যবর্তী সম্বন্ধের উদ্‌ঘাটন আন্তরিকতার সহিত করিয়াছেন এবং অব-শেষে উহাকে অভিনব গুপ্তের অদ্বৈতের অপেক্ষা ভট্টনায়কের দ্বৈত-সিদ্ধান্তের সন্নিকট বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তবুও তাঁহার সবগুলি সার-সিদ্ধান্ত যথাবৎ গ্রাহ্য নয়। ইহা ঠিক যে প্রাচীন আচার্যদের মধ্যে ভট্টনায়কের দৃষ্টিকোণ দ্বৈতের উপর আশ্রিত বলিয়া উহাতে বিষয়ের সত্তার স্বীকৃতি আছে এবং যেহেতু তিনিই সর্বপ্রথম রসাস্বাদের প্রসঙ্গে নৈতিকতার প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন অতএব এই ধারণাটিও সঙ্গত যে তাঁহার দৃষ্টিকোণ আধ্যাত্মিক বা শুদ্ধ আনন্দবাদী না হইয়া নৈতিকতার উপর আশ্রিত। এই দুইটি তত্ত্ব এমন যাহা রামচন্দ্র শুক্লের দৃষ্টিকোণেও বিদ্যমান আছে, অতএব তাঁহার মত ভট্টনায়কের অনুকূল এই সিদ্ধান্তটিও অশুদ্ধ নয়। কিন্তু ভট্টনায়ক এবং রামচন্দ্র শুক্লের মতের মধ্যে কিছু স্পষ্ট প্রভেদ বর্তমান আছে—

(১) উদাহরণস্বরূপ ভট্টনায়ক সকলের সাধারণীকরণ স্বীকার করিয়াছেন, কেবল আলম্বনের উপর বল দেন নাই।

(২) নিজ কান্তাস্মৃতির সত্তাকে তিনি রসাস্বাদের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু রামচন্দ্র শুক্ল বিকল্পরূপে এই মতটিকেও গ্রহণ করিয়াছেন যে "যদি কোন পাঠক বা শ্রোতার কোন সুন্দরীর সহিত প্রেম থাকে তাহা হইলে শৃঙ্গার রসের স্বতন্ত্র উক্তি শুনিবার সময় থাকিয়া থাকিয়া আলম্বন রূপে তাঁহার প্রেয়সীর মূর্তি কল্পনালোকে ফুটিয়া উঠিবে।'

(৩) ভট্টনায়ক করুণাদি সমস্ত রসের অনুভূতিকে আনন্দময়ী বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু শুক্লজির রস-ধারণা হৃদয়ের মুক্তাবস্থারই সমার্থক, অর্থাৎ উহা ভট্টনায়কের ভাবকত্ব-ব্যাপার-জন্য 'নিজমোহসঙ্কটতা নিবারণ' এর পরেই সমাপ্ত হইয়া যায় 'ভোগ' পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না।

পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্রের পশ্চাতেও এই আলোচনা-ধারাটি ব্যাহত হয় নাই

এবং ডঃ গুলাবরায় ও পণ্ডিত রামদহিন মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত-ভাবে নিজেদের বিচার ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের আলোচনায় বিষয়ের ব্যাখ্যাই প্রাধান্য পাইয়াছে—কোন নূতন বিচার উপস্থিত হয় নাই।

সারাংশ

এই সম্পূর্ণ বিবেচনার সারাংশ এই যে :

(১) রসের সকল অবয়ব—বিভাব, অনুভাব, স্থায়ী ও সঞ্চারীর সাধারণীকরণ হয়। সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ায় একটি সূক্ষ্ম (অসংলক্ষ্য) ক্রম বিদ্যমান থাকে—বিভাবাদির সাধারণীকরণ প্রথমে হয় এবং পরিণামস্বরূপ ইহার পশ্চাতে স্থায়ী ভাবের হয়। ইহা ভট্টনায়কের মত এবং ইহাতে বিষয় ও বিষয়ী উভয় পক্ষের সমানতা দৃষ্ট হয়।

(২) মূলতঃ রসের বিভাবাদি—সমস্ত অবয়বেরই সাধারণীকরণ হয় এবং বিভাবাদির সাধারণীকরণের ফলে স্থায়ীর সাধারণীকরণ হয় যাহার দ্বারা সহৃদয়ের চেতনা ব্যক্তি-সংসর্গ হইতে মুক্ত হইয়া তল্লীন হইয়া যায়। কিন্তু স্থায়ী ভাবের এই সাধারণীকরণ—অর্থাৎ সহৃদয়-চেতনার এই নির্মুক্তিই অবশেষে মুখ্য হইয়া পড়ে এবং অবশিষ্ট জ্ঞান (সামান্য ও বিশেষ উভয় প্রকারের) উহার মধ্যে লীন হইয়া যায়। ইহা অভিনব গুপ্তের মত এবং ইহাতে অনন্তপক্ষে ভাব এবং বিষয়ী পক্ষ স্বীকৃতি পাইয়াছে।

(৩) তৃতীয় মতানুসারে সাধারণীকরণ সকলেরই স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রমাতা ও আশ্রয়ের তাদাত্ম্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে—প্রমাতার চেতনা বিকাশ লাভ করিয়া হনুমানের চেতনার সহিত একাত্ম হইয়া সমুদ্রলঙ্ঘনের অনুরূপ অলৌকিক কার্যের প্রতিও উৎসাহ অনুভব করে। এখানে হনুমানের (বিভাব) মাত্র উৎসাহী পুরুষ রূপে সাধারণীকরণ স্বীকার করা হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ প্রমাতৃবর্গের অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন হনুমানের সহিত তাদাত্ম্য স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপে এই মতটি ভট্টনায়ক ও অভিনব গুপ্তের মত হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এই মত বিশ্বনাথের। জগন্নাথও দর্শনের শব্দাবলীর সাহায্য লইয়া এই মতটির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিচারানুসারে (ভ্রমবশতঃ হউক না কেন) আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্যই মুখ্য ক্রিয়া।

(৪) রামচন্দ্র শুক্লের মতে সাধারণীকরণ মূলতঃ আলম্বন বা আলম্বনত্ব ধর্মের হয় অর্থাৎ কবি আলম্বনের এইরূপ বর্ণনা করেন যে উহা তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও সাধারণ ধর্মের জন্য সমস্ত পাঠকের হৃদয়ে সেইরূপ ভাব উদ্বুদ্ধ করে, যেমন কাব্য-প্রসঙ্গের অন্তর্গত আশ্রয়ের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবের সাধারণীকরণকে শুক্লজিও যথাবৎ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তিনি বিভাব অর্থাৎ আবলম্বন বা আলম্বন-ধর্মের সাধারণীকরণের উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন।

(৫) সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার তিনটি তত্ত্ব-বিন্দু বর্তমান: কবি, নায়ক (আশ্রয়) এবং শ্রোতা। এই তিনটির ভাব-তাদাত্ম্য হইলে পরে সাধারণীকরণ পূর্ণ হয়। ইহা ভট্টতোতের মত, আচার্য শুক্লও ইহাকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবেচনা

এইসব বিকল্পের মধ্যে কোনটি সত্য—প্রকৃতপক্ষে সাধারণীকরণ কাহার হয়? ইহাই মূল প্রশ্ন যাহার সমাধান না হইলে পর সাধারণীকরণের বাস্তবিক অর্থ ও গুরুত্ব স্পষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়।

'রামচরিত মানসের' 'জনক-বাটিকা' প্রসঙ্গটির অধ্যয়ন করিবার সময় দুইটি সত্তা বিদ্যমান থাকে—একটি বস্তু বা বিষয়ের সত্তা এবং অপরটি প্রমাতা বা বিষয়ীর সত্তা। বিষয়ের অন্তর্গত বিভাব অর্থাৎ আশ্রয় ও আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব ও সঞ্চারীর স্থান, বিষয়ী স্বয়ং সহৃদয় বা প্রমাতা। ভট্টনায়কের মতে বিষয়ের সমস্ত অঙ্গের সাধারণীকরণ হয় এবং পরিণামে প্রমাতার স্থায়ী ভাবেরও হয়। ইহাই মূল সিদ্ধান্ত, কিন্তু ইহারে আলোচনার পূর্বে এই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাবিত সংশোধনের উপর বিচার করিয়া লওয়া অধিক উপযোগী হইবে।

আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্য—সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ায় যেখানে রসের সমস্ত অবয়বের সাধারণীকরণ হয়, সেখানে আশ্রয়ের সাধারণীকরণও অন্তর্ভুক্ত থাকে—অর্থাৎ যেমন পূর্বে স্পষ্ট করিয়াছি, আশ্রয়ের সাধারণীকরণও সমস্ত প্রক্রিয়ার একটি অনিবার্য অঙ্গ। কিন্তু আশ্রয়ের সাধারণীকরণ এবং প্রমাতার দ্বারা আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্য বা সাধারণীকরণ, উভয় অনুভূতির মধ্যে প্রভেদ বর্তমান। প্রথমটির অর্থ হইতেছে, রাম বা হনুমান অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিয়া সামান্য পুরুষ হইয়া যান এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হইতেছে প্রমাতা সেই সময় নিজেকে রাম বা হনুমানরূপে অনুমান করেন এবং ধনুর্ভঙ্গ বা সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি অলৌকিক কার্যের প্রতি তাঁহার মনে উৎসাহ জাগ্রত হয়। প্রথমটিতে রাম বা হনুমানের সামান্য মানব-ধরাতলে নামিয়া আসার কথা বলা হইয়াছে এবং অপরটিতে প্রমাতার বিশেষ/অলৌকিক ধরাতলের উপর পৌঁছানোর কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আশ্রয়ের সাধারণীকরণের অর্থ এই নয় যে ইঁহারা নিজেদের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া জনসাধারণের স্তরে নামিয়া আসেন। ইহা স্বীকার করিয়া লইলে কাব্যের দ্বারা অভিব্যক্ত উদ্‌গতিকরণ সিদ্ধান্তের খণ্ডন স্বতঃই হইয়া যাইবে। কিন্তু সেইজন্য ইহা স্বীকার করিলে চলিবে না যে কাব্যে ব্যক্তির নয় 'জাতি' বা বর্গের চিত্রণ হয় এবং আশ্রয় নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া বর্গগত বা জাতিগত গুণের প্রতীক মাত্র হইয়া যায় কারণ ইহা হইলে পরে কাব্য ভাবানুভূতির বিষয় না থাকিয়া বিচারেরই বিষয় হইয়া পড়িবে এবং উহার প্রভাব শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ এই যে আশ্রয়ের গৌরব বা দেশকালবদ্ধ

রূপ-বৈশিষ্ট্য তিরোহিত হইয়া যায় এবং সামান্য মানবীয় ঔদার্য প্রকাশ লাভ করে যাহা সহৃদয়-সমাজের সংস্কারেও নিসর্গতঃ বিদ্যমান থাকে। তবুও ইহাকে 'আশ্রয়ের সহিত প্রমাতার তাদাত্ম্য' বলা যাইতে পারে না, কারণ তাদাত্ম্যের প্রক্রিয়ায় আশ্রয় তো অপরিবর্তিতই থাকেন। বিশ্বনাথের মতানুসারে প্রমাতা নিজের মধ্যে হনুমানের উৎসাহ অনুভব করেন—এমন কি সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি অলৌকিক কার্যের প্রতিও তাঁহার উৎসাহ জাগ্রত হয়। এই স্থিতি প্রাচীন মতানুসারে অগ্রাহ্য; প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের অলৌকিক পাত্র এবং উহার কার্যকে সামান্য পাঠকের জন্য গ্রাহ্য করিবার জন্যই সাধারণীকরণের প্রয়োজন আরও অধিক হয়। ইহা ব্যতীত 'আশ্রয়' শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। এখানে আশ্রয়ের ব্যক্তিত্ব প্রেয় এবং ভাব মধুর হওয়ার জন্য আমরা কিছুক্ষণের জন্য সন্দেহচিত্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু কেবল রাম ও দুষ্মন্ত বা হনুমান ও অঙ্গদই নয়, রাবণ ও শূর্পণখাও আশ্রয় হইতে পারেন, অর্থাৎ আশ্রয় ঘৃণিত, ক্রূর, ভিন্ন-লিঙ্গী, নীচ—আমাদের ব্যক্তিত্বের ঠিক বিপরীতও হইতে পারেন, আমরা উহার সহিত কতদূর পর্যন্ত তাদাত্ম্য করিতে থাকিব? যদি কেবল প্রেয় চরিত্রগুলিকেই গ্রহণ করা হয়, তবুও তাদাত্ম্য সর্বত্র গ্রাহ্য নাও হইতে পারে; মৃতবৎসা শৈব্যার সহিত তাদাত্ম্য তো শোকের কারণই হইতে পারে, রসের নয়। পণ্ডিতরাজের মতানুসারে, ভাবনা-দোষের জন্য কল্পিত দুষ্মন্তত্ব দ্বারা সহৃদয়-চেতনার আচ্ছাদনের প্রকল্পনাকেও যদি যথাবৎ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবুও এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। যদিও মধ্যে কল্পনাকে লইয়া আসাতে বাস্তবিক শোকের আঘাত কম হইয়া যায়—কিন্তু এই কল্পিত শোকের রসে পরিণতি সম্ভবপর নয়। পণ্ডিতরাজও কাব্যের চমৎকার ব্যতীত ইহার কোন তর্কসম্মত উত্তর দিতে পারেন নাই। অতএব, আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্যের স্বতন্ত্র বা প্রমুখ স্থিতি অগ্রাহ্য; সাধারণী-করণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার অঙ্গরূপেই তাদাত্ম্য স্বীকৃত হইতে পারে।

আশ্রয়ের প্রসঙ্গে নায়কের প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইতে পারে। নায়কের সহিত প্রমাতার তাদাত্ম্য হয়: নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ (তোত)। ইহাতে কি কোন আপত্তি হইতে পারে? আপত্তি স্পষ্ট। সংস্কৃত কাব্যের নায়ক এমন সব গুণের দ্বারা বিভূষিত থাকিতেন যে উহার সহিত তাদাত্ম্য স্থাপন করা প্রত্যেক সহৃদয়ের পক্ষে সহজ ও বাঞ্ছনীয় ছিল। কাব্যের মূল অর্থের অভিব্যক্তি কবি প্রায় নায়কের মধ্যে দিয়া করিতেন, অর্থাৎ কবি স্বয়ং নায়কের সহিত তাদাত্ম্য স্থাপন করিয়া লইতেন, অতএব সহৃদয়-সমাজেরও উহার সহিত সহজ তাদাত্ম্য হইয়া যাইত। এই বিধির প্রয়োগ আজও হইতেছে এবং নায়কের পরম্পরাগত গরিমা আজও নষ্ট হয় নাই। কিন্তু অবস্থার অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজ অনেক প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে নায়কের রূপ উক্ত আদর্শের একদম বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায় যাহার সহিত তাদাত্ম্য সহৃদয়ের পক্ষে সহজও নয়, স্পৃহনীয়ও নয়। উদাহরণস্বরূপ এক সাম্যবাদী উপন্যাসকার কোন এক হৃদয়হীন পুঁজিপতিকে নায়করূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া নিজের সম্পূর্ণ ঘৃণাকে উহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া

দেন। উপন্যাসটি ব্যক্তিপ্রধান কারণ পুঁজিবাদের মূল চেতনা—ব্যক্তিবাদের প্রতি ঘৃণার প্রসার করাই ইহার উদ্দেশ্য। নায়ক অসন্দিগ্ধরূপে সেই ঘৃণিত ব্যক্তিই। কিন্তু আপনি কি উহার সহিত তাদাত্ম্য করিতে পারিবেন? যদি করিতে পারেন তাহা হইলে উহা উপন্যাসকারের ঘোর বিফলতা প্রমাণিত করিবে। এইজন্য 'নায়কের সহিত তাদাত্ম্য'ও কোনমতেই স্থির হয় না এবং রস-পরিপাকের জন্য নায়কের সাধারণীকরণও আশ্রয়ের সাধারণীকরণের অনুরূপই (যদিও ততখানি নয়) অপর্যাপ্তই থাকিয়া যায়।

আলম্বন বা আলম্বন-ধর্মের সাধারণীকরণ

আলম্বন-ধর্মের সাধারণীকরণের অর্থ এই যে কাব্যের বর্ণিত ভাবের বিষয়—ব্যক্তি বা বস্তু—যদিও বিশেষ রূপেই প্রত্যেক সহৃদয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তবুও উহার সামান্য অংশের গুণ যাহা সকলকে সমান রূপে প্রভাবিত করে, তাহা সমস্ত সহৃদয় সমাজের চিত্তে প্রায় একই ভাব জাগ্রত করে। এইরূপ সাধারণীকরণ মূলতঃ আলম্বনের সেইসব গুণের হয় যাহা সম্বদ্ধ ভাবের উৎপত্তির কারণ-রূপ। সীতার সীতাত্ব নষ্ট হয় না, কিন্তু তাঁহার এমন কতকগুলি সামান্য গুণ প্রকাশিত হয় যাহার জন্য তিনি কেবল রামেরই নয় সম্পূর্ণ সহৃদয়-সমুদায়ের অনুরাগভাজন হইয়া যান। আমার ধারণা যে আচার্য শুক্লের মতের ইহার অপেক্ষা অধিক স্পষ্টীকরণ সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইহা কি স্বীকারযোগ্য?

এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা খুবই স্পষ্ট। প্রথমতঃ এই মত ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত উভয়ের মত হইতে ভিন্ন, কেবল বিশ্বনাথের মতের সহিত পরিণামের দিক দিয়া এই মতের ঐক্য বিদ্যমান আছে। ভট্টনায়ক ও অভিনব গুপ্ত উভয়েই আলম্বন প্রভৃতির ব্যক্তি ধর্মের বিলুপ্তিকে স্বীকার করেন—উহা ভিন্ন বিভাবের এবং ভাবের সাধারণীকরণ সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয়। এই স্বতঃস্পষ্ট তথ্যটিকে স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই—রামচন্দ্র শুক্লের যুগটি নানা সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল কারণ অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির গ্রন্থ সেই সময় সুলভ ছিল না। অধিকন্তু তাঁহার চিন্তাধারাও একান্তরূপে শাস্ত্রবদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় কথা এই যে বিশেষ রূপকে সুরক্ষিত রাখিয়া আলম্বনের সাধারণীকরণের সিদ্ধি, প্রকৃতপক্ষে, সম্ভবপর নয়। স্বয়ং রামচন্দ্র শুক্ল ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন সেইজন্য তিনি আলম্বন হইতে সরিয়া আলম্বনত্ব বা আলম্বন-ধর্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পরে উহাকে তাঁর নৈতিক আধার প্রদান করিতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র শুক্লের পক্ষে সেইসব আলম্বন গ্রাহ্য নয় যাহার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই কারণ তাহার তো সাধারণীকরণ হইতেই পারে না। এই সব কথাগুলির জন্য ক্রমশঃই ব্যাপারটা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে—প্রথমে, আলম্বন, তাহার পরে আলম্বন-ধর্ম এবং শেষে উহার ঔচিত্য এবং নৈতিক ভিত্তির কথা। এইসব নানা কথার কারণ এই যে ভাবের বিষয়কে

ভাব হইতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে এবং সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ায় একটি অঙ্গ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় অভিযোগ এই যে এইরূপ আলম্বনের ক্ষেত্র সীমিত হইয়া যায় এবং কেবল পরম্পরার দ্বারা নির্ধারিত আলম্বনগুলিই কাব্যের জন্য গ্রাহ্য হয়—অর্থাৎ রামাদি কেবল প্রীতিকর ভাবের এবং রাবণাদি অপ্রীতিকর ভাবের আবলম্বন রূপে গৃহীত হন। অতএব এই রসদৃষ্টি পরম্পরাগত নৈতিক মূল্যের দ্বারা পরিবদ্ধ। সাধারণতঃ পরম্পরা ও নৈতিক মূল্যের শাসন শ্রেয়স্করই এবং কাব্যমূল্য নৈতিক মূল্য হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্রও নয়। কিন্তু তবুও নৈতিক মূল্য ও সাহিত্যিক মূল্য সমার্থক হইতে পারে না। অন্যথা ভাব-ক্ষেত্রের বিকাশই স্তব্ধ হইয়া যাইবে এবং 'মেঘনাদ বধ'-এর অনুরূপ মহান্ কাব্যের রসবত্তাই খণ্ডিত হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে পরম্পরা ও নীতি সংহিতার বিশেষ গুরুত্ব আছে, কিন্তু মানবতা উহার অপেক্ষা অনেক বড়। অতএব পরম্পরা ও নীতি বিধানের প্রতি নিষ্ঠাবান্ থাকিয়াও কাব্য-মূল্যকে মানবীয় ও সার্বভৌম হইতে হইবে। প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটিকে যথাবৎ স্বীকার করিলে রসের ক্ষেত্র সীমিত হইয়া যায়—মানবাত্মার সেই দিব্যকান্তি যাহা প্রথা ও নীতির আবরণ ভেদ করিয়া জীবনের অসাধারণ মুহূর্তে প্রকাশ লাভ করে, তাহাকে এই রস-দৃষ্টির পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নয়, অন্যথা কেবল মাইকেলই নয়, সুরদাস ও টল্‌স্টয়ের অনুরূপ শিল্পীদের সহিতও ন্যায় বিচার করা হইবে না।

সহৃদয়ের চেতনার সাধারণীকরণ

সহৃদয়ের চেতনার সাধারণীকরণ বা নির্মুক্তি রসাস্বাদনের অন্তিম ও আধারভূত ক্রিয়া। কিন্তু ইহা সাধারণীকরণের পরিণামরূপ। বিভাবাদি সাধারণীকৃত রূপে উপস্থিত হইলে পর অবশেষে প্রমাতার চেতনাও স্ব-পরের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া তল্লীন হইয়া যায়। পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্র অভিনব গুপ্তের প্রমাণের ভিত্তিতে এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন : "চিত্ত তল্লীন ও সাধারণীকৃত হইলে পর তাঁহার (প্রমাতার) সব কিছুই সাধারণ প্রতীত হয়।"[১] কিন্তু এই ধারণা যথাবৎ মান্য নয়—চিত্তের তল্লীনতাই তো সংবিদ্বিশ্রান্তি এবং উহাই রস, অতএব উহা সাধারণীকরণের কারণ হইতে পারে না, উহা তো কার্য বা পরিণতি। চিত্ত তল্লীন হইলে প্রমাতা, অভিনব গুপ্তের মতানুসারে, আত্মাস্বাদ-রূপ রসের অনুভূতি করেন, সেই সময় তাঁহার অন্য পদার্থের সাধারণ প্রতীতির অবসরই থাকে না। সাধারণীকরণ রসাস্বাদের সমরূপ, সহচারী বা সঞ্চারী নয়, উহা তো কারণ বিশেষ। অতএব এই সিদ্ধান্তটিও কোন মতেই মান্য নয় যে প্রমাতৃ-চেতনার তল্লীনতাই বস্তুতঃ সাধারণীকরণ।

১. সাহিত্যালোচন—(১৯৯১ বিক্রম শতাব্দী), পৃ০ ২৮৫

সর্বাঙ্গের সাধারণীকরণ

অবশেষে আমরা পুনরায় ভট্টনায়কের নিকটই ফিরিয়া আসি যাঁহার মতে প্রকৃত পক্ষে সর্বাঙ্গেরই সাধারণীকরণ ঘটে। প্রাগুক্ত 'জনক-বাটিকা প্রসঙ্গ'-এ আশ্রয় রাম, আলম্বন সীতা, আশ্রয়ের চেষ্টা সকল-অনুভাব, জনক-বাটিকার রমণীয় পরিবেশ-উদ্দীপন, রামের হৃদয়ের সঞ্চরণশীল হর্ষ, মতি প্রভৃতি ভাব সমস্তই সাধারণীকৃত হইয়া যায়। অন্য ভাবে বলা যাইতে পারে যে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটিরই, বিশিষ্ট দেশকাল-বদ্ধ ঘটনারূপ আর অবশিষ্ট না থাকিয়া, সাধারণীকরণ হইয়া যায় কিন্তু এই কাব্য প্রসঙ্গটি আপন হইতে একটি জড় পদার্থ বিশেষ—ইহার চৈতন্য অংশ ইহার 'অর্থ' এবং এই 'অর্থ'টি কি? কবির সংবেদ্য—কবির অনুভূতি; সামান্য ভাবানুভূতি নয়, সর্জনাত্মক অনুভূতি, ভাবের কল্পনাত্মক পুনঃসৃজনের অনুভূতি—ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের শব্দাবলীতে ইহাকেই 'ভাবনা' বলা হয়। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম 'ধ্বন্যর্থ' যাহা এক দিকে কবির অর্থকে ব্যক্ত করে এবং অপর দিকে প্রমাতার চিত্তে সমরূপ অর্থ উদ্‌বুদ্ধ করে। কাব্য প্রসঙ্গ ইহারই মূর্তরূপ বা বিম্বরূপ। অর্থের অনুরূপই বিম্ব সরল বা সংশ্লিষ্ট হয়—প্রায়ঃ সংশ্লিষ্টই হয়। উল্লিখিত বিম্ব নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট, উহাতে নানা লঘুবিম্ব সমন্বিত রূপে বিদ্যমান আছে। রামের বিষয়ে কবির ভাবাত্মক কল্পনা 'আশ্রয় রামে' র রূপ ধারণ করিয়া বিম্বিত হইয়াছে। সীতা-বিষয়ক ভাবনা 'আলম্বন সীতা' রূপে, তাঁহাদের প্রথম মিলনের পবিত্র-রমণীয় বাতাবরণের ভাবনা 'উদ্দীপক জনকবাটিকা' রূপে এবং রামের হৃদয়ে উদ্‌ভূত ভাবনার কল্পনা 'হর্ষ, মতি প্রভৃতি সঞ্চারী' রূপে বিম্বিত হইয়াছে। এইসব লঘু বিম্বগুলি সংযুক্ত হইয়া একটি সংশ্লিষ্ট বিম্বের নির্মাণ করে যাহা রামসীতার প্রথম মিলন বিষয়ক কবির সংশ্লিষ্ট 'ভাবনা' কে শব্দ-মূর্ত রূপ প্রদান করে। অতএব কাব্য-প্রসঙ্গ আর কিছু নয় কবির 'ভাবনা'র বিম্বরূপ মাত্র—এই কাব্য-প্রসঙ্গ বা বিম্ব শরীর বিশেষ এবং উহার প্রকাশক কবি-ভাবনা চৈতন্য আত্মা বিশেষ। এবং, যেহেতু সাধারণীকরণ জড় যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়, চৈতন্য ক্রিয়া অতএব কাব্যপ্রসঙ্গ বা রসের সমস্ত অবয়বের সাধারণীকরণকে স্বীকার করা মনোবৈজ্ঞানিক[১] দৃষ্টিতে অধিক অনুকূল। ভট্টনায়কের বিষয়প্রধান ধারণা ও অভিনব গুপ্তের বিষয়িপ্রধান ধারণা—উভয়ের সহিত এই মতের সামঞ্জস্য স্পষ্ট, প্রকৃতপক্ষে ইহা উভয় মতের মধ্যবর্তী অনুস্যূত সম্বন্ধ-সূত্র বিশেষ। বর্তমান যুগে রস-সিদ্ধান্তের সর্বাধিক সমর্থ প্রতিষ্ঠাপক আচার্য শুক্লেরও ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

বিগত দশকে আমার এই সিদ্ধান্তটিকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিবাদ হইয়াছে এবং উহার বিরুদ্ধে নানা যুক্তি ও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেশির

১. কয়েকজন পণ্ডিত মনোবিজ্ঞানের নাম শুনিলেই রাগিয়া যান, ইহাতে না মনোবিজ্ঞানের দোষ আছে, না আমার।

ভাগ অভিযোগ পূর্বাবিষ্ট মন অথবা ব্যক্তিগত নিষ্ঠার উপর আশ্রিত, অতএব এই সব অভিযোগের মধ্যে যুক্তি বা সত্যান্বেষণের আগ্রহ ততখানি নাই যতখানি রামচন্দ্র শুক্লের প্রতি তর্কাতীত বিশ্বাস এবং গুরুদ্রোহীর প্রতি আক্রোশ বিদ্যমান আছে। এই সব অবোধ তার্কিক এবং মন্ত্রদাতারা করুণারই পাত্র কারণ ইঁহারা কি বলিতে চান এবং কি বলিতেছেন নিজেরাই জানেন না। কিন্তু দুইটি অভিযোগ এমন আছে যাহার সমাধান এই বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য আবশ্যক। একটি অভিযোগ স্বর্গীয় ডঃ গুলাব রায় করিয়াছেন—তিনি ইহা স্বীকার করেন না যে সম্পূর্ণ কাব্য-প্রসঙ্গ (আশ্রয় আলম্বন ও উহার সহিত সম্বন্ধ ঘটনা প্রভৃতি) কবির অনুভূতির প্রতীক মাত্র, উহার কোন স্বতন্ত্র বস্তু-স্থিতি বা স্থায়িত্ব নাই :

যদিও এই কথাটি অনেকাংশে ঠিক যে রাম-সীতাদির রূপ বিভিন্ন কবিগণের চিন্তার অভিব্যক্তির উপরই আশ্রিত তবুও জনতার হৃদয়েও পরম্পরাগত সংস্কারের জন্য একটি সামান্য বিচার প্রথম হইতে বিদ্যমান থাকে, উহাই আলম্বনের বিষয়গত অস্তিত্ব। যাহা সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান আছে তাহা মানসিক হইলেও বিষয়গম্যরূপ (objectivity) ধারণ করিয়া লয়। (সিদ্ধান্ত ঔর অধ্যয়ন, দ্বি. সং. পৃ০ ২১৩)।

প্রকৃতপক্ষে গুলাব রায়ের এই মন্তব্য এবং আমার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন বিশেষ বিরোধ লক্ষিত হয় না কারণ তিনিও অবশেষে আলম্বন প্রভৃতির অস্তিত্বকে মানসিক বা সংস্কারগত রূপেই স্বীকার করিয়াছেন। একটি 'জনকবাটিকা-প্রসঙ্গ' 'প্রসন্নরাঘব' এও আছে এবং অপরটি 'রামচরিত মানস' এ এবং 'বাল্মীকি রামায়ণ' এ উহার কোন উল্লেখ নাই। এমন অবস্থায় উহার প্রকৃতরূপ কি ছিল? গুলাব রায় বলিবেন যে জনমানসে এই প্রসঙ্গের যে 'সাধারণ' সংস্কার বিদ্যমান আছে তাহাই উহার বস্তুগত আধার রূপ। কিন্তু এই সাধারণ সংস্কারও কবির অনুভূতির দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে ইহা বিভিন্ন কবিদের অনুভূতির সমষ্টি রূপই। এবং ইহা ব্যতীত, মানস'এর জনকবাটিকা প্রসঙ্গ জনমানসের সাধারণ সংস্কারের বিম্ব মাত্র নয়—তুলসীর তদ্বিষয়ক মনোবিম্বের শব্দ-রূপ। এইজন্য গুলাব রায়ের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়-সত্তাও অবশেষে বিষয়িগতই সিদ্ধ হয় এবং তাঁহার মতভেদ মূল সিদ্ধান্তের সহিত না হইয়া কেবল আপেক্ষিক গুরুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে—অর্থাৎ তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল যে আমি সম্পূর্ণ গুরুত্ব করিব বিশিষ্ট অনুভূতির উপরই কেন্দ্রীভূত করিয়াছি। কিন্তু এরূপ কিছুই করি নাই। আমি কোথাও কবির অনুভূতিকে 'বিশিষ্ট' বা 'বৈয়ক্তিক' অনুভূতি বলিয়া স্বীকার করি নাই।

দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে যেরূপ প্রত্যেক অবস্থায় আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্য স্থাপিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, সেইরূপ প্রত্যেক অবস্থায় কবির সহিত তাদাত্ম্য স্থাপিত করা কঠিন হইতে পারে। যেরূপ আশ্রয়ের ভাবচিন্তা আমাদের ভাব-চিন্তা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত হইতে পারে, সেইরূপ কবিরও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন প্রগতিবাদী কবি বিদ্রোহের উগ্র ভাবধারার দ্বারা অভিভূত

হইয়া ভারতীয় পরম্পরা উপহাস করেন বা চিরন্তন প্রয়োগশীলতার প্রতি আগ্রহী কবি জীবনের শাশ্বত মূল্যের প্রতি ব্যঙ্গ করেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমাদের একাত্ম হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব, অর্থাৎ উক্ত প্রগতিবাদী বা আধুনিক কবির অনুভূতির সাধারণীকরণ কেমন করিয়া সম্ভবপর। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্ত কবিদের সম্বন্ধেও এই সমস্যাটি উপস্থিত হয়। তাঁহাদের 'সহচরী ভাব'এর সাধারণীকরণ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এই সমস্যার সমাধানও কঠিন নয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল অবস্থা এইরূপ যেখানে কবির পক্ষে নিজস্ব ভাবচিন্তার সাধারণীকরণ সম্ভবপর নয়—সাম্প্রদায়িক চেতনা অথবা রাজনীতিক বা সাহিত্যিক পূর্বাবিষ্টতার জন্য তাঁহার অনুভূতি বিশিষ্টই থাকিয়া যায়। এবং, যখন কবি স্বয়ংই নিজস্ব অনুভূতির সাধারণীকরণে অসমর্থ থাকিয়া যান তখন পাঠক বা পাঠক-সমাজের চিত্তে সমরূপ অনুভূতির উদ্‌বোধন তাঁহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? এইরূপ মূলতঃ অ-সাধারণীকৃত বা সাধারণীকরণের পক্ষে অযোগ্য কবি—অনুভূতির উদাহরণের অনুসরণে আমাদের সিদ্ধান্তটিকে অসিদ্ধ প্রমাণিত করা যায় না। বাস্তবিক দৃষ্টিতে উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে অনুভূতি ব্যক্তিগতই থাকিয়া যায়, কাব্যানুভূতির রূপধারণ করিতে পারে না কারণ কবি বা কবিকর্মরত ব্যক্তি, স্বয়ংই নিজের চিত্তকে তল্লীন করিতে পারেন নাই—তিনি তো নিজের ব্যক্তিগত (বর্গগত বা সম্প্রদায়গত)[১] ভাবকেই বাণীরূপ প্রদান করিতেছেন এবং ব্যক্তিগত ভাবের অভিব্যক্তি কবিতা নয়। ইহার বিপরীত যেখানে তাঁহার কবি-কর্ম সাফল্য লাভ করে, দৃষ্টান্তরূপে 'মেঘনাদ বধ', সেখানে সাধারণীকরণ হইয়া যায় এবং হিন্দু পাঠকও নিজস্ব ব্যক্তিগত বা জাতিগত সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সহৃদয়তার সমভূমিতে কবির সহিত কিছুক্ষণের জন্য একাত্ম হইয়া যান।

"অতএব আমাদের সার কথা এই যে সাধারণীকরণ কবির নিজস্ব অনুভূতির—অর্থাৎ যখন কোন কবি নিজস্ব অনুভূতিকে এইরূপে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হন যে উহা সকলের হৃদয়ে সমান অনুভূতি জাগ্রত করিতে পারে তখন পারিভাষিক শব্দাবলীর সাহায্যে আমরা বলি যে উহাতে সাধারণীকরণের শক্তি বিদ্যমান আছে। প্রত্যেকের অনুভূতি জাগ্রত হয়, সকল ব্যক্তি অনুভূতিকে যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তও করেন, কিন্তু সাধারণীকরণের শক্তি সকলের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। সেইজন্য অনুভূতি ও অভিব্যক্তির শক্তি বর্তমান থাকিলেও সকলে কবি হন না। তিনিই কবি হন যিনি নিজের অনুভূতির সাধারণীকরণ করিতে পারেন। অর্থাৎ "যিনি লোকহৃদয়ের সহিত পরিচিত।" এই স্থানে পৌঁছাইতে পারিলে সকল বাধা আপন হইতে দূর হইয়া যায়। যদিবা কোন আশ্রয়ের ব্যক্তিত্ব আমাদের ব্যক্তিত্ব হইতে বিপরীত হয়, বা কোন নায়ক আমাদের ঘৃণা এবং ক্রোধের বিষয়রূপ হয়, অথবা কোন আলম্বনের প্রতি আমাদের অনুচিত ভাব বিদ্যমান থাকে অথবা যদি আশ্রয়রূপ রাবণ কোথাও রামের

১. বর্গ-চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাও ব্যক্তি-চেতনারই প্রক্ষেপণ মাত্র।

তিরস্কার করেন তাহা হইলে কি বা আসে যায়? আমাদের রসানুভূতিতে কোন বাধা আসে না কারণ আমাদের অন্তরে সেই অনুভূতিই জাগ্রত হয় যাহা কবি এই প্রতীকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। রাবণের প্রতি মাইকেলের হৃদয়ে সহানুভূতি আছে এইজন্য 'মেঘনাদ বধ'-এর এই প্রসঙ্গ আমাদের হৃদয়ে রাবণের জন্য সহানুভূতি ও রামের প্রতি তুচ্ছভাব জাগ্রত করে। তুলসীর হৃদয়ে যদি রামের প্রতি ভক্তি এবং রাবণের প্রতি ঘৃণাভাব বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে এই প্রসঙ্গ উহারই অনুকূল রাবণের জন্য উপহাস, তুচ্ছভাব বা ঘৃণা এবং রামের প্রতি ভক্তিভাব জাগ্রত করিবে। আমাদের উভয় পরিস্থিতিতে রসানুভূতি হইবে। আশ্রয় যদি ভিন্নলিঙ্গী হয় অর্থাৎ যদি পুরুষ পাঠকের সম্মুখে 'খণ্ডিতা'র বিরহ নিবেদন বা নারী পাঠকের সম্মুখে খলনায়কের চাটুকারিতার বর্ণনা হয় তবুও কোন পার্থক্য দেখা দিবে না কারণ আমরা খণ্ডিতার সহিত তাদাত্ম্য করি না এবং খল নায়কের সহিতও করিনা। আমাদের তাদাত্ম্য এই সব বিম্বগুলির দ্বারা ব্যক্ত কবিভাবের সহিত হয়। এইরূপ যদি সাম্য-বাদী লেখকের উপন্যাসের পুঁজিপতি নায়ক নিজের কুৎসার জন্য জঘন্যরূপে বর্ণিত হয় তবুও কিছু আসে যায় না, আমরা উহার সহিত তাদাত্ম্য সূত্রে আবদ্ধ হই না। আমরা (আমাদের অনুভূতি) লেখকের (অনুভূতির) সহিত তাদাত্ম্য স্থাপনা করি। অতএব আমরা লেখকের অনুরূপ উহার জঘন্য বৃত্তির প্রতি আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধ জাগ্রত করিয়া উপন্যাসের রস গ্রহণ করিয়া থাকি। ঠিক এই রূপ যদি সীতার প্রতি আমাদের পরম্পরাগত পূজ্য-বুদ্ধি বর্তমান থাকে তাহা হইলেও কোন পার্থক্য হয় না। কাব্যে তিনি সীতা নন, তিনি তো কবির অনুভূতির প্রতীকমাত্র। তাঁহার প্রতি যদি তুলসীর হৃদয়ে অমিশ্রিত রতির অনুভূতি না জাগ্রত হইয়া শ্রদ্ধামিশ্রিত রতির অনুভূতি জাগ্রত হয় তাহা হইলে আমাদেরও ঠিক সেইরূপ হইবে। আমরা রামের সহিত তাদাত্ম্য না করিয়া কেবল তুলসীর সহিতই করিব। এমন অবস্থায় আমাদের রসানুভূতি নিশ্চিত হইবে কিন্তু উহা অমিশ্রিত শৃঙ্গারের হইবে না। ইহার বিপরীতে 'কুমারসম্ভব' বা রীতিকালীন রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম প্রসঙ্গ পড়িয়া যদি আমাদের সমিশ্রিত শৃঙ্গারে অনুভূতি হয় তাহা হইলে কারণ এই যে তুলসী হইতে ভিন্ন কালিদাস বা রীতি-যুগের কবিদের তদ্‌বিষয়ক অনুভূতি সমিশ্রিত রতিরই অনুভূতি ছিল। উহাতে কোন মানসিক বিকৃতি ছিল না। ইহাই সহজ সত্য কিন্তু ইহাকে একদিকে সাধারণীকরণের আবিষ্কারক ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত প্রভৃতিরা ভারতবর্ষের অব্যক্তিগত কাব্য-পরম্পরা জন্য এবং অপরদিকে আধুনিক আলোচনার ক্ষেত্রে উহার সর্বাধিক প্রবল পৃষ্ঠপোষক রামচন্দ্র শুক্ল নিজস্ব বস্তুপরক বা নৈতিক রস-দৃষ্টির জন্য, অভিজ্ঞ হইয়াও, সম্পূর্ণ ও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই।

যদি আপনি বিরক্ত না হইয়া থাকেন তো আসুন আর একটি আবশ্যক প্রশ্নের সমাধান করা যাক। কবির পক্ষে সাধারণীকরণ কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়। তিনি নিজের অনুভূতির কেমন করিয়া সাধারণীকরণ করেন? স্বদেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ

ইহার দুইটি উত্তর দিয়াছেন—(১) সাধারণীকরণ ভাষা বা কাব্যভাষার ধর্ম, (২) মানব-সুলভ সহানুভূতি সাধারণীকরণের মূলাধার যাহা প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে একইরূপে অনুস্যূত থাকে।

প্রথমটির উত্তরে ভট্টনায়ক ও অভিনব গুপ্তের মতের আভাস পাওয়া যায়। ভট্টনায়ক কাব্যের মধ্যে (কাব্যময় শব্দে) এমন একটি 'ভাবকত্ব' শক্তির সত্তা স্বীকার করেন যাহার দ্বারা ভাবের আপন হইতে সাধারণীকরণ হইয়া যায়। অভিনব গুপ্ত শব্দে ভাবকত্বের কল্পনাকে নিরাধার বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন এবং শব্দের সর্বপ্রধান শক্তি ব্যঞ্জনাতেই সাধারণীকরণের শক্তি নিহিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিদেশের পণ্ডিতগণ ভাষাকে এমন জ্ঞান ও ভাব-প্রতীকের সমূহ বলিয়া স্বীকার করেন যাহা সেইসব বিশেষ জ্ঞানখণ্ড ও ভাবকে সমানরূপ সকলের চেতনায় জাগ্রত করিতে সমর্থ। জ্ঞান ও ভাব প্রকৃতপক্ষে পরস্পর বিপরীত না হইয়া চেতনার দুইটি সংস্থান বিশেষ ঃ জ্ঞান প্রথম সংস্থান এবং ভাব দ্বিতীয়। কখনও তো এমন হয় যে কোন বিশেষ প্রতীক আমাদের চেতনায় কোন বস্তুর মাত্র জ্ঞান উৎপন্ন করে এবং কখন সেই জ্ঞান ব্যতীত উহার 'ভাবন' ও করে। ভাষার ইহাই দুইটি প্রয়োগ। প্রথমটিতে প্রতীকগুলি কেবল জ্ঞান উৎপন্ন করে, অপরটিতে ভাবও জাগ্রত হয়। প্রথম প্রয়োগটির ব্যবহার আমরা সকলেই সাধারণতঃ করিয়া থাকি, অপরটির কেবল ভাব-দীপ্ত ক্ষণে করিয়া থাকি—যখন আমাদের নিজস্ব ভাব প্রতীকের উপর আরূঢ় হইয়া উহাদের এইরূপ ভাবময় করিয়া দেয় যে উহাদের মধ্যে শ্রোতাদের হৃদয়ে সমরূপ ভাব উদ্‌বুদ্ধ করিবার শক্তি আসিয়া যায়। তাৎপর্য এই যে শব্দের ভাবোদ্দীপন করিবার শক্তি মূলতঃ আমাদেয় ভাবগুলির দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। এখন আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন যে এক ব্যক্তির ভাব অপর ব্যক্তির হৃদয়ে সমভাব কেমন করিয়া উৎপন্ন করে তবে উহার উত্তর এই যে মূলতঃ সম্পূর্ণ মানবতা একই চেতনার দ্বারা চৈতন্য প্রাপ্ত। প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে (ভারতীয় দর্শন তো চরাচরকেও নিজের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া লয়) চেতনার এমন একটি সূত্র অনুস্যূত যে কোন এক স্থান স্পর্শ করিলে সমগ্র হৃদয় ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। ইহার মধ্যে আপনি বোধ হয় রহস্যবাদের আভাস পাইতে পারেন কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে মনোবিজ্ঞান, শরীর-শাস্ত্র ও অধ্যাত্ম এখনও ইহার অপেক্ষা অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

অতএব সাধারণীকরণের অর্থ হইতেছে ভাষার ভাবময় প্রয়োগ। প্রযোক্তার ভাব শক্তির উপর ভাষার ভাবময় শক্তি নির্ভরশীল থাকে, এবং প্রযোক্তার ভাবের সংবেদন শক্তির ভিত্তি হইতেছে—মানবসুলভ সহানুভূতি।

ভাব-শক্তি অল্পবিস্তর প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে বর্তমান থাকে। এইজন্য সাধারণী-করণের শক্তিও অল্পবিস্তর প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, নচেৎ জীবন-যাত্রা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সাধারণীকরণের বিশেষ শক্তি সেই ব্যক্তির মধ্যেই সঞ্চিত থাকে যাঁহার ভাব-শক্তি বিশেষরূপে সমৃদ্ধ, যাঁহার অনুভূতি বিশেষরূপে সজাগ। এমন

ব্যক্তিই ভাষার ভাবময় প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন অর্থাৎ নিজস্ব সমৃদ্ধ ভাবের বলে তিনি ভাষার প্রতীকগুলিকে সহজই এমন শক্তি-প্রদান করেন যে উহা অপরের হৃদয়েও সমভাব জাগ্রত করে। এমন ব্যক্তিকেই কবি বলা হয়।'' ('রীতিকাব্য কী ভূমিকা' হইতে উদ্ধৃত)।

■ ■ ■

চতুর্থ অধ্যায়

(ক) ভাবের বিবেচনা

(খ) রস-সংখ্যা

(ক) ভাবের বিবেচনা

ভাবেরও বিবেচনা সর্বপ্রথম ভরতই করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে ভাবেরই ব্যাখ্যা হইয়াছে ঃ

ভাবা ইতি কস্মাৎ। কিং ভবন্তীতি ভাবাঃ, কিং বা ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ।

(না০ শা০ ১০৪)

—ভাবের ব্যুৎপত্তি কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে? যাহা হয় তাহাই ভাব অথবা যাহা নিষ্পাদন (ভাবিত) করে তাহাই ভাব।

প্রথম ব্যুৎপত্তি ভূ ধাতু অর্থাৎ 'হওয়া'র অর্থে করা হইয়াছে—যাহার অর্থ স্থিতি বা সত্তা; দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিও ভূ ধাতুর দ্বারা 'নিষ্পাদন করা'র অর্থে করা হইয়াছে এবং ইহার প্রয়োগ ব্যাপ্ত্যর্থে করা হইয়াছে। কাব্যশাস্ত্র-প্রসঙ্গে ভরত এই দ্বিতীয় অর্থটি-কেই গ্রহণ করিয়াছেন ঃ

ভূ ইতি করণে ধাতুঃ তথা চ ভাবিতং বাসিতং কৃতমিত্যনর্থান্তরম্। লোকেঽপি চ সিদ্ধমহো হ্যনেন গন্ধেন রসেন বা সর্বমেব ভাবিতমিতি। তচ্চ ব্যাপ্ত্যর্থম্।

—অর্থাৎ ভূ ধাতুর এখানে করণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে, ভাবিতের অর্থ হইতেছে অনুবাসিত। সাধারণ ক্ষেত্রেও এমন ব্যবহার হয় যে অমুক গন্ধ বা রসের দ্বারা সমস্ত বাতাবরণ ভাবিত বা অনুবাসিত হইয়াছে। এখানে ভাবনের অর্থ ব্যাপ্তি।

(না০ শা০, পৃ০ ১০৪-১০৫)

নিজের অভিপ্রায়ের স্পষ্টীকরণের জন্য ভরত তিনটি আনুবংশ্য শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিভাবৈরাহৃতো যোঽর্থো অনুভাবৈস্তু গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥১॥
বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।
কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্‌ভাব উচ্যতে ॥২॥
নানাভিনয়সম্বন্ধান্‌ভাবয়ন্তি রসানিমান্।
যস্মাত্তস্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাট্যযোক্তৃভিঃ ॥৩॥

উক্ত শ্লোকগুলির অনুসারে ভাবের তিনটি অর্থ প্রকট হয় ঃ

(১) যে অর্থ বিভাবসমূহ দ্বারা আহৃত হয়, অনুভাবসমূহ দ্বারা প্রতীত হয়, অর্থাৎ বাক্য, অঙ্গ, সত্ত্ব অভিনয়রূপ অনুভাব দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়, তাহাকেই ভাব বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে ভাবের অভিপ্রায় 'কাব্যার্থ'।

(২) বাক্য, অঙ্গ ও মুখরাগ দ্বারা, সত্ত্ব দ্বারা এবং অভিনয় দ্বারা কবির অন্তর্গত ভাবকে ভাবিত করে, এই জন্য ভাব বলিয়া কথিত হয়। এখানে ভাবের অর্থ 'কবির ভাবকে যে তত্ত্ব সহৃদয়ের চিত্তে ব্যাপ্ত করে।'

(৩) যেহেতু নানা অভিনয় দ্বারা সংবদ্ধ এই রসসমূহকে ভাবিত করে, সেই হেতু ইহা নাট্য প্রযোক্তাগণ কর্তৃক ভাব বলিয়া বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এখানে ভাবের অর্থ সেই সব তত্ত্ব যাহা কাব্যার্থকে সহৃদয়ের চিত্তে ব্যাপ্ত করে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যার সার নিম্নরূপ : নাট্যশাস্ত্রে ভাবের সত্তাকে বস্তুগত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। উহা হয় (১) কাব্যার্থের বাচক অর্থাৎ সেই অর্থের বাচক যাহা কাব্যবস্তু এবং নাট্যকৌশলের দ্বারা সহৃদয়ের চেতনায় ব্যাপ্ত হইয়া যায়, অথবা সেই তত্ত্ব বা সেই সব তত্ত্বের বাচক যাহা নাট্য উপকরণের মাধ্যমে কবিগত অনুভাবকে সহৃদয়ের চেতনায় পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয় অর্থাৎ (২) রসের সামগ্রী—বিভাব, অনুভাব ও স্থায়ীর বাচক 'অন্যথায়' সেইসব তত্ত্বের বাচক যাহাদের দ্বারা চতুর্বিধ অভিনয় দ্বারা ব্যক্ত কাব্যার্থ সহৃদয়ের চেতনায় ব্যাপ্ত হইয়া যায়—এখানেও (৩) বিভাবাদির সামগ্রীই অভিপ্রেত। আধুনিক শব্দাবলীতে প্রাচীন আচার্যদের মতানুসারে 'ভাব' হয় কাব্য অথবা নাট্যের 'সংবেদ্য তত্ত্বের' বাচক নতুবা 'সংবেদক তত্ত্বের' বাচক। উহা 'মনোবেগ' (মানসিক-শারীরিক অনুভূতি) বা 'চেতনার মাত্রার' দ্যোতক নহে। ভাবের একটি অর্থ অনুভূতিগতও বর্তমান আছে, যেমন 'কবেরন্তর্গতং ভাবম্'-এ পাওয়া যায়। যদ্যপি সেখানেও উহা শুদ্ধ মানসিক অনুভূতি রূপ নয়—কল্পনাত্মক অনুভূতি রূপই; তবুও সেখানে উহার স্থিতি বস্তুনিষ্ঠ না হইয়া অনুভূতিনিষ্ঠই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভরতের ভাব-বিবেচনায় ইহা স্পষ্ট যে তিনি ব্যাপক রূপে তৃতীয় অর্থটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন : যাহা রসের ভাবন করে তাহাই ভাব—অর্থাৎ রসব্যঞ্জক সামগ্রীকেই তিনি ভাব বলেন। স্থায়ী, সঞ্চারী এবং ইহার সঙ্গে বিভাব ও অনুভাব সমস্তই রসব্যঞ্জক সামগ্রী। কিন্তু পরে তিনি বিভাব ও অনুভাবকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন এবং ভাবের সংখ্যা ৪৯ বলিয়া স্থির করিয়াছেন : স্থায়ী ভাব আটটি, তেত্রিশটি সঞ্চারী ভাব এবং শেষ আটটি সাত্ত্বিক ভাব—এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশদ্-ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ (পৃ০ ১০৬)। এখানে ভাবের অর্থ-ব্যাপ্তি মনোবেগ বা মানসিক-শারীরিক অনুভূতির কাব্যগত রূপের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়াছে, উহাদের কারণ ও কার্য ভাবের পরিধি হইতে মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী আচার্যগণ প্রায় এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ভরত হইতে প্রেরণা পাইয়া কেবল আর একটি রূপ বিকাশ লাভ করে—অনুপচিত স্থায়ী বা উপচিত সঞ্চারী ভাবের অর্থে।

এইরূপ সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে সামান্যতঃ তিনটি অর্থে ভাবের প্রয়োগ হইয়াছে : (১) ব্যাপক রূপে সম্পূর্ণ রসব্যঞ্জক সামগ্রীর অর্থে যাহার মধ্যে বিভাব, অনুভাব, স্থায়ী সঞ্চারী সমস্তই অন্তর্ভুক্ত, (২) কাব্যগত স্থায়ী, সঞ্চারী ও সাত্ত্বিক ভাব অর্থাৎ মানসিক, শারীরিক অনুভূতির অর্থে, (৩) অনুপচিত স্থায়ী বা উপচিত সঞ্চারী ভাবের অর্থে।

ইহা ব্যতীত আরও দুইটি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—(৪) সামান্য মনোবেগের অর্থে এবং (৫) কবির সৃজনকারী অনুভূতির (কবেরন্তর্গতং ভাবম্) অর্থে ; কিন্তু এই শেষের দুইটি প্রয়োগের মধ্যে প্রথমটি অপারিভাষিক লৌকিক প্রয়োগ এবং দ্বিতীয়টি অত্যন্ত সীমিত প্রয়োগ। প্রাগুক্ত পাঁচটি অর্থের মধ্যে অবশেষে দ্বিতীয় অর্থটিই ব্যাপক রূপে প্রসার লাভ করে—এবং উহাতেও সাত্ত্বিক ভাবগুলিকে অনুভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়—

পৃথগ্‌ ভাবাঃ ভবন্ত্যন্যেনুভাবত্বেঽপি সাত্ত্বিকাঃ।

(দশরূপক পৃ০ ১২৪, ৪.৪)।

এইরূপে ভাবের প্রয়োগ সামান্যতঃ স্থায়ী এবং সঞ্চারীর জন্যই করা হইয়াছে এবং আজও হইতেছে : তে চ স্থায়িনো ব্যভিচারিণশ্চেতি বক্ষ্যমাণাঃ (দশরূপকাবলোক, ধনিক, পৃ০ ১২৪)।

অতএব ইহা স্পষ্ট যে এই প্রসঙ্গে ভাবের অর্থ কাব্যগত মনোবিকার। লৌকিক মনোবিকার হইতে নিশ্চিতরূপে ইহা ভিন্ন, কিন্তু তবুও লৌকিক মনোবিকারই ভাবের ভিত্তি স্থানীয়। এইজন্য কাব্যশাস্ত্রীয় অথবা কাব্যগত ভাবের ব্যাখ্যা লৌকিক ভাবের ভিত্তিতেই করা যাইতে পারে।

লৌকিক ভাবের মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

যাহা চেতনাকে ব্যাপ্ত করে তাহাই ভাব : ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে ভাবের সাধারণতঃ এইরূপ লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। ভাবকে মনোবিকার বা মনোযোগও বলা হইয়াছে। এই অর্থেরও সমাবেশ করিয়া লইলে লক্ষণ নির্দেশের ক্ষেত্রে বলা যায় : বাহ্য জগতের সম্পর্কের আশ্রয়ে উৎপন্ন মনের বিকার যাহার দ্বারা চেতনার ব্যাপ্তি ঘটে, তাহাই ভাব—"বাহ্য জগতের সংবেদনগুলির দ্বারা মনুষ্য-হৃদয়ে যে সকল বিকার উৎপন্ন হয় তাহাকেই ভাব বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে।"

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে ভাবের বিষয়ে খুবই বিবাদ আছে এবং আজও অনেক মনোবৈজ্ঞানিক আছেন যাঁহারা ভাবের স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করেন না। "যখন প্রত্যেক পদার্থের জন্য বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী বর্তমান তখন বিজ্ঞানের অন্তর্গত 'ভাব' -এর অনুরূপ অনাবশ্যক শব্দের সমাহারের সার্থকতা কি? আমার ভবিষ্যদ্বাণী এই যে বৈজ্ঞানিক মনঃশাস্ত্র হইতে আজ 'ইচ্ছাশক্তি, প্রায় বহিষ্কৃত হইয়াছে, 'ভাব'এরও এই দশাই হইবে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মার্কিন মনোবৈজ্ঞানিকগণ অতীতের নানা বিচিত্ররূপ বলিয়া ইহাদের লইয়া পরিহাস করিবেন।" (এম০ এফ০ মেয়র, সাইকোলজিকল রিভিউ, ১৯৩৩, পৃ০ ৩০০)। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের প্রয়োগশালায় যাহাই হউক না কেন, সামান্য জীবনে ভাবের অস্তিত্ব নিষেধ করা সম্ভবপর নয় এবং মনোবিজ্ঞানের জগতেও কিছু অতিব্যবহারবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অধিকাংশ বিদ্বানেরা ইহাকে নিশ্চিতরূপে

স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ঠিক যে 'ভাব'এর স্বরূপ বিষয়ে এখনও তীব্র মতভেদ বিদ্যমান আছে—কতিপয় বিদ্বানগণ ইহাকে কেবল অনুভাব বা সহচারীমনঃস্থিতি বা অনুভবের বিধিমাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, কতিপয় এমন পণ্ডিতও আছেন যাঁহারা ইহাকে কেবল 'বেগ' বা 'উর্জা'রূপে স্বীকার করেন। ভাব সংবেদনের সংহতিমাত্র ইহাও অনেকে মনে করেন। অপরদিকে অন্য বৈজ্ঞানিকেরা কেবল বিসংহতিরূপে ইহার ব্যাখ্যা করেন। (দ্রষ্টব্য 'ইমোশন' —লেঃ জেম্‌স হিলম্যান। কিন্তু অনেক মনোবৈজ্ঞানী আবার ভাবের বিশিষ্টরূপ এবং ভেদ-প্রভেদও স্বীকার করেন। শ্যাণ্ড, সোল. স্টাউট, অংশতঃ ম্যাক্‌ডুগলও—এবং অপরদিকে জার্গেন্সন, উলিয়ম্‌স, বার্ট প্রভৃতি বিদ্বানগণ এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল বৈজ্ঞানিকদের মতের সার এই যে ভাব চেতনার ব্যবহারশীল মাত্রারূপ—এমন শক্তিবিশেষ যাহাদের নিশ্চিত আধার ও লক্ষ্য বিদ্যমান থাকে, যাহাদের মধ্যে কর্তৃত্বের ক্ষমতা থাকে। × × × যদি আমরা উহাদের 'ধর্ম' রূপে স্বীকার করি তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে উহারা অন্যোন্যাশ্রিত, কিন্তু ব্যবহারে সকলই স্বায়ত্তরূপ। যদি 'তত্ত্ব' রূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে উহারা স্বতন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত এবং একটি নিশ্চিত সীমার মধ্যে উহাদের পরিগণনা সম্ভবপর। যদি প্রত্যয়রূপে উহাদের গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে ভাবগুলি যথার্থের পৃষ্ঠপট রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় যাহার দ্বারা প্রয়োগমূলক বিধি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে। সারাংশ এই যে প্রত্যেক ভাবের একটি বিশিষ্ট গুণাত্মক আধার থাকে যাহা অনন্য এবং অখণ্ড। উহাদের পরস্পর হইতে ভিন্ন বিশিষ্ট এবং বাস্তবিক সত্তা বিদ্যমান থাকে—কিন্তু উহারা পদার্থরূপ হয় না।[১]

ভাবের স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করিয়া লইলেও উহার লক্ষণ নিরূপণ করা সহজ নয়। জেম্‌স ড্রেবর মহাশয় ভাবের স্বরূপ বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন : ভাবের বর্ণনা ও বিবেচনা বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন রীতিতে করেন। কিন্তু এই কথাটি সকলেই স্বীকার করেন যে উহা জৈবিক বিধানের একটি সাংকর্য অবস্থাবিশেষ যাহার জন্য শরীরে নানা প্রকারের বিকার জন্মে, যেমন, শ্বাস-ক্রিয়ায়, নাড়ীতে, গ্রন্থিগুলির রসন-ক্রিয়ায়; মানসিক দৃষ্টিতে উহা উত্তেজনা বা উদ্বেগের স্থিতিরূপ যাহাতে প্রবল অনুভূতি এবং সামান্যতঃ একটি নিশ্চিত ধরণের ব্যবহারের প্রতি প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। যদি ভাব তীব্র হয় তাহা হইতে বুদ্ধির ক্রিয়াও অল্পবিস্তর অস্তব্যস্ত হইয়া পড়ে—একটি নিশ্চিত মাত্রায় সম্বন্ধ-ক্রম ভাঙিয়া যায় এবং একটি ক্রমহীন বা অস্পষ্ট ব্যবহারের প্রতি প্রবৃত্তি জন্মে। ইহার পরে অতিরিক্ত কিছু আলোচনা করিলেই বিবাদের মধ্যে পড়িতে হইবে।[২] ইহা ভাবের আধুনিক স্বরূপ-নিরূপণ। পূর্ববর্তী লক্ষণগুলির মধ্যে অনিশ্চয়তার সুর থাকিলেও উহা অধিক স্পষ্ট—যদিও

১. ইমোশন—লেঃ জেম্‌স হিলম্যান, পৃঃ ৪২-৪৩

২. এ ডিক্‌শনারী অব সাইকোলজি (১৯৬০)—ড্রেবর, পৃঃ ৮০

এই লক্ষণগুলির সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটি সামান্য লক্ষণ এইরূপ : (স্থূলরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে) বিশেষ বাহ্য স্থিতির সংবেদন অথবা স্মৃতি এবং কল্পনার স্বতন্ত্র প্রত্যয়ের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ মনোদশাই ভাব, ইহার দুইটি প্রধান গুণ বর্তমান : অনুভূতি ও প্রযত্ন।"[১] আরো স্পষ্টরূপে, ডঃ ম্যাক্‌-ডুগালের মতানুসরণে, ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের কোন স্বাভাবিক বৃত্তি জাগ্রত হইলেই সেই বৃত্তির অনুকূল মাংশপেশি ও স্নায়ুর মধ্যে ওজস্‌ সঞ্চরিত হইতে থাকে। ওজঃ—সঞ্চরণের এই অবস্থায় উত্তেজনা বিদ্যমান থাকে এবং প্রত্যেক পরি-স্থিতিতে এই উত্তেজনায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য থাকে যাহার জন্য আমরা উহাকে ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি পৃথক নামে ডাকিতে পারি। এখানে 'স্বাভাবিক বৃত্তির জাগৃতি, এবং 'উত্তেজনায় নিহিত বিশিষ্টতা' উভয়ের দ্বারা ভাবের মানসিকরূপের বর্ণনা হয়, এবং 'স্নায়ু ও পেশির মধ্যে ওজের সঞ্চরণ' উহার শারীরিক রূপকে প্রকট করে। এই মানসিক ও শারীরিক রূপ ব্যতীত ভাবের পক্ষে কয়েকটি অন্য স্থিতিও অনিবার্য—

(১) ভাবে বিষয়ের সত্তা অবশ্য হইবে, কারণ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির বস্তু অর্থাৎ বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি মানসিক প্রতিক্রিয়াই ভাব।

(২) ভাবের সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক আস্বাদন নিশ্চিতরূপে হইবে।

(৩) এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার পরিণামস্বরূপ কিছু প্রযত্নও অনিবার্যভাবে করা হইবে।

(৪) ভাবের শারীরিক অভিব্যক্তি অবশ্যই হইবে অর্থাৎ স্নায়ু ও পেশির পরিবর্তন স্বরূপ শরীরে বিকার অবশ্য উৎপন্ন হইবে।

(৫) কোন এক ভাবের স্থিতি নিরপেক্ষ থাকিবে না, উহাতে নানাপ্রকারের বিকার উৎপন্ন হইতে থাকিবে।

মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণদের মধ্যে ভাবের মানসিক ও শারীরিক রূপের পূর্বাপর ক্রম লইয়া অনেক কিছু বিবাদ হইয়াছে। জেম্‌স, ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতিরা বলেন যে ভাবের মানসিকরূপ শারীরিক রূপেরই পরিণাম। স্টাউট প্রভৃতি বিদ্বানগণের বিচারে এমন কথা শারীরিক সংবেদনের জন্য অবশ্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ভাবের বিষয়ে এই ক্রম স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাঁহার মতে প্রায় ইহার বিপরীত ক্রমই স্বীকার্য। আধুনিক যুগে ভাবের প্রকল্পনার অন্তর্গত স্নায়বিক তত্ত্বের গুরুত্ব আরও প্রসারলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা এই বিবাদে না পড়িয়া কেবল ইহাই বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনে ষ্টাউট প্রভৃতির মতই গ্রহণ করা হইয়াছে। চেতনার পৃথক্‌ সত্তাকে যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের পক্ষে এই মতটিই গ্রাহ্য হইতে পারে।

স্থায়ী ও সঞ্চারীর মনোবৈজ্ঞানিক আধার—সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে লৌকিক ভাবের বর্ণনা স্বভাবতঃই হয় নাই। সেখানে তো কাব্যগত ভাব অর্থাৎ রসব্যঞ্জক

১. মৈলোন এণ্ড ড্রুম্যাণ্ড—এলিমেণ্টস্‌ অব সাইকোলজি, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২১৯

স্থায়ী-সঞ্চারী ভাবেরই বর্ণনা-বিবেচনা হইয়াছে : কিন্তু এই কাব্যগত ভাব বা রস-ব্যঞ্জক ভাব নিশ্চয়ই চিত্তবৃত্তিরূপ :

ভাবশব্দেন তাবচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষা এব বিবক্ষিতাঃ।

অভিনবভারতী, পৃ০ ৩৪৩

অতএব চিত্তবৃত্তির ভিত্তিতে—মনোবিজ্ঞানের অনুসরণে, স্থায়ী ও সঞ্চারীর বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভরত হইতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত স্থায়ী ও সঞ্চারীর বিবেচনা প্রায় সকল আচার্যই করিয়াছেন—এখানে প্রত্যেক আচার্যের মতের পৃথক উল্লেখ না করিয়া সকলের বিবেচনার সার প্রকাশিত করাই সমীচীন হইবে কারণ সকলের মত প্রায় অভিন্নাত্মক।

স্থায়ী ভাব বাসনারূপে প্রমাতার চিত্তে বিদ্যমান থাকে। কারণ অনুপস্থিত থাকিলেও উহার সত্তা বিদ্যমান থাকে, যেমন পতঞ্জলি বলিয়াছেন : চৈত্র কোন এক স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, ইহার অভিপ্রায় এই নয় যে সে অন্য স্ত্রীগণের প্রতি বিরক্ত। (অর্থাৎ অন্যদের প্রতি অব্যক্তরূপে অনুরাগ থাকিতে পারে।)[১] ইহার বিপরীতে সঞ্চারীভাব কারণের অভাবে নিঃশেষ হইয়া যায়। অতএব স্থায়ীভাব একটি স্থির মনোদশা এবং সঞ্চারী অস্থির।

জীবনের মূল বৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া স্থায়িভাবের সম্বন্ধ পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সহিত সহজেই স্থাপিত হইয়া যায়। অতএব সঞ্চারীর অপেক্ষা স্থায়ি ভাবের জীবনের পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অধিক।[২] অর্থাৎ জীবনে স্থায়িভাবের গুরুত্ব সঞ্চারী ভাবের অপেক্ষা অধিক। স্থায়ী ভাব অধিক প্রবল হয়—অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাব উহাকে নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু সঞ্চারী ক্ষণে-ক্ষণে আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া স্থায়ী ভাবের পোষণ করিতে থাকে।

কেবল স্থায়ীই রস দশাকে প্রাপ্ত হয়, সঞ্চারী হয় না কারণ প্রত্যেক সহৃদয়ের চিত্তে বাসনা রূপে বিদ্যমান থাকার জন্য স্থায়ীরই সাধারণীকরণ সম্ভবপর হয়। এইরূপে স্থায়ী ভাবে সঞ্চারীর অপেক্ষা 'রঞ্জনাধিক্য' (রঞ্জনার অধিক ক্ষমতা) বিদ্যমান থাকে।

মনোবিজ্ঞানে ভাবের বর্গ-বিভাজন নিশ্চয়ই এইরূপে সম্ভব নয়। আধুনিক প্রবৃত্তি তো বর্গীকরণেরই বিরুদ্ধে, তবুও কতিপয় অধিকারী মনোবৈজ্ঞানিক স্থূলদৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে কিছু কাজ করিয়াছেন। ভাবের সামান্য রূপে তিনটি ভেদ করা হইয়াছে :

(১) মৌলিক মনোবিকার (Primary Emotion) যাহা স্বতন্ত্র, অমিশ্র ও অখণ্ড যেমন—ভয়।

(২) ব্যুৎপন্ন মনোবিকার (Derived Emotion) যাহা স্বতন্ত্র না হইয়া কোন অন্য বিকারের আশ্রিত থাকে, যেমন—আশঙ্কা।

---

১. হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃ০ ৪৮০

২. পুমর্থোপয়োগিত্বেন রঞ্জনাধিক্যেন বা ইয়তামেবোপদেশ্যত্বাৎ। ঐ, পৃ০ ৩৪০

(৩) মনোবৃত্তি (Sentiment) যাহা মনোবিকারের সংমিশ্রণ, উহাদের পুনরাবৃত্তি ও ক্রমশঃ বৌদ্ধিক তত্ত্বের সমাবেশের দ্বারা নির্মিত একটি স্থির মনোদশা, যেমন—ক্লৈব্য।

এখন এখানে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে স্থায়ী ভাবকে একসঙ্গে আমরা শুদ্ধ মৌলিক মনোবিকার বলিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, নির্বেদ বা শম একটি শুদ্ধ মনোবিকার নয়। একাধিক মনোবিকারের সংমিশ্রণ এবং বৌদ্ধিক তত্ত্বের প্রাধান্য হওয়ার জন্য উহা একটি ব্যবস্থিত মনোদশাই। অদ্ভুৎ রসের স্থায়ী 'বিস্ময়'ও স্পষ্টতঃ একটি মিশ্র ভাব। ব্যুৎপন্ন মনোবিকারেরও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ইহাদের সমস্তগুলি ব্যুৎপন্ন নয়। ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি স্পষ্টতঃই মৌলিক। এখন মনোবৃত্তি অবশেষ থাকিয়া যায়। স্থূলদৃষ্টিতে স্থায়ী ভাব মনোবৃত্তির অনেকটা সমরূপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা হইতে ভিন্ন।

সাম্য—(১) মনোবৃত্তির অনুরূপ স্থায়ীভাবও অন্য (সঞ্চারী) ভাবের অপেক্ষা স্থায়ী বেশী।

(২) মনোবৃত্তির অনুরূপই স্থায়ী ভাব একটি মনোদশা, যাহার মধ্যে অন্য ভাব সঞ্চরণ করিতে থাকে।

বৈষম্য—কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু মৌলিক প্রভেদও বিদ্যমান আছে—

(১) মনোবৃত্তি একটি ব্যাপ্ত মনঃস্থিতি মাত্র। যাহার সমগ্র রূপের অনুভব কখনই হইতে পারে না। মনোবৃত্তির সঞ্চারীরই আস্বাদন হইতে পারে, স্বয়ং মনোবৃত্তির নয়। উদাহরণস্বরূপ দেশভক্তির আস্বাদন কখনই হয় না, উহার আশ্রিত বা সঞ্চারী-ভাব উৎসাহ প্রভৃতিরই হয়; কিন্তু স্থায়ীর সম্বন্ধে এই কথাটি খাটে না, উহা কেবল সঞ্চারী নয়, উহা স্বয়ংই সমগ্রতঃ আস্বাদ্যরূপ। ক্লৈব্যমনোবিকারের কারণরূপ, স্বয়ং মনোবিকার নয়, কিন্তু ভয় স্বয়ংই মনোবিকার।

(২) মনোবৃত্তি সর্বদা মনোবিকারের আবৃত্তি হইতে জন্মায় কিন্তু স্থায়ী ভাবের বিষয়ে ইহা সত্য নয়; চিন্তার আবৃত্তি করিলেই উহা শোকে পরিণত হইবে না।

(৩) মনোবৃত্তি সর্বদা বিচারমূলক, কিন্তু স্থায়ীভাব (শম ব্যতীত) বিচারমূলক নহে—প্রবৃত্তিমূলকই।

এইরূপে প্রচলিত অর্থে সাহিত্য-শাস্ত্রের স্থায়ী ভাবের স্বরূপনিরূপণ ও বিবেচনা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষার দ্বারা সম্ভবপর নয়, কিন্তু তবুও ইহা অমনো-বৈজ্ঞানিক নয়। উহারও নিজস্ব সঙ্গতি আছে। প্রারম্ভে বোধহয় উপলব্ধ সাহিত্যের পর্যালোচনার দ্বারা উদ্‌গমন বিধির অনুসরণে স্থায়ী-সঞ্চারীর বর্গীকরণ হইয়াছিল, কিন্তু পরে আচার্যগণ যোগ, মীমাংসা প্রভৃতির ভিত্তিতে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া ইহাদের ব্যাপকতাকে সিদ্ধ করিবার জন্য নিজেদের বর্গীকরণকে নির্দোষ রূপে প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের স্থাপনা-গুলিকে নিম্নরূপে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ঃ

(১) মানব-হৃদয়ে যে সব তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহাদের যোগ করিলে বিভিন্ন মনোবিকার জন্মে। উহাদের সংখ্যা বেয়াল্লিশ। এই সকল মনোবিকার শুদ্ধ, মিশ্র, ব্যুৎপন্ন, মন্দ, তীব্র, অস্থায়ী, স্থায়ী সকল রূপই হয়। ইহাদের মধ্যে কেবল রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও নির্বেদ নয়টি মনোবিকার এমন যাহা অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিক স্থায়ী, অধিক প্রভাবশালী এবং পুষ্ট হওয়ার জন্য রস-পরিপাকের যোগ্য, অতএব ইহাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং পারিভাষিক শব্দাবলীতে ইহাদের স্থায়ী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

(২) এইরূপে অর্থাৎ রসে পরিণত হওয়ার যোগ্য ভাব সামান্যতঃ নয়টিই। অন্য ভাবসকল হয় ইহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, যেমন, দানশীলতা, ধর্ম-প্রেম প্রভৃতি ভাব উৎসাহের অন্তর্গত (আধুনিক যুগের দেশভক্তি, রাষ্ট্রভাবনা প্রভৃতিও উৎসাহের অন্তর্গতই) নতুবা রস-দশা পর্যন্ত পৌঁছাইতে অসমর্থ বলিয়া উহারা স্থায়ী-পদেরও অধিকারী হইতে পারে না—উদাহরণস্বরূপ (শাস্ত্রের অনুসারে) বাৎসল্য বা দেবাদিবিষয়ক রতি 'ভাব'ই, স্থায়ী ভাব নয়।

এখানে দুইটি প্রশ্ন ওঠে—

(১) স্থায়ী ও সঞ্চারীর মধ্যেকার এই প্রভেদ কি মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে ন্যায়-সঙ্গত?

(২) স্থায়ীভাবের সংখ্যা কি কেবল নয়ই হইতে পারে এবং সঞ্চারীর তেত্রিশ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রাগুক্ত আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে যে মনোবিজ্ঞানে এইরূপ বর্গবিভাজন পাওয়া যায় না। সেখানে তো কেবল দুই ধরণের বর্গীকরণই স্বীকৃত। প্রথম, মৌলিক (শুদ্ধ) ও ব্যুৎপন্ন মনোবিকারের বর্গীকরণ এবং দ্বিতীয়, মনোবিকার ও মনোবৃত্তির বর্গীকরণ। স্থায়িত্ব, তীব্রতা ও প্রভাবের ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞান বর্গীকরণ করে না।

মনোবিজ্ঞান বস্তুতঃ বিজ্ঞান যাহা উপযোগী ও অনুপযোগী, সুন্দর ও অসুন্দর, সাধু ও অসাধু, তীব্র ও মন্দের ভিত্তিতে বর্গীকরণ করে না। কিন্তু তবুও জীবনে এইরূপ ভেদ ও বিভাজন বিদ্যমান তো আছেই ও বিদ্যমান থাকিবেও। বিজ্ঞান এই সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নাই কারণ এই সমস্তই উহার পরিধির বাহিরে, কিন্তু যখন জীবনের উপযোগিতার প্রশ্ন ওঠে তখন ইহার নিষেধ কেমন করিয়া সম্ভব? এইরূপ ভাবের ক্ষেত্রেও একটি ভাব অন্য ভাবের অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছন্দ ও কোমল অথবা তীব্র ও স্থায়ী হয় অথবা অধিক প্রভাবশালী হয়, ইহা সহজেই স্বীকার করা হয়। মনোবিজ্ঞান ইহার বিশ্লেষণ করে না, কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে, যাহা ভাবের জীবনগত উপযোগিতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এইরূপ বর্গীকরণ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক নয়। আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল নৈতিক মূল্যের ভিত্তিতে স্থায়ী ভাবের ঔচিত্য-নির্ণয় করিয়াছেন। উহা একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ কিন্তু অধিক ব্যাপক দৃষ্টিকোণের সাহায্যেও ইহার সমাধান করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চিন্তার অপেক্ষা শোক অধিক তীব্র—চিন্তার তীব্রতম চিত্রণ শোকের

তীব্রতম চিত্রণের অপেক্ষা ক্ষীণই থাকিবে, এইরূপে চিন্তার অপেক্ষা শোকে স্থায়িত্বও স্পষ্টতঃ অধিক বিদ্যমান থাকে—শোকে চিন্তা নিমগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু চিন্তায় শোক নিমগ্ন হইতে পারে না। চিন্তার অপেক্ষা শোক প্রকৃতপক্ষে অধিক ব্যাপক। যে ভাব-সকল অধিক তীব্র, অধিক স্থায়ী ও অধিক ব্যাপক তাহা নিশ্চয়ই অধিক প্রভাবশালী হইবে। এই কথাই গর্ব ও উৎসাহ, শংকা ও ভয় অথবা এই ধরণের অন্য ভাবের বিষয়েও বলা যাইতে পারে।

যদ্যপি আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এইরূপ বিভাজন উপলব্ধ হয় না, তবুও ইহাকে আমরা মিথ্যা ও অমনোবৈজ্ঞানিক বলিতে পারি না। স্থায়ী ভাবের স্থিতি প্রকৃতপক্ষে জীবনের সেইসব নৈসর্গিক, তীব্র ও ব্যাপক মনোবিকারের মধ্যে নিহিত যাহা মানব-স্বভাবের আধারভূত অঙ্গবিশেষ এবং যাহাদের সাধারণতঃ মূল মনোবেগ (Elemental Passion) রূপে অভিহিত করা হয়। এই সকল মনোবেগ মানব-আত্মার মূলীভূত গুণ রাগদ্বেষের সহিত স্পষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আত্মার প্রাথমিক অভিব্যক্তি হইতেছে অস্মিতা-অহংকার, যাহাকে বর্তমানযুগের মনোবিশ্লেষণকার অহং (Ego) বলিয়া নির্বিরোধে স্বীকার করিয়াছেন। অহংকারের অভিব্যক্তির দুইটি সরণি বিদ্যমান আছে রাগ ও দ্বেষ—যাহা মানব-জীবনের দুইটি মৌলিক অনুভব সুখ ও দুঃখের শাস্ত্রীয় সমার্থ মাত্র 'সুখাৎ রাগঃ, দুঃখাৎ দ্বেষঃ'। আধুনিক মনোবিশ্লেষণ-শাস্ত্রে ইহাদেরই প্রেম করিবার প্রবৃত্তি (Eros) ও নাশ করিবার প্রবৃত্তি (Thanatos) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আরও গভীর বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে ফ্রয়েডের 'কাম' মূলতঃ রাগই, এবং এড্‌লরের 'হীনভাব' দ্বেষ। আধুনিক মনোবিশ্লেষকদের এই সম্বন্ধে তিনটি মত আছে—প্রথমটি ফ্রয়েডের মত, যাহার অনুসারে কাম জীবনের মূল ভিত্তি। দ্বিতীয়টি এড্‌লরের মত, যাহাতে হীন-ভাব বা ক্ষতি-পূর্তির উল্লেখ হইয়াছে এবং তৃতীয়টি য়ুঙ্গের (Jung) মত। তাঁহার মতে জীবনেচ্ছা (বা স্বত্ব রক্ষা)—আমাদের ভাষায় অস্মিতা-ই মূল তত্ত্ব এবং উক্ত দুইটি মত ইহারই শাখাবিশেষ। আজ এই তৃতীয় সিদ্ধান্তই সামান্যতঃ স্বীকৃত।

উত্তম, সম ও অধমের ভিত্তিতে রাগ, প্রশ্রয়, প্রেম ও করুণার রূপ ধারণ করিয়া লয় এবং দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ও ঘৃণার। এইরূপে ভাব-জগতের বিস্তার হয়। ডঃ ভগবান দাস অত্যন্ত মৌলিক ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের সমস্ত অস্থায়ীভাব এই মূল ভাবের মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া যায়। রতি, হাস, উৎসাহ ও বিস্ময় সাধারণতঃ অস্মিতার উপকারক হওয়ার জন্য রাগের অন্তর্গত এবং শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা অস্মিতার অপকারক হওয়ার জন্য দ্বেষের অন্তর্গত হয়। শমে উভয়ে সমন্বিত থাকে; উহ[illegible] অস্মিতার সমরসতার অবস্থা লক্ষিত হয়। প্রথম চারিটি ভাব মধুর হওয়ার জন্য সুখের [illegible]ভিব্যক্তি করে এবং অপরগুলি কটু হওয়ার জন্য দুঃখের অভিব্যক্তি করে। শমে উভয়ে [illegible]ন্বিত থাকে। বলা বাহুল্য এই বিভাজন নির্দোষ নয়, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কোন প্রবৃত্তি [illegible] রাগ হইতে পারে না এবং অমিশ্রিত দ্বেষও হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, রাগ এবং দ্বেষের (Eros এবং Thanatos) সংঘর্ষের দ্বারাই আমাদের মানসিক জীবন (Cycle life) সঞ্চালিত। এইজন্য যদি উৎসাহে 'যুযুৎসা' রূপে দ্বেষের অংশ থাকে বা শোকে রাগের, তাহা হইলে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়, বলিতে গেলে স্বয়ং রতিও শুদ্ধ রাগ নয়।

পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানে ভাবের বর্ণনা

পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রে ভাবের বর্ণনা খুবই কম হইয়াছে। প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে কেবল এরিস্টটল এই সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। পোয়েটিক্‌স নামক গ্রন্থে ট্র্যাজেডির তত্ত্বের বর্ণনা করিতে গিয়া 'বিচার' প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন: বিচার সম্বন্ধে আমরা সেই সব সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করিয়া লইতে পারি যাহার উল্লেখ অলঙ্কার শাস্ত্রে[১] করা হইয়াছে (পৃ০ ৫১) (অলঙ্কার শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে এগার পর্যন্ত তিনি বক্তৃত্ব-কলার সম্পর্কে) অনেক মনোবেগের[২] ক্রমানুসারে সূক্ষ্ম বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব মনোবেগগুলি ক্রমানুসারে নিম্নরূপ: ক্রোধ ও শান্তি (ক্রোধ-শান্তি); প্রেয়স্ (মিত্র-স্নেহ) এবং বৈর (ঘৃণা); ভয় ও বিশ্বাস; লজ্জা (এবং নির্লজ্জতা); অনুগ্রহ (কৃপা এবং অকৃপা); করুণা ও মন্যু (অন্যায় প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন অমর্ষ); অসূয়া এবং স্পর্ধা। বলিতে গেলে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই এই ক্রম অনুসরণ করা হইয়াছে কারণ ইহাতে বিপরীত ভাব-যুগ্মের একসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে—ক্রোধের বিপরীত ভাব শান্তি, স্নেহের বৈর, ভয়ের বিশ্বাস ও করুণার মন্যু। এই সব ভাবের বর্ণনা, যেরূপ আমি এখনি আলোচনা করিয়াছি, বক্তৃত্ব-কলার সন্দর্ভেও করা হইয়াছে যাহা এরিস্টট্‌লের যুগে গ্রীকদেশে ব্যক্তির সর্বপ্রমুখ সামাজিক অলঙ্কার ছিল। অতএব স্বভাবতঃ এই সমস্ত ভাব সামাজিক ভাব বৈয়ক্তিক নয়, উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিগত 'রতি' ব্যতীত এরিস্টটল 'প্রেয়স্ (মিত্র-স্নেহ)-এরও বর্ণনা করিয়াছেন। 'ক্রোধ'এর পরে সামাজিক ভাবনার জন্য 'মন্যু'র পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 'অসূয়া' ব্যতীত 'স্পর্ধা'র পৃথক্ বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত 'শোকের' স্থানে সামাজিক ভাব 'লজ্জা' ও 'করুণা'কে প্রাথমিকতা দিয়াছেন। তথাপি ইহাদের মধ্যে ক্রোধ, ভয়, ঘৃণা (জুগুপ্সা), প্রেয়স্ (প্রেম), করুণা (শোক) ভারতীয় রস শাস্ত্রের ভাবের খুবই অনুরূপ। 'শান্তি'র বৃত্ত যদিও ক্রোধের মধ্যে সীমিত হইয়া যাওয়াতে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তবুও 'শম'এর বীজ উহাতে বিদ্যমান আছে। এইরূপ 'অনুগ্রহ' এবং 'স্পর্ধা'র মধ্যে উৎসাহের বীজ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কেবল 'বিস্ময়' ও 'হাস'এর উল্লেখ হয় নাই—বোধ হয় এইজন্য যে এরিস্টট্‌লের দৃষ্টি কেবল

---

১. Rhetoric.

২. Of the several passions in order.

সেই সব সামাজিক ভাবের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল যাহার দ্বারা ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সম্ভবপর। যদিও প্রাগুক্ত ভাবের বিবেচনার অন্তর্গত 'হাস' ও 'বিস্ময়'এরও প্রসঙ্গতঃ চর্চা হইয়াছে। কিন্তু স্বতন্ত্র বিবেচনা উক্ত কারণে হয় নাই।

এরিস্টটল কর্তৃক মনোবেগের বিবেচনাও ব্যবস্থিত ও ক্রমবদ্ধ এবং উহাতে প্রায় অনুগম বিধির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। সর্বপ্রথম মনোবেগের ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে: "মনোবেগ বলিতে আমাদের অভিপ্রায় সেই সব ভাব যাহাদের দ্বারা মানুষের বুদ্ধি-নির্ণয়ের উপর প্রভাব পড়ে এবং যাহাদের অনুভূতি সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক হয়। এই সব মনোবেগগুলি নিম্নরূপ: (ক্রোধ, করুণা, ভয় প্রভৃতি এবং উহাদের বিপরীত ভাব।"[১] প্রত্যেকটি মনোবেগের বর্ণনা করিবার জন্য তিনটি তথ্যের জ্ঞান আবশ্যক: (১) সেই মনোবেগ-বিশেষের অনুভবের সময় অনুভবকর্তার মনঃস্থিতির জ্ঞান, (২) উহার উদ্রেক কোন ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রতি হয়? (৩) কি কারণে এই ধরণের ভাবোদ্রেক হয়?[২] ইহাদের মধ্যে প্রথমটি মনোবেগের স্বরূপের সহিত এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি আলম্বন ও উদ্দীপন অর্থাৎ বিভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহার পরে যেখানে এই সকল মনোবেগের প্রত্যক্ষ বর্ণনা হইয়াছে যেখানে প্রায় আশ্রয় এবং স্থান-বিশেষে অনুভাবের বর্ণনাও পাওয়া যায়।[৩] এই প্রসঙ্গে ভারতীয় আচার্য ও এরিস্টটলের দ্বারা প্রকাশিত কতিপয় প্রমুখ মনোবেগের বিবরণ তুলনাত্মক দৃষ্টিতে রুচিকর সিদ্ধ হইতে পারে:

ক্রোধ

(১) ভরত—রাক্ষস, দানব ও উদ্ধত মনুষ্যগণের আশ্রিত, যুদ্ধজন্য ক্রোধরূপ স্থায়িভাবাত্মক রৌদ্ররস হয়।

অভিনব—(রৌদ্ররসের সংজ্ঞায়) আত্মপদ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে অন্যায়-কারিতা প্রধানরূপে ক্রোধের বিষয় হয়। এবং এইরূপে (অন্যায়কারী) পুরুষের সম্বন্ধে সকলেই উগ্র ধারণা পোষণ করেন......।

ভরত—এবং সেই ক্রোধ আধর্ষণ (স্ত্রী প্রভৃতিদের তিরস্কার), অধিক্ষেপ (দেশ, জাতি, কুল প্রভৃতির নিন্দা), অনৃত ভাষণ, উপঘাত (ভৃত্য প্রভৃতিকে পীড়ন), বাক্‌পারুষ্য, অভিদ্রোহ, মাৎসর্য প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

ভরত—এবং অসম্মোহ, উৎসাহ, আবেগ, অমর্ষ, চপলতা, উগ্রতা, গর্ব, খেদ, কম্পন, রোমাঞ্চ ও গদগদ স্বর প্রভৃতি ইহার (রৌদ্ররসের) ব্যভিচারী ভাব।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃঃ ৫৮২-৮৬)

---

১. Rhetoric—Basic Works of Aristotle (Richard Mackwon), p. 1380

২. ঐ, p. 1380

৩. দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ১৩৭০-১৪০৩

(২) এরিস্টটল—নিজের বা নিজের বন্ধুদের প্রতি অন্যায়পূর্ণ ঘোর অপমানের প্রতিশোধ লইবার আবেগময়প্রবৃত্তির নাম ক্রোধ যাহার মধ্যে দুঃখ মিশ্রিত থাকে।

ক্রোধ আসিলে পরে মনঃস্থিতি ক্লেশময়ী হইয়া যায়। সেই সময় মানব কিছু-না-কিছু লক্ষ্য নির্ধারিত করিতে থাকে।

সেই সব ব্যক্তিরা ক্রোধের আলম্বন হন, যাঁহারা আমাদের উপহাস বা অপমান করেন × × ×। এমন ব্যক্তিরা যাঁহারা অহঙ্কারবশতঃ আমাদের অহিত সাধন করেন—এবং তাঁহারাও সেই সব বিষয়ের সন্দর্ভে আমাদের নিন্দা বা অবমাননা করেন যাঁহাদের প্রতি আমাদের মনে বিশেষ আগ্রহ থাকে × × × ×।

(Rhetoric—Basic Works of Aristotle, p. 1380-1382)

উল্লিখিত লক্ষণগুলির ভেদাভেদ স্পষ্ট। ভরত দ্বারা নিরূপিত ক্রোধ মুখ্যতঃ অভিনয়াত্মক এবং এরিষ্টটলের নিরূপণ মুখ্যতঃ মনোবৈজ্ঞানিক—উহাতে মনঃস্থিতির প্রাধান্য বিদ্যমান। কিন্তু উভয়ের মূলরূপে অধিক তফাৎ নাই। ভরত ও এরিস্টটল উভয়ে একস্বরে বলিয়াছেন ক্রোধে ক্লেশ, আবেগ, উগ্রতা, অতিশয়, জাগতি (অসম্মোহ—নিরন্তর লক্ষ্য নির্ধারিত করিবার প্রবৃত্তি) প্রভৃতির ধারণা বিদ্যমান থাকে। ক্রোধের কারণ (বিভাব) প্রসঙ্গে অপমান, অহিত, অন্যায়, অধিক্ষেপ (অর্থাৎ দেশ, জাতি, কুল প্রভৃতি এমন বিষয়ের নিন্দা যাহার প্রতি মনে আগ্রহ থাকে) মাৎসর্য প্রভৃতির চর্চাও উভয়ে সমানরূপে করিয়াছেন।

ভয়

(১) বিশ্বনাথ—রৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্যদং ভয়ম্।

অর্থাৎ রৌদ্র, ব্যক্তি, পশু প্রভৃতির শক্তি হইতে উৎপন্ন চিত্তের বৈক্লব্যের নাম ভয়। (সা০ দ০ ৩.১৭৮)

(২) এরিস্টটল—কোন ভাবী অনিষ্ট—ধ্বংস বা দুঃখের তাৎকালিক আশঙ্কা হইতে উৎপন্ন ক্লেশ বা উদ্‌বেগের নাম ভয়। (Rhetoric, পৃ০ ১৩৮৯)

ভরত ভয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—উহা (ভয়) বিকৃত শব্দ হইতে (অট্টহাসাদি হইতে), পিশাচ প্রভৃতিকে দেখিলে পরে, শৃগাল, উলূক প্রভৃতি হইতে, অপরের ভয় ও উদ্‌বেগ হইতে, শূন্য আগার অরণ্যে যাইলে পরে, স্বজনের বধ-বন্ধনাদি দেখিলে পরে, শুনিলে বা চর্চা প্রভৃতির জন্য উৎপন্ন হয়।

× × ×

"স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্‌গদ, রোমাঞ্চ, কম্পন, স্বরভঙ্গ, চেহারা সাদা হইয়া যাওয়া, শঙ্কা, মোহ, দীনতা, আবেগ, চপলতা, ত্রাস, মৃগী, মরণ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী ভাব।"

(হিন্দী অভিনব ভারতী, পৃ০ ৫৯৭)

স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতির ব্যক্তিদের মধ্যে ভয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গুরু ও রাজার

প্রতি অপরাধ, হিংস্র পশু, শূন্য আগার, বন, পর্ব্বত, কন্দরাদি, গজ ও সর্পের দর্শন, ভর্ৎসনা, অটবী, দুর্দিন (মেঘাচ্ছন্ন দিন), রাত্রি, অন্ধকার, উলূক, পিশাচ প্রভৃতির শব্দ শুনিলে বা এইরূপ অন্য কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। হস্ত-পদাদির কম্পন, হৃদ্-কম্পন, স্তম্ভ, মুখ-শোষ, জিহ্বার লেহন, শরীর-কম্পন, ত্রাস পরিত্রাণ-অন্বেষণ, দৌড়ানো, চীৎকার প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা উহার অভিনয় হওয়া উচিত। ..."

(নাট্যশাস্ত্র, কা০ মা০ পৃ০, ১১০)

এই বিবরণ এরিস্টট্‌লের ভয়-বিষয়ক বিবরণ হইতে ভিন্ন—বস্তুতঃ এরিস্টট্‌লের দৃষ্টিকোণ এখানেও সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক থাকিয়া গিয়াছে, এবং ভরতের লক্ষ্য ছিল অভিনয়। কিন্তু ভরতের ভয়-বর্ণনা মনোবিজ্ঞানের আধুনিক গ্রন্থের সহিত অনেকটা মিলিয়া যায়। তুলনার জন্য ফ্লেচরের ভয়-বর্ণনা দ্রষ্টব্য—১

শরীর বৈজ্ঞানিক আধার	মূল বৃত্তি	মানসিক অনুভব	মানসিক প্রবৃত্তি	উদ্দীপক কারণ (চিহ্ন)	পরিণামী শারীরিক প্রবৃত্তি
শ্বাস-বেগে বৃদ্ধি; পাচন-ক্রিয়ায় মন্দতা; অধিবৃক্ক গ্রন্থিগুলির সক্রিয়তা; বৃহত্তর পেশির মধ্যে রক্তের অধিক প্রবাহ।	ভয়	স্তম্ভ; উদ্বেগ; নিরন্তর মানসিক চাঞ্চল্য (স্থিতি যদি উগ্র না হয়); (স্থিতি যদি উগ্র ও ভীষণ হইয়া যায়) ঘোর ত্রাস; স্থিতির সম্মুখীন হওয়ার উৎকট চেষ্টা; অত্যন্ত পরিশ্রম ও অবধান।	অন্ধকার হইতে একান্তে পলায়ন; অপরিচিত ও একান্ত স্থানে না যাওয়া; পরিচিত স্থান ও ব্যক্তির খোঁজ; পরস্পর সহায়তা প্রভৃতির ইচ্ছা।	অন্ধকার; অন্ধকার হইতে উত্থিত শব্দ, গতি প্রভৃতি, বিশেষতঃ অপরিচিত এবং অপ্রত্যাশিত শব্দ এবং গতি প্রভৃতি। এমন ঘটনা যাহা সহসা ঘটিত হয় বা চমকাইয়া দেয়— অপরিচিত অনাখ্যেয় ঘটনা।	জড়তা, শ্বাস-রোধ, প্রতীক্ষার ভাব; নিতান্ত কণ্ঠরোধ; কার্যে সাবধানতা; সাহসিকতার সহিত শব্দ বা কার্য করা; ত্রাস-পূর্ব্বক পলায়ন, বোধ হয় চীৎকার ও; স্থিতির সহিত যুদ্ধকরা; প্রাণপণ চেষ্টা করা বা পূর্ণ পরাজয়ের স্থিতিতে হাত দিয়া মুখ ও চোখ ঢাকিয়া লওয়া প্রভৃতি।

1. Instincts in Man—The Contemporary Theory of Instincts. P. 310

উল্লিখিত তালিকার দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে ভরতের বর্ণনা কত অধিক মনোবৈজ্ঞানিক/বিভাবের অন্তর্গত শূন্য স্থান, অন্ধকার, বিকৃত শব্দ, অপরিচিত আকৃতি প্রভৃতির এবং অপর দিকে ব্যভিচারী ভাব ও অনুভাবের অন্তর্গত স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্ গদ, স্বরভঙ্গ, হৃদ্-কম্প, শরীর-কম্প, পরিত্রাণ-অন্বেষণ, ত্রাসপূর্বক পলায়ন, জড়তা, ত্রাস, আবেগ (উদ্বেগ) প্রভৃতির উভয়ে আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাব-সংখ্যা

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে ভাব-সংখ্যার। ইহা স্বীকার করিয়া লইলে যে স্থায়ী ভাবের স্থিতি জীবনের মূল মনোবেগের স্থিতি হইতে অভিন্ন এবং এই ধরণের বিভাজনের একটি সূক্ষ্ম আধারও হয় যাহা অমনোবৈজ্ঞানিক নয়, তখন আর একটি প্রশ্ন ওঠে, ইহা কি সত্য যে জীবনের মূল মনোবেগ কেবল নয়টি অর্থাৎ মনোবেগের সংখ্যা কি কেবল নয়, কম-বেশী নয়? এই প্রশ্নটি সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রে অনেকবার উঠিয়াছে। স্থায়ী ভাবের সংখ্যাকে কম-বেশী করিবার চেষ্টাও হইয়াছে, উহাদের প্রধানতা-অপ্রধানতারও বিবেচনা হইয়াছে—ইহাদের সকলকে কেবল একটি মূল স্থায়ী ভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবারও চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ফলশ্রুতির ক্ষেত্রে স্থায়ী ভাবের সংখ্যা স্থূলতঃ নয়টিই এবং নয়টিই হওয়া উচিত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ভরত মূলতঃ আটটি রস ও তদনুসারে আটটি স্থায়ী ভাব স্বীকার করিয়াছেন; উহাদের মধ্যেও রতি, উৎসাহ, ক্রোধ ও জুগুপ্সাকে প্রধান এবং মৌলিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং হাস, শোক, ভয় ও বিস্ময়কে গৌণ এবং ব্যুৎপন্ন বলিয়াছেন। ভরতের মতানুসারে রতি হইতে হাস, উৎসাহ হইতে বিস্ময়, ক্রোধ হইতে শোক ও জুগুপ্সা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু এইমতটি পরবর্তী যুগে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। পরবর্তীযুগে শম[১] বৃদ্ধি পায় এবং স্থায়ী ভাবের সংখ্যা নয় স্থির হইয়া যায়। তবুও শোধন-কার্য্য চলিতে থাকে এবং নানা নূতন স্থায়ী ভাবের উদ্ভাবনা হইতে থাকে: রুদ্রট স্নেহ[২], ভোজ মতি[৩] (উদাত্ত রসের স্থায়ী)

---

১. শমের বিষয়ে মতভেদ আছে—কতিপয় বিদ্বানদের মত এই যে বোধ হয় উদ্‌ভট শান্ত রস ও শম স্থায়ী ভাবের উদ্‌ভাবনা করিয়াছিলেন কারণ সর্বপ্রথম নবরসের প্রামাণিক উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থেই পাওয়া যায়: নবনাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ (কাব্যালংকার সারসংগ্রহ, বর্গ ৪.৪) দ্রষ্টব্য শংকরণের 'Theories of Rasa And Dhavni, P. 32. অপর দিকে অভিনব গুপ্তের দৃঢ় মত এই যে ভরতই শান্তরসকে যথাবৎ স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহাই ঠিক প্রতীত হয় যে শমের উদ্‌ভাবনা পরে হইয়াছিল।

২. কাব্যালংকার ১২.৩; ১৪.১৭ স্নেহপ্রকৃতিঃ (প্রয়ান্)।

৩. সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প০ ৫, পৃ০ ৫৯৯।

ও গর্ব (উদ্ধত রসের স্থায়ী) ও হর্ষ (আনন্দ রসের স্থায়ী), বিশ্বনাথ বৎসল ভাব [১] সল্য রসের স্থায়ী), ভানুদত্ত মিথ্যাজ্ঞান[২] (মায়া রসের স্থায়ী) ও স্পৃহা[৩] (কার্পণ্য রসের স্থায়ী) ও রূপগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ভক্তি বা ভগবদ্রতি স্থায়ীর উদ্‌ভাবনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক স্থায়ী ভাবের উল্লেখ সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়—উদাহরণস্বরূপ অভিনবগুপ্ত কোন পূর্ববর্তী আচার্য দ্বারা স্বীকৃত গর্ধ অর্থাৎ অমৃত্তবিষয়া তৃষ্ণার (লৌল্য রসের স্থায়ী ভাবের) উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র আসক্তি (ব্যসন রস), অরতি (দুঃখ রস), সন্তোষ (সুখ রস), ডঃ রাঘবন জৈনদের অনুযোগদ্বারসূত্রে উল্লিখিত ব্রীড়ার (ব্রীড়নক রসের স্থায়ী) সংকেত করিয়াছেন[৪] — ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের আচার্যগণের মধ্যে প্রারম্ভ হইতেই স্থায়ী ভাবের সংখ্যা লইয়া মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। অভিনব গুপ্তের সংকেতের দ্বারা ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে লোল্লট প্রভৃতি কতিপয় বিদ্বান্ স্থায়ী ভাবের সীমানা নিশ্চিত করিবার ব্যাপারে—অনন্তপক্ষে নয়ের সীমাকে স্বীকার করিবার ব্যাপারে—রাজী ছিলেন না—

তেনানন্তেহপি পার্ষদপ্রসিদ্ধ্যা এতাবতাং প্রয়োজ্যত্বমিতি যদ্ ভট্টলোল্লটেন নিরূপিতং তদবলেপেনাপরামৃশ্য ইত্যলম্।

—অর্থাৎ লোল্লট প্রভৃতিরা ইহা বলিয়াছেন যে (রস) অনন্ত হইতেও নটেদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য (নাটকে) ইহাদেরই (আটটি রসেরই) প্রয়োগ করা উচিত তাহা (তাঁহারা) অভিমানবশতঃ বিনা বিচারেই বলা হইয়াছে; অতএব উহার খণ্ডন করিবার আবশ্যকতা নাই। (হিং অ০ ভা০, পৃ০ ৫২৯)।

কিন্তু অবশেষে বহুমত ভরতের পক্ষেই থাকিয়াছে এবং এই তথাকথিত উদ্‌ভাবনাগুলিকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এই বিষয়েও—অন্য প্রসঙ্গের অনুরূপ অভিনব গুপ্তের মতই প্রায় মান্য হইয়াছে। তিনি স্থায়ী ভাবের সীমা নির্ধারিত করিয়া স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন:

স্থায়ী ভাব এতগুলিই হয় কারণ প্রাণী এতগুলি বাসনাযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। উদারণস্বরূপ —"দুঃখের সম্পর্কের সহিত যাঁর দ্বেষ ও সুখাস্বাদের জন্য যিনি তৎপর হইয়া ওঠেন তিনি এই নিয়মের দ্বারা হন—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে উৎকর্ষ-প্রাপ্ত রমণেচ্ছা দ্বারা যুক্ত থাকে (ইহার দ্বারা রতির স্থায়ি ভাবত্ব সূচিত হয়), (২) রমণেচ্ছার জন্য সে অপরের উপহাস করে (ইহার দ্বারা হাসের), (৩) প্রিয়বস্তুর বিয়োগে সে দুঃখিত হয় (ইহার দ্বারা শোকের স্থায়ি ভাবত্ব সূচিত হয়), (৪) সেই সব (বিয়োগের)

---

১. স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ। স্থায়ী বৎসলতাস্নেহ······। সা০ দ০ ৩. ২৫১

২. প্রবুদ্ধমিথ্যাজ্ঞানবাসনা মায়া রসঃ। (রসতরঙ্গিণী, পৃ০ ১৬২)।

৩. স্থায়ী ভাবোঽত্র সংপ্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণবিভাগ ৫.২)।

৪. দ্রষ্টব্য, ডঃ রাঘবনের পুস্তক—The Number of Rasas, P. 116 & 141.

কারণের প্রতি তাহার ক্রোধ ব্যক্ত হয় (ইহার দ্বারা ক্রোধের), (৫) শক্তি না থাকিলে পরে ক্রোধের স্থানে সে ভীত হইয়া ওঠে (ইহার দ্বারা ভয়ের), (৬) কাহাকেও, পাই-বার জন্য তাহার অভিলাষা প্রকট হয় (ইহার দ্বারা উৎসাহের), (৭) কখনও অনুচিত বস্তু রূপ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হয়, কাহাকেও অনভীষ্ট-রূপে স্বীকার করে (ইহার দ্বারা জুগুপ্সার), (৮) নিজের বা অপরের ঠিক সেই ধরণের (আশ্চর্যজনক) কার্য দেখিয়া বিস্মিত হয় (ইহার দ্বারা বিস্ময়ের), এবং (৯) কাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে (ইহার দ্বারা নির্বেদের স্থায়িভাবত্ব সূচিত হয়)।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৭৯)।

নিজের মন্তব্যকে আরও স্পষ্ট করিয়া অভিনবগুপ্ত পরে লিখিয়াছেন :

আর্দ্রতা রূপ স্থায়িভাব যুক্ত স্নেহ এক ধরণের আকর্ষণেরই নাম। উহা সব প্রকারেরই আকর্ষণ বা স্নেহ রতি বা উৎসাহাদির মধ্যে মিশিয়া যায়। গর্ধ-রূপ স্থায়ি-ভাব যুক্ত লোল্য রসের খণ্ডনেও এই পদ্ধতির অনুসরণ করা উচিত। এইরূপ ভক্তি রসের সম্বন্ধেও বুঝা উচিত (অর্থাৎ ভক্তি রস কোন স্বতন্ত্র রস নয়)। উহারও রতি অথবা ভাবের মধ্যে অন্তর্ভাব সম্ভবপর।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৬৪১)।

তাৎপর্য এই যে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে সামান্যতঃ নয়টি স্থায়িভাবকেই মান্যতা দেওয়া হইয়াছে—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, ভয়, উৎসাহ, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও নির্বেদ। ইহা ভিন্ন কেবল দুইটি ভাব এমন ছিল যাহা, একটি নিশ্চিত সীমায়, স্থায়িত্বের অধি-কারী হইতে পারিয়াছিল—বৎসল ভাব ও ভগবদ্রতি। অবশিষ্ট ভাবগুলি হয় ইহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় নতুবা সঞ্চারীরূপে গৃহীত হয়।

মনোবিজ্ঞানে সামান্যতঃ মনোবেগের সংখ্যার প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু সহজ বৃত্তিও আশ্রয়ে, এগুলির বর্গীকরণের চেষ্টা সময়ে-সময়ে করা হইয়াছে, মনোবেগের গণনাও হইয়াছে। অধিকাংশ মনোবৈজ্ঞানিক ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে জীবে স্বভাবতঃ কতিপয় মূলবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। তাঁহাদের মতানুসারে মূলবৃত্তি সেই নৈসর্গিক শক্তি যাহার দ্বারা প্রাণী কোন বিশেষ কার্যে অনায়াসই প্রবৃত্ত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ প্রকারের মনঃসংবেগের অনুভব করে—ম্যাকডুগলের মতানুসরণে : মূল-বৃত্তি সেই আনুবংশিক বা সহজ মানসিক-শারীরিক প্রবৃত্তি যাহার প্রেরণায় প্রাণী কোন বিশেষ পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে—উহার প্রতি মনঃসংযোগে করে, উহার উপ-স্থিতিতে একটি বিশেষ প্রকারের মনঃসংবেগ অনুভব করে এবং একটি বিশেষ রীতিতে উহার সম্বন্ধে ক্রিয়াশীল হয় অথবা অন্ততঃপক্ষে এইরূপ ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য আবেগ অনুভব করে।"[১] মনোবিজ্ঞানের বিকাশ-ধারায় ম্যাকডুগলের স্থিতি প্রায় মধ্যবর্তী।

---

1. Social Psychology, P. 25

তাঁহার বিচার জেম্‌স, শেণ্ড প্রভৃতিদের অনুরূপ প্রাচীন নয় এবং অত্যাধুনিক মার্কিন মনোবৈজ্ঞানিকদের অনুরূপ সর্বথা নবীনও নয়। অতএব তাঁহার আশ্রয়ে অগ্রসর হইলে মধ্যম মার্গের অনুসরণ করা হইবে। ম্যাক্‌ডুগলের বিচারেও পরিবর্তন হইয়াছে এবং তিনি নিজের প্রারম্ভিক ধারণাগুলিতে মাঝে-মাঝে সংশোধন করিয়াছেন। তিনি মূলবৃত্তিগুলির ও উহার সহবর্তী মনোবেগগুলির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

মূলবৃত্তি	বৃত্তিগত ভাব বা মনঃসংবেগ
(১) ভোজনোপার্জন (ভোজন অর্জন করিবার প্রবৃত্তি)	ক্ষুধা
(২) বিকর্ষণ (কোন বস্তুকে পরিত্যাগ করিবার বা উহা হইতে সরিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি)	ঘৃণা (জুগুপ্সা)
(৩) কাম (প্রেম এবং যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের প্রবৃত্তি)	রতি
(৪) ভয় (দুঃখদায়া বস্তু হইতে মুক্ত হইয়া পলাইবার বা শরণ লইবার প্রবৃত্তি)	ভয়
(৫) জিজ্ঞাসা (নবীন ও অদ্‌ভুত বস্তুর অন্বেষণের প্রবৃত্তি)	ঔৎসুক্য বা কুতূহল
(৬) সামাজিকতা (সজাতীয় ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করিবার প্রবৃত্তি)	মিলনেচ্ছা (সহানুভূতি)
(৭) পুত্রৈষণা বা মাতৃ-ভাবনা (অপত্য-স্নেহ, সন্তানের সংরক্ষণের প্রবৃত্তি)	বাৎসল্য
(৮) আত্ম-প্রতিষ্ঠা (নিজের ব্যক্তিত্বের প্রদর্শন, অপরের উপর আধিপত্য স্থাপনের প্রবৃত্তি)	অহঙ্কার
(৯) প্রণতি বা অধীনতা (নিজের হইতে অধিক বলবানের প্রতি আদর, প্রশ্রয়, অধীনতা প্রভৃতির প্রবৃত্তি)	দৈন্য

মূলবৃত্তি	বৃত্তিগত ভাব বা মনঃসংবেগ
(১০) যুযুৎসা বা ক্রোধ (বাধা ও বিঘ্ন অথবা বিরোধকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবার প্রবৃত্তি)	ক্রোধ
(১১) শরণাগতি (স্বয়ং বিফল বা নিরাশ হইলে পরে অপরের নিকট হইতে সাহায্য চাওয়ার প্রবৃত্তি)	আর্তি বা দুঃখ
(১২) নির্মাণ (আবশ্যক আচ্ছাদন প্রভৃতি নির্মাণ করিবার প্রবৃত্তি)	সর্জনোৎসাহ
(১৩) পরিগ্রহ (বাঞ্ছিত বস্তুকে প্রাপ্ত করিবার এবং উহার উপর অধিকার দেখাইবার প্রবৃত্তি)	অধিকার-ভাবনা
(১৪) হাস্য (অপরের দোষ বা বিকৃতি দেখিয়া হাসিবার প্রবৃত্তি)	হাস

প্রথমে ম্যাক্‌ডুগাল এই ১৪টি মূলবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন, পরে চারটি আরও স্বীকার করেন :

আরাম (Comfort)—এমন স্থানের খোঁজ করা যেখানে শরীর-সুখ পাওয়া যায়।

নিদ্রা —বিশ্রাম বা নিদ্রার প্রবৃত্তি।

ভ্রমণ —নবীন স্থানে ভ্রমণ করিবার প্রবৃত্তি।

কাশি, হাঁচি, শ্বাস-প্রশ্বাস মোচন প্রভৃতি।

কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ শারীরিক ক্রিয়ার সহিত অধিক, অতএব ইহাদের সহকারী মনোবিকার বা মনঃস্থিতি খুব স্পষ্ট এবং বিশিষ্ট নয়। পরিণামে, ইহাদের দ্বারা আমাদের কোন বিশেষ উপকার হয় না। উল্লিখিত ১৪টি প্রবৃত্তিমূলক মনোবিকারের মধ্যেও ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক, অতএব কাব্যে উহার বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই—আশা করাও বৃথা। ইহা ভিন্ন শেষ ১৩টিও, অতিব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তি হইতে মুক্ত নয়। এগুলি স্পষ্টতঃ পরস্পরের সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সর্জনোৎসাহ এবং অধিকার-ভাবনা অহংকারের পরিধির মধ্যে আসিয়া যায়। দৈন্য ও আর্তি পরস্পর হইতে খুব বেশী ভিন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে এদুটি

একই প্রবৃত্তির দুইটি অভিব্যক্তি। এইরূপ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অনুসরণেও প্রবৃত্তি-মূলক মনোবিকার সাধারণতঃ দশের বেশী নয়। রতি, হাস, ক্রোধ, ভয়, ঘৃণা (জুগুপ্সা), ঔৎসুক্য, বাৎসল্য, অহঙ্কার, আর্তি, সহানুভূতি (সঙ্গেচ্ছা)। ইহাদের মধ্যে প্রথম সাতটি সংস্কৃত স্থায়ী ভাব হইতে প্রায় অভিন্নই। অহঙ্কার ও উৎসাহের মধ্যেও কোন বিশেষ তফাৎ নাই। বাৎসল্যকেও কতিপয় আচার্যগণ স্থায়ী ভাব স্বীকার করিয়াছেন। যদিও সর্বসম্মত মত ইহাই যে ভাব ভিন্ন উহাদের অন্য কোন রূপ নাই। এই কথা সহানুভূতির সম্বন্ধে আরও নিশ্চয়পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের আর একটি স্থায়ীভাব আছে—শোক। আর্তি এবং সহানুভূতি উভয়কে কি শোকের (করুণ) তত্ত্বরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না?

ইহাতে সন্দেহ নাই যে আজ মনোবিজ্ঞান ম্যাকৃডুগালকে পশ্চাতে রাখিয়া অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং মূলবৃত্তির বর্গীকরণ এবং গণনাতেও অনেক কিছু পরিবর্তন আসিয়াছে। ম্যাকৃডুগালের ভিত্তি যেখানে মূলতঃ জীববিজ্ঞান ছিল, সেখানে এখন অবচেতনশাস্ত্র এবং জীববিজ্ঞান উভয়ের ভিত্তিতে মূলবৃত্তি ও মনোবেগ প্রভৃতির বিবেচনা হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ রেনাল্ড ফ্লেচার নিজের "Instinct in Man" (1957) গ্রন্থে যে তালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন, উহাতে মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা শারীরিক বৃত্তির সংখ্যা অধিক। ফ্লেচার সাহেব পাঁচটি শিরোনামার অন্তর্গত মূলবৃত্তি-গুলির বর্গীকরণ করিয়াছেন: শরীরবৈজ্ঞানিক আধার, মানসিক অনুভব, মানসিক প্রবৃত্তি, উদ্দীপক কারণ (চিহ্ন) পরিণামী (শারীরিক) প্রবৃত্তি। ইহাদের মধ্যে মানসিক অনুভব-গুলি প্রায় মনোবেগেরই সমরূপ। মানসিক প্রবৃত্তি আন্তরিক অনুভাবের এবং শারীরিক প্রবৃত্তি বাহ্য অনুভাবের নিকট—উদ্দীপক কারণ বিভাবের নিকট। এই তালিকায় সাকুল্যে ১০টি মূলবৃত্তির উল্লেখ হইয়াছে—ইহাদের যথার্থ বৃত্তি[১] বা মূল আবেগ বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তিনটি সামান্য[২] প্রবৃত্তি বা অহং প্রবৃত্তি এবং দুইটি গৌণ[৩] আবেগ বিদ্যমান আছে। প্রথম পর্যায়ের দশটি মূলবৃত্তির মধ্যে ছয়টি শারীরিক—(১) শ্বসন; (২) ভোজন; (৩) পান; (৪) তাপ-রক্ষণ (উপযুক্ত তাপমানের রক্ষণ); (৫) স্বাপ (জাগরণ); (৬) শরীর-সুখের এষণা এবং (৭) উৎসর্জন। কেবল তিনটি বৃত্তি মানসিক—(১) ভয়; (২) সামান্য স্ফূর্তি বা উৎসাহ [(ক) ক্রীড়া; (খ) কৌতুহল; (গ) মৃগয়া.] (৩) কাম-বৃত্তি: [(ক) কামকেলি; (খ) কামজন্য দ্বেষ বা সংঘর্ষ; (গ) বাৎসল্য; (ঘ) গার্হস্থ্য বৃত্তি।] দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ অহং-প্রবৃত্তির তিনটি ভেদ বর্তমান—(১) সুখ-দুঃখ; (২) রাগ-বিরাগ; (৩) প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এবং তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ গৌণ আবেগের কেবল দুইটি উল্লেখ হইয়াছে—(১) কুণ্ঠা বা নিরাশা, (২) আশা-আকাঙ্ক্ষা। পৃ০ ৩০৯-৩১৫।

---

1. Instincts Proper or Primary Impulses;

2. General Instinctive Tendencies or Ego Tendencies;

3. Secondary Impulses.

বলা বাহুল্য, ক্ষমতাগত এই মাত্রাভেদ চেতনার অপেক্ষা শরীরের বর্ধমান শক্তিরই নির্দেশ দেয় এবং আমাদের ধারণায় এই পরিবর্তনের দ্বারা কোন সংশোধনও আনয়ন করা সম্ভব নয়। এই ভেদ গতিরই দ্যোতক, প্রগতির নয় অর্থাৎ ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মধ্যবর্তী মনোবৈজ্ঞানিকদের যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা এই অত্যাধুনিক অনুসন্ধানকে মান্যতা দেওয়া হইবে ইহা বলা কঠিন। তবুও মনোবেগের দৃষ্টিতে উল্লিখিত তালিকায় যে তিনটি মানসিক মূলবৃত্তির উল্লেখ হইয়াছে তাহার অন্তর্গত অনেকগুলি স্থায়ী ভাবের স্থিতি যথাবৎ গ্রহণীয়: (১) ভয়, (২) উৎসাহ, (৩) কৌতূহল (বিস্ময়), (৪) রতি, (৫) বাৎসল্য এবং (সীমিত রূপেই হউক না কেন?) (৬) ক্রোধ। 'হাস'কে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বা (সামান্য) স্ফূর্তির ভেদ ক্রীড়ার অন্তর্গত উহারও অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বর্গে অহং প্রবৃত্তির অন্তর্গত 'দুঃখ'এর মধ্যে 'শোক'কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপে এই বর্গের অন্তর্গত বিরাগ (avoidance)-এর মধ্যে জুগুপ্সার এবং নিবৃত্তি'র মধ্যে 'নির্বেদ-এর সঙ্কেতও পাওয়া যায়।

প্রাগুক্ত বিবেচনার দ্বারা সংস্কৃত নয়টি রসের সার্বভৌমিকতা সিদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে আমাদের এই বর্গীকরণ সর্বথা অনর্গল বা স্বকপোল-কল্পিত নয়। স্থায়ী ভাবের স্থিতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের প্রতিকূল নয়, এবং সংখ্যা-নির্ধারণও সর্বথা নিরাধার নয়, এবং ইহাও ঠিক যে সর্বথা নির্দোষও নয়। কিন্তু কোনও বর্গীকরণ এবং সংখ্যা নির্ধারণ কি সর্বথা নির্দোষ হইতে পারে?

সঞ্চারী ভাবের বিবেচনা

সঞ্চারী ভাবের স্থিতি এইরূপ স্পষ্ট নয়। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে সঞ্চারীর পরিভাষা এইরূপে করা হইয়াছে:

বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরনাদ্ ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ তদ্ভিদাঃ॥ —সা০ দ০ ৩.১৪০

স্থিররূপে বিদ্যমান রত্যাদি স্থায়ী ভাবের মধ্যে উন্মগ্ন, নির্মগ্ন অর্থাৎ আবির্ভূত-তিরোভূত হয় (স্থায়ীভাবরূপী জলে তরঙ্গের অনুরূপে সঞ্চরণ করে) বলিয়া তাহাদের সঞ্চারী বলা হয়।

ইহাদের সংখ্যা তেত্রিশ গণনা করা হইয়াছে। ভরত নিম্নক্রমে ইহাদের বর্ণনা করিয়াছেন:

নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, স্বপ্ন (সুপ্ত), বিবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক।

ভরতের বর্ণনায় ইহা স্পষ্ট যে উল্লিখিত ভাব-সকলের অভিনয়াত্মক রূপই প্রমুখ এবং মনোবৈজ্ঞানিক রূপ গৌণ। অতএব তিনি সঞ্চারী ভাবের মধ্যে মন ও শরীরের প্রায় সেই সমস্ত অবস্থার অন্তর্ভাব করিয়াছেন যাহা আটটি রসের মধ্যে সাধারণতঃ সঞ্চারিত হয়। সঞ্চারীর বাস্তবিক স্থিতি কি এই সম্বন্ধে বিদ্বানদের মধ্যে তীব্র মতভেদ বিদ্যমান আছে। আধুনিক বিদ্বানগণ[১] মনোবিজ্ঞানের স্থূল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে তেত্রিশটি সঞ্চারীর মধ্যে—

(ক) কেবল ১৪টি ভাব বা মনোবিকার—নির্বেদ, শঙ্কা, হর্ষ, দৈন্য, উগ্রতা, চিন্তা, ত্রাস, অসূয়া, অমর্ষ, গর্ব, ব্রীড়া, আবেগ, বিষাদ, ঔৎসুক্য।

(খ) ৪টি মনোবেগ না হইয়া জ্ঞানাত্মক অনুভব মাত্র—ধৃতি, মতি, বিতর্ক, অবহিত্থ।

(গ) ৫টি শারীরিক সংবেদন মাত্র—গ্লানি, শ্রম, আলস্য, মদ, মোহ।

(ঘ) ১০টি মানসিক অনুভাবই নয়—স্মৃতি, স্বপ্ন, নিদ্রা, বিরোধ, জড়তা, চপলতা, অপস্মার, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ।

ডঃ গুলাবরায়ও[২] এই প্রসঙ্গে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং পরে নিজেই তাহার সমাধান করিয়াছেন। প্রথম আপত্তি এই যে শ্রম, স্বপ্ন, নিদ্রা, বিরোধ, অপস্মার, উন্মাদ, ব্যাধির মনের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার সমাধান তিনি এই-রূপে করিয়াছেন যে ইহাদের সকলের ভৌতিক অস্তিত্ব অবশ্য আছে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এগুলির অনুকূল মানসিক স্থিতিও বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে ত্রাস, শঙ্কা, বিষাদ ও অমর্ষ প্রভৃতি কতিপয় ভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—ভয়, শোক ও ক্রোধের অনুরূপ স্থায়ীভাবের মধ্যে ইহাদের অন্তর্ভাব হইয়া যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে সাম্য দৃষ্ট হইলে পরেও শঙ্কা ও ত্রাসের ভয় হইতে, অমর্ষের ক্রোধ হইতে এবং বিষাদের শোক হইতে স্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান আছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই যে কতিপয় সঞ্চারী ভাব, যেমন ধৃতি, মতি ও অবহিত্থ জ্ঞানমূলক। ইহার উত্তর এই যে এগুলিকে ভাব বলিতে কোন বাধা নেই কারণ প্রায় সকল ভাবই জ্ঞানাশ্রিত হয়।

অপরদিকে পরম্পরানিষ্ঠ অন্য গবেষকগণ[৩] রসগঙ্গাধরের আশ্রয়ে ডঃ রাকেশ গুপ্ত যে সব আপত্তি তুলিয়াছিলেন তাহার খণ্ডন করিয়া ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে সবমিলিয়া তেত্রিশটি সঞ্চারী ভাবই চিত্তবৃত্তিরূপ। তথাকথিত ভৌতিক স্থিতির মধ্যেও চিত্তবৃত্তিরূপ ভাবের স্থিতি অনিবার্যতঃ বিদ্যমান থাকে—যেমন 'ব্যাধি'র মধ্যে মনস্তাপ 'নিদ্রা'র মধ্যে চিত্তের সম্মীলন (সক্রিয়তার অন্ত), 'স্বপ্ন'এর মধ্যে জ্ঞানের স্থিতি বিদ্যমান থাকে। এইরূপ জ্ঞানাত্মক অনুভবও চিত্তবৃত্তি রূপই কারণ ভারতীয় দর্শন

---

১. দ্রষ্টব্য: Psychological studies in Rasa—Dr. Rakesh Gupta, পৃ০ ১৪৫

২. দ্রষ্টব্য: সিদ্ধান্ত ও অধ্যয়ন (দ্বি০ সং০), পৃ০ ১৩২-৩৪

৩. দ্রষ্টব্য: রসগঙ্গাধরকা শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন (প্র. সং.)—ডঃ প্রেমস্বরূপ গুপ্ত, পৃষ্ঠ ২৩৯-৪০

জ্ঞানকে চিত্তবৃত্তি হইতে পৃথক বলিয়া স্বীকার করে না।

উল্লিখিত বিবেচনার ভিত্তিতে সঞ্চারীর ঔচিত্যানৌচিত্যের বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়:

(১) সঞ্চারী সেই অর্থে ভাব নয় যে অর্থে স্থায়ীকে ভাব বলা হয়। ভরত 'ভাব' শব্দটির প্রয়োগ ব্যাপক রূপে করিয়াছেন—অতএব সঞ্চারীর অন্তর্গত কেবল মনোবিকার বা মনোবেগের গণনা হয় নাই বরং সেইসব শারীরিক-মানসিক অবস্থারও গণনা করা হইয়াছে যাহাদের আটটি রসের সহিত—বিশেষ করিয়া উহাদের অভিনয়ের সহিত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ আছে। অতএব প্রত্যেকটি সঞ্চারী শুদ্ধ ভাবরূপ বা চিত্তবৃত্তিরূপ নয়। ভরতের বিবরণ ও অপরদিকে ধনঞ্জয়ের বিবরণের দ্বারা এই ধারণাটিই স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে ব্যাধি, উন্মাদ, অপস্মার, নিদ্রা, বিরোধ, প্রভৃতির শারীরিক রূপের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ—

ভরত—অপস্মারের উৎপত্তি দেব, যক্ষ, নাগ, ব্রহ্মরাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ দ্বারা গ্রহণ বা উহার স্মরণের দ্বারা, উচ্ছিষ্ট ভোজন, শূন্য ভবন প্রভৃতির গ্রহণের দ্বারা, অশুচিকালের প্রভাবে, পরিপতন, ব্যাধি প্রভৃতির জন্যও হয়। ইহার অভিনয় কম্প, নিঃশ্বাস, উৎকম্প, ধারণ, পতন, স্বেদ, মুখ-ফেন, জিহ্বা পরিলেহন প্রভৃতি অনুভাবের সাহায্যে করা উচিত।

ধনঞ্জয়—প্রারব্ধবশতঃ গ্রহজনিত দুঃখ প্রভৃতির জন্য যে আবেশ উপস্থিত হয় তাহাকে অপস্মার বলা হয়। মাটিতে পড়িয়া যাওয়া, কম্প, ঘামে ঘেমে যাওয়া, ঢোক গেলা ও মুখে ফেণ আসা প্রভৃতি অপস্মারের অনুভব। (দশরূপক, ৪।২৫)

(২) সঞ্চারীর বিবেচনায় মনোবিজ্ঞান ও তর্কের কোন বলিষ্ঠ ভিত্তি লক্ষিত হয় না—সেইজন্য ইহাতে সম্যক্ ব্যবস্থার অভাব দৃষ্ট হয়। অর্ধেকেরও কম সঞ্চারী এমন যাহা বস্তুতঃ 'ভাব' সংজ্ঞার ন্যায্য অধিকারী এবং উহাদের মধ্যেও কতিপয় এমন আছে যাহাদের অন্তর্ভাব কয়েকটি স্থায়ীভাবের মধ্যে হইয়া যায়। কয়েকটি জ্ঞানাত্মক বা ভৌতিক (শারীরিক) অনুভব সংবেদন মাত্র এবং অনেকগুলিকে তো মানসিক অনুভবই বলা যায় না।

(৩) ইহা ঠিক যে সমস্ত সঞ্চারীগুলি স্থায়ী ভাবের অনুরূপ বিশুদ্ধ ভাব নয়, তবুও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রমাণিত করিয়াছেন যে উহাদের মধ্যে কাহারও চিত্ত-বৃত্তিরূপতায় সন্দেহ করা যাইতে পারে না। মরণের অর্থ যথার্থ প্রাণান্ত নয় বরং উহার পূর্ববর্তী মূর্চ্ছাই ধরিয়া লইতে হইবে। যেগুলির মধ্যে শারীরিক বা বৌদ্ধিক চেতনার প্রাধান্য আছে, সেগুলিও চেতনা বা চিত্তবৃত্তিরূপই। অতএব এই নির্ণয় অসঙ্গত যে অনেক সঞ্চারী কেবল বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া বা শারীরিক সংবেদন বা ভৌতিক অবস্থা ব্যতীত আর কিছু নয়। কারণ ইহাদেরও তো অনুভূত্যাত্মক রূপ বিদ্যমান থাকে। প্রকৃত পৃষ্ঠাধারকে না জানিয়া পরম্পরার খণ্ডন ঠিক নয়।

উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিতে সত্যের অংশ নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান

আছে। ভরতের রস-বিবেচনার অধ্যয়ন করিবার পর ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে তিনি চিত্তবৃত্তির অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থে ভাব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সকল সঞ্চারী তাঁহার মতে বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি-রূপ নয়। ভরতের মতে নাট্য এই জগতের অনুকৃতি মাত্র অতএব তিনি বিভিন্ন রসের সহিত সম্বদ্ধ প্রমুখ মানসিক এবং শারীরিক স্থিতিসকলের, যেগুলি এই সমস্ত রসের মূল ভাবের সন্দর্ভে অস্থায়ীরূপে সাধারণতঃ উৎপন্ন হইতে থাকে, সেগুলিকে সঞ্চারী ভাবের (সঞ্চরণশীল অবস্থার) অন্তর্গত সংখ্যাভুক্ত করিয়াছেন/অপরদিকে পণ্ডিতরাজের এই বিবেচনাও অমান্য যোগ্য নয় যে প্রত্যেক সঞ্চারীর নিজস্ব অনুভূত্যাত্মকরূপ বিদ্যমান থাকে—ব্যাধি, অপস্মার, মরণ প্রভৃতি-রও যাহাতে শারীরিক বিকারের প্রাধান্য থাকে বা ধৃতি, মতি, বিতর্ক প্রভৃতিরও, যাহাতে বুদ্ধি তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে, নিজস্ব বিশিষ্ট অনুভব আছে। অতএব ব্যাধিজন্য শারীরিক বিকারের স্থানে মনঃস্তাপ প্রভৃতি মনোবিকারই, সঞ্চারী ভাবের অন্তর্গত গ্রহণীয়। কিন্তু এই দুইটি যুক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও অনেকগুলি প্রশ্ন অবশেষ থাকিয়া যায়ঃ

(১) ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও যে সঞ্চারীর অন্তর্গত ভরত কেবল বিশুদ্ধ ভাবের গণনা করেন নাই, সঞ্চারীর স্বরূপ স্পষ্ট হয় না। এমন অনেক সঞ্চারী শারীরিক অথবা বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া রূপও বিদ্যমান আছে যাহাদের দেখিয়া এই প্রশ্ন ওঠে যে এমন ক্রিয়া তো আরও অনেক আছেঃ ব্যাধি, অপস্মার, মদ, মোহ, গ্লানি, শ্রম, জড়তা প্রভৃতির মধ্যেই শারীরিক ক্রিয়াকে সীমিত বলিয়া স্বীকার কেন করা হইবে এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়াকেও কেন ধৃতি, মতি, বিতর্ক, স্মৃতি প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হইবে? অপস্মারও ব্যাধি এবং ব্যাধি তো আরও অনেক আছে যাহা এই লৌকিক জীবনের প্রতি মুহূর্তে দেখিতে পাওয়া যায় বা অনুভব করা যায়—সেইজন্য কেবল অশীত বা সদাহ জ্বরেরই উল্লেখ কেন? ধৃতি, মতি ও বিতর্ক ব্যতীত এমন অনেক বৈচারিক অবস্থা আছে যাহার অনুভব মানুষ প্রতিদিন করে—সেই সব বিবিধ এবং বিভিন্ন অবস্থার পৃথক উল্লেখ না করিয়া এই সকল সমরূপ স্থিতির স্বতন্ত্ররূপে বর্ণনার মধ্যে কি কোন বিশেষ সার্থকতা আছে? আমাদের ইহা বলার উদ্দেশ্য যে এই বর্গীকরণের কোন নিশ্চিত ভিত্তি নাই। উল্লিখিত তর্কানুসারে ভরতের মত স্পষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু শারীরিক অবস্থা এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়াকে 'ভাব' সংজ্ঞা দেওয়ার ঔচিত্য তবুও সিদ্ধ হয় না।

(২) এই যুক্তিকেও সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না যে ব্যাধি, জড়তা ও অপরদিকে বিতর্ক, মতি প্রভৃতিরও স্ব-স্ব অনুভূত্যাত্মকরূপ হয়, এইজন্য ইহাদেরও চিত্তবৃত্তি বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। মনোবিজ্ঞানেও অনন্তপক্ষে নিদ্রা, বিরোধ, বিশ্রাম, শ্রম, গ্লানি, প্রভৃতিরও মানসিক অনুভবরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবুও ইহা এগুলি যে 'ভাব' তাহা প্রমাণিত হয় না। এইরূপে তো জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারই ভাব কারণ এমন কোন ব্যাপারই নাই যাহার অনুভূতি মনের দ্বারা হয় না। তাহা হইলে ঘটনা ও ভাব, বিষয় ও অনুভূতির প্রভেদই সমাপ্ত হইয়া যাইবে।

দার্শনিক ভিত্তিতে ইহা প্রমাণিত করা বোধ হয় সম্ভব হইতে পারে কিন্তু এখানে আমরা মূলতত্ত্বের বিচার করিতেছি না বরং ব্যবহারিক বর্গীকরণেরই বিবেচনা করিতেছি যাহা অভেদ বুদ্ধির উপর আশ্রিত নয় বরং ভেদ-বুদ্ধির উপরই আশ্রিত।

(৩) তৃতীয় প্রশ্নটি সংখ্যার। যে কোন দৃষ্টিতে বিচার করিলে সঞ্চারীর সংখ্যা মাত্র তেত্রিশ সিদ্ধ করা অসম্ভব। যদি সঞ্চারী ভাব সকলকে বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি বা মনোবিকার রূপ বলিয়া স্বীকার করা হয় তবুও উহার গণনা সহজ নয়। মনোবিজ্ঞান, বিশেষ করিয়া আধুনিক মনোবিজ্ঞানানুসারে এইরূপ গণনা অসম্ভবই। দর্শন, আচার শাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতিতে উল্লিখিত সবগুলি ভাবের নামেরও যদি সংকলন করা হয় তাহা হইলেও উহাদের সংখ্যা অনেক গুণ হইয়া যায় এবং এই সংখ্যায় যদি বৌদ্ধিক অনুভূতি-গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহা হইলে তো বলারই কিছু থাকিবে না। আমাদের প্রতিদিনের অনুভবের মধ্যেই এমন অনেকগুলি ভাব আছে যাহাদের স্থিতি এই পরিগণিত ভাবের বাহিরে। সংস্কৃত-আচার্যদের সম্মুখেও এই প্রশ্নটি ছিল। ভানুদত্ত দশটি কামদশার অন্তর্ভাব ব্যভিচারীর মধ্যে করিয়াছেন, ভোজপ্রভৃতিরা 'হাব' ইত্যাদিরও সমাবেশের প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং অপরদিকে সাত্ত্বিকগুলিকেও ইহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মাৎসর্য, উদ্বেগ, দম্ভ, ঈর্ষা, বিবেক, নির্ণয়, ক্লৈব্য, ক্ষমা, কৌতূহল, উৎকণ্ঠা, বিনয়, সংশয়, এবং ধৃষ্টতা প্রভৃতির ও কথা উঠিয়াছে, কিন্তু শেষে ব্যভিচারীর মধ্যে উহাদের সকলের অন্তর্ভাব করা হইয়াছে, যেমন, মাৎসর্যের অসূয়ার মধ্যে, উদ্বেগের ত্রাসের মধ্যে, দম্ভের অবহিত্থার মধ্যে, ঈর্ষার অমর্ষের মধ্যে, বিবেক ও নির্ণয়ের মতির মধ্যে, ক্ষমার ধৃতির মধ্যে, ক্লৈব্যের দৈন্যের মধ্যে, উৎকণ্ঠার ঔৎসুক্যের মধ্যে, বিনয়ের লজ্জার মধ্যে, সংশয়ের তর্কের মধ্যে, কৌতূহল ও ধৃষ্টতার চপলতার মধ্যে, অন্তর্ভাব করা হইয়াছে।[১] কিন্তু আজ ইহাতে কেহ সন্তুষ্ট হইবেন না। এইরূপে তো ধৃতির মতির মধ্যে, বিষাদের চিন্তার মধ্যে অন্তর্ভাবও স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাচ্য মীমাংসানুসারেও অনেক মনোবিকার এমন আছে যাহা এই পরিধির বাহিরে। উদাহরণস্বরূপ—আদর, শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রশ্রয়ের বিভিন্ন রূপ অথবা ঔদার্য, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি অনুকম্পার অন্তর্ভেদ অথবা দ্বেষের অন্তর্গত অসন্তোষ, অবমান, অবিশ্বাস প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডঃ ভগবানদাস প্রাচ্য বিচার-শাস্ত্রেরই অনুসরণে ৬৪টি মনোবিকারের গণনা করিয়াছেন, যাহাতে উল্লিখিত সমস্ত এবং ইহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি মনোবিকার সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের তেত্রিশ বা ৪২টি সঞ্চারীর পরিধির বাহিরে আসিয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক জেম্স যেরূপ বলিয়াছেন যে মনোবিকারের গণনা করা এবং উহার পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করা কেবল কঠিনই নয় অসম্ভবও কারণ মনের বস্তুর প্রতি প্রতিক্রিয়াই তো মনোবিকার যাহা প্রত্যেক বস্তুর সংস্পর্শে পরিবর্তিত হইতে থাকে। মনে অসংখ্য তরঙ্গ উঠিতে থাকে

১. হিন্দী রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃষ্ঠ ৩২৪-৩৫

যাহা পরস্পরে নানারূপে মিলিত হইয়া সংখ্যাতীত মনোবিকারের আবির্ভাব ঘটায়। সাধারণতঃ মৌলিক মনোবিকারের গণনা করাই অত্যন্ত কঠিন, আবার মিশ্র ও ব্যুৎপন্ন মনোবিকারের তো অন্তই নাই।

অতএব আমরা এই সার-কথা বলিতে বাধ্য যে সঞ্চারী ভাবের স্থিতি ততখানি পুষ্ট নয় এবং স্বয়ং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের মতন পরম্পরানিষ্ঠ আচার্যও এই অপ্রিয় তথ্যটি অনুভব করিয়াছিলেন—অথ কথমস্য সংখ্যানিয়মঃ অর্থাৎ ভাবের সংখ্যা ৩৩ বা ৩৪, এই নিয়ম কিরূপে করা যাইতে পারে। কিন্তু শেষে এই যুক্তি দেখাইয়া যে—মুনিবচনানুপালনস্য সম্ভব উচ্ছৃঙ্খলতায়া অনৌচিত্যাৎ—তিনি পরম্পরাকে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন। যখন তথাকথিত নবীন ভাবের, সল্প-বিস্তর ভেদ থাকা সত্ত্বেও, পরিগণিত সঞ্চারীর মধ্যেই অন্তর্ভাব করিয়া মুনির বচনের মর্যাদা রাখা সম্ভবপর তখন উচ্ছৃঙ্খলতার দরকার কি? পণ্ডিতরাজের তিনশত বৎসর পরে আজ আমরাও ভরতের পরম্পরার প্রতি আদর ভাব ব্যক্ত করিয়াও, এই কথাটি বলিবার সাহস করিতে পারি যে সঞ্চারীর বিবেচনা অনন্তপক্ষে যথাবৎ স্বীকার্য নয়।

■ ■ ■

(খ) রস-সংখ্যা

রস-সংখ্যা প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গেরই অন্তর্গত। যদিও স্থায়ী ভাব প্রসঙ্গে ইহার অল্প-বিস্তর চর্চ্চা করা হইয়াছে তবুও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এখানে স্বতন্ত্র আলোচনা করা হইতেছে। এই আলোচনার দ্বারা বোধ হয় ইহার স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্টও প্রমাণিত হইতে পারিবে।

ঐতিহাসিক বিকাস-ক্রম—ভেদ-বিস্তার

ভরত আটটি রসের কথা বলিয়াছেন:

শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্‌ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতা:। ৬.১৬

—অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীব, ভয়ানক, বীভৎস, ও অদ্ভুত নামক আটটি রস নাট্যশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ স্মরণ করিয়া থাকেন। এই সংখ্যা নির্ধারণ কিন্তু ভরত করেন নাই, বরং তাঁহার পূর্বে স্বয়ং ব্রহ্মা, অথবা দ্রুহিণ নামক কোন প্রাচীন ঋষি এই সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন: (৬.১৭ পূর্বার্ধ)

এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা।

অর্থাৎ ভরতের পূর্ব হইতে প্রাচীন পরম্পরানুসরণে এই আটটি রসের কথাই চলিয়া আসিতেছিল। পরে ভরতের মেধাবী ব্যাখ্যাকার অভিনবগুপ্ত নিজস্ব মতের অনুকূলে নাট্যশাস্ত্রের অন্য কোন পাঠের ভিত্তিতে ইহা প্রমাণিত করিবার সতত প্রয়াস করিয়াছিলেন যে ভরতও নয়টি রসের কথা বলিয়াছেন: "এবং প্রকৃতপক্ষে রস নয়টি। কিন্তু যাঁহারা নাট্যে ইহাকে স্বীকার করেন নাই তাঁহারা ('বীভৎসাদ্‌ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ'র স্থানে 'বীভৎসাদ্‌ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ' এইরূপে) 'অষ্টৌ' এই পাঠটিকেই স্বীকার করেন।" (—হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪২৯)। কিন্তু এই উদ্‌ভাবনাটি প্রমাণপুষ্ট নয়। ভরত উপর্যুক্ত 'রস-সংখ্যা বর্ণনা' প্রসঙ্গে দুইবার আটটি রসের উল্লেখ তো করিয়াছেনই, উহার পূর্বেও নানা স্থানে আটটি রসেরই বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন: উদাহরণস্বরূপ, উৎপত্তি, বর্ণ ও অধিদেবতার বর্ণনাতে (নাট্যশাস্ত্র, ৬.৪০-৪৬); ভাববিবেচনার সন্দর্ভে যেখানে ৮টি স্থায়ী, ৮টি সাত্ত্বিক এবং ৩৩টি সঞ্চারীকে যোগ করিয়া যোগ-সংখ্যা ৪৯ স্বীকার করা হইয়াছে (নাট্যশাস্ত্র, ৭৬ গদ্যভাগ, পৃ০ ১০৬), প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গেও অভিনবগুপ্ত বৈকল্পিক পাঠের সংকেত

দিয়াছেন কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। অতএব ইহা নিশ্চিত যে ভরত রসের সংখ্যা কেবল আটটি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহা তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল না বরং ইহার পশ্চাতে প্রাচীন পরম্পরার পুষ্ট আধার বিদ্যমান ছিল।

ভরতের পরে দণ্ডীও কাব্যাদর্শে কেবল আটটি রসেরই উল্লেখ করিয়াছেনঃ "ইহ ত্বষ্টরসায়ত্তা রসবত্তা স্মৃতা গিরাম্" (২.২৯২)—অর্থাৎ এখানে রসবৎ অলংকারে বাণীর আটটি রসের দ্বারা যুক্ত হওয়াকেই রসবত্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কিছু কাল পরে উদ্‌ভট নির্ভ্রান্ত এবং সহজ ভাবে শান্তকে সংযুক্ত করিয়া নয়টি রসের উল্লেখ করেন ঃ

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্‌ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪.৪

দণ্ডী ও উদ্‌ভটের মধ্যবর্তী অন্য কোন বিখ্যাত আচার্য নাই। সেইজন্য পণ্ডিতেরা এই অনুমান করেন যে শান্ত রসের উদ্‌ভাবনা উদ্‌ভটই করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ভাবে সহজরূপে উদ্‌ভট শান্ত রসের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এই ধারণা হয় যে তিনি সেই যুগে প্রচলিত রস-সংখ্যাকে মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। —অর্থাৎ উদ্‌ভটের সময় পর্যন্ত শান্তরস রসবেত্তাদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এবং উদভট উহাকে গ্রহণ করিয়া কেবল মাত্র পরম্পরার পালন করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে উদভট নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যে (যাহা আজ অনুপলব্ধ) শান্ত রসকে যুক্তি-যুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে কেবল ইহাই স্বীকার করা সঙ্গত হইবে যে শান্ত-সহ নবরসের প্রথম উল্লেখ উপলব্ধ গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্‌ভটের 'কাব্যালংকারসংগ্রহ'তেই পাওয়া যায়। বামন রসের সংখ্যার উল্লেখ করেন নাই এবং সকল রসের নামও দেন নাই। কিন্তু রুদ্রট প্রেয়ান্ রসের কথা বলিয়া রসের স্বীকৃত সংখ্যার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ঃ

শৃঙ্গারবীরকরুণা বীভৎসভয়ানকাদ্‌ভুতা হাস্যঃ।
রৌদ্রঃ শান্তঃ প্রেয়ানিতি মন্তব্যা রসাঃ সর্বে ॥ ১২.৩

এই প্রেয়ান্ রস যাহার স্থায়ী ভাব স্নেহ বোধ হয় রুদ্রটেরই নিজস্ব কল্পনা ছিল, কিন্তু বিদ্বানদের নিকট হইতে ইহা স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ রূপে বলা যায় যে রুদ্রটের প্রায় সমসাময়িক রুদ্রভট্টও নিজের 'শৃঙ্গার-তিলক'এ কেবল নবরসেরই বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রুদ্রটও রসভেদের এক-আধটি নবীন রস কল্পনার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন না—তিনি লোল্লট প্রভৃতি কতিপয় প্রাচীন ক্রান্তিকারী আচার্যদের অনুযায়ী ছিলেন যাঁহারা রসকে অনন্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার নিজস্ব ধারণা ছিল ঃ

রসনাদ্রসত্বমেষাং মধুরাদীনামিবোক্তমাচার্যৈঃ।
নির্বেদাদিস্বপি তন্নিকামমস্তীতি তেঽপি রসাঃ ॥ ১২.৪

অর্থাৎ ভরতাদি আচার্যগণ স্থায়ী ভাবগুলিকে এইজন্য রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যেহেতু এগুলি মধুর, অম্ল প্রভৃতি রসের অনুরূপ আস্বাদ্য। এই আস্বাদনীয়তা

নির্বেদাদি সঞ্চারী ভাবের মধ্যেও বিদ্যমান আছে, অতএব উহারাও রসত্ব লাভ করে। ইহা নিশ্চিত একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু পরম্পরার প্রভাবস্বরূপ ভোজ ব্যতীত কোন অন্য আচার্য ইহাকে স্বীকার করেন নাই। ইহার পরে আনন্দবর্ধনের যুগ অর্থাৎ ধ্বনিকাল শুরু হয়। আনন্দবর্ধন বিস্তারের অপেক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অধিক আগ্রহশীল ছিলেন,* অতএব তিনি রসের সংখ্যাবৃদ্ধি না করিয়া কেবল নয়টি রসেরই চর্চা করিয়াছেন। এই যুগের দুইজন প্রমুখ আচার্য ধনঞ্জয় ও অভিনবগুপ্তও এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করিয়াছেন। যদিও মহিমভট্ট, অগ্নিপুরাণকার, মম্মট প্রভৃতিরা রসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন কিন্তু রস-সংখ্যা বিষয়ক কোন বিশেষ কথা তাঁহারা বলেন নাই। ধনঞ্জয় অষ্টবিধ রস এবং অষ্টরসবিলক্ষণ শান্ত রসের সম্বন্ধে নিজস্ব সমাধান উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন যে নাট্যে আটটি রসই স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে। কতিপয় বিদ্বানগণ শম স্থায়ী ভাব এবং উহার পরিপাক শান্ত রসকেও স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু নাট্যে উহার সঞ্চার অসম্ভব : শমমপি কেচিৎপ্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য। (দ০ রূ০ ৪.৩৫) ইহার অর্থ এই যে ধনঞ্জয় কাব্যে শান্তরসকে স্বীকৃতি দিয়াছেন কিন্তু যেহেতু তাঁহার বিবেচ্য বিষয় রূপক, সেইজন্য তাঁহার পক্ষে শান্তরসের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ছিল। ধনঞ্জয় প্রেয়ান্ এবং ভক্তিরসেরও খণ্ডন করিয়াছেন—তাঁহার সময় কালে বা তাঁহার পূর্বে কয়েক জন বিদ্বান্ মৃগয়া রস ও অক্ষ (দ্যূত) রসের উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই সমস্তের নিরাকরণ করেন।

প্রীতিভক্ত্যাদয়ো ভাবা মৃগয়াক্ষাদয়ো রসাঃ।
হর্ষোৎসাহাদিষু স্পষ্টমন্তর্ভাবান্ন কীর্তিতাঃ॥

দশরূপক; ৪.৮৩

—অর্থাৎ কিছু লোক প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতিকে স্থায়ী ভাব এবং মৃগয়া ও অক্ষ প্রভৃতিকে রস বলিয়া স্বীকার করেন। হর্ষ, উৎসাহ প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের মধ্যেই এগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অতএব, ইহাদের পৃথক আলোচনার আবশ্যকতা বোধ হয় নাই।

ধনঞ্জয়ের বিপরীতে অভিনবগুপ্ত অত্যন্ত প্রবল ভাবে সম্পূর্ণ বুদ্ধি-বলের সাহায্যে শান্ত রসকে নাট্যে এবং কাব্যে উভয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তিনি এই সন্দর্ভে নাট্য এবং কাব্যের প্রভেদকেও স্বীকার করেন নাই। এইরূপে অভিনবগুপ্ত নির্দ্বিধায় এবং নিশ্চিন্ত হইয়া বলিয়াছেন যে রস নয়টিই—এবং তে নবৈব রসাঃ ১—অর্থাৎ কমও নয় এবং বেশীও নয়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে কতিপয় বিদ্বানগণ এই নয়টি প্রতিষ্ঠিত রস ব্যতীত আরও তিনটি রসের উল্লেখ করিয়াছেন—যেমন (১) আর্দ্রতাস্থায়িক স্নেহরস, (২) গর্ধস্থায়িক লৌল্যরস, (৩) ভক্তি-রস। কিন্তু অবশেষে তিনি ইহাদের পৃথক স্থিতি স্বীকার করেন নাই :

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৬৪০

স্নেহ নামে এক (দশম) রস আছে, আর্দ্রতা তাহার স্থায়ী ভাব, এই মত ঠিক নয় কারণ স্নেহ হইতেছে এক ধরণের আসক্তি। এই সকল প্রকারের আসক্তি রতি বা উৎসাহ প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়। যেমন বালকের মাতা-পিতার প্রতি, যুবকের মিত্রের প্রতি এবং লক্ষ্মণাদির ভ্রাতার প্রতি যে স্নেহ তাহা রতির নামান্তর। বৃদ্ধের পুত্রাদির প্রতি স্নেহও যাহাকে অনেকে বাৎসল্য রস বলেন) এইরূপ বুঝিতে হইবে। গর্ধ বা তৃষ্ণা স্থায়ী ভাব হইয়া যে লৌল্য-রস জন্মায় বলিয়া কথিত হয়, তাহার প্রত্যাখ্যানের জন্য এই পদ্ধতিই গ্রহণ করিতে হইবে কারণ হাস বা রতি বা অন্য ভাবে তাহার পর্যাবসান হয়। এইরূপে ভক্তিরসের বিষয়েও ইহাই বলিতে হইবে অর্থাৎ রতির মধ্যে উহা অন্তর্লীন। (হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৬৪১)।

ভোজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণ এবং শৃঙ্গার প্রকাশে রস-সংখ্যার বিস্তার সর্বাধিক লক্ষিত হয়। রাজা ভোজ সংগ্রহশীল প্রবৃত্তির লোক ছিলেন, অতএব তিনি নিজের গ্রন্থে প্রায় সকল উপলব্ধ মতের সঙ্কলনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ নবরস ব্যতীত প্রেয়ান্, উদাত্ত এবং উদ্ধত নামে তিনটি রসের স্পষ্ট উল্লেখ করেন:

......প্রেয়াংসঃ শান্তোদাত্তোদ্ধতা রসাঃ।

স০ কণ্ঠাভরণ ৫.১৬৪ ॥

কাব্যমালা সংস্করণে "শান্তদাত্তোদ্ধতা রসাঃ" এই পাঠ আছে, কিন্তু ডঃ রাঘবন শৃঙ্গার প্রকাশের উদ্ধরণের আশ্রয়ে ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে এই নবীন রসগুলি নায়ক ভেদের অনুসরণে উদ্‌ভাবিত হইয়াছে: অর্থাৎ

প্রেয়ান্ = ধীরললিত
শান্ত = ধীরপ্রশান্ত
উদাত্ত = ধীরোদাত্ত
উদ্ধত = ধীরোদ্ধত

অতএব 'দান্ত' পাঠ শুদ্ধ নহে। ইহা ব্যতীত রাজা ভোজ একদিকে স্বাতন্ত্র্য, আনন্দ, প্রশম এবং পারবশ্য এবং অপরদিকে সাধ্বস, বিলাস, অনুরাগ এবং সঙ্গম রসেরও প্রাগুক্ত উভয়গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (স০ ক০, পৃ০ ৩১৯)। বস্তুতঃ রাজা ভোজ রসের আনন্ত্যে বিশ্বাস করিতেন। রুদ্রট এবং তাঁহার টীকাকার নমিসাধুর অনুরূপ তিনি ইহা স্বীকার করিতেন যে সমস্ত ভাব—স্থায়ী, সঞ্চারী এবং সাত্ত্বিকও—রসত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (দ্রষ্টব্য—ডঃ রাঘবনের গ্রন্থ 'The number of Rasas' —পৃ০ ১২৪-২৫)।

ভোজের পরে হেমচন্দ্র কাব্যানুশাসনে অভিনবগুপ্তের মতের প্রায় অনুবাদ করিয়া স্নেহ, লৌল্য এবং ভক্তি রসের উল্লেখ ও খণ্ডন করেন:

পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র সাকুল্যে রস নয়টিই। অতএব আর্দ্রতাস্থায়িক স্নেহকে রস বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত নয়—কারণ উহা রতি প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়। এই রূপে যুবকের—মিত্রজনে স্নেহ রতিতে এবং লক্ষ্মণ প্রভৃতির ভ্রাতৃস্নেহ ধর্মবীরে

পর্য্যবসিত হয়। এইরূপে বালকের মাতাপিতা প্রভৃতির প্রতি যে স্নেহ তাহা ভয়ের অন্তর্ভূ'ত। বৃদ্ধের পুত্রাদির প্রতি স্নেহও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই ভাবে অর্ধস্থায়িক লৌল্যরসের হাস বা রতিতে পর্য্যবসান হয়। ভক্তিরসের ক্ষেত্রেও ইহাই বলিতে হইবে।

[হেমচন্দ্র—কাব্যানুশাসন (মহাবীর জৈন বিদ্যালয়, বোম্বাই), পৃ০ ১০৬]

অপরদিকে হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রও প্রায় এই ধরণেরই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অতিরিক্ত তিনটি রসের উল্লেখও করিয়াছেন—ব্যসন, দুঃখ এবং সুখ :

কিন্তু এই সকল ব্যতীত অন্য রসও হইতে পারে। যেমন, আসক্তি-স্থায়িভাব ব্যসনরস, অরতি-স্থায়িভাব দুঃখরস এবং সন্তোষ-স্থায়িভাব সুখরস। কতিপয় পণ্ডিতগণ ইহাদের রস বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু পূর্বোক্ত নয়টি রসের মধ্যে ইহাদের অন্তর্ভূ'ত করিয়া লন।[১] (হিন্দী না০ দ০, পৃ০ ৩০৬)

কবিরাজ বিশ্বনাথ নবরসকে স্বীকার করিবার পর, স্পষ্টভাবে বাৎসল্য রসকেও স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার নিয়মিত ভাবে পূর্ণাঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন : স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ—প্রকট চমৎকারক হওয়ার জন্য বৎসলকেও রস বলিয়া স্বীকার করা হয়। (সা০ দ০ ৩.২৫১)

ভানুদত্ত আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রথমে রসের দুইটি মৌলিক বর্গের কল্পনা করিয়াছেন :

স চ রসো দ্বিবিধঃ লৌকিকোহলৌকিকশ্চেতি

—অর্থাৎ রস দুই প্রকার—লৌকিক এবং অলৌকিক।

লৌকিক-সন্নিকর্ষ-জন্য রস লৌকিক এবং অলৌকিক-সন্নিকর্ষ-জন্য রস অলৌকিক হয়। লৌকিক রস লৌকিক সন্নিকর্ষের মাধ্যমরূপ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের অনুসরণে ছয় প্রকার এবং অলৌকিক রস অলৌকিক সন্নিকর্ষ অর্থাৎ জ্ঞানের তিনটি রূপের অনুসারে তিন প্রকার— (১) স্বাপ্নিক, (২) মানোরথিক এবং ঔপনায়িক। এই অলৌকিক রসগুলির মধ্যে স্বপ্নের দ্বারা প্রাপ্ত রস স্বাপ্নিক, মনোরথ-জন্য রস মানোরথিক এবং উভয়েই সুখদুঃখময়। অলৌকিক রসের তৃতীয় ভেদ যাহা কাব্যের পদ-পদার্থ অর্থাৎ শব্দার্থ এবং নাট্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়—অর্থাৎ অলৌকিক রস-বর্গের তৃতীয় ভেদের নাম হইতেছে কাব্য (বা নাট্য) রস। কাব্যরসের অন্তর্গত সাধারণতঃ পরম্পরা—সম্মত নবরসকেই স্বীকার করিলে পরেও ভানুদত্ত বাৎসল্য, লৌল্য এবং ভক্তি ব্যতীত কার্পণ্য এবং মায়া—এই দুইটি নবীন রসের আরও উল্লেখ করিয়াছেন—

মায়ারস—চিত্তবৃত্তির্দ্বিধা প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চেতি। নিবৃত্তৌ যথা শান্তরসস্তথা প্রবৃত্তৌ মায়ারস ইতি প্রতিভাতি। একত্র রসোৎপত্তিরপরত্র নেতি বক্তুমশক্যত্বাৎ।

১. অযুক্তমিদমিত্যন্য।

ন চ স রতিরেব স কস্যাস্তু ব্যভিচারী। ন শৃঙ্গারস্য, তদ্বৈরিণো বীভৎসস্যাপি তত্র সত্ত্বাদত এব ন বীভৎসস্যাপি × × × নাহপি শান্তস্য, তদ্বিরোধিত্বাৎ। ন চ সামান্য এব রসস্তদ্বিশেষা ইতরে ভবন্তি, শান্তরসস্য তর্হি রসাভাসত্বাপত্তেঃ। কিন্তু বিদ্যুৎ ইব রতিহাস-শোকক্রোধোৎসাহভয়জুগুপ্সাবিস্ময়াস্তত্রোৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে চ। তেন তত্র তে ব্যভিচারিভাবা ইব। লক্ষণং চ প্রবুদ্ধমিথ্যাজ্ঞানবাসনা মায়ারসঃ। মিথ্যা-জ্ঞানমস্য স্থায়িভাবঃ। বিভাবাঃ সাংসারিকভোগার্জকধর্মাধর্মাঃ। অনুভাবাঃ পুত্র-কলত্রবিজয়সাম্রাজ্যাদয়ঃ। (রসতরঙ্গিণী, পৃ০ ১৬১)।১

—ইহার সারাংশ এই যে: (১) চিত্তবৃত্তি দুই প্রকার—প্রবৃত্তিমূলক এবং নিবৃত্তিমূলক। নিবৃত্তিতে যেরূপ শান্তরসের প্রতীতি হয় সেরূপ প্রবৃত্তিতে মায়া-রসের হয়। (২) মায়া-রসের নিষেধ সম্ভবপর নয় কারণ যদি নিবৃত্তিতে শান্তরসের কল্পনা সঙ্গত তাহা হইলে প্রবৃত্তিতে মায়া-রসের নিষেধ কেমন করিয়া সম্ভবপর? (৩) এখানে একটি সন্দেহ হইতে পারে যে মায়া-রস কি একটি স্বতন্ত্র রস বা রতি অর্থাৎ অনুরক্তিরই একটি অন্য রূপ? ইহার উত্তর এই যে ইহা স্বতন্ত্র স্থায়ী না হইয়া যদি কেবল ব্যভিচারী হয় তো উহা কাহার ব্যভিচারী? প্রকৃতপক্ষে পরস্পর অনুকূল-প্রতিকূল সকল রসের মধ্যে মায়ার স্থিতি সমভাবে বিদ্যমান আছে। কিন্তু কোন ব্যভিচারী ভাব প্রতিকূল রসের মধ্যে সমভাবে সঞ্চরণ করিতে পারে না—অর্থাৎ এমন কোন ব্যভিচারী নাই যাহা বিপরীত রসেও সঞ্চরণ করিতে সমর্থ। অতএব এই সন্দেহের কোন ভিত্তি নাই। (৪) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে মায়ারস স্বতন্ত্র রস না হইয়া সামান্য রসেরই প্রতিরূপ—শান্ত ভিন্ন আটটি রস উহারই বিশেষ রূপ বা ভেদ-বিশেষ। ইহার সমাধান এই যে যদি প্রবৃত্তিরূপিণী মায়া রসেরই প্রতিরূপ হয় তাহা হইলে উহার বিপরীতরূপ নিবৃত্তিমূলক 'শান্ত' রস না থাকিয়া রসাভাসে পরিণত হইবে। (৫) এইজন্য মায়া একটি স্বতন্ত্ররস ব্যভিচারী নয়—রতি, হাস, শোক প্রভৃতি আটটি ভাব বিদ্যুতের মতন উহা হইতে উৎপন্ন এবং বিলীন হইতে থাকে এইজন্য উহারাই ইহার ব্যভিচারী। (৬) মায়া-রসের সংজ্ঞা এইরূপ—মিথ্যা জ্ঞানের বাসনা প্রবুদ্ধ এবং উপচিত হইয়া মায়া রসের রূপ ধারণ করে। ইহার স্থায়িভাব, মিথ্যাজ্ঞান, সাংসারিক ভোগের উৎপাদক ধর্মাধর্ম বিভাব এবং পুত্র, কলত্র, বিজয়, সাম্রাজ্য প্রভৃতি অনুভাব।

কার্পণ্য রস—রস প্রসঙ্গের প্রারম্ভে ভানুদত্ত বাৎসল্য, লৌল্য, ভক্তির সহিত আর একটি নবীন রসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা কার্পণ্য-রস যাহার স্থায়ীভাব স্পৃহাঃ—ননু বাৎসল্যং, লৌল্যং, ভক্তিঃ কার্পণ্যং বা কথং ন রসঃ। আর্দ্রতাঽভিলাষ-শ্রদ্ধাস্পৃহাণাং স্থায়িভাবানাং সত্ত্বাদিতি।২ কিন্তু ইহা উল্লেখ মাত্র। ভানুদত্ত বাৎসল্য, লৌল্য এবং ভক্তির সহিত কার্পণ্যের রসত্বকেও স্বীকার করেন নাই কারণ

---

১. বেঙ্কটেশ্বর প্রেস (১৯৭১ বি০)

২. দ্রষ্টব্য ডঃ রাঘবনের গ্রন্থ The Number of Rasas, পৃ০ ১৪১

আর্দ্রতা, অভিলাষা, শ্রদ্ধার অনুরূপ স্পৃহাও ব্যভিচারী ভাব মাত্র, স্বতন্ত্র স্থায়ী নয়। বাৎসল্য রস যেরূপ করুণ রসের ব্যভিচারী এবং ভক্তি শান্তের সেইরূপ লৌল্যের অনুরূপ কার্পণ্যও হাস্যের ব্যভিচারী মাত্র।

এই প্রসঙ্গে বোধহয় অন্তিম প্রয়াস করিয়াছেন বৈষ্ণব আচার্য রূপ গোস্বামী। তিনি কাব্যশাস্ত্রীদের এই নির্ণয়ের ঘোর বিরোধ করিয়াছেন যে ভক্তি রস না হইয়া কেবলমাত্র ভাব, এবং পূর্ণ ব্যবস্থার সহিত ভক্তিকে প্রধান এবং শাস্ত্রীয় রসগুলিকে গৌণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে রস দুই প্রকার:[১]

(১) মুখ্য রস

শান্ত ভক্তিরস	শান্তি স্থায়ী
প্রীত ভক্তিরস	প্রীতি স্থায়ী
প্রেয়ান্ ভক্তিরস	সখ্য স্থায়ী
বৎসল ভক্তিরস	বাৎসল্য স্থায়ী
মধুর ভক্তিরস	মধুরা রতি স্থায়ী

(২) গৌণ রস

হাস্য ভক্তিরস	হাসরতি স্থায়ী
অদ্ভুত ভক্তিরস	বিস্ময়রতি স্থায়ী
বীর ভক্তিরস	উৎসাহরতি স্থায়ী
করুণ ভক্তিরস	শোকরতি স্থায়ী
রৌদ্র ভক্তিরস	ক্রোধরতি স্থায়ী
ভয়ানক ভক্তিরস	ভয়রতি স্থায়ী
বীভৎস ভক্তিরস	জুগুপ্সারতি স্থায়ী

রস-সংখ্যার বিস্তার প্রায় এখানেই সমাপ্ত হইয়া যায়—কেবল আর একটি নবীন রস 'ব্রীড়নক রস'এর উল্লেখ ডঃ রাঘবন জৈনদের অনুযোগদ্বারসূত্রের আশ্রয়ে করিয়াছেন।[২] ব্রীড়নক রসের স্থায়ী ভাব ব্রীড়া বা লজ্জা। উল্লিখিত সূত্রের টীকাকার মলধারী হেমচন্দ্র (দ্বাদশ শতাব্দী খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন যে কতিপয় বিদ্বান্ ব্রীড়নকের স্থানে ভয়ানক রসের উল্লেখ করেন কিন্তু ভয়ানক তো নিজস্ব কারণভূত রস রৌদ্রেরই অঙ্গ অতএব ইহার পৃথক সত্তা হয় না। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে সূত্রকার বা ভাষ্যকার উভয়ের কোন স্থান নাই, তবুও কেবল নবীনতার দৃষ্টিতেই ব্রীড়নকের মাত্র উল্লেখ করা অসমীচীন নয়।

---

১. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃ০ ৩০৬

২. দ্রষ্টব্য ডঃ রাঘবনের গ্রন্থ, The Number of Rasas, পৃ০ ১৪১

সংস্কৃতের অন্তিম মেধাবী আচার্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। ইনি অত্যন্ত প্রবল ভাবে এই সংখ্যা-বিস্তার-প্রবৃত্তির খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরম্পরাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভজ্যেত, ইতি যথাশাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ।--অর্থাৎ ভক্তি প্রভৃতি রস অন্তর্ভুক্ত করিলে পরে মুনির দ্বারা নির্দিষ্ট রস-সংখ্যা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, অতএব শাস্ত্রের অনুসরণই শ্রেয়স্কর। (হি০ রস০ গং০, পৃ০ ১৭৬)

মধ্যযুগের এবং আধুনিক কালের আচার্যগণের অভিমত

মধ্যযুগে ভারতীয় ভাষায় কাব্যশাস্ত্রের বিকাশ প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল—কেবল হিন্দী ভাষায় রীতিকাব্যের (কাব্যশাস্ত্রের) ব্যাপক বিকাশ ও প্রসার পুরোপুরি দুই শতাব্দী পর্যন্ত দৃষ্ট হয়, যদিও উহা অধিক ক্ষেত্রেই বর্ণনাত্মক ছিল, সমীক্ষাত্মক নয়। অতএব হিন্দী রীতিকবিদের মুখ্যতঃ এই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যাইতে পারে যে তাঁহারা সংস্কৃতের সমৃদ্ধ রস-পরম্পরাকে ভাষায় অবতরিত (এবং উহার পোষণও) করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রস-সংখ্যা প্রসঙ্গে কেবল ইহাই উল্লেখযোগ্য যে কেশব[১] এবং দেব[২] প্রভৃতি কতিপয় বিস্তারপ্রিয় কবিদের দ্বারা শৃঙ্গারের 'প্রচ্ছন্ন' এবং 'প্রকাশ' প্রভেদগুলিও স্বীকৃতি পাইয়াছে। দেব রসের লৌকিক এবং অলৌকিক প্রকার-ভেদ করিয়াছেন[৩] এবং মহারাজা রামসিংহ নিজের গ্রন্থ রস-নিবাসে রসের লৌকিক-অলৌকিক এবং প্রত্যেক রসের স্বনিষ্ঠ-পরনিষ্ঠ ভেদের পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই—প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ ভেদের উল্লেখ রুদ্রট ও ভোজ এবং লৌকিক-অলৌকিক ও স্বনিষ্ঠ-পরনিষ্ঠের উল্লেখ ভানুদত্তের অনুসরণে করা হইয়াছে। দেব লৌকিক-অলৌকিকের যে ভেদ করিয়াছেন তাহা ভানুদত্তেরই অনুরূপ কিন্তু উভয়ের ব্যাখ্যায় পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভানুদত্ত কাব্যরসগুলিকে অলৌকিক রসের তৃতীয় ভেদ ঔপনায়িকের উপভেদ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু দেব উহাদের লৌকিক রসেরই উপভেদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অলৌকিক রসের তিনটি প্রভেদ—স্বাপ্নিক, মানোরথিক ও ঔপনায়িকের মধ্যে ক্রমশঃ স্বপ্ন, মনোরথ ও লীলার মাধ্যমে হরি-রসেরই স্থাপনা করিয়াছেন। এই প্রভেদের কারণ কি—ভ্রান্তি অথবা মতভেদ? আমাদের ধারণা এই যে ভক্তিরসকে ব্যবহারিক এবং সৈদ্ধান্তিক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর দেব ভানুদত্তের মতের সংশোধন করিয়াছেন।[৪]

---

১. রসিকপ্রিয়া ১/২

২. ভাববিলাস (সম্পাদক লক্ষ্মীনিধি চতুর্বেদী) পৃ০ ৬৮-৬৯

৩. হিন্দী সাহিত্য কা বৃহদ্ ইতিহাস (ষষ্ঠ ভাগ) পৃ০ ৪০৬

৪. ভাববিলাস (সম্পাদক লক্ষ্মীনিধি চতুর্বেদী) পৃ০ ৬৬-৬৭

আধুনিক বিদ্বানগণ উপভেদের চিন্তা না করিয়া মূল রস-ভেদের উপরই মনোযোগ দিয়াছেন। হিন্দীতে সর্বপ্রথম ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র নিজের গ্রন্থ 'নাটক'এ প্রাচীন পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিয়াও রসের সীমা নির্দ্ধারণের ব্যাপারে ঘোর বিরোধ প্রকট করিয়াছেন ঃ

"বাঃ বাঃ! রসকে স্বীকার করা মানেই বেদের ধর্মকে স্বীকার করা! যাহা লেখা আছে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে নচেৎ পতিত হইতে হইবে! রস এমন বস্তু যাহা অনুভব-সিদ্ধ। ইহাকে স্বীকার করিবার জন্য প্রাচীনদের দরকার নাই। যদি উহা অনুভূতিগম্য তো স্বীকার করুন অন্যথা স্বীকার করিবেন না।"[১]

তিনি স্বীকৃত সূচীর মধ্যে ভক্তি, বাৎসল্য ও সখ্য ব্যতীত প্রমোদ বা আনন্দ রসকেও আগ্রহপূর্বক অন্তর্ভু'ক্ত করিয়াছেন। যদিও ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিকে অনেক সংস্কৃত আচার্য স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। চতুর্থ ভেদ প্রমোদ বা আনন্দ রসও ভারতেন্দুর নিজস্ব না হইয়া ভোজেরই উদ্ভাবনা ছিল, তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই যে ভারতেন্দু স্বতন্ত্রভাবে খুবই আস্থার সহিত এই সকল রসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সখ্যের স্বতন্ত্র সত্তার ঘোষণা করিয়া তিনি লিখিতেছেন ঃ

সখ্য, এই রস লোকেদের মতে শৃঙ্গারে পর্য্যবসিত হয়। আমরা কি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রসঙ্গে এবং উহার অনুরূপ অনেক মিত্রের বিপত্তিতে যেখানে মিত্রেরা আসিয়া সাহায্য করে--সেই প্রসঙ্গে শৃঙ্গার রস কেমন করিয়া আসিবে, কারণ শৃঙ্গারের স্থায়ী রতি এবং এখানে মিত্রতার মধ্যে রতির কি কাজ? (কবিবচন-সুধা)

এই যুগে হিন্দী, মারাঠী এবং বাংলাতেই সর্বাধিক সমৃদ্ধ রসশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মারাঠী ও হিন্দীর স্থান বিশেষ উচ্চ পর্যায়ে। এই সকল ভাষার শাস্ত্রে প্রায় উল্লিখিত দ্বাদশ রসেরই খণ্ডন-মণ্ডনের সহিত চর্চা হইয়াছে। হিন্দীর হরিঔধ ও মারাঠীর ডঃ বাটবের অনুরূপ সমর্থ আচার্যরা বাৎসল্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হিন্দীর সেঠ কন্হৈয়ালাল পোদ্দার প্রভৃতি ও মারাঠীর চাফেকর ও বাটবে প্রভৃতিরা অত্যন্ত প্রবল ভাবে ভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ব্যতীত সমসাময়িক কাব্যের আশ্রয়ে কয়েকটি নবীন রসের কল্পনাও অনিবার্য রূপে প্রকাশ পাইয়াছে যাহাদের মধ্যে প্রমুখ—প্রকৃতি-রস (উদাত্ত রস), দেশভক্তি-রস, ক্রান্তি-রস, উদ্বেগ-রস এবং প্রক্ষোভ-রস।

প্রকৃতি রস—হিন্দীভাষায় রামচন্দ্র শুক্ল বিশেষভাবে প্রকৃত-রসের স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির প্রত্যক্ষ এবং কাব্য-নিবদ্ধ উভয়রূপের আস্বাদে রসের সত্তাকে স্বীকার করিয়াছেন— যখন দূর-দূরান্তর পর্যন্ত প্রসারিত সবুজ বন-ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত স্বচ্ছ জলধারা এবং দুই তীরবর্ত্তী অসম পাথুরে-ভূমি ও নানা রঙ্গের

---

১. ভারতেন্দু দ্বারা লিখিত পত্র, ৫.৭.১৮৭২, কবিবচন-সুধা, পৃঃ ১৭৮-১৭৯

ফুলের ছায়া শোভিত শুক্লের রমণীয়তা আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত করে সেই সময় স্বার্থময় জীবনের শুষ্কতা ও বিরসতা হইতে আমাদের মন মুক্ত হইয়া যায়। সেই দশা রস-দশা ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

(২) যখন প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের ভাবের আলম্বন তখন এই শঙ্কা নিরর্থক যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় কোন রস উদ্‌ভূত হয় ? (রসমীমাংসা, পৃ০ ১৪৩)।

প্রকৃতি-বর্ণনার রসাত্মক রূপের স্থাপনার জন্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্যে সুবিস্তৃত আধার ভূমি উপলব্ধ হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রকৃতি-রসের স্থাপনা রামচন্দ্র শুক্লের নিজস্ব মৌলিক কল্পনা এবং ইহা অত্যন্ত বিবাদস্পদও—কারণ শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে, যদিও উহা কতই পরিষ্কৃত বা উদাত্ত হউক না কেন, রসানুভূতি রূপে স্বীকার না করিয়া লৌকিক ভাবানুভূতি বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে।

এই প্রকৃতি-রসের স্থায়ীভাব রতি—রামচন্দ্র শুক্ল ইহাকে সাহচর্যজন্য বলিয়াও বাসনাগত রূপেই স্বীকার করিয়াছেন কারণ মানবের নিজস্ব আদিম সহচরী প্রকৃতির সহিত প্রেম এখন সংস্কার বলিয়া ধরা হয়। প্রকৃতি-রসে স্পষ্টতঃ প্রকৃতিই আলম্বন, উদ্দীপন নয়। যাঁহারা উহাকে উদ্দীপন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। রামচন্দ্র শুক্লের নিজস্ব বক্তব্য খুবই স্পষ্ট—কাব্যে প্রকৃতি-বর্ণনা পড়িয়া আমরা নিশ্চিতরূপে আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ি—এই ভাবময় আনন্দই রস, অতএব প্রকৃতি-কাব্য বাস্তবিকই রসাত্মক হয়। ইহার বিরুদ্ধে এই তর্ক অসঙ্গত যে 'আশ্রয়, আলম্বন প্রভৃতি সম্পূর্ণ রস-সামগ্রী প্রকৃতি-কাব্যে পাওয়া যায় না, অথবা প্রকৃতির প্রতি রতিভাব একাঙ্গী, আলম্বনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উহা পুষ্ট হইতে পারে না'—কারণ কেবল আলম্বন-বর্ণনাও রস-পরিপাকের পক্ষে পর্যাপ্ত। মারাঠীর বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুণকর, রা০ ভি০ জোশী, ও বি০ বা০ ভিড়ে উদাত্ত রসরূপে প্রকৃতি রসেরই স্থাপনা করিয়াছেন। চিপলুণকর উদাত্ত রসের শাস্ত্রীয় বিবেচনা করেন নাই, কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিদের প্রকৃতি-কাব্যের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া নানা স্থলে উহার স্বতন্ত্র রূপের উল্লেখ করিয়াছেন। রা০ ভি০ জোশী উদাত্ত রসের অন্তর্গত প্রকৃতির কেবল চিত্তাকর্ষক বর্ণনাকেই স্বীকার করিয়াছেন : কোন প্রসঙ্গের অথবা পর্বত, অরণ্য প্রভৃতি স্থলের—বনশ্রীর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং চিত্তাকর্ষকরূপে যেখানে বর্ণনা করা হয়, সেখানে উদাত্ত রসের পরিপাক হয়।[১] কিন্তু বি০ বা০ ভিড়ে 'উদাত্ত' শব্দের শাব্দিক অর্থটিকে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির ভব্যরূপের বর্ণনাকেই এই রসের অন্তর্গত গ্রহণ করিয়াছেন : প্রকৃতির ভব্য দৃশ্য—অর্থাৎ আকাশ, সমুদ্র, নদী, পর্বত, অরণ্য প্রভৃতির শান্ত স্থিতির বর্ণনা অথবা পঞ্চমহাভূতের ক্ষোভের বর্ণনা করিবার অথবা শুনিবার জন্য অন্তঃকরণে যে বৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহাকেই উদাত্ত রস বলা হয়।

১. সুলভ অলংকার, পৃ. ২৫

দেশভক্তি-রস—সংস্কৃতের শাস্ত্রীয় পরম্পরা হইতে ভিন্ন আর একটি রস যাহা আধুনিক ভারতীয় কাব্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা দেশভক্তি-রস। হিন্দীর ডঃ গুলাবরায় এবং মারাঠীর শ্রীশিবরাম পন্ত[১], পরাঞ্জপে ও অধ্যাপক জোগ এই রসকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। অধ্যাপক জোগ বলেন যে, দেশভক্তি একালের কাব্যে যে স্থান পাইয়াছে তাহা দেখিয়া উহাকে সহজেই রস বলা যায়।[২] ডঃ গুলাবরায় এবং অধ্যাপক জোগের মতানুসারে ইহার স্থায়ী ভাব দেশ-প্রেম কিন্তু পরাঞ্জপে দেশ-প্রেমের স্থানে দেশাভিমানের কথা বলিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্য বিদ্বানেরাও দেশভক্তির গুরুত্বকে স্বীকার করিয়াছেন—উদাহরণস্বরূপ হিন্দীর রামচন্দ্র শুক্ল এবং মারাঠীর দ০ কে০ কেলকর এবং শ্রী০ কৃ০ কোল্‌হটকর; যদিও এই সব বিদ্বানেরা প্রেমকে ব্যাপক রূপ প্রদান করিয়া দেশভক্তিকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

অন্য নবীন রস ঃ ক্রান্তি, উদ্বেগ, প্রক্ষোভ—আধুনিক কাব্য-প্রবৃত্তিগুলিকে দৃষ্টিতে রাখিয়া মারাঠীতে কতিপয় অন্য রসেরও উদ্‌ভাবনা হইয়াছে। শ্রীজাবডেকর[৩] ক্রান্তি-রসের, শ্রীবিদ্যাধর বামন ভিড়ে উদ্বেগ রসের এবং শ্রীআত্মারাম রাওজী দেশপাণ্ডে প্রক্ষোভ-রসের নবকল্পনা করিয়াছেন। শ্রীজাবডেকর ক্রান্তি-রসের অবয়বের বিবেচনা করেন নাই, বোধ হয় উহার প্রয়োজনও ছিল না কারণ ক্রান্তির অর্থ এবং স্বরূপ প্রভৃতি স্বতঃস্পষ্ট। উদ্বেগ-রসের পরিভাষা শ্রীভিড়ে এইরূপ করিয়াছেন ঃ সমাজে অথবা সমাজের বিশিষ্ট বর্গে উপলব্ধ অনীতি, দুর্ব্যসন, হাস্যাস্পদ আচার-ব্যবহার অথবা বিচারের জন্য অনুভূয়মান ত্রাস, দুঃখ, ঘৃণা, বা খেদজন্য যে বৃত্তি অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, তাহাকে উদ্বেগ বলা হয়।[৪] এইরূপে প্রক্ষোভ-রসের বিষয়ে দেশপাণ্ডের মন্তব্য সংক্ষেপে এই ঃ স্থায়ী ভাব—সহসংবেদমূলক সংবেগ; আলম্বন—দলিত বর্গের বিপত্তি প্রভৃতি; উদ্দীপন—উহার সঙ্কটাবস্থা; সঞ্চারী—আবেগ, অমর্ষ, কারুণ্য প্রভৃতি ও অনুভাব—সংঘর্ষের দ্যোতক নানারকম চেষ্টা।[৫]

বলা বাহুল্য যে এই সকল নবীন রসের প্রকল্পনার প্রেরণা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন নবপ্রবৃত্তি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব-স্বরূপ এবং নবজাগৃতির ফলে ভারতীয় সাহিত্যে যে বিচার-চেতনার প্রসার লাভ ঘটে তাহা নানা দৃষ্টিতে পরম্পরা হইতে ভিন্ন এবং নূতন—অতএব অনুগমাত্মক পদ্ধতির দ্বারা বিচার করিলে পরে আমরা অনুভব করি যে এই সাহিত্যের সমীক্ষা ও মূল্যাঙ্কনের জন্য কাব্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং বিষয়েরও সংশোধন-পরিবর্দ্ধন এবং বিচার-পুনর্বিচার প্রয়োজনীয়। উল্লিখিত নবীন রস-কল্পনাগুলি কাব্যশাস্ত্রের এই অনুগমাত্মক পুনর্বিচারেরই পরিণাম।

---

১. জীবন আণি সাহিত্য, পৃ০ ৫৫

২. অভিনব কাব্যপ্রকাশ, পৃ০ ১১৫

৩, ৪, ৫. ডঃ মনোহর কালে—আধুনিক হিন্দী তথা মারাঠী মে কাব্যশাস্ত্রীয় অধ্যয়ন, পৃ০ ১৭১

উপভেদ-বিস্তার

বিস্তারের এই প্রবৃত্তি কেবল রসের বিভিন্ন ভেদের মধ্যেই সীমিত ছিল না—উপভেদের বিস্তারও কম হয় নাই। স্বয়ং ভরতও রসের নানা উপভেদের পূর্ণ বিস্তার করিয়াছিলেন।

শৃঙ্গার রসের উপভেদ—ভরত শৃঙ্গার রসের মানসিক অবস্থানুসারে দুইটি ভেদ করিয়াছেন: (১) সংভোগ, এবং (২) বিপ্রলম্ভ। কিন্তু ইহাদের ভরত ভেদ না বলিয়া 'অধিষ্ঠান' বলিয়াছেন এবং অভিনবগুপ্ত ইহাকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন:

এখানে শৃঙ্গাররূপে অধিষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহাদের অবস্থা (অধিষ্ঠান বলা হয়)। এইজন্য গোত্বের শাবলেয়ত্ব (দুই-রঙ্গা) এবং বাহুলেয়ত্বর (নানা-রঙ্গা) অনুরূপ ইহারা (অর্থাৎ সম্ভোগ-শৃঙ্গার এবং বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার) শৃঙ্গার রসের ভেদ নহে, অপিতু উভয় দশায় সমান রূপে বিদ্যমান আস্বাদাত্মক রতির আস্বাদ্যমান রূপই শৃঙ্গার রস।১

আবার ইহার পরে ভরত শৃঙ্গারের দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টি অনুসরণে তিনটি করিয়া ভেদ করিয়াছেন: অভিনয়ের দৃষ্টিতে বচনাত্মক, বেষাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক এবং পুরুষার্থের দৃষ্টিতে—ধর্ম-শৃঙ্গার, অর্থ-শৃঙ্গার এবং কাম-শৃঙ্গার।২ অভিনয়ের দৃষ্টিতে যে সব ভেদ করা হইয়াছে তাহাদের কাব্যের মূল-চেতনা বা শৃঙ্গারের মনোবিজ্ঞানের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। স্বভাবতঃ এই তিনটি ভেদ পরবর্তী যুগে প্রায় লুপ্ত হইয়া পড়ে। পুরুষার্থের উপর আশ্রিত ভেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই, কেবল নাট্যদর্পণে এবং ভোজের শৃঙ্গার-প্রকাশে ইহাদের উল্লেখ হইয়াছে। (রাঘবন, The Number of Rasas, পৃ০ ১৪৫)।

এইরূপে প্রথম দুইটি অধিষ্ঠানই শৃঙ্গারের ভেদরূপে প্রসার লাভ করে। ভরতের পর রুদ্রট সংভোগ এবং বিপ্রলম্ভকে যথাবৎ স্বীকার করিয়া বিপ্রলম্ভের চারটি ভেদের বোধ হয় সর্বপ্রথম স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন—প্রথমানুরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ।৩ ইহা ব্যতীত তিনি শৃঙ্গারের আরও দুইটি ভেদ করিয়াছেন—প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ। এইগুলিকে রাজা ভোজও স্বীকার করিয়াছেন। ধনঞ্জয় মূল ভেদের মধ্যে অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করিয়া দুইটির স্থলে তিনটি ভেদের উদ্ভাবনা করিয়াছেন—অয়োগ, বিপ্রয়োগ এবং সম্ভোগ অর্থাৎ পূর্বরাগ অথবা অয়োগকে তিনি বিপ্রলম্ভের উপভেদ রূপে গ্রহণ না করিয়া স্বতন্ত্র ভেদরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। বিপ্রয়োগের অন্তর্গত করুণকেও স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হয় নাই। যেখানে একের মৃত্যুতে অপরে বিলাপ করে সেখানেই করুণ

১. হিন্দী অ০ ভারতী, পৃ০ ৪৪৩

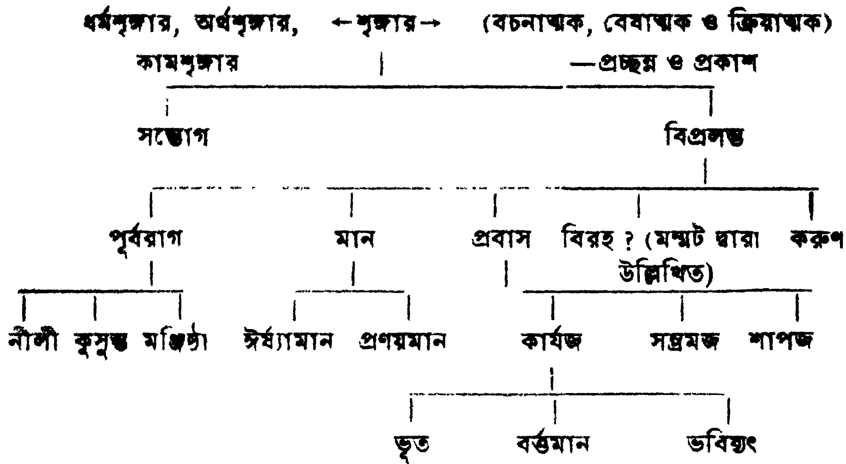
২. ঐ, পৃ০ ৬০৯

৩. কাব্যালংকার ১৪।১ এবং ১২।৬

রস হইবে—যেমন অজবিলাপ-প্রসঙ্গে, কিন্তু যেখানে মরণের পরে দৈবী শক্তির আশ্রয়ে পুনর্জীবিত হওয়ার বর্ণনা আছে, যেমন কাদম্বরীতে মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের প্রসঙ্গে, সেখানে বিয়োগ-প্রবাসই হইবে। এইরূপ বিপ্রয়োগের কেবল দুইটি উপভেদ অবশেষ থাকিয়া যায়—মান ও প্রবাস। ইহাদের আবার পৃথক্-পৃথক্ উপভেদ আছে: মানের দুইটি আছে (১) ঈর্ষ্যা-মান, এবং (২) প্রণয়-মান এবং প্রবাসের তিনটি (১) কার্যজন্য (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান), (২) সম্ভ্রম-জন্য—অর্থাৎ দৈবী অথবা মানুষী বিপ্লবের জন্য এবং শাপ-জন্য।[১] মম্মট বিস্তারের অপেক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অধিক আগ্রহশীল ছিলেন—তিনি রসের ভেদ বা উপভেদের বিস্তারের প্রতি বিশেষ কোন-রকম রুচি প্রদর্শিত করেন নাই। এই প্রসঙ্গে কেবল বিপ্রলম্ভের উপভেদের তালিকায় তিনি অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া চারটির জায়গায় পাঁচটি উপভেদ স্বীকার করিয়াছেন—অভিলাষ-নিমিত্তক (পূর্বরাগ), বিরহ-নিমিত্তক, ঈর্ষ্যা-নিমিত্তক (মান), প্রবাস-নিমিত্তক এবং শাপ-নিমিত্তক। ইহাদের মধ্যে 'বিরহ'ই নূতন।[২] হেমচন্দ্র করুণ বিপ্রলম্ভকে 'করুণ'ই বলিয়াছেন, শৃঙ্গারের ভেদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই;[৩] কিন্তু তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র মম্মটের পাঁচটি ভেদকে যথাবৎ স্বীকার করিয়াছেন।[৪] ইঁহাদের অপেক্ষা সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের মনে বিস্তারের প্রতি অধিক আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল। তিনি পূর্বরাগেরও তিনটি ভেদ করিয়াছিলেন—(১) নীলী রাগ, যাহার বাহিরের চমক-দমক কম কিন্তু হৃদয়ে সর্বদা বিদ্যমান থাকে যেমন রাম-সীতার, (২) কুসুম্ভ রাগ, যাহা বাহির হইতে অত্যন্ত আকর্ষক প্রতীত হয় কিন্তু অবশেষে নষ্ট হইয়া যায় এবং (৩) মঞ্জিষ্ঠা রাগ, যাহা বাহির হইতে আকর্ষকও এবং স্থিরও।[৫] ভানুদত্তও নবীনতা প্রদর্শনের জন্য কিছু প্রযত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। তাঁহার দ্বারা নিরূপিত বিপ্রলম্ভের পাঁচটি ভেদ প্রায় মম্মটেরই অনুরূপ কেবল 'বিরহ'এর স্থানে তিনি 'গুরু-নিদেশ'এর উল্লেখ করেন: দেশান্তর গমনের জন্য (প্রবাস জন্য), গুরুনিদেশের জন্য, অভিলাষার জন্য (পূর্বরাগ), ঈর্ষ্যার জন্য (মান) এবং শাপের জন্য।[৬] ইহা ব্যতীত তিনি তিনটি আরও উপভেদের উল্লেখ করিয়াছেন: সময়-হেতুক, দৈব-হেতুক এবং বিড্‌বরাদি-(উপদ্রবাদি-)হেতুক, কিন্তু ইহাদের উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ হইয়াছে, নিয়মানুসারে হয় নাই।[৭]

১. দশরূপক, ৪.৬৪-৬৫-৬৭
২. কাব্যপ্রকাশ, ৪.২৯ গদ্য
৩. কাব্যানুশাসন, অ০ ২ সূ০ ৬
৪. হিন্দী নাট্য দর্পণ, পৃ০ ৩০৬
৫. সাহিত্যদর্পণ ৩. ১৯৫
৬. রসতরঙ্গিনী, পৃ০ ১৪০
৭. ঐ, পৃ০ ১৪১

মানচিত্র



হাস্যের উপভেদ—ভরত মূলতঃ হাস্যের দুইটি উপভেদ করেন—(১) আত্মস্থ যেখানে বিদূষক বা পাত্র স্বয়ং হাস্য করেন এবং (২) পরস্থ যেখানে উঁহারা পরকে হাসান।[১] অভিনবগুপ্তের মতানুসারে আত্মস্থের অর্থ হইতেছে এইরূপ হাস্য যাহা স্বয়ং প্রমাতার চিত্তে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বগত হাস্য এবং পরস্থের অর্থ সেই হাস্য যাহা অপরকে হাসিতে দেখিয়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অন্যত্রসংক্রান্ত হাস্য।[২] ডঃ রাঘবন 'স্বয়ং হসতি' এবং 'পরং হাসয়তি'র অর্থ ক্রমশঃ এইরূপ করিয়াছেন—অপরের সহিত হাস্য করে এবং অপরের প্রসঙ্গে হাস্য করে—কিন্তু ইহা পাশ্চাত্য হাস্য-ভেদের আরোপণ মাত্র, উল্লিখিত শব্দাবলীর উচিত অর্থ নয়।[৩] ইহার পূর্বে আশ্রয়ের প্রকৃতি-ভেদে আবার ছয়টি ভেদ করা হইয়াছে—উত্তম প্রকৃতিতে (১) স্মিত এবং (২) হসিত, মধ্যম প্রকৃতিতে, (৩) বিহসিত এবং (৪) উপহসিত, অধম প্রকৃতিতে, (৫) অপহসিত এবং (৬) অতিহসিত।[৪] যদিও এই সকল ভেদগুলি হাস্য-ক্রিয়ার মাত্রা-ভেদের উপর নির্ভরশীল, তবুও ইতিপূর্বে যাহা অভিনবগুপ্ত স্পষ্ট করিয়াছেন তাহার অনুসরণে হাস্য-ভাব অথবা রসের ন্যূনাধিক্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। (৭) এই সকল ভেদগুলি আত্মস্থ ও পরস্থ উভয় প্রকারের হাস্যরূপে বিদ্যমান থাকে। এইরূপে সর্বসমেত হাস্যের বারটি ভেদ পাওয়া যায়। কিন্তু শৃঙ্গারের অনুরূপ হাস্যেরও অভিনবগুপ্তের দৃষ্টিতে

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৫৭২
২. ঐ, পৃ০ ৫৭৩
৩. রাঘবন, The Number of Rasas
৪. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৫৭৪

তিনটি আরও প্রভেদ বিদ্যমান আছে—বচনাত্মক, বেষাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক। সৌভাগ্যবশতঃ হাস্যের ভেদ-প্রভেদের ইহার পরে আর বিস্তার হয় নাই। ধনঞ্জয় ও ভানুদত্ত ব্যতীত অধিকাংশ বিদ্বানেরা আত্মস্থ ও পরস্থ ভেদেরও উল্লেখ করেন নাই—অগ্নিপুরাণকার অপহসিত ও অতিহসিতকেও স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই।[১]

করুণের উপভেদ—করুণের তিনটি ভেদের উল্লেখ ভরত করিয়াছেন—(১) ধর্মোপঘাতজ-ধর্মহানি হইতে উৎপন্ন, (২) অর্থাপচয়োদ্ভব—অর্থহানি হইতে উৎপন্ন এবং (৩) শোক-কৃত—স্বজনদের মৃত্যু-শোক হইতে উৎপন্ন। এই তালিকায় অগ্নিপুরাণকার আর একটি ভেদ যুক্ত করেন—চিত্তগ্লানি-জন্য।[২] ভানুদত্ত এখানেও স্বনিষ্ঠ এবং পরনিষ্ঠ ভেদ করিয়াছেন—নিজের অনিষ্ট হইতে উৎপন্ন স্বনিষ্ঠ এবং অপরের অনিষ্ট হইতে উৎপন্ন (দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি হইতে প্রেরিত) পরনিষ্ঠ।

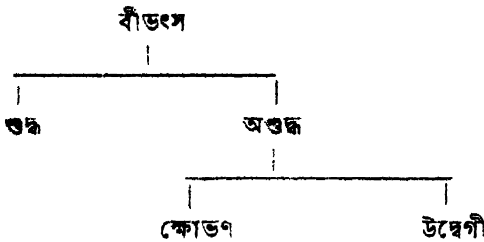
বীররসের উপভেদ—ভরত বীররসের কেবল তিনটি উপভেদের চর্চা করিয়াছেন: (১) দানবীর, (২) ধর্মবীর এবং (৩) যুদ্ধবীর।[৩] দশরূপকে ধর্মবীরের স্থানে সর্বপ্রথম দয়াবীরের উল্লেখ হয়—প্রসঙ্গের শেষে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে বীররসের প্রতাপবীর, গুণবীর, আবর্জনবীর প্রভৃতি আরও নানা ভেদ কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেইগুলি অপ্রয়োজনীয়।[৪] কিন্তু সাহিত্যদর্পণে দয়াবীর ও ধর্মবীরের একসঙ্গে চারটি স্পষ্ট ভেদ করা হইয়াছে।[৫] পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সত্যবীর ও পাণ্ডিত্যবীরেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের উল্লেখ খণ্ডনাত্মক তর্করূপে হইয়াছে কারণ তিনি সমস্ত উপভেদেরই বিরোধী ছিলেন।

ভয়ানক রসের উপভেদ—ভরতের মতানুসারে ভয়ানক রসেরও তিনটি ভেদ বিদ্যমান আছে—(১) ব্যাজ-জন্য অর্থাৎ কৃত্রিম, (২) অপরাধ-জন্য এবং (৩) বিত্রাসিতক অর্থাৎ বিপদের আশঙ্কা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন।[৬] ইহাদের মধ্যে কৃত্রিমের অর্থ এই যে উত্তম প্রকৃতির ব্যক্তি গুরু প্রভৃতির প্রতি অপরাধ করিয়া যে ভয়ের প্রদর্শন করেন, উহা বাস্তবিক হয় না কৃত্রিমই হয়। অপরাধের অর্থ অভিনবগুপ্ত অপরাধী অর্থাৎ চোর প্রভৃতি করিয়াছেন: অপরাধ্যন্তীতি অপরাধাঃ—চোরাদয়ঃ।[৭] কিন্তু বোধ হয় এই অর্থ ভরতের অভীষ্ট ছিল না কারণ তৃতীয় ভেদের অন্তর্গত ভরত চোরের ভয়ের কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অন্য কোন পরবর্তী আচার্য ভেদের বিস্তার করেন নাই। কেবল ভানুদত্ত নিজের দ্বারা নির্মিত স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ প্রভৃতি প্রিয় ভেদগুলির আরোপণ

১. অগ্নিপুরাণ কা কাব্যশাস্ত্রীয় ভাগ (নে০ প০ হাউস), পৃ০ ৫৬
২. ঐ, পৃ০ ৫৭
৩. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৬০৬
৪. দশরূপক ৪.৭২ বৃত্তি
৫. সা০ দ০ ৩.২৩৪
৬. নাট্যশাস্ত্র ৬.৮১
৭. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৬০৭

ভয়ানকের উপরও করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ ভয়ের স্বয়ং যেখানে অনুভব হয় সেখানে স্বনিষ্ঠ এবং অপরের ভয় দেখিয়া যেখানে ভয়ের সংক্রামক প্রতীতি হয় সেখানে পরনিষ্ঠ ভয়ানক রস হয়।[১]

বীভৎস রসের উপভেদ—বীভৎস রসের মূলতঃ দুইটি ভেদই ভরত স্বীকার করিয়াছেন : (১) রুধির প্রভৃতি হইতে উদ্গত শুদ্ধ অথবা ক্ষোভণ এবং (২) বিষ্ঠা, কৃমি প্রভৃতি হইতে উদ্গত অশুদ্ধ অথবা উদ্বেগী।[২] অভিনবগুপ্ত ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, ভট্টতোতের মতে এই দুইটি ভেদই অশুদ্ধ বীভৎস-রসের ভেদ : শুদ্ধ বীভৎস সেই যাহা সংসারের প্রতি জুগুপ্সা উৎপন্ন করে এবং পরিণামে মোক্ষ-সাধক হয়। অতএব প্রকৃত পক্ষে বীভৎসেরও তিনটিই ভেদ :



কিন্তু শুদ্ধ বীভৎস অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া কারিকার অন্তর্গত কেবল দুইটিরই উল্লেখ হইয়াছে।[৩] অন্য প্রসঙ্গের অনুরূপ এখানেও ভরতের মতের উপর অভিনবগুপ্ত নিজস্ব আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণের আরোপ করিয়াছেন—ভরতের ব্যবহারিক অভিনয়নিষ্ঠ দৃষ্টিকোণের সম্মুখে প্রকৃতপক্ষে ক্ষোভণ ও উদ্বেগী এই দুই ভেদই বিদ্যমান ছিল। দশরূপকে, কিন্তু, উল্লিখিত তিনটি উপভেদই স্বীকৃতি পাইয়াছে : (১) উদ্বেগী, (২) ক্ষোভণ, ও (৩) শুদ্ধ যাহা বৈরাগ্যবশতঃ জঘন, স্তন প্রভৃতির প্রতি ঘৃণা হইতে উৎপন্ন হয়।[৪] রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র বীভৎসের উপভেদের বর্ণনা করেন নাই কিন্তু তাঁহারা বিভাবের অন্তর্গত পরশ্লাঘা অর্থাৎ শত্রুর প্রশংসারও বর্ণনা করিয়াছেন।[৫] এখানে বীভৎসের উৎপত্তির কারণরূপে কেবল দৃশ্যমান পদার্থকেই গ্রহণ করা হয় নাই বরং ঘৃণিত ব্যক্তির মিথ্যা গুণ-কথন অর্থাৎ মিথ্যাকেও উদ্বেগকারী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই তথ্যটিকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে বীভৎসের একান্ত ইন্দ্রিয় রূপ ব্যতীত মানসিক রূপের প্রতিও (বোধ হয় সর্বপ্রথম) ইঙ্গিত করা

১. রসতরঙ্গিণী, পৃ০ ১৫৪
২. নাট্যশাস্ত্র, ৬.৮২
৩. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৬০৮
৪. দশরূপক, ৪.৭৩
৫. হিন্দী নাট্যদর্পণ, পৃ০ ৩১৬

হইয়াছে। বীভৎসের প্রসঙ্গে আর বিশেষ কোন সংশোধন-পরিবর্দ্ধন হয় নাই—কেবল ভানুদত্ত স্বনিষ্ঠ ও পরনিষ্ঠের ভেদের এখানেও উল্লেখ করিয়াছেন।

অদ্‌ভুত রসের উপভেদ—ভরতের মতানুসারে অদ্‌ভুত রস দুই[১] প্রকার—(১) দিব্য অর্থাৎ দৈবিক চমৎকার হইতে উৎপন্ন, এবং (২) আনন্দজ অর্থাৎ মনোরথ পূর্ণকারী অপ্রত্যাশিত ঘটনা হইতে উৎপন্ন। আনন্দজের অর্থ ভরত স্পষ্ট করেন নাই এবং অভিনবগুপ্তও করেন নাই—পরে রামচন্দ্রও কেবল 'অভিষ্টসিদ্ধিতঃ' বলিয়া মৌন হইয়াছেন। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধির অভিপ্রায় আকস্মিক সিদ্ধিই যাহা ইতিপূর্বে নাট্যদর্পণের ভাষ্যকার আচার্য বিশ্বেশ্বর স্পষ্ট বলিয়াছেন।[২] প্রবন্ধকাব্যের নির্বহন-সন্ধিতে প্রায় অদ্‌ভুতের এই 'আকস্মিক মনোরথ-সিদ্ধি' রূপেরই প্রয়োগ হয়। এই রসের ভেদ-বিস্তার হয় নাই, কেবল ভানুদত্ত এখানেও স্বনিষ্ঠ-পরনিষ্ঠ ভেদের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

রৌদ্র রসের উপভেদ—রৌদ্র রসের তিনটি উপভেদের উল্লেখ ভরত শৃঙ্গারের সহিত করিয়াছেনঃ অঙ্গনেপথ্যবাক্যৈশ্চ হাস্যরৌদ্রৌ ত্রিধা স্মৃতৌ। ৬.৭৮ অর্থাৎ শৃঙ্গারের অনুরূপ হাস্য এবং রৌদ্রেরও তিনটি করিয়া উপভেদ হয়ঃ (১) আঙ্গিক বা ক্রিয়াত্মক, (২) বেষাত্মক এবং (৩) বচনাত্মক। ইহা ব্যতীত রৌদ্রের আর অন্য কোন ভেদ বিস্তার হয় নাই।

এইরূপে আটটি রসের উপভেদের বর্ণনা ভরত করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুকরণে অন্য আচার্যগণও করিয়াছেন। কেবল শান্তই একমাত্র রস যাহার কোন ভেদ করা হয় নাই, কিন্তু উহার পরিকল্পনাই ভরতের পরবর্তী যুগে হইয়াছিল। এই সমস্ত উপভেদের সংখ্যা ক্রমশঃ অধিকাধিক বিস্তার লাভ করিতে থাকেঃ শৃঙ্গারের ৫২টি উপভেদ, হাস্যের ৩৬, করুণার ৮, বীরের ৯, ভয়ানকের ৬, বীভৎসের ৬, অদ্‌ভুতের ২, রৌদ্রের ৩—সব যোগ করিয়া ১২২টি উপভেদের উল্লেখ কাব্যশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

উপভেদের এই পরিকল্পনার আধার অনেকঃ স্বয়ং ভরত উপভেদের নিরূপণে কোথাও চিত্তবৃত্তিকে আধাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও অবস্থা ও পরিস্থিতি-গুলিকে, কোথাও বিভাব বা প্রেরক কারণগুলিকে, কোথাও কেবল অভিনয়কে—এবং কোন-কোন স্থলে একাধিক আধারের সংমিশ্রিত রূপকে গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ণনীয় বিষয়ের সহিতও সম্বন্ধযুক্ত হইয়া উপভেদের বিস্তার হইয়াছে—একদিকে যেমন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর বিস্তার লাভ হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি আচার্যরা বিভিন্ন রসের অন্তর্গত—বর্ণিত প্রসঙ্গের অনুসরণে উপভেদেরও বিস্তার করিয়াছেন। পরে অন্য রসের উপভেদগুলি প্রায় অপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে কিন্তু নায়িকাভেদের প্রসারের সহিত শৃঙ্গারের ভেদে আরও বিস্তার ঘটিতে থাকে।

১. নাট্যশাস্ত্র, ৬.৮৩
২. হিন্দী না০ দ০, পৃ০ ৩১৬

বিশ্লেষণ ও সার-মত

রস-সংখ্যার সহিত সম্বন্ধ প্রাগুক্ত সামগ্রীর বিশ্লেষণ করিলে পরে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি উপলব্ধ হয় :

(১) সকল শ্রেণীর উদ্‌ভাবনাগুলিকে সংযুক্ত করিলে পরে রস-ভেদের সম্পূর্ণ যোগফল ৩২টি হয় :

—প্রায় সর্ব-স্বীকৃত রস—শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস ও শান্ত = ৯।

—একাধিক আচার্যদের দ্বারা নিশ্চিতপূর্বক যে সব রস স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—প্রেয়ান্ (সখ্য), বাৎসল্য, ভক্তি, আনন্দ (প্রমোদ), প্রকৃতি এবং দেশভক্তি = ৬।

—কোন একজন আচার্য দ্বারা যে রস নিশ্চিতপূর্বক স্বীকৃত হইয়াছে—উদাত্ত, উদ্ধত, মায়া, ব্রীড়নক (প্রাচীন); ক্রান্তি, উদ্বেগ, প্রক্ষোভ (নবীন) = ৭।

—কেবল খণ্ডনের জন্য যে সব রসের উল্লেখ হইয়াছে—লৌল্য; অক্ষ (দ্যূত)-রস, মৃগয়া-রস, ব্যসন-রস, সুখ ও দুঃখ এবং কার্পণ্য = ৭।

কেবল নামমাত্র উল্লেখ হইয়াছে—পারবশ্য, সাধ্যস, বিলাস = ৩।

= সর্বযোগ ৩২।

(২) এই নূতন উদ্‌ভাবনাগুলির মুখ্যতঃ তিনটি আধার-ভিত্তি লক্ষিত হয় :

(ক) **ব্যবহারিক**—অর্থাৎ যে উদ্‌ভাবনাগুলি নাট্যগত এবং কাব্যগত বর্ণনীয় বিষয়ের উপর আশ্রিত : উদাত্ত, উদ্ধত, অক্ষ, মৃগয়া, ব্যসন, দেশভক্তি, ক্রান্তি, প্রকৃতি প্রভৃতি রসের উদ্‌ভাবনা প্রায় কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়গুলির আশ্রয়ে হইয়াছে।

(খ) **মনোবৈজ্ঞানিক**—প্রারম্ভিক আটটি রসের সহিত প্রেয়ান্, বাৎসল্য, লৌল্য, সুখ, দুঃখ, ব্রীড়নক প্রভৃতি রসগুলি প্রায় মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উদ্‌ভাবিত হইয়াছে।

(গ) **দার্শনিক**—আত্মার বিভিন্ন প্রবৃত্তির উপর যে সব রস আশ্রিত—শান্ত, ভক্তি, মায়া প্রভৃতি রসের উদ্‌ভাবনা প্রায় দার্শনিক ভিত্তিতেই হইয়াছে।

(৩) বিস্তারের প্রবৃত্তি প্রায় সেই সব গ্রন্থেই অধিক লক্ষিত হয় যাহাদের বিবেচ্য বিষয় নাট্য, কারণ দৃশ্যের প্রাধান্য থাকার জন্য এই সব গ্রন্থের দৃষ্টিকোণ স্বভাবতঃ অধিক বিষয়নিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল।

(৪) বহুমতে বিস্তারের বিরোধই হইয়াছে। ইহা ঠিক যে অনেক বিদ্বানেরা রস-সংখ্যার সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে স্পষ্ট সন্দেহ প্রকট করিয়াছেন—লোল্লট, রুদ্রট প্রভৃতিরা সমস্ত সঞ্চারীগুলিকে রসত্বের অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিয়া রসের কোন সীমাই স্বীকার করেন নাই, কিন্তু উচিত বিকল্পের অভাবে, (অর্থাৎ এই ভাবিয়া যে অন্য কোন প্রস্তাবিত সংখ্যাও ঠিক এইরূপই বিবাদাস্পদ হইতে পারে) তাঁহারা পরম্পরার অনুসরণই অধিক নিরাপদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(৫) প্রাচীন আচার্যরা কেহই কোন রকম সঙ্কোচ করেন নাই বা এই রকম কোন প্রবৃত্তিই তাঁহাদের ছিল না। কেহই স্বীকৃত রসের কোনটাকেই অস্বীকার করেন নাই এবং আটটির কম সংখ্যাও কেহ স্বীকার করেন নাই। কেবল অনুযোগদ্বারসূত্রে ভয়ানকের কারণভূত রৌদ্ররসে উহাকে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়, কিন্তু কাব্যশাস্ত্রে উহাকে কোন প্রামাণিক সূত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই এবং কোন আচার্য উহার উল্লেখও করেন নাই। হিন্দীতেও এই পরম্পরারই পালন হইয়াছে এবং ফলে কোন স্বীকৃত রসের নিষেধ করা হয় নাই। কেবল মারাঠীতে রৌদ্র এবং অদ্ভুতের স্বতন্ত্র সত্তা ও বীভৎসের রসাত্মকতার নিষেধ করা হইয়াছে কিন্তু[১] এই মতেরও খুব বেশী প্রচার হয় নাই।

একটি মূল রসের কল্পনা

ভারতীয় কাব্য-চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্য যে একদিকে যেমন রসের অনন্ততাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে সকল রসকে একই রসের অন্তর্ভূর্ত করিবারও চেষ্টা চলিয়াছে—এবং ইহা অস্বাভাবিকও ছিল না কারণ বিস্তার প্রিয় হইলেও অবশেষে ভারতীয় দৃষ্টি অদ্বৈতে গিয়াই সমাপ্ত হয়—বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য থাকিয়াছে। অতএব রসের ক্ষেত্রেও রসের ভেদ-প্রভেদের বিস্তারের সহিত অনেক রসকে একই রসের অন্তর্ভূর্ত করিবার উদ্-যোগও নিরন্তর চলিয়াছে।

একো রসঃ করুণ এব

ঐতিহাসিক কাল ক্রমানুসরণে এই ক্ষেত্রে ভবভূতির প্রয়াসই সর্বপ্রথম। উত্তররামচরিতে অত্যন্ত মার্মিকভাবে ভবভূতি তমসার মাধ্যমে এই ঘোষণা করিয়াছেন:

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্ ভিন্নঃ পৃথকৃপৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্বিকারানম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎসমগ্রম্॥

উত্তররামচরিত ৩.৪৭

—একই করুণ রস নিমিত্ত-ভেদ-হেতু ভিন্ন হইয়া পৃথক্-পৃথক্ রূপে ভেদ প্রাপ্ত হয়, জল যে প্রকার আবর্ত্ত, বুদ্বুদ ও তরঙ্গরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সমস্তই সলিল।

এই শ্লোকের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির কথা উঠিতে পারে:

১. ডঃ বাটবে—রসবিমর্শ পৃঃ ২৪৭; অধ্যাপক জোগ—অভিনব কাব্যপ্রকাশ, পৃঃ ১১৫

—ইহা কেবল একটি বিশেষ পাত্র তমসার একটি বিশেষ নাটকীয় পরিস্থিতিতে কাব্যময় উদ্গার মাত্র। নাটকের পরিবেশ খুবই করুণাময় হইয়া পড়িয়াছিল—সীতা, রাম, বাসন্তী সকলের হৃদয় করুণার্দ্র ছিল। এই শ্লোক সেই পরিস্থিতিরই বাচিক প্রতীক মাত্র। অতএব ইহাকে শাস্ত্র-কাব্যরূপে গ্রহণ করা বোধ হয় উচিত হইবে না।

—যদি এই উক্তিকে পাত্রের মাধ্যমে কবিরই উক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবুও এই উক্তি সম্পূর্ণ করুণাপ্লাবিত নাটকের 'ভাবার্থ' বলিয়াই প্রতীত হয়। ইহাকে শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

—ইহা কবি ভবভূতির সৈদ্ধান্তিক যুক্তি যাহা তিনি নাটকীয় শৈলীতে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম দুইটি সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াও সংস্কৃত বিদ্বান্‌গণ প্রায়ঃ তৃতীয় বিকল্পটিকে গ্রহণ করিয়াছেন—(১) উত্তররামচরিতের টীকাকার বীররাঘব স্বয়ং ইহার পুষ্টি করিয়াছেন এবং ভোজ-প্রতিপাদিত শৃঙ্গার-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করুণার স্বপক্ষে দুইটি যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন :

(১) প্রাচুর্যাৎ অর্থাৎ জীবনে করুণারই প্রাচুর্য এবং (২) রাগিবিরাগিসাধারণ্যাৎ—অর্থাৎ অনুরাগী এবং বিরাগী উভয়ে সমানরূপে ইহার অনুভব করেন (ইহার বিপরীতে শৃঙ্গারের অনুভব কেবল অনুরাগীরাই করেন)।[১] কিন্তু এই ব্যাখ্যার পরেও অভীষ্ট অর্থের সিদ্ধি হয় না কারণ কাব্যশাস্ত্রে শোককে করুণ রসের স্থায়ীভাব স্বীকার করা হইয়াছে। ইষ্টের নাশ ইহার আধার—কেবল ইষ্টের বিয়োগ নয় এবং শাস্ত্রের ভিত্তিতে উত্তররামচরিতের অঙ্গী রস বিপ্রলম্ভ সিদ্ধ হয়, করুণা নয়। এমন পরিস্থিতিতে ইহা কি স্বীকার করা হইবে যে দেশ ও কাল হইতে ক্ষিন্ন ভবভূতি পরম্পরার প্রতি বিদ্রোহ করিয়া একদিকে করুণাকে কেবল ইষ্ট নাশ পর্যন্তই সীমিত বলিয়া স্বীকার করেন নাই—ইষ্টের এইরূপ বিষম বিয়োগকেও করুণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যাহাতে পীড়ার তীব্রতা বিদ্যমান আছে এবং মিলনের আশা প্রায় ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, এবং অপর দিকে অবসানের স্থানে অন্তর্ব্যাপ্তিকে অঙ্গী রসের নির্ণায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই অর্থ-বিস্তারের অনুসরণে আমাদের সার-কথা এই যে ভবভূতির করুণ রসের স্থায়ী ভাব 'শোক' না হইয়া 'করুণ' যাহা 'দয়া'র স্থানে ব্যাপক অর্থে 'সহৃদয়তা'র—হৃদয়-দ্রুতির দ্যোতক। শঙ্কুক করুণার এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন :

সদয়হৃদয়তা হি করুণেতি লোকে প্রসিদ্ধা। সা লিঙ্গৈরনুকর্ত্তরি শোকং প্রতিয়তাং সামাজিকানামিতি তত্র করুণব্যপদেশঃ ইতি শ্রীশঙ্কুকঃ।

—সদয়-হৃদয়তা লোকে 'করুণা' নামে প্রসিদ্ধা। উহা (স্বীয় দৃশ্যমান রোদন,

১. উত্তররামচরিত (সম্পাদক—এম০ আর০ কালে ১৯২৪), পৃ০ ৯৭

বিলপন প্রভৃতি) লিঙ্গের দ্বারা অনুকর্তায় (নটে) স্থিত শোকের অনুভব কর্তা সামাজিকের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এইজন্য এই রসের করুণ (সার্থক) নাম। ইহা শ্রীশঙ্কুকের মত। (হিন্দী অভিনব ভারতী পৃ০ ৫৭৯)।

এই যুক্তির অনুসরণে আনন্দবর্ধন করুণ রসে আর্দ্রতা বা দ্রুতির মাত্রা শৃঙ্গারের অপেক্ষা অধিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। করুণার ইংরাজী সমার্থ 'প্যাথেটিক'এরও অর্থ-বিস্তার এইরূপে হইয়াছে। ইহারও দুইটি পরস্পর সম্বদ্ধ অর্থ আছে—শোকাত্মক এবং রাগাত্মক [প্যাথস (গ্রীক) = শোক, মনোবেগ; প্যাথেটিক (গ্রীক প্যাথেটিকোস) = শোকাত্মক, মনোবেগাত্মক[১]]। এরিস্টটল মহাকাব্যের চারিটি ভেদ স্বীকার করিয়াছেন: (১) সরল, (২) জটিল, (৩) নৈতিক, এবং (৪) করুণ[২] (প্যাথেটিক)। স্পষ্টতঃ এখানে করুণ (প্যাথেটিক) বলিতে ভাব-প্রধান অর্থই অভিপ্রেত, শোকাত্মক অর্থ উদ্দিষ্ট নয়। এই ব্যাপক অর্থেই ভবভূতি করুণকে মূলরস বলিয়াছেন কারণ চিত্তদ্রুতি অথবা সংবেদনাই মূল চেতনা রূপে সকল মনোবেগে বিদ্যমান থাকে, অথবা ইহাও বলা যায় যে সকল মনোবেগ 'সংবেদনারই' বিভিন্ন রূপ। এই ব্যাপক পরিভাষার ভিত্তিতে সুখান্ত হইলে পরেও উত্তররামচরিতের অঙ্গী রস করুণকেই স্বীকার করা যাইতে পারে।[৩]

ভবভূতির পূর্বে বা তাঁহার পশ্চাতেও কাব্যশাস্ত্রের কোন আচার্যই করুণাকে মূলরস বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ভরত তো উহাকে মুখ্য রস স্বীকার না করিয়া রৌদ্র হইতে উদ্ভূত গৌণ রসই বলিয়াছেন এবং পরবর্তী আচার্যদের মধ্যে অধিকাংশ উহাকে মহাকাব্য অথবা নাটকের অঙ্গী রস পর্যন্ত স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছেন। তবুও ভবভূতির এই সিদ্ধান্তের কারণ কি? কারণ বোধ হয় দুই-তিনটি হইতে পারে—প্রথমতঃ ভবভূতির নিজস্ব গম্ভীর স্বভাব যাহা স্বীয় জীবনগত কুণ্ঠার জন্য অত্যধিক সংবেদনশীল হইয়া গিয়াছিল স্বভাবতঃ করুণার পক্ষপাতী ছিল। দ্বিতীয়তঃ যে রামকথা তাঁহার কাব্যের মূলাধার ছিল তাহা বস্তুতঃ করুণ কথা: পুটপাক প্রতীকাশো রামস্য করুণা রসঃ—এবং তৃতীয়তঃ করুণার করুণাস্থায়িক ব্যাপক অর্থও ভবভূতির যুগে প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব এইসব কারণে করুণার প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব সত্যই স্বাভাবিক কিন্তু করুণাস্থায়িক করুণের প্রতিই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল, শোকস্থায়িক করুণার প্রতি নয়।

---

১. The Concise Oxford Dictionary (4th Edition), P. 873

২. অরস্তুকা কাব্যশাস্ত্র, পৃ০ ১৩৭

৩. ডঃ রাঘবন 'সিম্প্যাথি'র শব্দার্থের আশ্রয়ে করুণ রসের মৌলিকতাকে প্রমাণ করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য, The Number of Rasas, পৃ০ ১৬৫)। আমার ধারণা যে 'প্যাথেটিক্'এর আশ্রয়ে ইহার সিদ্ধি অধিক সরল এবং গ্রাহ্য।

শান্তস্তু প্রকৃতির্মতঃ[১]

—ভবভূতির প্রায় চার শতাব্দী পরে অভিনব গুপ্ত শান্তকে মূলরসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শান্তের প্রতি অভিনব গুপ্তের নিজস্ব আগ্রহ তো স্পষ্টই, কিন্তু তিনি এই প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের কোন এক প্রাচীন সংস্করণের উল্লেখ করিয়া ভরতকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, "এইজন্য (ভরত নাট্যশাস্ত্রের) 'প্রাচীন পুস্তকে স্থায়িভাবের রসত্ব-প্রাপ্তির বর্ণনা করিলেন' ইহার পর 'সমরূপে স্থায়িভাবাত্মক রস শান্তরস হয়' এই শান্ত রসের সংজ্ঞা-নিরূপণ করা হইয়াছে।" (হিন্দী অভিনবভারতী পৃ০ ৬৩৫)। নাট্যশাস্ত্রের একটি সংস্করণে, যেখানে শান্ত রসের পৃথক্ বিবেচনা হইয়াছে, স্পষ্ট লেখাও আছে—

ভাবা বিকারা রত্যাদ্যাঃ শান্তস্তু প্রকৃতির্মতঃ।
বিকারঃ প্রকৃতের্জাতঃ পুনস্তত্রৈব লীয়তে॥
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ ভাবঃ প্রবর্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে চ শান্ত এবোপলীয়তে॥

—রতি প্রভৃতি ভাবগুলি বিকার এবং শান্ত (শম) হইতেছে প্রকৃতি অর্থাৎ মূলরস। বিকার প্রভৃতি বা স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার ইহাতেই লীন হইয়া যায়। নিজের-নিজের অনুকূল (বিভাবাদি) নিমিত্ত জীবনগুলি প্রাপ্ত হইলে পরে শান্ত হইতেই (রত্যাদি) ভাব উৎপন্ন হয় এবং নিমিত্ত কারণের অভাবে আবার শান্তেই লীন হইয়া যায়। (নাট্যশাস্ত্র, ৬.৮৪)।

এই বিবেচনা (যাহা সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্তই) নিশ্চিতরূপে অভিনব গুপ্তের পূর্বেকার বিবেচনা কারণ অভিনব গুপ্ত অভিনবভারতীতে নিজস্ব মতের পুষ্টির জন্য ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] অভিনব গুপ্ত নিজের পক্ষ হইতে শান্তের আনুকূল্যে নিম্নলিখিত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন—(ক) শান্ত রসের স্থায়ী ভাব আত্মজ্ঞান যাহা পরিকল্পিত বিষয়ভোগ প্রভৃতির বাসনা হইতে মুক্ত শুদ্ধ আনন্দময়ঃ তেনাত্মৈব জ্ঞানানন্দাদিবিশুদ্ধধর্মযোগী পরিকল্পিতবিষয়ভোগরহিতোঽত্র স্থায়ী।[৩] বস্তুতঃ ইহাই রসের স্বরূপঃ রতি শোকাদির এই আত্মচৈতন্যের স্থিতিকে প্রাপ্ত করিয়া শৃঙ্গার করুণাদি রসে পরিণত হইয়া যায়—(উপরাগদায়ী অর্থাৎ) আত্মার স্বরূপের আচ্ছাদনকারী উৎসাহ, রতি প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত আত্মার যে রূপ তাহা (মালার মধ্যে) দূরে-দূরে অবস্থিত মণির মাঝখান হইতে দৃশ্যমান ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল সূত্রের অনুরূপ (কখন-কখন অল্পক্ষণের জন্য) প্রতিভাসিত হইলে পরে রত্যাদি রূপ

১. শান্তই প্রকৃতি বা মূল
২. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৬৩৭
৩. ঐ, পৃ০ ৬২৩

সকল উপরঞ্জকের সেইরূপে থাকিলে পরেও ('সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরং' ইত্যাদি বাক্যানুসারে) এই আত্মরূপ এক বারেই প্রকাশিত হইয়া বিষয়োন্মুখতা রূপ সমস্ত দুঃখের জাল হইতে বর্জিত এবং পরমানন্দের প্রাপ্তির সহিত অভিন্ন রূপে কাব্য ও নাটক প্রভৃতির দ্বারা সমান রূপে প্রতীত হইয়া অন্তর্মুখী অবস্থা ভেদে লোকোত্তর আনন্দের প্রাপক হইয়া হৃদয়কেও সেইরূপ (আনন্দময়) করিয়া দেয়। (হিন্দী অভিনবভারতী পৃ০ ৬৪০)। অতএব যে আত্মাস্বাদ অন্য রসের রসত্বের মূলাধার তাহাই শান্তি রসের স্থায়ী ভাব।

(খ) শান্তের স্থায়ী ভাব তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অন্য সমস্ত স্থায়ী ভাবের আধারস্থানীয়— স্থায়ির স্থায়ী, অতএব ইহাই স্থায়িতম ভাব। অন্য স্থায়ী এখানে ব্যভিচারীত্ব লাভ করে:

তত্ত্বজ্ঞানন্তু সকলভাবান্তরভিত্তিস্থানীয়ং সর্বস্থায়িভ্যঃ স্থায়িতমং সর্বা রত্যাদিকাঃ স্থায়িচিত্তবৃত্তীর্ব্যভিচারীভাবয়ৎ নিসর্গত এব সিদ্ধস্থায়িভাবমিতি।

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান অন্য সকল (রত্যাদি) ভাবের আশ্রয়ভূত, অন্য সকল স্থায়িভাবের অপেক্ষা অধিক স্থায়ী এবং রত্যাদি রূপ সকল বৃত্তিকে ব্যভিচারিত্ব প্রাপ্ত করাইয়া স্বভাবতঃ স্থায়িভাব রূপে স্বয়ংসিদ্ধ হয়।[১]

প্রকৃতপক্ষে লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় প্রকারের চিত্তবৃত্তির সমুদায় তত্ত্বজ্ঞান রূপ স্থায়ীর ব্যভিচারী হইয়া যায়: তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণস্য চ স্থায়িনঃ সমস্তোঽয়ং লৌকিকালৌকিকচিত্তবৃত্তিকলাপো ব্যভিচারিতামভ্যেতি।[২] ইহা কিরূপ হয়, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ অভিনব ভারতীর আর একটি উদ্ধরণে হইয়াছে:

এইরূপ (২) সমস্ত বস্তুর বিকার দেখিয়া (বিকৃত-দর্শন জন্য হাস্য রসের স্থায়িভাব হাস শান্ত রস উৎপন্ন করে)। (৩) সমস্ত সংসারকে যিনি শোচনীয় রূপে অবলোকন করেন সেই (সাধক) তাঁহার (করুণ রসের স্থায়িভাব শোক শান্ত রসের অনুভূতিতে সহায়ক হয়), (৪) সাংসারিক বৃত্তান্তকে (আত্মার জন্য) অপকারী রূপে যিনি দেখেন (অপকারিত্ব-জন্য রৌদ্র রসের ক্রোধ রূপ স্থায়িভাব), (৫) অত্যন্ত জ্ঞানপ্রধান (বীর্য) উৎসাহকে যিনি স্বীকার করেন সেই (সাধক) তাঁকে (বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহ), (৬) সমস্ত বিষয়সমূহ দেখিয়া যিনি ভয় অনুভব করেন তাঁর (ভয়ানক রসের স্থায়িভাব ভয়), (৭) সকলের প্রিয় কামিনী প্রভৃতিকেও যিনি ঘৃণা করেন তাঁর (বীভৎস রসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা), (৮) এবং নিজের অপূর্ব আত্ম-স্বরূপের প্রাপ্তির জন্য (অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব) বিস্ময়াভিভূত (সাধক) তিনি মোক্ষ লাভ করেন।[৩]

বস্তুতঃ উল্লিখিত বক্তব্যের অভীষ্ট সার অর্থ এই যে শান্ত রসের পৃথক্ স্থায়ীর কল্পনা অনাবশ্যক, আটটি প্রসিদ্ধ ভাবের মধ্যে যে কোনটিই অলৌকিক বিভাবের সন্দর্ভে উহার স্থায়ী হইতে পারে।[৪] এবং এইজন্য অভিনবগুপ্ত ইহার খণ্ডনও

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৬২৪

২. ঐ. পৃ০ ৬২৭

৩. ঐ, পৃ০ ৬২০-৬২১

৪. রতিহাসাদীনাং বিস্ময়ান্তানামষ্টতমস্ত স্থায়িত্বং নিরূপণীয়ম্। (হিন্দী অ০ ভা০ পৃ০ ৬২১)

করিয়াছেন। কিন্তু ইহার একটি অন্য সার-অর্থও হইতে পারে: সকল প্রসিদ্ধ স্থায়ী ভাব শান্তের প্রতি উন্মুখ থাকে অথবা শৃঙ্গার, হাস্যাদি অন্য রস শান্তের রূপান্তর মাত্র। প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে আমরা এই অর্থেই এই উদ্ধরণের উল্লেখ করিতেছি।

শৃঙ্গারমেব রসনাদ্রসমামনামঃ[১]

প্রায় এই সময় রাজা ভোজ বলিষ্ঠ ভাবে এই ঘোষণা করিলেন যে যদিও প্রাচীন আচার্যরা দশটি রসের কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু আস্বাদনীয়তা কেবল শৃঙ্গারেই বিদ্যমান আছে, অতএব আমরা উহাকেই রস বলিয়া স্বীকার করি।[২] তাঁহার বক্তব্যের সার-মর্ম এইরূপ:

আমাদের অহংকারই প্রতিকূল পরিস্থিতির অভাবে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীর দ্বারা আনন্দরূপে সংবেদ্য হইয়া রসত্বকে লাভ করে। এই অহংকার আত্মার বিশিষ্ট গুণ, ইহাই অভিমান, ইহাই শৃঙ্গার এবং ইহাই রস। রতি-হাস প্রভৃতি ভাব এই শৃঙ্গার হইতে উৎপন্ন হয়। উহারা ভাবই থাকে, স্বয়ং রসত্বকে প্রাপ্ত হয় না। উহারা তো, যেইরূপ প্রকাশ-কিরণ অগ্নির শোভা বৃদ্ধি করে, সেইরূপ শৃঙ্গারের শোভা বৃদ্ধি করে। এইজন্য, সঞ্চারী প্রভৃতির প্রবাদ মিথ্যা। শৃঙ্গারই চতুর্বর্গের কারণ, উহাই রস।[৩]

অগ্নিপুরাণের শৃঙ্গার-সিদ্ধান্ত ইহারই রূপান্তর মাত্র। যদিও অগ্নিপুরাণের রচনাকালের বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে এবং ইহা বলা আজও কঠিন যে অগ্নিপুরাণের সিদ্ধান্ত ভোজের সিদ্ধান্তেরই রূপান্তর অথবা স্থিতি ঠিক ইহার বিপরীত। বাস্তবিক তথ্য এই যে উভয়েরই সার কথা প্রায় সমান। উভয়েই ইহা স্বীকার করেন যে আত্মার মূল ধর্ম বা বিশিষ্ট গুণ অহঙ্কার, কিন্তু রাজা ভোজের মতে এই অহঙ্কারই অভিমান এবং ইহাই শৃঙ্গার। ইহার বিপরীতে অগ্নিপুরাণের মতানুসারে অহঙ্কার ও অভিমানের মধ্যে এবং অভিমান ও রতির মধ্যে সমার্থ সম্বন্ধ না হইয়া জনক-জন্য সম্বন্ধ বিদ্যমান:

ততোঽভিমানঃ.... । ৩.৩ । অভিমানাদ্রতি.... ৩.৪ ।

---

১. রসনীয়তার ভিত্তিতে আমরা শৃঙ্গারকেই রস বলিয়া স্বীকার করি।

২, ৩. শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতরৌদ্রহাস্যবীভৎসবৎসলভয়ানক শান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষুর্দশ রসান্ সুধিয়ো বয়ং তু শৃঙ্গারমেব রসনাদ্রসমামনামঃ॥

× × ×

অপ্রাতিকূলিকতয়া মনসো মুদাদের্যঃ সংবিদোঽনুভবহেতুরিহাভিমানঃ।
জ্ঞেয়ো রসঃ স রসনীয়তয়াত্মশক্তে রত্যাদিভূমনি পুনর্বিতথা রসোক্তিঃ॥
রত্যাদয়োঽর্ধশতমেকবিবর্জিতানি ভাবাঃ পৃথগ্বিধবিভাবভুবো ভবন্তি।
শৃঙ্গারতত্ত্বমভিতঃ পরিবারয়ন্তঃ সপ্তার্চিষং দ্যুতিচয়া ইব বর্ধয়ন্তি॥ (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইহা ব্যতীত ভোজ রতিকে শৃঙ্গার-প্রভব ও রস-পরিণতিতে অসমর্থ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু ইহার বিপরীতে অগ্নিপুরাণের মত এই যে ব্যভিচারী প্রভৃতির দ্বারা পুষ্ট রতিই শৃঙ্গার রূপ ধারণ করে এবং অন্যরস ইহারই বিভিন্ন ভেদ যদিও ইহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র লক্ষণ এবং স্থায়ী ভাব বর্তমান আছে :

তদ্‌ভেদাঃ কামমিতরে হাস্যাদ্যা অপ্যনেকশঃ।
স্বস্বস্থায়িবিশেষোৎথ পরিঘোষস্বলক্ষণাঃ॥[১] ৩.৪

বস্তুতঃ ইহা কোন মৌলিক ভেদ নয়—কথন-ভেদ মাত্র।

হিন্দীর রীতিকাব্যে শৃঙ্গারের মহিমা আরও বিস্তার লাভ করিয়াছে—কেশব, চিন্তামণি, দেব প্রভৃতি আচার্য কবিরা মুক্তকণ্ঠে শৃঙ্গারকে রসরাজ বলিয়াছেন। কেশব এবং দেব প্রধান রস ব্যতীত মূল এবং একমাত্র রসরূপেও আগ্রহের সহিত ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন :

(ক) সবকো কেশবদাস হরি নায়ক হৈ শৃঙ্গার। (কেশব, রসিকপ্রিয়া ১,১৬)

(খ) ভাব-সহিত সিঙ্গার মেঁ নবরস ঝলক অজস্র।
জ্যোঁ কঙ্কনমণি-কনক কো তাহী মেঁ নবরত্ন॥

(দেব, ভবানী বিলাস)

নিজেদের মতের পুষ্টির জন্য এই কবিরা ব্যবহার এবং সিদ্ধান্ত উভয়েরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইঁহারা সকল রস শৃঙ্গারের অন্তর্ভূর্ত করিয়াছেন—কেবল হাস্যাদি মিত্ররসগুলিই নয়, রৌদ্র এবং বীভৎস প্রভৃতি অমিত্র রসগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদনের জন্য কেশব অর্দ্ধদার্শনিক অথবা পৌরাণিক আধার গ্রহণ করিয়াছেন :

শ্রী বৃষভানুকুমারি হেতু 'শৃঙ্গার' রূপ ভয়।
বাস, 'হাস' রস হরে, মাত-বন্ধন 'করুণাময়'॥
কেশী প্রতি অতি 'রৌদ্র', 'বীর' মারো বৎসাসুর।
'ভয়' দাবানল পান, পিয়ো 'বীভৎস' বকী উর॥
অতি 'অদ্ভুত' বঞ্চ বিরঞ্চি মতি, 'শান্ত' সন্ততে শোচ চিত।
কহি কেঁশব সেবহু রসিক জন নবরস মেঁ ব্রজ-রাজ নিত॥

(রসিকপ্রিয়া, ১,২)

পাণ্ডুলিপি (শৃঙ্গারপ্রকাশ খণ্ড ১, পৃ০ ২-৩) (ডঃ শংকরণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।
তং চাত্মনোহহঙ্কারগুণবিশেষং ব্রুমঃ, স শৃঙ্গারঃ স্তোভিমানঃ স রসঃ।
(শৃঙ্গারপ্রকাশ খণ্ড ২, পৃ০ ১১, পৃ০ ৩৫৬)
রত্যাদয়ঃ শৃঙ্গারপ্রভবা ইতি। একোনপঞ্চাশদ্‌ভাবা বীরাদয়ো
মিথ্যারসপ্রবাদাঃ শৃঙ্গার এবৈক : চতুর্বর্গৈকারণং, স রস, ইতি।
শৃঙ্গারপ্রকাশ, খণ্ড ১, পৃ০ ২-৩ (ডঃ শঙ্করণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

১. অগ্নিপুরাণ কা কাব্যশাস্ত্রীয় ভাগ (অনু০ রামলাল বর্ম্মা)

উল্লিখিত স্তুতি-ছন্দে কবি কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে নয়টি রসের সমাবেশ করিয়া নিজস্ব সিদ্ধান্তের জন্য আধার-ভূমি রচনা করিয়াছেন : কৃষ্ণ যেইরূপ শৃঙ্গারময় হইয়াও নবরস-রূপ ধারণ করেন, সেইরূপ শৃঙ্গারও নবরসে পরিণত হইতে পারে বা নবরসের শৃঙ্গারের সহিত তাদাত্ম্য হইতে পারে।

দেবের দৃষ্টিকোণ অপেক্ষাকৃত অধিক শাস্ত্রীয় :

তীন মুখ্য নৌ হু রসনি দ্বৈ দ্বৈ প্রথম বিলীন।
প্রথম মুখ্য তিন তিনহুঁ মৈঁ, দোউ তেহি আধীন॥
হাস্য ভয়রু সিঙ্গার সঁগ রৌদ্র করুন সঁগ বীর।
অদ্ভুত অরু বীভৎস সঙ্গ শান্তহিঁ বরনত ধীর॥

(ভবানী বিলাস)

এবং শেষে

ভূলি কহত নবরস সুকবি সকল মূল সিঙ্গার।
তেহি উছাহ নির্বেদ লৈ, বীর, শান্ত সঞ্চার॥

(ভবানী বিলাস)

—অর্থাৎ নয়টি রসের মধ্যে তিনটি মুখ্য শৃঙ্গার, বীর এবং শান্ত। শেষ ছয়টি রস ইহাদেরই আশ্রিত—হাস্য এবং ভয় শৃঙ্গারের আশ্রিত, করুণ এবং রৌদ্র বীরের এবং অদ্ভুত ও বীভৎস শান্তের আশ্রিত। এবং, আবার এই তিনটির মধ্যে শৃঙ্গারই মুখ্য, শেষ দুইটি রস—বীর ও শান্ত—উহারই অধীন কারণ বীরের জন্ম শৃঙ্গারের উৎসাহ হইতে এবং শান্তের শৃঙ্গারের নির্বেদ হইতে হয়।

বলা বাহুল্য কেশব এবং দেবের এই বিশ্লেষণ ততখানি শাস্ত্রীয় বা মনোবৈজ্ঞানিক নয়, যতখানি কাব্যময়।

সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ[১]

—অদ্ভুতই মূল ও একমাত্র রস—ইহা কবিরাজ বিশ্বনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারায়ণ পণ্ডিতের মত। বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণের রস-প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী বিদ্বান্ ধর্মদত্তের অনুসরণে এই কথা বলিয়াছিলেন :

তদাহ ধর্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে—

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্।

—তাই ধর্মদত্ত স্বগ্রন্থে বলেন—রসের সার হইতেছে চমৎকার, উহা সর্বত্রই

১. অদ্ভুত সর্বত্রই অনুভূত হয়।

অনুভূত হয়, সেই চমৎকারের সার সর্বত্রই অদ্ভুত রস বলিয়া স্বীকৃত হয়। অতএব পণ্ডিত নারায়ণ অদ্ভুত রসকেই একমাত্র রস বলিয়া স্বীকার করেন।

(সা০ দ০, বিমলা টীকা ১৯৩৬, পৃ০ ৪৯)

এই সিদ্ধান্তের আধার হইতেছে 'চমৎকার'। চমৎকার ভারতীয় সৌন্দর্যশাস্ত্রের একটি অত্যন্ত মৌলিক শব্দ যাহা রসশাস্ত্রের অনেক পারিভাষিক শব্দের অনুরূপ শৈব-দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে। অভিনবগুপ্তের মতানুসারে চমৎকারের অর্থ এইরূপ :

সা চাবিঘ্না সংবিৎ চমৎকারঃ × × স

চাতৃপ্তিব্যতিরেকেণাহবচ্ছিন্নো ভোগাবেশ ইত্যুচ্যতে।

—সর্বথা বিঘ্ন-বিহীন এই প্রতীতিই চমৎকার এবং ইহা (অবিঘ্ন সংবিৎরূপ চমৎকার) অতৃপ্তি হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ পূর্ণতৃপ্তি রূপ) ভোগাবেশ বলিয়া কথিত। (হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৭১-৭২)।

এইরূপ চমৎকারের অর্থ নির্বিঘ্ন আত্মপ্রতীতি—আত্মাস্বাদ অথবা আনন্দ। এবং যেহেতু কাব্য অথবা রসের এই আনন্দ বিষয় জন্য আনন্দের অন্য রূপ হইতে ভিন্ন হয়, এইজন্য ইহার সহিত অলৌকিক বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেবল রস-প্রসঙ্গেই নয়, অলঙ্কার এবং বক্রোক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও কাব্যের সৌন্দর্য এবং উহার পরিণামরূপ আহ্লাদের জন্য 'লোকোত্তর' প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ প্রারম্ভ হইতে হইয়া আসিতেছে। অতএব কাব্যানন্দ 'অলৌকিক'—'লোক হইতে কিছু অধিক' অথবা 'অসাধারণ' তত্ত্ব মূলতঃ প্রারম্ভ হইতে অন্তর্ভূত। পাশ্চাত্য সৌন্দর্য-দর্শনেও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে বিস্ময় তত্ত্বের স্থিতি অনিবার্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, উহাতে অনুরাগ এবং বিস্ময়ের সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে।

স চ রসো ভগবদ্‌ভক্তিময় এব[১]

শেষে, ভারতীয় বাঙ্‌ময়ে ভক্তিকাব্যের প্রচুর বিকাশ হওয়ার জন্য বৈষ্ণব আচার্যরা ভক্তিরসের কেবল প্রতিষ্ঠাই করেন নাই বরং উহাকেই মূলরস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক রস ভক্তিরসই, কারণ ইহাই পূর্ণানন্দময়; শৃঙ্গারাদি কাব্যরস উহার অপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র; পরিপূর্ণরসা ভগবদ্রতি এবং শৃঙ্গারাদির মধ্যে অন্তর ঠিক সেইরূপ যেরূপ সূর্য এবং খদ্যোতের মধ্যে লক্ষিত হয় :

পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।

খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্যপ্রভেব বলবত্তরা॥

(মধুসূদন সরস্বতী; ভগবদ্‌ভক্তিরসায়ন ২.৭৮)

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কাব্যরসের স্থিতি ভক্তিরসে সঞ্চারী ভাবের অনুরূপ :

১. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (দুর্গমসঙ্গমনী), পৃ০ ৭৪

হাসাদীনাং ব্যভিচারিত্ব পর্যবসানাং ।১ এই যুক্তি অনুসরণে রূপগোস্বামী হাস প্রভৃতির হাসরতি, বিস্ময়রতি প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং উহাদের মূল রতি—ভগবদ্রতির গৌণ ভেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব মধুসূদন সরস্বতী, রূপগোস্বামী প্রভৃতি আচার্যদের মতে ভক্তিরসই মূলরস : ভক্তিরসের বিভিন্ন ভেদের মধ্যে মধুরাভক্তিরস বা উজ্জ্বল রসই প্রমুখ—উহাই বাস্তবিক রস এবং 'ভক্তিরসরাজ'।

এইরূপ মূল রসত্বের জন্য পাঁচটি রসের পক্ষ হইতে দাবী জানান হইয়াছে। এই সকল রস করুণ, শান্ত, শৃঙ্গার, অদ্ভুত ও ভক্তি। এই ক্রমানুসারে বিবেচনা করিয়া আমরা সত্যাসত্যের নির্ণয়ের প্রয়াস করিব।

সর্বপ্রথম করুণ রস। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে রূঢ় কাব্যশাস্ত্রীয় অর্থে শোকস্থায়িক করুণায় সমস্ত রসের সমাহারের প্রশ্নই উঠে না—স্বয়ং উত্তররামচরিতেরই অঙ্গীরস করুণ শোকস্থায়িক নয়। ভবভূতির মত তখনই বিচারযোগ্য যখন আমরা করুণের স্থায়ীভাব রূপে করুণা বা মানব-সংবেদনাকে স্বীকার করি এবং হৃদয়-দ্রুতিকে উহার মূল ধর্মরূপে গ্রহণ করি। এখানেও শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে এই অভিযোগ করা যাইতে পারে যে উৎসাহ এবং ক্রোধে চিত্ত দ্রবিত না হইয়া স্ফীত হইয়া যায়, তবুও ব্যাপক দৃষ্টি অনুসারে উৎসাহ এবং ক্রোধের মূলে, অপ্রত্যক্ষরূপে, মানবসংবেদনার প্রেরণা বিদ্যমান থাকে এবং উহা স্বীকার্য। অপরের রাগদ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কাব্যরসের মূলাধার—ইহারই নাম সংবেদনা বা সহৃদয়তা। এখানে করুণের বিশেষ অর্থ বিস্তার হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই অর্থ গ্রহণ করিলে করুণের বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ইহা ব্যতীত ভবভূতির অভিমতকে প্রমাণিত করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্তের দার্শনিক ভূমিকা খুবই পুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সিদ্ধান্তটি তাঁহার রস-স্বরূপ-বিবেচনার স্বাভাবিক পরিণতি। অভিনবগুপ্তের মতানুসারে রসের অর্থ নির্বিঘ্ন আত্ম-প্রতীতি এবং ইহাই শমেরও পরিভাষা—অতএব শান্তরসে প্রত্যেক রসের পর্যবসান স্বতঃসিদ্ধ। পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং কাব্য-মর্মজ্ঞদের কাব্যানুভূতির ব্যাখ্যাও অনেকটা এইরূপ। আত্মবাদী ও অনাত্মবাদী উভয়েই প্রায় নিজেদের যুক্তিঅনুসারে ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে কাব্যাস্বাদ চিত্তবৃত্তির সুসংহত অবস্থাবিশেষ। কাব্যে বিভিন্ন ভাবের প্রবল উদ্বেলন বিদ্যমান থাকে কিন্তু এই উদ্বেলন প্রক্রিয়াতেই বিদ্যমান থাকে; পরিণতিতে দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হইয়া যায় এবং সকল চিত্তবৃত্তিগুলি সংহতি লাভ করে। —ইহা কেমন করিয়া হয়? শিল্পকলার প্রভাবে, কারণ অশৃঙ্খলিত তত্ত্বগুলিকে সুসম্বদ্ধ করাই শিল্পকলার কাজ; অতএব শিল্পকলার পূর্ণানুভূতি অনিবার্যতঃ চিত্তবৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণরূপের....দ্বারাই হয়। অভিনবগুপ্তের আনন্দবাদী দর্শন আত্মার এই নির্বিঘ্ন প্রতীতিকে সহজ আনন্দময় বলিয়া স্বীকার করে। ইহাই অভিনব

১. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (দুর্গমসঙ্গমনী), পৃঃ ৩০৯

গুপ্তের মত ও পাশ্চাত্য বিচার ধারার অন্তবর্তী প্রভেদ। প্রকৃতপক্ষে অভিনবগুপ্তের রস-পরিভাষাকে স্বীকার করিয়া লইলে পরে এই যুক্তির মধ্যে বিপ্রতিপত্তির কোন অবকাশই থাকে না যে—ভাবাঃ বিকারা রত্যাদ্যা শান্তস্তু প্রকৃতির্মতঃ, কারণ ইহার অনুসারে শান্ত রসের ভেদ না হইয়া রসেরই সমার্থ প্রজমনিত হয়। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা এই যে তাঁহার আত্মবাদী রস কল্পনাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভোজের 'শৃঙ্গার সিদ্ধান্ত'ও প্রায় এইরূপ যুক্তি-তর্কের উপরই আশ্রিত: আত্মার প্রথম বিকার অহঙ্কার, ইহাই প্রকৃতপক্ষে আত্মার প্রথম প্রতীতি কারণ ইহার পূর্বে আত্মা প্রতীতির বাহিরে শুদ্ধ চৈতন্যরূপে বিদ্যমান থাকে। এই অহঙ্কারই রস-আত্মার স্বীয়-প্রতীতি হওয়ার জন্য সহজ আনন্দময় বা রসময় এবং আত্মরমণেরই রূপ হওয়ার জন্য ইহার অপর নাম শৃঙ্গারও। এইরূপ ভোজের সিদ্ধান্তের সার এই: আত্মার প্রথম প্রতীতির নাম অহঙ্কার, আত্মার এই প্রথম প্রতীতি বা নিজানুভূতি আনন্দময়, অতএব ইহাই রস এবং ইহারই পরিভাষিক নাম শৃঙ্গার। যেহেতু রত্যাদি সমস্ত ভাব অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয় এবং অহঙ্কারের অপর নাম শৃঙ্গার, অতএব শৃঙ্গার সমস্ত ভাবের স্রোত ও মূলরস যাহাকে রত্যাদি ভাবগুলি সমৃদ্ধ করে। এইরূপ ভোজের মতানুসারেও রসের মূল অর্থ আত্ম-প্রতীতিই এবং যেহেতু শৃঙ্গার অহঙ্কার বা আত্ম-প্রতীতিরই অপর নাম, অতএব শৃঙ্গারই রস। এবং, এই দৃষ্টিতে অভিনবগুপ্ত ও ভোজের সিদ্ধান্তে কোন মৌলিক ভেদ নাই কারণ আত্ম-প্রতীতিকেই একজনে শান্ত বলিয়াছেন ও অপরে শৃঙ্গার। অভিনবগুপ্তের মতে রস-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এইরূপ: কাব্যে কবি নিজের রতি প্রভৃতি ভাবগুলিকে কল্পনার বৈচিত্র্যের দ্বারা সাধারণীকৃত-রূপে প্রকাশিত করেন। প্রমাতা যখন শব্দার্থের মাধ্যমে ভাবের এই সাধারণীকৃতরূপের অনুভব করেন তখন তাঁহারও রত্যাদিভাব প্রবুদ্ধ হইয়া দেশ-কাল, স্ব-পর প্রভৃতি চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার ভগ্নাবরণা চেতনার বিষয় হইয়া যায়—অর্থাৎ প্রমাতার চেতনা আবরণমুক্ত হইয়া ইহা ভোগ করে অথবা বলা উচিত যে বিশুদ্ধ ভাব-ভূমিকায় প্রমাতার আত্মা স্বীয় সহজ আনন্দের ভোগ করে। ভোজ এই রস-প্রক্রিয়াকে একটু ভিন্ন রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। আত্মার বিশিষ্ট ধর্ম অহঙ্কার—এই অহঙ্কারই রতি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবগুলিকে জন্ম দেয়। কাব্যে এই ভাবের বর্ণনা পড়িয়া প্রমাতা নিজের অহঙ্কারের আস্বাদন করেন। ভাবের মাধ্যমে অহঙ্কারের এই আস্বাদনই রস এবং আত্ম-রমণ রূপ হওয়ার জন্য ইহারই নাম শৃঙ্গার। প্রমাতা কাব্যগত রত্যাদি ভাবের আস্বাদন করেন না, বরং উহার মাধ্যমে অহঙ্কারেরই আস্বাদন করেন। এইরূপ উভয়ের মতে ভাবের মাধ্যমে আত্মার আস্বাদের নামই রস। ভেদ কেবল বিবরণগত কারণ অভিনবগুপ্ত অন্য রসগুলিকে মূলরসের রূপান্তর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার বিপরীতে ভোজ উহাদের রস না বলিয়া মূলরস হইতে উৎপন্ন ভাবমাত্র বলিয়াছেন। অপরদিকে অগ্নিপুরাণের রতি-সিদ্ধান্ত এবং ভোজের শৃঙ্গার সিদ্ধান্তের মধ্যে তো কেবল শব্দেরই ভেদ লক্ষিত হয়।

অদ্ভুতের পক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। (১) ধর্মদত্তের উল্লিখিত উদ্ধরণে চমৎকারিতার প্রয়োগ নির্বিঘ্ন সংবিৎ বা আনন্দরূপে না হইয়া বিস্ময়ের অর্থেই হইয়াছে এবং ইহাই ইহার মৌলিক দোষ কারণ রসের সার বিস্ময় নয় আহ্লাদ। এই আহ্লাদ সামান্য লৌকিক আহ্লাদ হইতে কিয়ৎ অংশে ভিন্ন এবং এই দৃষ্টিতে অংশতঃ অসাধারণও; তবুও ইহাকে অদ্ভুত রসের স্থায়ী ভাব 'বিস্ময়'এর সমার্থ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। কাব্য-সৌন্দর্যের আস্বাদে বিস্ময় স্থায়ী না হইয়া সঞ্চারীই। অতএব চমৎকারের গৌণ অর্থের আশ্রয়ে অদ্ভুতকে মূলরস সিদ্ধ করা তর্কসঙ্গত নয়। (২) পরবর্তীকালে ভারতীয় সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য সাহিত্যেও আশ্চর্যজনক তত্ত্বের জন্য 'চমৎকার', 'লোকোত্তর' প্রভৃতি শব্দের স্থূল অর্থে প্রয়োগ প্রসার লাভ করে। এই শব্দগুলির অর্থ বিকৃতির সহিত কাব্য-মূল্যও বিকৃত হইতে থাকে; চমৎকারিতা কুতূহলের সমার্থক হইয়া রসবাদী কাব্য-মর্মজ্ঞদের জন্য ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠে।

বৈষ্ণব আচার্যগণ আধ্যাত্মিক এবং সাম্প্রদায়িক পর্য্যায়ে ভক্তিরসের স্থাপনা করিয়াছেন অতএব তাঁহাদের যুক্তি-তর্কের কাব্যশাস্ত্রীয় অথবা মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ সম্ভবপর নয়। বৈষ্ণব ভক্তদের জন্য, যাঁহারা কৃষ্ণের মধুর রূপের উপাসক, মধুররস নিশ্চিতরূপেই রসরাজ এবং উহাই মূলরস। হাস্য, বীর প্রভৃতি রস যাহা জীবনের বিভিন্ন ভাব-বৃত্তির উপর আশ্রিত, ভক্তিরসেরই অঙ্গ বা সঞ্চারী ভাব কারণ জীবনের এই বিভিন্ন বৃত্তিগুলি পরিশেষে মধুর ভাবেরই পুষ্টি করে—উহাতেই উহাদের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সিদ্ধি ভক্তির ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিক স্তরেই সম্ভবপর। কাব্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক যুক্তিতর্কের আশ্রয় লইলে সুফল হইবে না।

প্রকৃতপক্ষে রসের দার্শনিক বিবেচনার সহিত একটি রসের কল্পনার সূত্রপাত হয়। ভরতের দৃষ্টি ব্যবহারিক এবং বস্তুনিষ্ঠ ছিল: নাট্য তাঁহার জন্য লোক-জীবনের বৈবিধ্যের অনুকরণ মাত্র, অতএব রসের বৈবিধ্যও তাঁহার পক্ষে যথাবৎ স্বীকার্য ছিল। অভিনবগুপ্ত প্রসিদ্ধ ভরত-সূত্রে—'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে' প্রযুক্ত এক বচনান্ত রস শব্দের অনুসরণে রসের অদ্বৈততাকে প্রমাণিত করিয়াছেন কিন্তু উহা তাঁর অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের প্রক্ষেপণ মাত্র কারণ ভরতের একবচন-প্রয়োগ সামান্য ব্যাকরণিক প্রয়োগ, উহা কোন দার্শনিক প্রতিপত্তি নয়। এই কথা বলার মুখ উদ্দেশ্য এই যে ভরত নানা রসত্বকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক রসত্বকে নয় কারণ ইহাই তাঁহার ব্যবহারিক দৃষ্টির অনুকূলে ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন অভিনবগুপ্তের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলস্বরূপ শৈবাদ্বৈতের ভিত্তিতে রস-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা হইল তখন রসের অদ্বৈততা অনিবার্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিল। রসের অর্থ আত্মাস্বাদ সিদ্ধ হইবার পর ইহাকে এক, অখণ্ড ও বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য বলিয়া স্বীকার করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ও ছিল না। অভিনবগুপ্ত সপ্রমাণ, সতর্ক আত্মবিশ্বাসের সহিত এই ঘোষণা করিলেন: অস্মন্মতে তু সংবেদনমেবানন্দঘনমাস্বাদ্যতে × × × কেবলং তস্যৈব চিত্রতাকরণে রতিশোকাদিবাসনাব্যাপারস্তদুদ্বোধনে চাভিনয়াদিব্যাপারঃ। —অর্থাৎ আমাদের

মতে আনন্দময় জ্ঞানস্বরূপ (আত্মা)রই আস্বাদন (রসরূপ) হয়। × × × কেবল সেই (আনন্দময় বিজ্ঞানস্বরূপ) তার বৈচিত্র্যের সম্পাদনের জন্য রতি, শোক প্রভৃতি সংস্কারের (স্থায়িভাবের) ব্যাপার হয়। এবং উহাদের উদ্‌বোধনের জন্য অভিনয়াদির ব্যাপার হয়। (হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৫০৭)। এই আত্মাস্বাদরূপ রসকে, যাহা পরমার্থতঃ একই, কোন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে? বীতরাগী অভিনবগুপ্ত নিজের প্রবৃত্তির অনুকূল আত্মজ্ঞানের গুরুত্বের আশ্রয়ে উহাকে শান্ত বলিয়াছেন এবং অনুরাগী ভোজরাজ আত্মরতি বা আত্ম-রমণের প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়া ইহাকেই শৃঙ্গার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই ভেদ কেবল নামের, স্বরূপের নয়। শৈবাগমের অন্তর্গত আনন্দ-সম্প্রদায়ের অনুযায়ী রসবাদীরা শান্ত ও শৃঙ্গারের প্রভেদ মিটাইবার জন্য 'আনন্দ রস' নামটিকে অধিক ব্যাপক এবং উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জয়শঙ্কর প্রসাদের মতানুসারে অভিনবগুপ্ত নাট্য রসের ব্যাখ্যায় এই অভেদময় আনন্দ রসেরই প্রচার করিয়াছেন।[১] বৈষ্ণব আচার্যরাও আনন্দবাদী অদ্বৈত সিদ্ধান্তের নানা তত্ত্বকে যথাবৎ স্বীকার করিয়া দ্বৈতের ভিত্তিতে ভক্তিরসকে মূল আনন্দরস বা শৃঙ্গার রসের সমকক্ষরূপে প্রায় এই সকল যুক্তি-তর্কের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত একরসের সিদ্ধির জন্য যে অন্য দুইটি প্রয়াস হইয়াছিল সেগুলির আধার দার্শনিক অপেক্ষা সাহিত্য ভূমির উপরই অধিক নির্ভরশীল ছিল। ভবভূতির দৃষ্টিকোণ রাগাত্মক। তাঁহার মতানুসারে রস একটি রাগাত্মক অনুভব এবং রাগের মূলরূপ সংবেদনা বা সহৃদয়তা অতএব, যাহা সর্বাধিক সংবেদনাত্মক অর্থাৎ করুণ তাহাই মূলরস। নারায়ণ পণ্ডিত এবং তাহার অনুসরণে ধর্মদত্ত আলঙ্কারিক দৃষ্টির আশ্রয়ে অদ্ভুতকে আধারভূত রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চমৎকারিতার আনন্দ-বাচক অর্থ গ্রহণ না করিয়া বৈচিত্র্যনিষ্ঠ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই বৈচিত্র্য-নিষ্ঠ চমৎকারিতা কল্পনারই চমৎকার যাহা অলঙ্কারবাদের প্রাণতত্ত্ব। যেহেতু প্রত্যেক রসের পরিপাক কল্পনার দ্বারা হয় অতএব কল্পনাজন্য বৈদগ্ধ্য বা চমৎকারিতাই রসের প্রাণ এবং কল্পনাজন্য চমৎকারিতা যেহেতু প্রমাতার মনকে বিস্ময়াভূত করে সেইজন্য এই মতানুসারে রসাস্বাদের মূলাধার বিস্ময়ই যাহা অদ্‌ভুত রসের স্থায়ীভাব—এইজন্য অদ্‌ভূতই মূলরস। এইরূপে ভবভূতি ও নারায়ণ পণ্ডিতের অভিমত সেই সব সিদ্ধান্তেরই সহজ পরিণাম যাহা ক্রমশঃ রাগ ও কল্পনাকে কাব্যের প্রাণতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ভারতীয় চিন্তাধারার মূল প্রবৃত্তিরূপে স্বীকার্য। কাব্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও এই প্রবৃত্তি নিরন্তর সক্রিয়রূপে কাজ করিয়াছে এবং পরিণামস্বরূপ কাব্যের আত্মার অনুসন্ধানের জন্য বিবিধ প্রযত্ন ও বিবিধ কাব্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রস-সম্প্রদায়ের অন্তর্গতও এই প্রবৃত্তির সক্রিয়তা লক্ষিত হয় এবং রসের আত্মার অনুসন্ধানের

১. কাব্যকলা তথা অন্য নিবন্ধ (চতুর্থ সংস্করণ) পৃ০ ৭৬

জন্যও নানা প্রযত্নের প্রসার ঘটে। দার্শনিকেরা আনন্দকে রসের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তদনুসারে আত্মজ্ঞানরূপ শম বা আত্মভোগরূপ শৃঙ্গারকে মূলরস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবুকেরা রাগ বা সংবেদনাকে রসের আত্মা বলিয়াছেন যাহার ফলে করুণ মূলরসরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এবং বিদগ্ধজন বা আলঙ্কারিকেরা কল্পনা তত্ত্বকে রসের সাররূপে স্বীকার করিয়া অদ্‌ভুতকেই মূলরস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত মতগুলি এই দৃষ্টিভেদেরই পরিণাম। রসে যেহেতু এই তিনটি তত্ত্বই সমন্বিতরূপে বিদ্যমান থাকে, এই জন্য সত্যের অংশ বোধ হয় এই তিনটি অভিমতেই বর্তমান। কিন্তু, যেহেতু রসে এই তিনটি তত্ত্ব অর্থাৎ আনন্দ, রাগ ও কল্পনার অনুপাত সমান না হইয়া এই ক্রমে তারতম্যিকরূপ বিদ্যমান থাকে (আনন্দের অনুপাত সর্বাধিক কারণ রস পরিশেষে আনন্দরূপই, রাগের অনুপাত আনন্দের অপেক্ষা কম কারণ শেষে আনন্দের মধ্যেই রাগ পরিণতি লাভ করে এবং কল্পনার অনুপাত রাগের অপেক্ষাও কম কারণ কল্পনা রাগকে সংযোজিত করিয়া আনন্দের সাধন করে), এইজন্য উল্লিখিত তিনটি মতধারার মধ্যেও সত্যের অংশকে এই ক্রমেই তারতম্যিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অভিনবগুপ্ত ও ভোজের সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত অধিক স্বীকার্য, ভবভূতির সিদ্ধান্তও বহুলাংশে গ্রাহ্য কিন্তু নারায়ণ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত আংশিকরূপেই স্বীকৃত হইতে পারে।

বিবেচনা

রসের সংখ্যা নির্ধারিত করিবার জন্য ইহা আবশ্যক যে রসের-স্বরূপ ও তাহার নিষ্পাদক তত্ত্বের বিষয়ে যেন আমাদের ধারণা স্পষ্ট থাকে কারণ এই ধারণাগুলিই অবশেষে রস-সংখ্যা নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসাবে কার্যকরী হয়। রসের স্বরূপের বিষয়ে দুইটি দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায়ঃ প্রথম, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ। ইহাতে রস ভাবমূলক কলাত্মক স্থিতিবিশেষ এবং দ্বিতীয়, আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ যাহাতে রস ভাবের ভূমিতে আত্মার আস্বাদ রূপ। প্রথম পরিভাষানুসারে নাট্যে বা রঙ্গমঞ্চে রসের নিষ্পত্তি হয়। নাট্য লোক-জীবনের অনুকরণেরই অপর নাম এবং লোক জীবন এমন সব ব্যাপারের সমন্বিত রূপ যাহা ভাববৃত্তির দ্বারা সঞ্চালিত হয়। অতএব নাট্যে নানা রকম ভাবমূলক স্থিতির কলাত্মক প্রদর্শন হয়। ইহাকেই নাট্য রস বলে। জীবনের এই ভাবমূলক স্থিতি যদিও অসংখ্য কিন্তু প্রমুখ বা স্থায়ী ভাবের ভিত্তিতে, যাহাদের সংখ্যা মূলতঃ আটটি, এই সকল স্থিতিগুলিরও সামান্যতঃ আটটি বর্গ করা যাইতে পারে—অবশিষ্ট স্থিতিগুলি ইহাদেরই অন্তর্ভূ'ত। অন্য স্থিতিরও কল্পনা সহজই করা যায়, কিন্তু যেহেতু স্থায়ীভাবের সংখ্যা আট অতএব এই নূতন স্থিতিগুলি কোন-না-কোন রূপে এই ভাবগুলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার জন্য উল্লিখিত আটটি বর্গের মধ্যেই অন্তর্ভূ'ত হইয়া যায়, অথবা এই সকল স্থিতি এইরূপও হইতে পারে যাহা সকলকে পূর্ণরূপে প্রভাবিত করিতে অসমর্থ।

অপর পরিভাষানুসারে রস ভাবের ভূমিতে আত্মার আস্বাদ রূপ; আত্মার আস্বাদ হওয়ার জন্য উহার মূল রূপ অখণ্ড ও অদ্বিতীয় কিন্তু ভাবের বহুত্বের জন্য রসের বাহ্য রূপ বিভিন্ন হইয়া যায়। এখানেও রসের সংখ্যা স্থায়ী ভাবের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। অতএব ইহা প্রমাণিত হয় যে আমরা বস্তুনিষ্ঠ পরিভাষা বা আত্মনিষ্ঠ পরিভাষার মধ্যে যে কোনটাকেই গ্রহণ করি না কেন, রস-সংখ্যার নির্ধারণ স্থায়ী ভাবের সংখ্যার ভিত্তিতেই সম্ভবপর।

স্থায়ী ভাব নির্ণয় করিবার চারটি মানদণ্ড আছে: স্থায়িত্ব, প্রবলতা, পুরুষার্থের প্রতি উপযোগিতা এবং সাধারণীকৃত হওয়ার ক্ষমতা। ইহা ব্যতীত আধুনিক রসবাদীরা —উদাহরণস্বরূপ, মারাঠী বিদ্বান্ ডঃ বাটবে আরও দুইটি গুণের কল্পনা করিয়াছেন: মূলবৃত্তির সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অর্থাৎ মৌলিকতা এবং ঔদাত্ত্য বা পরিষ্কৃতি। পরিণামতঃ রসের মূলধর্মও এইগুলিই প্রমাণিত হয়— অর্থাৎ রসের নির্ণায়ক তত্ত্ব ছয়টি: (১) (অপেক্ষাকৃত) স্থায়ী প্রভাব, (২) সার্বভৌম স্বীকৃতি, (৩) রঞ্জনাধিক্য বা উৎকট আস্বাদ্যমানতা, (৪) মানুষের কোন-না-কোন মূল বৃত্তির সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, (৫) জীবনের পরমপুরুষার্থের প্রতি উপযোগিতা, এবং (৬) পরিষ্কৃত অনুভূতি। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিলে শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুতের রসত্ব বিনা কোন বিশেষ পরিশ্রমেই সিদ্ধ হইয়া যায় কারণ ইহাদের সকলের প্রভাব স্থায়ী ও ব্যাপক, জীবনের মূলবৃত্তির সহিত ইহাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং ইহারা সকলগুলিই প্রকৃষ্ট ভাবে আস্বাদ্যমানও। বীভৎস এবং রৌদ্রের সম্বন্ধে মারাঠী বিদ্বানগণ আস্বাদ্যমানতার ভিত্তিতে আপত্তি করিয়াছেন কিন্তু সেই যুক্তি অনুসারে এই দুইটিও আস্বাদ্য যে যুক্তি অনুসারে করুণ ও ভয়ানককে আস্বাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। রাগের অনুরূপ দ্বেষও জীবনের একটি মৌলিক প্রবৃত্তি—মানুষের জীবন-ব্যাপারে ঘৃণা, ক্ষোভ, উদ্বেগ প্রভৃতির অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান আছে। সংসারের কত কিছুই না কুরূপ, ক্ষোভণ ও উদ্বেগকারী এবং জীবনের সজীব চিত্র রূপ হওয়ার জন্য কাব্য বা নাট্য হইতে এইগুলি কেমন করিয়া বিমুক্ত থাকিতে পারে? অতএব রৌদ্রকে বীরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং বীভৎসের আস্বাদনীয়তায় সন্দেহ প্রকট করিয়া তাহাদের রসত্বের নিষেধ সম্ভবপর নয়। ভরত-প্রতিপাদিত আটটি রস ব্যতীত নবম রস শান্তিও প্রায় সর্বমান্যই হইয়া গিয়াছে এবং উল্লিখিত মানদণ্ড অনুসরণে উহার রসত্বও নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করা যায়। স্থায়ী প্রভাব, পরিষ্কৃত এবং উদাত্ত অনুভূতি, আস্বাদনীয়তা পুরুষার্থোপযোগিতা প্রভৃতি গুণ উহাতে অন্য সমস্ত রসের অপেক্ষা অধিক বিদ্যমান আছে। শমকে যদি মৌলিক মনোবিকার স্বীকার নাও করা হয় তবুও মানব-চেতনার প্রকৃতাবস্থা হওয়ার জন্য উহা সকল মূলবৃত্তিরই মূল। এইরূপ এই অভিযোগও অধিক সঙ্গত নহে যে উহা সমস্ত ভাবের সমাহিতি মাত্র, স্বতন্ত্র ভাব নয়; কারণ চিত্তের এই সমাহিত অবস্থাও তো স্বতন্ত্ররূপে অনুভবেরই বিষয়। ইহার সঙ্গে এই আপত্তিও খুব বেশী মান্য নহে যে শমের অনুভব কেবল বীতরাগ পুরুষই করিতে পারেন—সাধারণ, সবাসন মানুষ

নয়, কারণ চিত্তের প্রকৃতাবস্থার অনুভব হইতে কে বঞ্চিত থাকিতে পারে, বিকৃতির জন্য এই অনুভব বিরল হইতে পারে, কিন্তু ইহার অভাব সম্ভবপর নয়।

ইহা ব্যতীত বিশ-বাইশটি নাম আরও থাকিয়া যায়। যদি নিরসন-পদ্ধতির আশ্রয় লওয়া হয় তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই খণ্ডন সহজেই সম্ভবপর। উদাহরণস্বরূপ রাজা ভোজ সাধ্বস, পারবশ্য, বিলাসের নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, এইগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। লৌল্য, কার্পণ্য, সুখ, দুঃখ, মৃগয়া, দ্যূত এবং ব্যসনের উল্লেখ কেবল খণ্ডনের জন্য করা হইয়াছে। ব্রীডনকের স্থাপনা কোন প্রতিষ্ঠিত আচার্য করেন নাই, কেবল একটি জৈনসূত্রে উহার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সাধারণ-ভাবেও উহা ব্রীড় 'ভাবে'র অন্তর্ভুক্ত। উদাত্ত এবং উদ্ধত রসের উদ্ভাবনা নাটকের চারিটি নায়ক-ভেদের সহিত সঙ্গতি স্থাপনার জন্য করা হইয়াছে যেগুলিকে নবীন রস-কল্পনার ক্ষেত্রে আধাররূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না কারণ ঔদাত্য এবং ঔদ্ধত্য চারিত্রিক বৃত্তি মাত্র, চিত্তবৃত্তি নয়। মায়ার কল্পনা ভানুভট্ট অভিনবগুপ্তের শান্তরসের বিপর্যায়রূপে, উক্ত একই তর্কপদ্ধতির অনুসরণে করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা স্বতন্ত্র মনোবেগ বা চিত্তবৃত্তি না হইয়া সমস্ত বাসনা এবং ভাববৃত্তির বা মনোবেগের মূল প্রেরণা, যাহার কোন পৃথক্ আস্বাদ্যরূপ নাই। ক্রান্তি একটি চিত্তবৃত্তি, কারণ, মানুষের চিত্তে বিদ্রোহের প্রবৃত্তি জন্মজাত ভাবে থাকিতে পারে ও থাকেও কিন্তু উহার মনোবেগাত্মক রূপ উৎসাহ, ক্রোধ (এবং কুণ্ঠিত অবস্থায়) শোক প্রভৃতি হইতে পৃথক হয় না। এইরূপে উদ্বেগ এবং প্রক্ষোভের বর্তমান সাহিত্যে প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও উহারা স্বতন্ত্র রসত্বের অধিকারী নয় কারণ এই দুইটিতেই করুণা, ক্রোধ, জুগুপ্সার দুইটি ভেদের মধ্যে হইতে কোন একটি—ক্ষোভ বা উদ্বেগ বা উভয়ে একত্র বিদ্যমান থাকে অতএব কোথাও করুণার প্রাধান্য থাকার জন্য ইহারা করুণার আবার কোথাও অমর্ষের প্রাধান্যের ফলে ক্রোধে অন্তর্লীন হইয়া যায় এবং কোথাও ক্ষোভ প্রভৃতির প্রাধান্য থাকার জন্য ইহাদের বিকাশ কেবল ভাবদশা পর্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে।

এখন এরূপ কয়েকটি রস অবশিষ্ট আছে যেগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে একাধিক আচার্যগণের দ্বারা। প্রাচীন আচার্যদের দ্বারা প্রেয়ান্ (সখ্য), বাৎসল্য, ভক্তি এবং নবীন আলোচকেদের দ্বারা প্রকৃতি ও দেশভক্তি রস। ইহাদের সম্বন্ধে একটি বিকল্প এই যে শৃঙ্গারের স্থানে প্রেম রসের ব্যাপক কল্পনা করিয়া এই সমস্তগুলিকে উহার ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। আমাদের এই সিদ্ধান্তের আধার এই যে উপর্যুক্ত রসগুলির কোন স্বতন্ত্র স্থায়ীভাব নাই বরং সকলেরই স্থায়ীভাব প্রেম যাহা আলম্বন-ভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করে: নর-নারীর প্রেম শৃঙ্গার, মিত্রের প্রতি প্রেম প্রেয়ান্ বা সখ্য, সন্তান বা সন্তানতুল্য ব্যক্তির প্রতি প্রেম বাৎসল্য, ইষ্টের প্রতি প্রেম ভক্তি, প্রকৃতির প্রতি প্রেম প্রকৃতি রস এবং দেশের প্রতি প্রেম দেশভক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। যেহেতু কোন স্বতন্ত্র রসের সিদ্ধি আলম্বন ভেদের স্থানে স্থায়ী ভাবের ভেদের অনুসরণেই হয় সেই জন্য ইহারা সকলেই স্বতন্ত্র রস না হইয়া প্রেম-রসেরই বিভিন্ন ভেদমাত্র। হিন্দীর আচার্য

শুক্ল এবং মারাঠীর ডঃ বাটবের ইহাই মত। ফ্রয়েড প্রভৃতি অবচেতন মনোতাত্ত্বিক বিদ্বানগণের মতধারার আশ্রয়ে ইহার পুষ্টি প্রায় সম্ভবপর। এইরূপে বর্গীকরণের সমস্যার সমাধান হইয়া যায় কিন্তু সহৃদয় সন্তুষ্ট হইতে পারেন না কারণ কোন বিদগ্ধ ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না যে কাব্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্গার ও বাৎসল্য বা দেশভক্তি ও প্রকৃতি-রসের অনুভূতি সর্বত্র সমান হয়। অতএব এই সকল রসের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সম্বন্ধে কিছু অধিক বিচার-বিমর্শ আবশ্যক। প্রেয়ান্ বা সখ্যের স্থায়ী ভাব সখা-ভাব বা মিত্র-প্রেম। কাব্যে বর্ণিত মৈত্রী-প্রসঙ্গগুলি যথা মহাভারতের কর্ণের মিত্র-প্রেম, মার্চেন্ট অব ভেনিসে এন্টোনিও-বেসানিওর সখ্য-ভাব প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিলে পরে, উহাতে প্রেম, উৎসাহ, শোক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণ উপলব্ধ হয়। এই প্রেম কামমূলক নয় বলিয়া শাস্ত্রসম্মত শৃঙ্গারের অন্তর্ভুক্ত নয়—শৃঙ্গং হি মন্মথোদভেদঃ; এবং যেহেতু উৎসাহ শোক প্রভৃতি ভাবও এখানে স্বতন্ত্র নয় প্রেম-প্রসূতই অতএব ইহাদের বীর বা করুণাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কেন স্বীকার করা হইবে না? কিন্তু আবার প্রশ্ন ওঠে যে এই সখ্য ভাব কি এতই উৎকট আস্বাদনীয় যে উহাকে রস-সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে প্রকৃতপক্ষে মৈত্রী মনোবেগ নয়, ইহা মনোবৃত্তিই (Sentiment) এবং প্রকৃত অবস্থায় ইহার আস্বাদ এত উৎকট হয় না যে ইহা ভাবরূপকে অতিক্রমণ করিয়া রস-রূপ গ্রহণ করিতে পারে: যদি ইহাতে উৎকটতা লক্ষিত হয়ও তবে তাহা উৎসাহ, শোক প্রভৃতি মৈত্রী-জন্য কোন প্রবল ভাবের জন্যই হয়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণের মৈত্রীপূর্ণ উদ্‌গারের আস্বাদ্য ভাব প্রধানতঃ উৎসাহ এবং 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' এর চরম ঘটনাকালে রসের পরিপাক সম্ভাবিত অনিষ্টের প্রতি মৈত্রী-জন্য শোকের আশ্রয়ে হয়। অতএব সখ্য রসের স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করা কঠিন। বাৎসল্যের পক্ষ নিশ্চিতরূপে ইহার চাইতে অধিক প্রবল: বৎসল ভাব মাতৃবৃত্তির মনোময় অনুভব এবং মাতৃবৃত্তি নিশ্চিতই জীবনের একটি অত্যন্ত মৌলিক বৃত্তি। পুত্রৈষণা জীবনের সর্বাধিক প্রবল এষণা যাহা জীবনের দুইটি পরম পুরুষার্থ ধর্ম ও কামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। ইহার প্রভাব অত্যন্ত স্থায়ী ও সার্বভৌম এবং ইহার অনুভব উৎকট। অতএব বাৎসল্যের রসত্বের নিষেধ সম্ভবপর নয় এবং উহার শৃঙ্গারাদির মধ্যে অন্তর্ভাবও ঠিক নয়। ইহাকে কেবল ভাব বলিয়া স্বীকার করাও ঠিক হইবে না, কিন্তু ভরত প্রভৃতিরা ইহার গণনা কেন করেন নাই? ইহার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম অনুমান নির্ভর প্রমাণ এই যে ভরতের পক্ষে রসের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল নাট্যের সহিত। এবং নাট্যে বাৎসল্যের প্রমুখ আলম্বন বালক এবং উহার উদ্দীপক ক্রীড়ার আয়োজন করা সম্ভবতঃ কঠিন। ইহা আজও কঠিন অতএব নাট্যরসের তালিকা হইতে ব্যবহারিক দৃষ্ট অনুসরণে বাৎসল্যকে ঠিক সেইভাবেই বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল যেইভাবে যুদ্ধ, অভিযান প্রসঙ্গগুলিকে নাট্য-দৃশ্য হইতে। এখন ভক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। প্রাচীন আচার্যরা ভক্তি—অর্থাৎ ভগবদ্রতিকে কেবল 'ভাব' বলিয়াছেন রস নয়, কারণ উহার পূর্ণ পরিপাক হয় না। অপর দিকে ভক্ত

আচার্যরা ইহার উত্তরে ভক্তিকে আদ্যরস এবং শৃঙ্গারাদিকে 'ভাব' মাত্র বলিয়াছেন, ভক্তি রসের সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন আস্বাদ-কর্তা বিষয়ে, তাঁহারা—সহৃদয় বা ভক্ত। অর্থাৎ ইহার রসত্বের বিচার অন্য কাব্য-রসের অনুরূপ কি সহৃদয়ের দৃষ্টিতে করা হইবে বা ভক্তের দৃষ্টিতে? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে সহৃদয়ের দৃষ্টিতে করিতে হইবে কারণ রস শব্দ আমাদের জন্য বা কাব্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে, কাব্য রসেরই বাচক এবং এইজন্য ভক্তি-রসের বিশ্লেষণ আমাদের কাব্যরসের মানদণ্ডের আশ্রয়ে করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে ভগবদ্রতি কি রতি, শোক প্রভৃতিরই অনুরূপ স্থায়ীভাবরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক সহৃদয়ের চিত্তে কি উহা বাসনারূপে বিদ্যমান থাকে? আস্তিকর (ভক্ত) নিকট ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে আত্মার পরমাত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান যাহা সাংসারিক রাগদ্বেষের জন্য অস্পষ্ট হইয়া পড়িলেও মানব-চেতনার মধ্যে স্থায়ীরূপে বিদ্যমান থাকে কিন্তু আজ এই উত্তরটিকে যথাবৎ গ্রহণ করা সহজ নয়। কোন পরোক্ষ সত্তার প্রতি জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, প্রচ্ছন্ন ভয় ও অধীনতার ভাব থাকার জন্য এবং উহার মহত্ত্বকে স্বীকার করিবার ফলে মানব-হৃদয়ে আদর-ভাব উৎপন্ন হইয়া সংস্কারের রূপ ধারণ করে এবং সামাজিক ও আনুবংশিক পরম্পরার জন্য আবার এই সংস্কার মানুষের চেতনায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, দাম্পত্য প্রভৃতি ভাবের রূপও ধারণ করে। কিন্তু এই সকল ভাব মৌলিক ও স্থায়ী নয়, সংস্পর্শ (পরম্পরা) ও অভ্যাসের (সাধনা) দ্বারা অর্জিত—পরোক্ষ আলম্বনের উপরে প্রকৃত ভাবের আরোপণ। অতএব বৈষ্ণব এবং অন্য ভক্তদের ভগবদ্রতিকে মৌলিক ভাব বলিয়া স্বীকার করা কঠিন; ভক্তদের জন্য ইহা প্রকৃত ভাব হইতে পারে কিন্তু সামান্য সহৃদয়ের জন্য নহে যিনি রসের বাস্তবিক অধিকারী। সাম্প্রদায়িক মধুর ভাব প্রভৃতির সাধারণীকরণে যে বাধা উপস্থিত হয় তাহার মূল কারণ ইহাই। এইজন্য এই সকল মধুর প্রসঙ্গের শ্রবণ-মননের দ্বারা ভক্ত চিন্ময় ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া যান কিন্তু সাধারণ সহৃদয় উহাতে কেবল শৃঙ্গার রসের অনুভব করেন। রসের অন্য তত্ত্ব—পুরুষার্থের প্রতি উপযোগিতা, পরিষ্কৃত অনুভূতি প্রভৃতির বিষয়ে কোন সন্দেহই উঠিতে পারে না কারণ জীবনের চরম পুরুষার্থ মোক্ষের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু উৎকট আস্বাদ্যমানতার প্রশ্ন তবুও বিচারযোগ্য: প্রমাতা কি কাব্যগত ভক্তির আস্বাদন সেইরূপ উৎকটভাবে করেন যেরূপ রতি, উৎসাহ প্রভৃতি ভাবের করেন? সুরসাগরের বিবিধ প্রসঙ্গ বা মীরার মাধুর্য ভাবের দ্বারা সিঞ্চিত পদের উৎকট আস্বাদনীয়তা ইহার প্রমাণ। কেবল ভক্তই নয়, প্রত্যেক সহৃদয় ইহার পূর্ণ আস্বাদন করে। কিন্তু ভক্ত এবং সহৃদয়ের আস্বাদন কি একরূপ হয়? আমার ধারণা হয় না কারণ ভক্তকে শুদ্ধ সহৃদয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না: উহার সহৃদয়তা বিশিষ্ট সংস্কারের দ্বারা 'বাসিত' হওয়ার জন্য কাব্যশাস্ত্রীয় অর্থে শুদ্ধ থাকিতে পারে না। অতএব ভক্তের অনুভব সাধারণীকৃত অনুভব হয় না; উহার অনুভবের সাধারণীকরণ ভক্তবর্গে তো সম্ভবপর কিন্তু সামান্য সহৃদয়-সমাজে উহা সম্ভবপর নয়। আবার সূরদাসের সরস প্রসঙ্গের আস্বাদ্যতার রহস্য কি? বিনয়ের

পদগুলিতে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সহৃদয়ের চিত্তেও অজ্ঞাত বিরাট শক্তির প্রতি সমর্পণের ভাব, যাহা ভয়-বিস্ময়-প্রেম-বিশ্বাসমূলক হয়, বাসনারূপে বিদ্যমান থাকে এবং বিনয়ের পদের বিভাবাদির সজীব চিত্রণের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সত্বকে প্রাপ্ত হয়। এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই 'সমর্পণ' ভাব কি স্থায়ী ভাব? আমার উত্তরে ইহা স্থায়ী ভাবই, যদিও সন্দেহ নাই যে ইহা একটি মিশ্র ভাব—ক্রোধ, ভয় প্রভৃতির অনুরূপ শুদ্ধ নয়, কিন্তু ইহাতে কোন বিশেষ তফাৎ হয় না কারণ আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করিয়াছি যে কাব্যগত সমস্ত স্থায়ীভাব শুদ্ধ নয়—শম, বিস্ময় ও স্বয়ং রসরাজ শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব রতিও মিশ্রভাবরূপ। অতএব রমণীয়তার ব্যাপারে কোন ভাবের মিশ্র রূপ বাধক নহে কিন্তু ভাবের মৌলিক হওয়া আবশ্যক, উহার মানব-বাসনার-সহিত-সম্বন্ধ থাকা উচিত যাহার দ্বারা সাধারণী-করণ সম্ভবপর অর্থাৎ প্রত্যেক সহৃদয় চিত্তের নির্বিঘ্ন স্থিতিতে যেন উহার আস্বাদন করিতে সমর্থ হন। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে পর ভক্তির এই অনন্যরূপের রসত্ব সিদ্ধ হয়। বর্তমানযুগে প্রমাতার বৌদ্ধিক সংস্কার রস-প্রতীতিতে বাধা উপস্থিত করে কিন্তু মধ্যযুগীয় কবির অনুভবের তীব্রতা প্রমাতার অনুভবের ক্ষতি সহজেই পূরণ করিয়া দেয়। রূপ-মাধুরী ও শৃঙ্গারের পদের রসনীয়তার আধার রতি কিন্তু অপার্থিব আলম্বনের প্রতি হওয়ার জন্য (শৃঙ্গারের পদগুলিতে আশ্রয় ও আলম্বন উভয়েই অলৌ-কিক) ইহা সামান্য লৌকিক রতি না হইয়া উদাত্তরূপ হয়। রতির উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ায় আলম্বনের চিন্ময়রূপের প্রভাবে ইন্দ্রিয় তত্ত্বের ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে অনুভূতি অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া যায়। অতএব এই রতির আস্বাদ্যতাও সর্বথা অসন্দিগ্ধ। সামান্য রস-প্রক্রিয়ায় যেখানে বিভাবের লৌকিকতা বিঘ্নরূপে বিদ্যমান থাকে এবং কবিকে নিজের কল্পনার দ্বারা যাহার নিরাকরণ করিতে হয়, সেখানে ভক্তি প্রসঙ্গে বিভাবাদির অলৌকিকতার জন্য এই বাধাই উপস্থিত হয় না এবং রসের সিদ্ধি অপেক্ষা-কৃত সরল হইয়া যায়। অতএব ভক্তির স্থায়ী ভয়-বিস্ময়-প্রেম-বিশ্বাসমূলক সমর্পণ-ভাব হউক বা চিন্ময় (উদাত্তীকৃত) রতি হউক না কেন, উহার আস্বাদ্যতা এবং পরিণামতঃ উহার রসত্বে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। অন্য রসের মধ্যেও ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর নহে কারণ ভক্তির স্থায়ী শুদ্ধ বিস্ময় নহে, ভয় নহে, শম নহে ও কামমূলক রতিও নহে—এই সকল তত্ত্বের মিশ্রণের দ্বারা নির্মিত ইহা একটি পৃথক ভাববৃত্তিই অতএব সিদ্ধান্ততঃ এবং ব্যবহারতঃ উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের নিষেধ সম্ভব নহে। এইরূপে ব্যাপক বা সামান্যরূপে ভক্তি রস সিদ্ধ হয় কারণ ব্যাপকরূপে উহা সর্ব-(সহৃদয়)-গম্য; কিন্তু সাম্প্রদায়িকরূপে কাব্যশাস্ত্রের দৃষ্টিতে উহা সিদ্ধ হয় না কারণ প্রথমতঃ সাম্প্র-দায়িকরূপ ভক্তি সাক্ষাৎ অনুভবরূপ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ কেবল ভক্তগম্য হওয়ার জন্য উহার সাধারণীকরণও সম্ভব নহে।

প্রকৃতি-রসের কল্পনা নূতন এবং ইহার কারণ আধুনিক যুগে প্রকৃতি-কাব্যের প্রাচুর্য্য। কাব্যে প্রকৃতির নানা রূপে বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ মানবের জীবন-ব্যাপারের

ভূমিকা রূপে, বিভিন্ন ভাবের উদ্দীপন রূপে, নানা অনুভূতি—বিশেষতঃ রহস্যানুভূতির মাধ্যম বা প্রতীক রূপে, অলংকার-সামগ্রী রূপে এবং আলম্বন রূপে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি রূপ প্রায় সমানই—ভূমিকারূপে প্রকৃতি ভাবগুলিকে উদ্দীপ্ত করিবারই কাজ করে যদিও প্রত্যক্ষরূপে নয় পরোক্ষরূপে। প্রভেদ কেবল এই যে ভূমিকা রূপে প্রকৃতি স্বতন্ত্র বর্ণনার বিষয় হয় এবং পাঠকের হৃদয় কিছুক্ষণ উহার প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিবার পর আবার এই বর্ণনার দ্বারা উদ্দীপ্ত ভাবের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়। ইহার বিপরীতে উদ্দীপন রূপে প্রযুক্ত প্রকৃতি প্রত্যক্ষতঃ ভাবকে উত্তেজিত করে। প্রতীক রূপে উহা রহস্যানুভূতি অথবা প্রেম, বিস্ময় প্রভৃতি কোন অন্য ভাবের আস্বাদনের মাধ্যম মাত্র হয়। কিন্তু আলম্বন রূপে উহা ভাবেরই বিষয় হইয়া যায়; কবি এবং ইহার পরে পাঠকের উহার সহিত স্পষ্ট রাগাত্মক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রকৃতি-কাব্যে অভিব্যক্ত বা উহার দ্বারা প্রমাতার চিত্তে উদ্‌বুদ্ধ এই ভাব নিশ্চিত রূপে আস্বাদ্য হয় যদিও ততখানি উৎকটরূপে নয় যতখানি রতি, উৎসাহ প্রভৃতি ভাব হইতে পারে কিন্তু ইহা নিশ্চিত আস্বাদনীয় এবং ইহাতে তন্ময়ীকরণের শক্তিও নিঃসন্দেহে বিদ্যমান থাকে। এইজন্য ইহার রমনীয়তা এবং এই ভিত্তিতে ইহার রসত্বও সিদ্ধ হয় কিন্তু এই রসের কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে অথবা ইহা কি অন্য কোন রসের মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে ইহা নির্ণয় করা আবশ্যক যে প্রকৃতির প্রতি কবি বা পাঠকের ভাবের স্বরূপ কি অর্থাৎ এই রসের স্থায়ীভাব কি? কাব্যে প্রায় প্রকৃতির তিন রকমের চিত্র উপলব্ধ হয়—মধুর, বিরাট্ এবং ভয়ানক বা রৌদ্র যাহার মধ্যে প্রকৃতির হিংস্র নখ-দন্ত মানব রক্তে রঞ্জিত থাকে। স্বভাবতঃ এই তিনটি রূপের প্রতি পাঠকের সমান প্রতিক্রিয়া হয় না : মধুর রূপের প্রতি উন্মুখীভাব বা রতিভাব হয়, বিরাট্ রূপের প্রতি ওজ এবং বিস্ময়ের ভাব উদিত হয় এবং ভয়ানকের প্রতি ভয়ের—এবং এই তিনটি অবস্থায় রসের স্বরূপও স্থায়ীর অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়। অতএব প্রকৃত রসের কোন বিশিষ্ট স্বরূপ আছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এবং যেহেতু উহার কোন একটি বিশিষ্ট স্বরূপ নাই সেইজন্য রসের প্রকৃত স্বতন্ত্র কল্পনা কেমন করিয়া সার্থক হইতে পারে? বলার উদ্দেশ্য এই যে প্রকৃতি কাব্যে রমনীয়তা অবশ্য বর্তমান থাকে কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকৃতি-রসের উদ্‌ভাবনার কোন আবশ্যকতা নাই এবং উহা সঙ্গতও হইবে না। কয়েকজন বিদ্বান্ সৌন্দর্য-বৃত্তির স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করিয়া উহাকেই প্রকৃতি-রসের স্থায়ীভাব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে সৌন্দর্যের প্রতি উন্মুখীভাব মানুষের জন্মগত কিন্তু উহার অনুভবাত্মক রূপ পৃথক বা বিশিষ্ট হয় না। সুন্দর পদার্থের প্রতি আকর্ষণের অনুভব হর্ষ, বিস্ময় বা খুব বেশী হইলে লোভ বা প্রেম রূপেই আমরা করি; অতএব এই দৃষ্টিতে ইহার পৃথক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। আচার্য শুক্ল কাব্যক্ষেত্রের বাহিরেও সাক্ষাৎ প্রকৃতি-রসের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে হৃদয়ের মুক্তাবস্থার নাম রস। কাব্য বা কলা এইজন্য সরস যে উহার মননের ফলে সহৃদয়ের চিত্ত ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত নির্লিপ্ত ভাবের

আস্বাদন করে এবং যেহেতু প্রকৃতির সাক্ষাৎকারের ফলেও চিত্ত ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া বিশদতার অনুভব করে, এইজন্য প্রকৃতির এই সাক্ষাৎ অনুভবকেও রস না বলিবার কোন কারণ নাই। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ অনুভবকে, যাহা সুখময় বা দুঃখময় বা শান্তিময়, লিপ্ত বা নির্লিপ্ত কিছুই হউক না কেন রস বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। কেবল প্রকৃতির সাক্ষাৎকারের কালেই নয় জীবনের নানা পরিস্থিতিতেও—যেমন কর্তব্যপালনের সময়ে, ধার্মিক সংসঙ্গ বা এইরূপ অন্য পরিস্থিতিতে আমাদের চিত্ত ব্যক্তি-সংসর্গ হইতে মুক্ত হইয়া নৈর্মল্য অনুভব করে কিন্তু এই ধরণের অনুভবকে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে রস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না: রস শব্দের প্রয়োগ এখানে লাক্ষণিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রকৃতি-রসের অনুরূপ দেশভক্তি-রসের উদ্‌ভাবনাও আধুনিক আলোচকেরা পাশ্চাত্য ও আধুনিক ভারতীয় কাব্যের প্রকাশেই করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা অন্যত্র বলিয়াছি যে দেশভক্তি একটি মিশ্র ভাব যাহাতে রাগ ও উৎসাহ মিশ্র ভাবে বিদ্যমান থাকে (দ্রষ্টব্য: রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক কবিতা—আধুনিক হিন্দী কবিতা কী মুখ্য প্রবৃত্তিয়া।)[১] দেশভক্তির কাব্যগত অভিব্যক্তি নানারূপে উপলব্ধ হয়—কোথাও উহা মাতৃভূমির প্রতি শুদ্ধ রতিভাব রূপে প্রকট হয়, আবার কোথাও উহার নিবাসীদের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতি রূপে হয়। কোথাও দেশের অখণ্ডতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অদম্য উৎসাহরূপে কিংবা আবার কোথাও বাধক শক্তির বিরুদ্ধে উগ্র অমর্ষ রূপে প্রকট হয় এই প্রেম। নয় তো প্রাচীন গৌরবের প্রতি গর্ব-মিশ্রিত অভিমানরূপে আবার কোথাও বর্তমান দুর্দশাকে দেখিয়া তীব্র করুণা, উদ্‌বেগ অথবা প্রক্ষোভ রূপে এই প্রেম প্রকট হয়। রাষ্ট্রীয়-সাংস্কৃতিক কবিতা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একটি প্রবল ধারা যাহার উৎকট আস্বাদ্যমানতায় সন্দেহ করিবার অর্থ এই যে: 'রস বিশেষ জানা তিন্‌হ নাহী' (রসের বৈশিষ্ট্য তিনি কিছুই জানেন না)। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে ইহা কি একটি স্বতন্ত্র রস? ইহার উত্তরও প্রায় সেই যাহা আমরা প্রকৃতি-রসের সন্দর্ভে ইতিপূর্বে বলিয়াছি অর্থাৎ দেশভক্তির প্রমুখ রূপগুলি বীর, করুণ প্রভৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; শুদ্ধ রাগাত্মক রূপের ব্যবস্থা হয় ব্যাপক প্রেমরসের অন্তর্গত করা যাইতে পারে বা উহাকে দেশ-বিষয়ক রতি 'ভাব' বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহারও রস-রূপে পৃথক কল্পনার জন্য পর্য্যাপ্ত যৌক্তিকতা নাই।

এইরূপে প্রাচীন আচার্যগণ ঘুরিয়া-ফিরিয়া অবশেষে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন যে নবরসের প্রকল্পনাই সমীচীন এবং ইহার মূলে দুইটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ কারণ বিদ্যমান আছে—প্রথমতঃ জীবনের আধারভূত মনোবেগের সংখ্যা আট-নয়টি বা বৎসল ভাব ও ভক্তিকে যুক্ত করিয়া খুব বেশী হইলে দশ-এগারটি এবং দ্বিতীয়তঃ যদি সংখ্যা বৃদ্ধির ক্রম একবার চালু হইয়া পড়ে তো ইহা স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িবে যে

১. লেখকের একটি অন্য গ্রন্থের নাম

কোথায় নিবৃত্ত হওয়া উচিত। আধারভূত মনোবেগগুলিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া লইলে এই সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হইয়া যায় কারণ এই ভাবগুলিই উৎকটরূপে আস্বাদ্য হয়—যে মনোবেগগুলি আধারভূত নয় অর্থাৎ জীবনের মূলবৃত্তি ও পুরুষার্থ সহিত প্রত্যক্ষতঃ সম্বন্ধযুক্ত নয় তাহাদের আস্বাদে যথেষ্ট উৎকট ভাব থাকে না এবং সঙ্গে-সঙ্গে আধারভূত মনোবেগগুলির বর্গীকরণ ও সংখ্যা-নির্ধারণও কঠিন নয় কারণ ইহাদের সংখ্যা সীমিতই হয়।

উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা-নির্ণয়ের প্রশ্নটি রসশাস্ত্রের মৌলিক প্রশ্ন নয় এবং এইজন্য ইহা অধিক গুরুত্বপূর্ণও নয় কারণ রস-সিদ্ধান্তের আধার কেবল পরিগণিত রসই নয়—এখানে আস্বাদের মূল হইতেছে ভাব এবং এইজন্য 'রস' বা 'রসধ্বনি'তে পরিগণিত রস ব্যতীত ভাব, রসাভাস, ভাবোদয়, ভাবপ্রশম, ভাবসন্ধি, ভাবসবলতা প্রভৃতি সমস্ত যথাবৎ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ঃ

রসভাবৌ তদাভাসৌ, ভাবস্য প্রশমোদয়ৌ।
সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ ॥ সা০ দ০ তৃ০
প০ ২৫৯-৬০

অতএব রস-সিদ্ধান্তের বাস্তবিক আধার ভাব যাহার ভেদ-গণনা সম্ভবপর নয়, আবশ্যকও নয়। প্রখ্যাত আচার্যরাও সংখ্যার উপর কোন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই—এইজন্য একদিকে সকল রসগুলিকে একটি রসের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রযত্ন হইয়াছে এবং অপরদিকে ভাবের সীমাহীনতার ভিত্তিতে রসের অসীমতাকে প্রমাণিত করা হইয়াছে। আমাদের এই যুক্তি যে রস-সংখ্যার প্রশ্নটি মৌলিক প্রশ্ন নয়—ইহার স্বপক্ষে একটি প্রবল প্রমাণ এই যে একই আচার্য রাজা ভোজ উভয়ক্ষেত্রে যুগপৎ ইহা প্রমাণিত করিবার প্রযত্ন করিয়াছেন যে রসের সংখ্যা একও আবার অনন্তও। অতএব উল্লিখিত রস-সংখ্যান-বিবেচনা আমরা শাস্ত্রীয় প্রতিপাদনকে সম্পূর্ণতা দান করিবার উদ্দেশ্যেই করিয়াছি এবং ইহার সার্থকতা এই যে ইহাতে রসের স্বরূপ ও পরিধি প্রভৃতির সহিত সম্বদ্ধ অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তথ্যের প্রসঙ্গতঃ অনায়াস উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হইয়াছে।

■ ■ ■

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিচার

(খ) অঙ্গী রস

(গ) রস-বিঘ্ন

(ঘ) রসাভাস

(ক) রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিচার

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে বিভিন্ন রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ—বিরোধ, অবিরোধ এবং বিরোধ-পরিহার প্রভৃতির অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং রুচিকর বিবেচনা হইয়াছে। সামান্যতঃ এই প্রশ্নগুলি শাস্ত্র-প্রচলিত পুঁথিগত প্রশ্ন বলিয়া মনে হয় কিন্তু কাব্যের আস্বাদন-(রসাস্বাদন)-প্রক্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার জন্য ইহাদের তাত্ত্বিক মূল্য অসন্দিগ্ধ এবং এই সমস্ত প্রসঙ্গের ব্যাখ্যার দ্বারা রসের আস্বাদনের সহিত সম্বদ্ধ নানা সমস্যার সমাধানও সম্ভবপর।

রসের বিরোধ-অবিরোধ প্রসঙ্গের ভরত কোথাও স্পষ্ট বিবেচনা করেন নাই এবং পরবর্তী আচার্যদের মধ্যে রুদ্রট পর্যন্ত ইহার কোন বিশেষ বর্ণনা হয় নাই। সর্বপ্রথম ইহার উল্লেখ বোধ হয় ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্যোতেই হইয়াছে। আনন্দবর্ধনের মতানুসারে রসের বিরোধী তত্ত্বের মধ্যে প্রথম হইতেছে : বিরোধিরসসম্বন্ধিবিভাবাদিপরিগ্রহ :(৩.১৮)-অর্থাৎ প্রস্তাবিত রসের বিরোধী রসের সম্পর্কিত বিভাবাদির গ্রহণ। কিন্তু বিরোধী রস কোন্‌গুলি অর্থাৎ কোন্ রসের কাহার সহিত বিরোধ, এবং কেন বিরোধ—ইহার প্রত্যক্ষতঃ বর্ণনা তিনি করেন নাই, রসভঙ্গের বিবেচনায় প্রসঙ্গতঃ কিছু সঙ্কেত অবশ্য পাওয়া যায় : উদাহরণস্বরূপ—

····শান্তরসবিভাবেষু তদ্বিভাবতয়ৈব নিরূপিতেষ্বনন্তরমেব শৃঙ্গারাদিবিভাববর্ণনে—শান্তরসের বিভাবগুলি বিভাবরূপে নিরূপিত হইলে তাহার পরই শৃঙ্গারাদির বিভাবের বর্ণনায় (নিবিষ্ট হউন)।[১]

বিরোধিরসানুভাবপরিগ্রহো যথা প্রণয়কুপিতায়াং প্রিয়ায়ামপ্রসীদন্ত্যাং নায়কস্য কোপাবেশবিবশস্য রৌদ্রানুভাববর্ণনে—বিরোধী রস ও ভাবের গ্রহণের উদাহরণ যেমন প্রণয়কুপিতা নায়িকা অপ্রসন্ন হইলে, কোপাবিষ্ট নায়কের রৌদ্রানুভবের বর্ণনায় (নিবিষ্ট হউন)।[২]

তদঙ্গত্বে চ সম্ভবত্যপি মরণস্যোপন্যাসো ন জ্যায়ান্। × × × করুণস্য তু তথাবিধে বিষয়ে পরিপোষো ভবিষ্যতীতি চেত্, ন।—মরণের সন্নিবেশ যদি বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের অঙ্গও হয় তবুও তাহা করা উচিত হইবে না। যদি বলা হয় যে সেই সকল

---

১. ধ্বন্যালোক (আচা বিশ্বেশ্বর—জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ২১৩

২. ঐ, পৃ০ ২১৪

বিষয়ে করুণ রসের তো পরিপুষ্টি হয় তাহা হইলে উত্তরে বলিব যে এই যুক্তি ঠিক নহে ।[১]

উল্লিখিত উদ্ধরণগুলির বিশ্লেষণ করিলে পরে আমরা এই সার তত্ত্বগুলি পাই :

বিরোধী রস—শৃঙ্গার ও শান্ত, শৃঙ্গার ও রৌদ্র, শৃঙ্গার ও করুণ ।

রস-বিরোধের আধার—বিভাব-ঐক্য—অর্থাৎ (১) আলম্বন-ঐক্য ও (২) আশ্রয়-ঐক্য এবং (৩) নৈরন্তর্য্য (একের পরে অন্যের পরপর তৎক্ষণাৎ বর্ণনা করা)— এই তিন দৃষ্টিতে রসগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় : শৃঙ্গার ও শান্তের মধ্যে বিরোধ বিভাব-ঐক্য এবং নৈরন্তর্য্য উভয় দৃষ্টিতে হয়, শৃঙ্গার ও রৌদ্র এবং শৃঙ্গার ও করুণের মধ্যে বিরোধ আলম্বন-ঐক্যের দৃষ্টিতে হয় ।

পরবর্তী আচার্যরা প্রায় এই সংকেতগুলির আশ্রয়ে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রসার করিয়াছেন । মম্মট রস—বিরোধের বিবেচনা প্রকারান্তরে রস-দোষ প্রসঙ্গে করিয়াছেন এবং বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ ও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন । এই দুইজন আচার্যের বিবেচনা অন্যদের অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত এবং পূর্ণ অতএব ইঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করা অধিক উপাদেয় হইবে ।

বিশ্বনাথের মতে—	রস	শত্রু (বিরোধী) রস
	শৃঙ্গার	করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক
	হাস্য	ভয়ানক ও করুণ
	করুণ	হাস্য ও শৃঙ্গার
	রৌদ্র	হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানক
	বীর	ভয়ানক ও শান্ত
	ভয়ানক	শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত
	বীভৎস	শৃঙ্গার
	শান্ত	বীর, শৃঙ্গার, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক ।[২]

—অদ্‌ভুত একমাত্র এমন রস যাহার কাহারো সহিত বিরোধ নাই এবং ইহার কারণ বোধ হয় এই যে বিশ্বনাথ নিজের প্রপিতামহ নারায়ণ পণ্ডিতের অনুরূপ ইহা স্বীকার করিতেন যে "সর্বত্রাপ্যদ্‌ভুতো রসঃ" ।

১. ধ্বন্যালোক (আচার্য বিশ্বেশ্বর—জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ২২০

২. সাহিত্যদর্পণ (বিমলা টীকা, সন্ ১৯৫৬) পৃ০ ১২৩-২৪

রস-বিরোধের আধার—"রসগুলির বিরোধিতা ও অবিরোধিতার তিন প্রকার ব্যবস্থা আছে। কোন রসদ্বয়ের আলম্বনে বিরোধ হয়, আবার কোন দুইটি রসের বিরোধিতা আশ্রয়ে সম্পাদিত হয় এবং কোন দুইটি রসের নৈরন্তর্য্য হইলে অর্থাৎ—তাহাদের উপস্থিতির মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকিলে রস দুইটি পরস্পর বিরোধী হয়।"[১]

আলম্বন-ঐক্য—শৃঙ্গারের সহিত বীরের; হাস্য, রৌদ্র ও বীভৎসের সহিত সম্ভোগ শৃঙ্গারের; বীর, করুণ, রৌদ্র ও ভয়ানকাদির সহিত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের;

আশ্রয় ঐক্য—বীরের সহিত ভয়ানকের;

নৈরন্তর্য্য দ্বারা—শান্তের সহিত শৃঙ্গারের।

মিত্র রস—বীর, অদ্‌ভুত এবং রৌদ্রের মধ্যে, শৃঙ্গার ও অদ্‌ভুতের মধ্যে, ভয়ানক এবং বীভৎসের মধ্যে পরস্পর পূর্ণ মৈত্রী ভাব বর্তমান অর্থাৎ উক্ত তিন প্রকারে উহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।[২]

জগন্নাথের অনুসারে—বীর ও শৃঙ্গার, শৃঙ্গার ও হাস্য, বীর ও অদ্‌ভুত, বীর ও রৌদ্র এবং শৃঙ্গার ও অদ্‌ভুত পরস্পর মিত্র রস।

এবং

শৃঙ্গার ও বীভৎস, শৃঙ্গার ও করুণ, বীর ও ভয়ানক, শান্ত ও রৌদ্র এবং শান্ত ও শৃঙ্গার পরস্পর বিরোধী রস।[৩]

বিরোধ ও অবিরোধের নির্ণয়ের আধার দ্বিবিধ— বিষয়গত এবং বিষয়িগত। বিষয়গত আধার বলিতে আমাদের অভিপ্রায় এই যে কাব্য-বিষয়ের অন্তর্গত পাত্রের স্থায়ী ভাবের ব্যঞ্জনা সামান্য অনুভবের (অথবা মনোবিজ্ঞানের) অনুকূলই হওয়া উচিত অর্থাৎ এমন ভাবের বর্ণনা হওয়া উচিত যাহাদের যুগপৎ স্থিতি জীবনে সম্ভবপর, এমন ভাবের নয় যেগুলি পরস্পরের খণ্ডন করে। উদাহরণস্বরূপ, একই ব্যক্তির প্রতি একই সময়ে আমাদের মনে রতি বা ক্রোধের বা রতি ও শোকের বা রতি ও জুগুপ্সার উদ্‌বোধ সম্ভবপর নয়। এইরূপে একই ব্যক্তির চিত্তে তৎক্ষণাৎ ভয় ও ক্রোধের বা ভয় ও উৎসাহের সঞ্চার হইতে পারে না অতএব বিভাব-ঐক্য অর্থাৎ আলম্বন-ঐক্যের দৃষ্টিতে রস বিরোধের নির্ণয়ের আধার বিষয়গত—এই নির্ণয় কাব্য-বস্তুর সন্দর্ভে করা হইয়াছে। বিষয়িগত আধার বলিতে আমাদের তাৎপর্য বিরোধ-অবিরোধের নির্ণয় যেখানে প্রমাতার অনুভূতির অনুসরণে করা হইয়াছে। প্রমাতার চিত্তে একই সময়ে রতি ও জুগুপ্সা বা রতি ও শোক, অথবা উৎসাহ ও ভয়, বা শম ও ক্রোধ প্রভৃতি উদ্রেক হইতে পারে না, কারণ এই সকল ভাব পরস্পরের খণ্ডন করে অতএব ইহাদের

১. সাহিত্যদর্পণ (বিমলা টীকা, সন্ ১৯৫৬) পৃ০ ২৬২

২. ঐ, পৃ০ ২৬৩

৩. রসগঙ্গাধর (হিন্দী-অনুবাদ, চৌখম্বা বিদ্যাভবন) প্র০ আ০ পৃ০ ১৭৬

পরিপাক রূপ রসের আস্বাদনও প্রমাতা নৈরন্তর্য্যের দ্বারা (একের পর তৎক্ষণাৎ অপরের) করিতে পারে না। এইরূপ নৈরন্তর্য্যের দৃষ্টিতে রস-সম্বন্ধ-নির্ণয়ের আধার-বিষয়িগত অর্থাৎ এই নির্ণয় প্রমাতার আস্বাদের সন্দর্ভে করা হইয়াছে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে উল্লিখিত বিবেচনা মনোবিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত, চিত্তের সকল বৃত্তিগুলি একে-অপরের অনুকূল এবং প্রতিকূল বা সমান ও বিপরীত হয়—এই তথ্য অনুভবসিদ্ধ। এই কথাটি যে একই সময়ে একই ভাবের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে, খুবই স্পষ্ট এবং ইহা খুব বেশী বিবাদস্পদও নয়—এইরূপ ইহাও সহজ অনুভবের বিষয় যে অনুকূল ভাব পরস্পরের পুষ্টি সাধন করে এবং বিপরীত ভাব পরস্পরের খণ্ডন করে এইজন্য ভাবের সাম্য ও বৈষম্যের ভিত্তিতে রসের বিরোধাবিরোধের কল্পনা অসঙ্গত নয়। কিন্তু এই সম্বন্ধগুলিকে সর্বস্থায়ী এবং অটুট বলিয়া স্বীকার করা উচিত নয় কারণ, অনুসন্ধান করিলে মানবের মনোব্যাপারে নানা প্রকারের বিরোধী প্রবৃত্তি উপলব্ধ হয়। সামান্যতঃ একই ব্যক্তির প্রতি প্রেম ও ঘৃণা বা ভয় ও ক্রোধের ভাব একসঙ্গে থাকিতে পারে না, কিন্তু কখন-সখন এমনও বিচিত্র মনঃস্থিতি হইতে পারে যখন এই বিরোধী ভাবগুলির যুগপৎ অস্তিত্বও সম্ভবপর হয়। আধুনিক সাহিত্যে এমন নানা প্রসঙ্গ আছে : স্বদেশ-বিদেশের সাহিত্যে নানা উপন্যাস, নাটক, গল্প প্রভৃতি আছে যাহাদের মধ্যে লেখক বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্বের দ্বারা রস-সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দ্বন্দ্ব যেসব বিরোধী ভাবের মধ্যে লক্ষিত হয় তাহাদের বিষয় বা আলম্বন প্রায় ভিন্ন হয় : উদাহরণস্বরূপ, কর্তব্য ও প্রেমের চির-পরিচিত দ্বন্দ্বে উৎসাহ ও প্রেমের আলম্বন ভিন্নই হয়। কিন্তু কখন-কখন বিরোধী ভাবের আলম্বন একই হয় এবং আধুনিক সাহিত্যকার এই ধরণের স্থিতির চিত্রণের প্রতি বিশেষ ভাবে আগ্রহশীল থাকেন কারণ অবচেতন মনস্তত্ত্বের আলোকে আজ ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে পরস্পর-বিরোধী ভাব কখন-কখন একই ভাবের দুইটি রূপ হয়—ঘৃণা প্রেমের প্রতিরূপ হইতে পারে, ক্রোধ প্রায় ভয়েরই প্রচ্ছন্ন রূপ হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে এই স্থিতিগুলির চিত্রণের জন্য লেখককে অত্যন্ত কুশল হইতে হয় এবং কৌশলের অভাবে রসভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, অনেক রচনাতে ইহা দৃষ্টও হয়। কিন্তু ইহাও ঠিক যে সফল কৃতিত্বে রসভঙ্গ হয় না বরং রস-পরিপাকই হয়। পশ্চিম ও ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যেও, যেমন মহাভারতে বা সেক্সপীয়রের নাটকে, নৈরন্তর্য্যের বাধাও প্রায় নষ্ট হইয়াছে। সুখ-দুঃখের এই আলো-আঁধারি পরিবেশ সেক্সপীয়রের নাটকের তো একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই এবং সেখানে সুখ ও দুঃখ বা হাস্য ও করুণার মধ্যে অদ্ভুত প্রভৃতি কোন মিত্র রসের ব্যবধানেরও ব্যবস্থা করা হয় নাই, তবুও প্রায় রসভঙ্গ হয় না—বরং ভাবের বৈষম্য মূল ভাবকে আরও প্রখর করিয়া তোলে যেমন হ্যামলেট নাটকের প্রসিদ্ধ 'গ্রেভ-ডিগার্স'[১] দৃশ্যটি। অতএব রস-বিরোধিতার সম্বন্ধে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের এই ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অকাট্য বা

১. কবর খননের বা খননকারীদের দৃশ্য

অপরিবর্তনীয় বলিয়া স্বীকার করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এখানেও রস-বিরোধের পরিহারের নানা প্রকারের বিধি-নিয়মের স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়—যাহা এই তথ্যেরই শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক।

রসবিরোধের পরিহার—রসবিরোধের পরিহারের ব্যবস্থাও সর্বপ্রথম আনন্দবর্ধনই করিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুসারে :

বিবক্ষিতে রসে লব্ধপ্রতিষ্ঠে তু বিরোধিনাম্।
বাধ্যানামঙ্গভাবং বা প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলা ॥ ৩,২০

প্রস্তাবিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে পর বিরোধী রসসমূহ তাহার (১) বশীভূত বা (২) অঙ্গীভূত হইলে তাহাদের বর্ণনা দোষাবহ হইবে না। (১) বশবর্তিতা বা বাধ্যত্বের অভিপ্রায় এই যে বিবক্ষিত রসের অঙ্গের বর্ণনায় এতই প্রাবল্য থাকে যে বিরোধী রসের অঙ্গের প্রভাব বাধিত হইয়া পড়ে—এমন পরিস্থিতিতে বিরোধী রস প্রকৃত রসের অপকর্ষ না করিয়া পরিপুষ্টি সাধনই করে। যেমন কাদম্বরীতে মহাশ্বেতার প্রতি পুণ্ডরীকের অতিশয় অনুরাগ জন্মিলে দ্বিতীয় মুনিকুমারের উপদেশ বর্ণনায় প্রদর্শিত শান্ত রসের অঙ্গগুলি মুখ্য রস শৃঙ্গারের অঙ্গের দ্বারা বাধিত হয় এবং শেষে রতি স্থির থাকে। এইজন্য 'বাধ্যত্বেন' উহাদের প্রতিপাদন দোষ নয়। (২) বিরোধী রস তিন প্রকারে অঙ্গত্ব লাভ করিতে পারে (ক) স্বাভাবিকভাবে, (খ) সমারোপিত হইয়া, এবং (গ) প্রধান রসের প্রতি দুই পরস্পর-বিরোধী রসের অঙ্গভূত রূপে। (ক) স্বাভাবিক অঙ্গরূপতা সেখানে হয় যেখানে বিরোধী রসের অঙ্গ—স্থায়ী ও সঞ্চারী প্রভৃতি মুখ্য রসের স্বাভাবিক অঙ্গ হইয়া যায়, যেমন করুণ রসের অঙ্গভূত ব্যাধি প্রভৃতি ভাব বিপ্রলম্ভেরও সহজ অঙ্গরূপে প্রযুক্ত হইয়া স্বাভাবিক অঙ্গত্ব লাভ করে। উদাহরণ-স্বরূপ—

ভ্রমিমরতিমলসহৃদয়তাং প্রলয়ং মূর্চ্ছাং তমঃ শরীরসাদম্।
মরণং চ জলদভুজগজং প্রসহ্য কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনাম্ ॥

—অর্থাৎ জলদভুজগজাত বিষ (জল) বিরহিণী নারীতে শিরোঘূর্ণন, বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক ঔদাস্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মূর্চ্ছা, অন্ধতা, শরীর-পীড়া ও মুমূর্ষুতা আনয়ন করে। (এখানে করুণ-রসোচিত ব্যাধির অনুভাব—ভ্রম প্রভৃতির—অস্তিত্ব বিপ্রলম্ভও সম্ভব হওয়ার জন্য, নৈসর্গিকী অঙ্গত্ব লাভের দ্বারা অবিরোধ হইয়াছে।)[১]

(খ) সমারোপিত অঙ্গত্ব হইলে বিরোধী রসের মুখ্য রসের সহিত অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ স্বাভাবিক না হইয়া শ্লেষ, সাম্য প্রভৃতির দ্বারা আরোপিত হয় : যেমন—

পাণ্ডুক্ষামং বদনং হৃদয়ং সরসং তবালসং চ বপুঃ ॥
আবেদয়তি নিতান্তং ক্ষেত্রিয়রোগং সখি হৃদন্তঃ ॥

---

১. ধ্বন্যালোক (হিন্দী ব্যাখ্যা—জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ২২৩

—অর্থাৎ হে সখী, তোমার মুখ মলিন ও ক্ষীণ, হৃদয় রসে পরিপূর্ণ, শরীর মান্দ্যবিশিষ্ট—এই সব লক্ষণ হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ ক্ষেত্রিয় রোগের পরিচায়ক। (ক্ষেত্রিয় রোগ অসাধ্যরোগকে বলা হয়)।

এই শ্লোকে করুণোচিত ব্যাধির বর্ণনা হইয়াছে কিন্তু শ্লেষভঙ্গীতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে স্থাপিত হইয়া নায়িকার উপর আরোপিত হইয়াছে। অতএব তাঁহার শৃঙ্গারের প্রতি সমারোপিত অঙ্গত্ব হওয়ার জন্য শৃঙ্গারে করুণোচিত ব্যাধির বর্ণনা দোষনীয় হয় নাই।[১]

(গ) প্রধান রসের মধ্যে দুই পরস্পর-বিরোধী রস অঙ্গীভূত হইলে পরেও বিরোধিতা দূর হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে শৃঙ্গার ও করুণের বিরোধিতা এইজন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে উহারা স্বতন্ত্র না থাকিয়া শিব-বিষয়ক রতির অঙ্গরূপ ধারণ করিয়াছে :

ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহতোঽপ্যাদদানোংঽশুকান্তং,
গৃহ্নন্ কেশেষপাস্তশ্চরণনিপতিতো নেক্ষিতঃ সম্ভ্রমেণ।
আলিঙ্গন্যোঽবধূতস্ত্রিপুরযুবতিভিঃ সাশ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ
কামীবাদ্রাপরাধঃ স দহতু দু রতং শাম্ভবো বঃ শরাগ্নিঃ॥[২]

—অর্থাৎ শম্ভুর শরাগ্নি সাশ্রুনেত্রা ত্রিপুরযুবতীদিগকে স্পর্শ করিলে তাহারা উহাকে নিরস্ত করিয়া দিল; বসনাঞ্চল ধরিলে তাহারা উহাকে জোরে তাড়াইয়া দিল, কেশ স্পর্শ করিলে তাহারা উহাকে অনাদর করিয়া দূর করিয়া দিল, পায়ে পড়িলে আবেগজনিতত্বরায় উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না। আলিঙ্গন করিতে আসিলে তাচ্ছিল্য করিয়া ফিরাইয়া দিল। মনে হয় অগ্নি যেন তাহাদের কামুক প্রণয়ী যে সম্প্রতি অপরাধ করিয়াছে। শম্ভুর এই শরাগ্নি তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

এই প্রসঙ্গে এই সন্দেহ হইতে পারে যে অন্যের অঙ্গ হইলে পরেও পরস্পর-বিরোধী রসের বিরোধিতার পরিহার কেমন করিয়া সম্ভবপর? ইহার উত্তরে ধ্বনিকার লিখিয়াছেন, 'মূল বিধিতে বিরোধী ভাবসমূহের সমাবেশ হইলে দোষাবহ হয়। পরে বিধির অঙ্গ যে 'অনুবাদ' বা সমর্থন তাহার মধ্যে বিরোধী ভাবের সমাবেশ দোষ হয় না।' যেমন— "এস যাও; নীচে পতিত হও, উপরে উঠ; কথা বল, চুপ করিয়া থাক—এই ভাবে ধনী ব্যক্তিরা প্রার্থীদিগকে লইয়া ক্রীড়া করেন।" এখানে আশারূপী গ্রহের ফেরে যাহারা পড়িয়া আছে সেই প্রার্থীদিগকে লইয়া ধনী ব্যক্তিরা ক্রীড়া করেন।"—ইহা বিধি অংশ বা মুখ্য অর্থ এবং এস, যাও, নীচে পতিত হও, উপরে ওঠ, কথা বল, চুপ করিয়া থাক।"[৩] —ইহা অনুবাদ অংশ বা সহায়ক বাক্যার্থ। এবং

১. ধ্বন্যালোক (হিন্দী ব্যাখ্যা—জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ২২৩
২. ঐ, পৃ০ ৮৭
৩. ধ্বন্যালোক (জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ২২৪

যেহেতু বিরোধী কথার কথন সহায়ক বাক্যার্থ বা অনুবন্ধ-অংশে করা হইয়াছে অতএব প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে উহা দোষ হয় নাই। এইরূপে উল্লিখিত পদে বিধি বা অভিপ্রেত অর্থ হইতেছে শিবভক্তি এবং ত্রিপুরের ভস্মকারী শিবের শরাগ্নির বর্ণনা অনুবাদ বা সহায়ক অংশ : যেহেতু করুণ ও শৃঙ্গারের সাহচর্য অনুবাদে বিদ্যমান আছে সেইজন্য উহা দোষ নয়। এই প্রসঙ্গে আচার্যরা দুইটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন— একই রাজার দুইজন পার্ষদ পরস্পর শত্রু হইতে পারে কিন্তু রাজার প্রতি নিষ্ঠার প্রশ্নে উভয়ের বিরোধ নিরস্ত হইয়া যায়—অথবা জল ও অগ্নি পরস্পর-বিরোধী কিন্তু ইহারা তণ্ডুলাদির পাকে সহকারী হয়।১

উল্লিখিত চারটি উপায় ব্যতীত ধ্বন্যালোকে বিরোধ-পরিহারের আরও দুইটি উপায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম উপায়টি, (ঘ) যেখানে স্মৃতি-রূপে বর্ণিত হইলে পরে রস-বিরোধের নিবৃত্তি হইয়া যায় :

অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংনঃ করঃ॥

—অর্থাৎ এই সেই হাত যাহা কাঞ্চী তুলিয়া ধরিয়াছে, স্ফীত স্তন মর্দ্দন করিয়াছে, নাভি, উরু ও জঘন স্পর্শ করিয়াছে এবং কটিদেশের বসনগ্রন্থি মোচন করিয়াছে।২

এখানে ভূরিশ্রবার পত্নী মহাভারতের যুদ্ধে স্বামীর কাটা হাত দেখিয়া বিলাপ করিতেছেন, অতএব বিবক্ষিত রস করুণ। কিন্তু এই বিলাপে তিনি পূর্বভুক্ত সংভোগ প্রসঙ্গের, যাহা করুণবিরোধী, স্মরণ করিতেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে এই বিরোধের পরিহার কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল। উত্তর স্পষ্ট যে শৃঙ্গার এখানে প্রত্যক্ষ না হইয়া কেবল স্মর্যমাণ অতএব উহা প্রত্যক্ষ বা বিবক্ষিত করুণ রসের বিরোধিতায় অসমর্থ বরং বিপরীতে উহার পরিপুষ্টি সাধকই—যেইরূপে সামান্য অনুভবেও অতীত সুখের স্মৃতি বর্তমান দুঃখের পরিপন্থী না হইয়া উহার পোষকতাই করে। বস্তুতঃ ইহা কোন পৃথক্ উপায় নয় : পূর্ব-স্মৃতিকে হয় আমরা বর্তমান শোকের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং তখন এই বিরোধ অঙ্গরূপতার অন্তর্গত আসিয়া যায় নতুবা আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি যে প্রত্যক্ষ করুণ রসের তীব্রতার জন্য স্মর্যমাণ শৃঙ্গার অনায়াসেই নিরাকৃত হইয়া 'বাধ্যত্বেন' উহার পোষক হইয়া যায়।

(ঙ) দ্বিতীয় উপায়টি আশ্রয়ৈক্য-বিরোধ অথবা একাধিকরণ্য-বিরোধের নিরসনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত :

বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ো যস্তু বিরোধী স্থায়িনো ভবেৎ।
সঃ বিভিন্নাশ্রয়ঃ কার্য্যস্তস্য পোষেঽপ্যদোষতা॥ ৩.২৫

যাহা স্থায়ী রসের সঙ্গে এক আশ্রয়ে থাকিলে স্থায়ী রসের বিরোধী হয় তাহাকে

---

১. ধ্বন্যালোক (জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ২২৭

২. ঐ, পৃ০ ২২৮

পৃথক আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সেই ভাবে সন্নিবেশ করিয়া তাহার প্রতি-পাদন পরিপুষ্টি বিধান করিলেও দোষ হয় না।[১] উদাহরণস্বরূপ বীর ও ভয়ানকে একাধিকরণ্যের বিরোধ বর্তমান থাকে অতএব এই বিরোধিতার পরিশমনের জন্য নায়কের প্রতিপক্ষের মধ্যে ভয়ানক রসের সন্নিবেশ করিতে হইবে। শেষে, নৈরন্তর্য্যণ বিরোধের পরিশমনের উপায় কথিত হইয়াছে[২] :

একাশ্রয়ত্বে নির্দোষো নৈরন্তর্যে বিরোধবান্।
রসান্তরব্যবধিনা রসো ব্যঙ্গ্যো সুমেধসা ॥ ৩.২৬

পরবর্তী যুগে অন্য আচার্যরাও এই বিষয়ের সুরুচির সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। মম্মটের দোষ বর্ণনা তো খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি রসবিরোধকে রস-দোষের একটি প্রমুখ কারণ রূপে গ্রহণ করিয়া দোষ-প্রকরণেই উহার পরিশমনের বিবেচনা করিয়াছেন যাহা মৌলিক না হইলে পরেও অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবস্থিত :

সঞ্চার্যাদের্বিরুদ্ধস্য বাধ্যস্যোক্তির্গুণাবহা। ৩.৬৩
আশ্রয়ৈক্যে বিরুদ্ধো যঃ স কার্যো ভিন্নসংশ্রয়ঃ।
রসান্তরেণান্তরিতো নৈরন্তর্য্যেণ যো রসঃ ॥ ৬৪
স্মর্য্যমাণো বিরুদ্ধোঽপি সাম্যেনাথ বিবক্ষিতঃ।
অঙ্গিন্যঙ্গত্বমাপ্তৌ যৌ তৌ ন দুষ্টৌ পরস্পরম্ ॥ ৬৫

—(১) (প্রকৃত রসের) বিপরীত সঞ্চারীভাব (অনুভাব ও বিভাব) প্রভৃতির বাধ্যত্বেন কথন (দোষ নয়) অপিতু গুণাধায়ক হয়। (২) যে রস আশ্রয়ের ঐক্যের বিরোধী উহাকে ভিন্ন আশ্রয়ে (বর্ণিত) কর উচিত। (৩) যাহা নৈরন্তর্য্যের জন্য বিরোধী (রস) উহাকে অপর (অবিরোধী) রসের দ্বারা ব্যবহিত করা উচিত (শান্ত ও শৃঙ্গারে নৈরন্তর্য্যেণ বিরোধ বর্তমান এই জন্য এই দুইটির মধ্যে অন্য কোন রস নিয়োজিত করিলে বিরোধীতার পরিশমন হয়)। (৪) বিরোধীও যদি স্মর্য্যমাণ রূপে অথবা (৫) সাম্যের দ্বারা বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ সাম্যমূলক অলংকারের মাধ্যমে বর্ণিত হয় তাহা হইলে দোষ হয় না। (৬) এই রূপে যে দুইটি বিরোধী রস কোন তৃতীয় রসের অঙ্গত্ব লাভ করে, উহারা আর পরস্পর বিরোধী থাকে না।

ইহাদের মধ্যে বাধ্যত্বেন কথন, স্মর্যমাণ রূপে বিবক্ষা, কোন অন্য রসের অঙ্গরূপতা, ভিন্ন সংশ্রয়তা এবং রসান্তর ব্যবধান—এই পাঁচটি উপায় এমন যাহার বর্ণনা আনন্দবর্ধন যথাবৎ করিয়াছেন এবং সাম্যের দ্বারা বিবক্ষাও কোন নূতন উদ্ভাবনা নয় সমারোপিত অঙ্গতারই একটি প্রকার বিশেষ। মম্মটের পরে বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্যগণ প্রায় এই বিচারধারারই আবৃত্তি করিয়াছেন।

রসের অঙ্গরূপতার সম্বন্ধে একটি সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যখন রস

---

১. হিন্দী ধ্বন্যালোক (জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ৩৭
২. ঐ, পৃ০ ৩৮

স্বয়ং পূর্ণ এবং অখণ্ড তখন উহা অঙ্গ কেমন করিয়া হইতে পারে। ইহার সমাধান দুই ভাবে দেওয়া হইয়াছে। মম্মট প্রভৃতিরা তো স্পষ্ট বলিয়াছেন যে এইরূপ প্রসঙ্গে রসের অর্থ স্থায়ী ভাবই: রসশব্দেন অত্র স্থায়িভাব উপলক্ষ্যতে। অপর দিকে কয়েকজন আচার্য খণ্ডরসের কল্পনা করিয়া এই শংকার সমাধান করিয়াছেন:

অঙ্গ বাধ্যোঽথ সংসর্গী যদ্যঙ্গী স্যাদ্রসান্তরে।
নাস্বাদ্যতে সমগ্রং তত্তত: খণ্ডরস: স্মৃত:॥

—রস যাহা প্রকৃত পক্ষে অঙ্গী-রূপই হয়, যদি অন্য রসের অঙ্গ হয় অথবা তাহা যদি বাধ্য হইয়া অন্তর্ভুক্ত হয় কিংবা প্রকৃত রসের উপকারী না হইলেও, অবিরোধী হইয়া যদি স্বাধীন ভাবে বিশ্রান্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ণভাবে আস্বাদন না হওয়ায় ঐ রসকে খণ্ডরস বলা হয়। (সা০ দ০ বিমলা টীকা, ১৯৫৬, পৃ০ ২৬২)

রসবিরোধিতার পরিশমনের এই ব্যবস্থা কাব্যালোচনার পক্ষে অত্যন্ত উপ-যোগী। ইহার দ্বারা রস-সিদ্ধান্তের ব্যাপকতা এবং ব্যবহারিকতার উপর স্বচ্ছ প্রকাশ পড়ে এবং নানা ধরণের শংকা ও ভ্রান্তির সমাধান সম্ভবপর হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই প্রশ্নটি লওয়া থাক যে শেক্‌সপীয়রের নাটকে ভয়ানক ও হাস্য বা করুণ ও শৃঙ্গারের যুগপৎ বিবক্ষা রসে বাধা উপস্থিত না করিয়া সাধক কেমন করিয়া হইয়াছে? ইহার উত্তরও এই প্রস্তাবিত বিবেচনায় সহজেই পাওয়া যায়: অর্থাৎ রসবিরোধের পরিহার সেখানে বাধ্যত্বেন কথনের জন্য হইয়া যায়। ম্যাকবেথে ভয়ের রোমাঞ্চক পরিবেশে প্রেতাঙ্গনাদের হাস্যময়ী অবতারণা ট্রাজিক প্রভাবকে আরও সঘন করিয়াছে যেহেতু সেখানে ভয়ানক হাস্যকে সহজই অভিভূত করিয়া লয়—ট্রাজি-কমেডিতে শৃঙ্গার ও করুণের নিয়োজন প্রায় নৈরন্তর্য্যেণ রূপে হয় নাই এবং যদি কোথাও হইয়াছেও সেখানে বিরোধী রস বিবক্ষিত রসের অঙ্গত্ব গ্রহণ করিয়াছে বা উহার দ্বারা বাধিত হইয়াছে।

■ ■ ■

(খ) অঙ্গী রস

অঙ্গী রসের প্রসঙ্গটিও সর্বপ্রথম আনন্দবর্ধনই বিধিবৎ উত্থাপন করিয়াছেন :

প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে

একো রসোঽঙ্গী কর্তব্যঃ...... ॥ ৩.২১

—কাব্যপ্রবন্ধে নানা রসের সন্নিবেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও কোন একটি মাত্র রসকে অঙ্গী বা মুখ্য করিবে—

কিন্তু অঙ্গী রসের এই কল্পনা মূলতঃ নাট্যশাস্ত্রেই পাওয়া যায় :

বহুনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্ বহু ।

স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥

না০ শা০ ৩। ১২০

—মহাকাব্যে বর্ণিত নানা রসের মধ্যে যাহা বহু অর্থাৎ অধিক বা প্রধান রূপে বিদ্যমান থাকে সেই রস স্থায়ী বা অঙ্গী হয় এবং অবশিষ্ট রসগুলি সঞ্চারী বা অঙ্গভূত হয়।

কিন্তু অঙ্গী রসের বিষয়ে মৌলিক দুইটি প্রশ্ন ওঠে—(১) রস উহারই নাম যাহা স্বয়ং চমৎকার রূপ। যদি উহার স্ব-চমৎকারিতা রূপে বিশ্রান্তি না হয় তাহা হইলে উহা রসই নয়। অঙ্গাঙ্গী ভাব অথবা উপকার্য-উপকারক ভাব বলিয়া স্বীকার করিলে অঙ্গভূত বা উপকারক রসের স্ব-চমৎকারিতায় বিশ্রান্তি সম্ভব নয়, অতএব উহাকে রস বলা যাইতে পারে না। উহা রস তখনই হইবে যখন স্ব-চমৎকারিতায় উহার বিশ্রান্তি হয়। এমন অবস্থায় উহা অপর কাহারো অঙ্গ হইতে পারে না। অতএব পরস্পর রসের অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্ভবপর নয়— (২) বিরোধী রসের অঙ্গরূপতাকে কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? বিরোধ দুই প্রকারে হয় (ক) সহানবস্থান ভাব হইতে এবং (খ) বাধ্য-বাধক বা বধ্য-ঘাতক ভাব হইতে। সহানবস্থান ভাব হইতে বিরোধের অর্থ এই যে দুইটি বিরোধী রস সমান রূপে এক সঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না। বধ্য-ঘাতক ভাবের অর্থ এই যে একটি উদয় হইলে পরে অপরটির বিঘাত হইয়া যায়। বীর ও শৃঙ্গার বা শৃঙ্গার ও হাস্য বা রৌদ্র ও শৃঙ্গারের অথবা বীর ও অদ্‌ভুতের বা রৌদ্র ও করুণের অথবা আবার শৃঙ্গার ও অদ্‌ভুতের বিরোধ সহানবস্থান ভাব হইতে হয়। অর্থাৎ ইহারা পরস্পরে একসঙ্গে থাকিতে পারে কিন্তু উভয়ের সমান উৎকর্ষ সাধন হওয়া উচিত নয়। অতএব ইহাদের বিরোধ অধিক উগ্র নয় এবং এই অনুপাতে ইহাদের অঙ্গাঙ্গীভাবও দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু শৃঙ্গার ও বীভৎসের বা বীর ও ভয়ানকের, অথবা শান্ত ও রৌদ্রের

বা শান্ত ও শৃঙ্গারের বাধ্য-বাধক ভাব হইতে বিরোধ—এইজন্য ইহাদের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ কেমন করিয়া হইতে পারে ?

আনন্দবর্ধন এই সব অভিযোগের সহিত পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার যুগে রসের অঙ্গাঙ্গিভাবের বিরোধী কোন ধারাও বিদ্যমান ছিল এবং ইহার প্রমাণ এই যে ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রট প্রভৃতি সকলেই মহাকাব্যাদিতে রসের সমবেত বর্ণনারই উল্লেখ করিয়াছেন—কেবল একটি অঙ্গী রসের প্রতি কেহই ইঙ্গিত করেন নাই :

ভামহ—রসৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক্। কাব্যালংকার, ১.২১

দণ্ডী—রসভাবনিরন্তরম্। কাব্যাদর্শ ১.১৮

রুদ্রট—সর্বে রসাঃ ক্রিয়ন্তে কাব্যস্থানানি সর্বাণি। কাব্যালংকার ১৬.৫

কিন্তু আনন্দবর্ধন প্রাগুক্ত দুইটি অভিযোগের সমাধান উপস্থিত করিয়া ভরতের মতটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রথম অভিযোগের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক রসের নিজস্ব প্রসঙ্গে পূর্ণ পরিপোষ হইয়া যায় এবং উহা নিজস্ব প্রসঙ্গের পরিধির মধ্যে স্বচমৎকারিতায় বিশ্রান্তিলাভ করে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে অপরের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না—আর নয় তো কিছু তারতম্য অবশ্যই থাকিতে পারে কারণ প্রবন্ধ কাব্যের বিভিন্ন পরিস্থিতির অনুকূল কোন রসের বর্ণনা স্বভাবতঃই কম হইবে এবং কারো অধিক। অপর অভিযোগটির উত্তর এই যে বিরোধিতা নিরাকরণের নানা উপায় আছে যাহার দ্বারা কেবল রসের পরস্পর বিরোধই সমাপ্ত হয় না বরং উহাদের মধ্যে উপকার্য-উপকারক সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ এই উপায়গুলির সংখ্যা তিনটি। (১) একটি রস অঙ্গী হইলে পরে উহার বিরোধী অথবা প্রতিরোধী রসের অত্যন্ত (অঙ্গীর অপেক্ষা অধিক) পরিপোষ উচিত নয়। (২) অঙ্গী রসের বিরুদ্ধ ব্যভিচারী ভাবের অধিক নিবেশ করা উচিত নয় অথবা নিবেশ করিলে পরে অতি শীঘ্রই অঙ্গী রসের ব্যভিচারীতে পরিণত করা উচিত। (৩) অঙ্গীভূত রসের পরিপোষ করিলে পরেও উহার অঙ্গরূপতার প্রতি অবিরাম দৃষ্টি রাখা উচিত।—এইরূপে আনন্দবর্ধনের মতে রসের অঙ্গাঙ্গী বা উপকার্য-উপকারক সম্বন্ধের কল্পনা সর্বদা গ্রাহ্য। অভিনবগুপ্ত ও ধ্বন্যালোকের এই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রমাণ স্বরূপ ভাগুরি-নামক এক প্রাচীন আলঙ্কারিকের মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন : তথা চ ভাগুরিরপি, কিং রসানামপি স্থায়িসঞ্চারি তাস্তীতি আক্ষিপ্যাভ্যুপগমে নৈবোত্তরমবোচদ্ বাঢমিতি। ইহার পর, পরবর্তী আচার্যরা উল্লিখিত প্রকল্পনাটিকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধকাব্যে অঙ্গী রসের স্থিতির উল্লেখ করিয়াছেন :

একাঙ্গি রসমন্যদঙ্গমদ্ভুতান্তং রসোর্মিভিঃ।
অলঙ্ঘিতমলঙ্কারকথাঙ্গৈরগলদ্রসম্॥

নাট্যদর্পণ, ১, সূত্র ১২, কারিকা ১৫

—(নাটক রচনার সময় নাট্যকার যেন এই কথাগুলি মনে রাখেন যে উহাতে একটি রস প্রধান এবং অন্য রসগুলি অপ্রধান এবং শেষে অদ্ভুত রস যেন বিদ্যমান থাকে, কিন্তু

রসাধিক্য সত্ত্বেও (কথাভাগ) যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, ইহার সঙ্গে অলঙ্কার বা কথা প্রভৃতির থাকা সত্ত্বেও রসও যেন বিচ্ছিন্ন না নয়। (হিন্দী নাট্যদর্পণ, পৃ০ ৩৭)।

শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে ॥ সা০ দর্পণ, ৬.৩১৭

—মহাকাব্যে শৃঙ্গার, বীর ও শান্তের মধ্যে কোন একটি রস অঙ্গী হয়।

(বিমলা টীকা, পৃ০ ২২৫)

এইরূপে প্রকৃত পক্ষে, দুই-একটি অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও (যাহার সমাধান হইয়া যায়), প্রবন্ধকাব্যে অঙ্গী রসের স্থিতি সর্বদা স্পষ্ট এবং অসন্দিগ্ধ। জীবনের বৈবিধ্যময় এবং সর্বাঙ্গচিত্রণের জন্য প্রবন্ধ কাব্যের পক্ষে স্বভাবতঃ বিভিন্ন রসের বর্ণনা অনিবার্য এবং উহাদের মধ্যে এক ধরণের তারতম্য ও অঙ্গাঙ্গিত্বের সন্নিবেশ স্বাভাবিক। যেরূপে নানা প্রকারের কথা থাকা সত্ত্বেও একটি কথার আধিকারিকতা অনিবার্য, অথবা ইহাও বলা যায় যে ঘটনার বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কথা-বিধানের একটি ঘটনাতেই পরিণতি অনিবার্য এবং নানা পাত্রের সমারোহে একটি পাত্রের নায়কতা অসন্দিগ্ধ, সেইরূপে নানা রসের সম্ভারের মধ্যে একটি রসের অঙ্গিতাও স্বয়ংসিদ্ধ।[১]

অঙ্গী রসের লক্ষণ ঃ

(১) উল্লিখিত বিবেচনার আশ্রয়ে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের অনুসরণে অঙ্গী রসের প্রধান লক্ষণ—বহুব্যাপ্তি। প্রবন্ধেষু প্রথমতরং প্রস্তুতঃ সন্ পুনঃ পুনরনুসন্ধীয়মানত্বেন স্থায়ী যো রসঃ··· (ধ্বন্যালোক ৩/২২-এর বৃত্তি)—অর্থাৎ কাব্য প্রবন্ধে যে রস প্রথমে প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং বারংবার অনুসন্ধানের ফলে যাহা স্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে····। প্রবন্ধ কাব্যে অভিব্যক্ত নানা রসের মধ্যে যে রস কথাবস্তুর মধ্যে সর্বাধিক ব্যাপ্ত থাকে, তাহাই অঙ্গীরস। প্রবন্ধ কাব্যের রস-বিধানে অঙ্গীরসের স্থিতি ঠিক সেইরূপ যেরূপ রস-পরিপাকে স্থায়ী ভাবের। রস-পরিপাকে সঞ্চারী ভাবগুলি উন্মগ্ন নিমগ্ন হইয়া নিজ-নিজ স্থায়ী ভাবকে পোষণ করে, সেইরূপ প্রবন্ধ কাব্যে অন্য অঙ্গভূত রস অঙ্গী রসকে সমৃদ্ধ করে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় লক্ষণ অত্যন্ত প্রামাণিক, কিন্তু অনেক সময় অনিশ্চিত অবস্থায় রস-নির্ণয়ের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ রূপে কার্যকরী হয় না। এইজন্য কয়েকটি সহায়ক লক্ষণের সংকেতও ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

(২) একটি সহায়ক লক্ষণ এই যে অঙ্গী রসে মুখ্য পাত্রের—পুরুষ অথবা

---

১. কার্যমেকং যথা ব্যাপি প্রবন্ধস্য বিধীয়তে।
তথা রসস্যাপি বিধৌ বিরোধো নৈব বিদ্যতে ॥ ধ্বন্যালোক ৩.২৩

যেমন একটি মূল ঘটনাকেই সমগ্র কাব্যপ্রবন্ধে ব্যাপ্ত রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেইরূপ একটি প্রধান রসের ব্যবহারেও কোন বিরোধ থাকিতেই পারে না।

নারী, যিনি কথার সঞ্চালন করিতেছেন—তাঁহার মূলবৃত্তির প্রতিফলন হয়। তত্ত্ব-রূপে প্রবন্ধ কাব্যের সম্পূর্ণ বিস্তার নায়কের জীবন-সাধনারই প্রসাররূপে হয়। যেরূপে জীবন সাধনার দুইটি পক্ষ—কর্ম এবং ভাব, সেইরূপে কথাবস্তুরও দুইটি পক্ষ—ঘটনা ও ভাব এবং নায়কের চরিত্রের মূলবৃত্তি এই দুইটি পক্ষের সঞ্চালন করে। এই মূলবৃত্তি কর্ম-পক্ষে চরম ঘটনা এবং ফলাগমের নির্ধারণ করে এবং ভাব-পক্ষে মূল ভাব বা অঙ্গী রসের নির্ধারণ করে। নাট্য দর্পণকার এই তথ্যটিকে নিজের ভঙ্গীতে প্রকাশিত করিয়াছেন—"নায়কের ঔচিত্যানুসারে যে কোন একটি রস প্রধান হইবে (ইহা 'একাঙ্গিরসম্' এর অর্থ)। 'অন্য' অর্থাৎ প্রধান রস হইতে ভিন্ন রস উহার অঙ্গ অর্থাৎ গৌণ হইবে। নাটকে (যদিও) সকল রসই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু একটি রস প্রধান এবং উহা হইতে ভিন্ন সব গৌণ হইবে। শেষে অর্থাৎ নির্বহণ সন্ধিতে অদ্ভুত রস হওয়া আবশ্যক। কারণ শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র রসের দ্বারা স্ত্রী-রত্ন অথবা রাজ্যপ্রভৃতির লাভ ও শত্রুর বিনাশ প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। এবং করুণ, ভয়ানক ও বীভৎসের দ্বারা (প্রতিনায়ককে) সেইসব (স্ত্রী-রত্ন, রাজ্য প্রভৃতির প্রাপ্তি) হইতে নিবৃত্তি হয়। এইজন্য এইরূপে (সকল রসেরই নাটকে উপযোগ হয় এবং) লোকোত্তর অসম্ভাব্য ফল-প্রাপ্তির জন্য শেষে অদ্ভুত রস হওয়া আবশ্যক। হিন্দী নাট্যদর্পণ, পৃ০ ৩৭)।" যদিও এই উদ্ধরণে লক্ষণের রূপ একেবারে স্পষ্ট হয় নাই, কিন্তু বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা উল্লিখিত তথ্যের উপলব্ধি নিশ্চিতভাবে হইয়া যায়। এখানে দুইটি তথ্যের স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে: (ক) প্রধান রসের সহিত নায়কের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে; (খ) প্রবন্ধ কাব্যের কথাবস্তুতে মূলতঃ নায়কের কার্য-ব্যাপার এবং রাজ্য প্রাপ্তি, স্ত্রী-রত্ন প্রাপ্তি প্রভৃতিরই বর্ণনা থাকে এবং তদনুসারে এই সকল কার্যব্যাপার ও উপলব্ধির রাগাত্মক রূপ বীর, শৃঙ্গার প্রভৃতি রস উহাতে মুখ্যরূপে বিদ্যমান থাকে। ইহার সংশ্লেষণ করিলে পরে নিম্ন সংজ্ঞা নিরূপিত হয়, নায়কের চরিত্রের মূলবৃত্তি এবং উহার ভিত্তিতে অর্জিত সিদ্ধির (বা ফলাগম) দ্বারা অঙ্গী রসের নির্ধারণে সহায়তা পাওয়া যায়।

(৩) এই যুক্তি-ধারার অনুসরণে অঙ্গীরসের তৃতীয় লক্ষণ এইরূপ করা যাইতে পারে যে অঙ্গী রস মূল উদ্দেশ্য বা ফলাগমের আস্বাদ-রূপ; অন্য ভাবে বলিতে গেলে, ইহা সারভূত প্রভাবের অভিব্যঞ্জক-রূপ হয়। প্রকৃত পক্ষে, ফলের নির্ণয় অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় পদ্ধতিতে ফল যোগের ভিত্তিতে হয় এবং এই কথাই জয়শঙ্কর প্রসাদ, আচার্য শুক্লের দ্বারা কথিত নিম্নতর রস-বর্গের স্থাপনার বিরোধে লিখিয়াছেন। পাশ্চাত্য কাব্য শাস্ত্রেও সারভূত প্রভাবকে নির্ণায়ক তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ কাব্যের ভাবন করিবার পর যে স্থায়ী মনঃস্থিতির নির্মাণ হয় কাব্যাস্বাদের দৃষ্টিতে উহাই প্রমুখ। প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক আলোচক আই০ এ০ রিচার্ড্সের মতানুসারে এই ধরণের মনঃস্থিতি (Attitude) রূপেই কাব্যাস্বাদ অন্তিম পরিণতি লাভ করে। ভারতীয় রস-ধ্বনি সিদ্ধান্তের অন্তর্গত প্রবন্ধ-ধ্বনির কল্পনার দ্বারা এই ধারণার আরও পুষ্টি হয়। রস-ধ্বনির ব্যাপ্তি কাব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবয়ব—উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতি হইতে কাব্যের সর্বাধিক ব্যাপক

রূপ—মহাকাব্য প্রভৃতি পর্যন্ত স্বীকার করা হইয়াছে। যে রূপে শব্দ এবং অর্থে পৃথক-পৃথক ধ্বনি বিদ্যমান থাকে সেইরূপে প্রবন্ধ কাব্যের সমস্ত অঙ্গেরও একটি সমবেত ধ্বনি হয়। এই সমবেত ধ্বনিই বিচারের ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বা 'সন্দেশ-বাণী' (Message) এবং ভাবের ক্ষেত্রে অঙ্গী রস। বিশ্বনাথ স্পষ্ট বলিয়াছেন ঃ প্রবন্ধে যথা মহাভারতে শান্ত ঃ, রামায়ণে করুণঃ, মালতীমাধবরত্নাবল্যাদৌ শৃঙ্গার ঃ—'মহাভারতে' শান্ত, 'রামায়ণে' করুণ, 'মালতীমাধব', 'রত্নাবলী' প্রভৃতিতে শৃঙ্গার ইত্যাদি সমস্ত প্রবন্ধতে ব্যঙ্গ্য হইয়াছে। (সাহিত্যদর্পণ, বিমলা টীকা, পৃ০ ১৪৭)।

এইরূপে সংস্কৃত-কাব্যশাস্ত্রের অঙ্গীরস-কল্পনাও একটি অত্যন্ত রুচিকর প্রসঙ্গ। প্রবন্ধ কাব্যের আস্বাদনের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করিবার জন্যই বোধ হয় ইহার কল্পনা করা হইয়াছিল এবং এই দৃষ্টিতে ইহার গুরুত্বও অসন্দিগ্ধ।

■ ■ ■

(গ) রস-বিঘ্ন

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে রস-বিঘ্ন অর্থাৎ রস-ভঙ্গের নানা কারণের বিবেচনা কবি এবং সহৃদয়—রসের স্রষ্টা ও ভোক্তা—উভয়ের দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কাব্যগত রসভঙ্গও সাধন রূপই যেহেতু রসভঙ্গ সহৃদয়ের চেতনাতেই হয়। রসের স্থিতি সহৃদয়ের চিত্তে এবং সেইজন্য রসভঙ্গ সহৃদয়ের চেতনাতেই হয়। এইরূপে কাব্যগত রসভঙ্গ সহৃদয়গত রসভঙ্গেরই একটি প্রমুখ কারণ বলিয়া গৃহীত।

(ক) কবির দৃষ্টিতে

আনন্দবর্ধন কবির দৃষ্টিতে রসভঙ্গের মুখ্যতঃ পাঁচটি কারণ স্বীকার করিয়াছেন :

বিরোধিরসসম্বন্ধিবিভাবাদিপরিগ্রহঃ।
বিস্তরেণান্বিতস্যাপি বস্তুনোঽন্যস্য বর্ণনম্ ॥
অকাণ্ড এব বিচ্ছিত্তিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্
পরিপোষং গতস্যাপি পৌনঃপুন্যেন দীপনম্।
রসস্য স্যাদ্ বিরোধায় বৃত্ত্যনৌচিত্যমেব চ ॥[১]

অর্থাৎ (১) প্রস্তাবিত রসের বিরোধী রসের সম্পর্কিত বিভাবাদির গ্রহণ।

(২) অপ্রাসঙ্গিক অন্য বস্তু (রসের সহিত) সম্পর্কিত হইলেও তাহার বিস্তারিত বর্ণন।

(৩) উপযুক্ত অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত অবসর ব্যতিরেকে রসের প্রকাশ।

(৪) যে রস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বারংবার তাহারও প্রকাশন।

(৫) বৃত্তির অনৌচিত্য।

পরবর্তী যুগে রসদোষরূপে ইহার ব্যাখ্যান ও বিস্তার ঘটে এবং ইহার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায় :

ব্যভিচারিরসস্থায়িভাবানাং শব্দবাচ্যতা।
কষ্টকল্পনয়া ব্যক্তিরনুভাববিভাবয়োঃ ॥
প্রতিকূলবিভাবাদিগ্রহো দীপ্তিঃ পুনঃ পুনঃ।
অকাণ্ডে প্রথনচ্ছেদৌ অঙ্গস্যাপ্যতিবিস্তৃতিঃ ॥

---

১. ধ্বন্যালোক (জ্ঞানমণ্ডল, ১৯৬২) পৃ০ ২১২-১৩

অঙ্গিনোঽননুসন্ধানং প্রকৃতীনাং বিপর্যয়ঃ।
অনঙ্গস্যাভিধানং চ রসে দোষাঃ স্যুরীদৃশাঃ ॥

—অর্থাৎ নিজ-নিজ বাচক শব্দের দ্বারা ব্যভিচারী ভাব, রস অথবা স্থায়ী ভাবের উক্তি (স্বশব্দবাচ্যতা), বিভাব-অনুভাবের প্রতীতি বিষয়ে কষ্ট কল্পনা, (রসের) প্রতিকূল বিভাব প্রভৃতির গ্রহণ, পুনঃ-পুনঃ (রসের) দীপ্তি, অস্থানে রসের বিস্তার অথবা অসময়ে ছেদ টানা, অপ্রধান (অঙ্গীভূত) রসকে অতি বিস্তৃত করা (অঙ্গী) প্রধান রসের উদ্বোধন না হওয়া (ভুলিয়া যাওয়া), প্রকৃতির বিপর্যয় (অর্থাৎ পাত্রদের স্বভাব গুণের অননুরূপ বর্ণনা করা) এবং অনঙ্গ (অর্থাৎ প্রকৃত রসের উপকারক নয়) রসের বর্ণনা, এই সমস্তই রসগত দোষ।১

মম্মটের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত এই সব রস-বিঘ্নের মধ্যে তিন-চারটি নূতন : যথা স্বশব্দবাচ্যত্ব, বিভাব-অনুভাবের প্রতীতি বিষয়ে কষ্ট কল্পনা, অঙ্গীর উপেক্ষা এবং অনঙ্গের কথন—এবং ইহাদের মধ্যে শেষের দুইটি, এক প্রকারে, ধ্বনি-কারের 'বস্তুনোঽন্যস্য বর্ণনম্'-এর অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত রস-বিঘ্নের বিশ্লেষণ করিলে পরে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে যদিও ইহা-দের মধ্যে অধিকাংশ বিঘ্নের অনুসন্ধান মুক্তকেও করা যাইতে পারে তবুও ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ বিঘ্নগুলি প্রবন্ধের আলোচনাতেই কথিত হইয়াছে এবং ইহা নিশ্চিত যে বিদ্বানেরা অন্তিম সাতটি দোষের কল্পনা প্রায় প্রবন্ধের সন্দর্ভেই করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই যে এই দোষগুলির মধ্যে কোনটিও অপরিহার্য নয়—প্রত্যেকটির পরিহারের উপায় বাহির করা সম্ভব। এই বিচারযুক্তিটি সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রের আচার্যদের ব্যবহার বুদ্ধির সুন্দর প্রমাণ : দোষের কল্পনা সর্বথা নির্ভ্রান্ত যদিও উহা কোথাও বদ্ধমূল হয় নাই। এমন খুবই অল্প দেখা গিয়াছে যে কোন পদ বা কাব্য, যাহার সরসতা সিদ্ধ এবং অসন্দিগ্ধ, কেবল একাধটি পরিগণিত দোষের অবস্থিতির জন্য তিরস্কৃত হইয়াছে।

প্রত্যেকটি দোষের পৃথক্ বিবেচনার দ্বারা উহার স্বরূপ ও প্রভাব আরও স্পষ্ট হইতে পারিবে।

সামান্য রসদোষ

(১) স্বশব্দবাচ্যতা—রস অথবা ভাবের নিজ বাচক শব্দের দ্বারা কথন রসাস্বাদে বাধা উৎপন্ন করে। এই বক্তব্য সমর্থনের কারণ এই যে কাব্যে রস অথবা ভাবের ব্যঞ্জনাই হয় কথন নয়; কথনের দ্বারা কেবল তথ্যবোধ হয়, প্রত্যক্ষ প্রতীতি তো ব্যঞ্জনার দ্বারাই সম্ভবপর। ভাবের বিষয়ে তথ্যবোধ, পরোক্ষ জ্ঞান রূপ হওয়ার জন্য, বুদ্ধির ক্রিয়া এবং অপরদিকে ভাবের সাক্ষাৎকারাত্মক প্রতীতি আস্বাদ রূপ হওয়ার জন্য চিত্তের

১. কাব্যপ্রকাশ (জ্ঞানমণ্ডল, ১৯৬০), পৃ০ ৩৫৭-৫৮

ক্রিয়া বলিয়া ধরা হয়। অতএব রস বা ভাবের অভিধান রসাস্বাদের সাধক তো কোন মতেই হইতে পারে না, চিত্তের ক্রিয়ায় বুদ্ধি সংক্রমিত হইলে বিপরীতে পরে বাধকই হইয়া পড়ে। এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে যে ভাবের বাচক শব্দের দ্বারা কথন না করিয়া অনুভাবের দ্বারা অভিব্যঞ্জন—অর্থাৎ মূর্ত রূপে উপস্থাপন করা উচিত। 'লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইলেন' বা 'উর্মিলা লজ্জিত হইলেন'—ইহা শুনিয়া কেবল তথ্যবোধ হয়, কিন্তু যখন আমরা ইহা শুনি যে 'লক্ষ্মণের নেত্র রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল' বা 'উর্মিলার নয়ন নত হইয়া গেল', তখন আমরা কল্পনার দ্বারা ক্রোধ অথবা লজ্জার সাক্ষাৎকার করি এবং এই সাক্ষাৎ অনুভব সম্বদ্ধ ভাবের প্রতীতিতে স্পষ্ট সাহায্য করে। আচার্য শুক্লের ভাষায় প্রথমটির দ্বারা অর্থ বোধ হয় এবং অপরটির দ্বারা বিম্ব-গ্রহণ হয়। পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রে—বিশেষ করিয়া আধুনিক কাব্য-শাস্ত্রে—বিম্বকে কাব্যের প্রমুখ মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ঃ কাব্যের অভিব্যক্তি এবং অনুভূতির মুখ্য মাধ্যম বিম্বই। অতএব উল্লিখিত দোষ-কল্পনা নিশ্চিতরূপে দৃঢ় মনোবৈজ্ঞানিক আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'স্বশব্দবাচ্যত্ব'-এর পুঁথিগত অর্থে এবং নির্বিবেক রীতিতে আরোপণ করিলে কাব্যের বিবেচনা ও মূল্যাঙ্কনে ত্রুটি হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এখানে অভিপ্রেত কেবল ইহাই যে রসের প্রসঙ্গে বিম্ব-বিধান সাধক এবং তথ্য-কথন বাধক। যেখানে কেবল তথ্য-কথন হইয়াছে সেখানে রস-প্রতীতি নিশ্চিত ভাবে বাধিত হয় ঃ

সীতা ভী নাতা তোড় গঈ,
ইস বৃদ্ধ সসুর কো ছোড় গঈ।
উর্মিলা বহু কী বড়ী বহন।
কিস ভাঁতি করূঁ মৈঁ শোক সহন?

(সাকেত, ২০০৫ বি০, পৃ০ ১১৮)

উল্লিখিত পদে 'শোক' এর—তথ্যের কথন মাত্র হইয়াছে, অতএব রস-প্রতীতি বাধিত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে—

কৌসল্যা ক্যা করতী থীঁ?
চুপ-চুপ ধীরজ ধরতী থীঁ।

(সাকেত, পৃ০ ৭৮)

এখানেও 'ধৃতি'র কথন মাত্র হইয়াছে; এইজন্য 'ভাব' এর প্রতীতি হইতে পারে নাই এবং শেষে রসের পরিপাকও অসিদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে।[১]

---

১. উল্লিখিত পদগুলিকে মুক্তকরূপে গ্রহণ করিলে পরেই উহাদের মধ্যে রস-দোষের অবস্থিতি গ্রাহ্য হইবে; প্রবন্ধে এই ধরণের ইতিবৃত্ত-কথন অনিবার্য এবং নীরস বলিয়া উহাদের তিরস্কৃত করা যাইতে পারে না, কারণ প্রবন্ধে বিশিষ্ট রস-প্রসঙ্গের সহিত উহাদের যে সম্পর্ক তাহা উহাদের মধ্যে সরসতার সঞ্চার করিতে থাকে।

এখান পর্যন্ত সবই ঠিক কিন্তু ইহার পরে ভাব বা রসের নামমাত্র উল্লেখ হইলে পরে যে রসভঙ্গের কথা বলা হয় তাহা অব্যবহারিক ও অসমীচীন :

মানস-মন্দির মেঁ সতী পতি কী প্রতিমা থাপ ।
জলতী-সী উস বিরহ্ মেঁ বনী আরতী আপ ॥

(সাকেত, সম্বৎ ২০০৫, পৃ০ ১৯১)

অথবা

প্রলয় মেঁ ভী বচ রহে হম, ফির মিলন কা মোদ,
রহা মিলনে কো বচা সূনে জগত কী গোদ ।
জ্যোৎস্না-সী নিকল আঈ ! পার কর নীহার,
প্রণয়-বিধু হৈ খড়া নভ মেঁ লিয়ে তারক-হার ॥

(কামায়নী, প্র০ সং, পৃ০ ৯২)

'সাকেত' এর পদে 'বিরহ্' কামায়নীর পংক্তিগুলিতে 'প্রণয়' এর স্বশব্দবাচ্যত্ব স্পষ্ট, কিন্তু এখানে কি রসভঙ্গ হইয়াছে ? দোষ-পরিহারের এখানে কোন উপায় নাই —অর্থাৎ শব্দে পরিবর্তন করিয়া—'জলতী-সী উর-অগ্নি মেঁ' বা অন্য কোন সংশোধনের দ্বারাও কোন বিশেষ লাভ হয় না । এইরূপে—

হঁস সীতা কুছ সকুচাঈ, আঁখেঁ তিরছী হো আঈ ।
লজ্জা নে ঘূঁঘট কাঢ়া,—মুখ কা রঙ্গ কিয়া গাঢ়া ॥

(সাকেত, পৃ০ ৭৬)

অথবা

গির রহীঁ পলকেঁ, ঝুকী থী নাসিকা কী নোক ।
ভ্রূলতা থী কান তক বঢ়তী রহী বেরোক ।
স্পর্শ করনে লগী লজ্জা ললিত কর্ণ কপোল ।
খিলা পুলক কদম্ব-সা থা ভরা গদ্‌গদ বোল ॥

(কামায়নী, পৃ০ ৯৪)

উপর্যুক্ত পদে কেবল 'লজ্জা'-র স্বশব্দবাচ্যত্বের জন্য রসভঙ্গকে স্বীকার করিয়া লওয়া রসিকজনসুলভ হইবে না । যদিও এই পদটি সর্বথা নির্দোষ নয়, কিন্তু স্বশব্দ বাচ্যত্ব এখানে রসের প্রতিবন্ধক হয় নাই । এই কথা বলাও এখানে যুক্তিযুক্ত হইবে না যে কোন-কোন স্থানে ভ্রান্তির নিবারণের জন্য ভাবের স্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, কারণ এখানে তো কোনরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনাই নাই ।—অতএব প্রকৃত ব্যাপার- এই যে ভাবের কথন মাত্রই রসভঙ্গের কারণ হয়, যেখানে অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা বিম্ব- বিধান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে সেখানে ভাবের মাত্র নামোল্লেখ অনিবার্যরূপে বাধক হইতে পারে না । হিন্দী আলংকারিকদের দ্বারা উদ্ধৃত নানা উদাহরণের বিশ্লেষণ করিয়া এই তথ্যটিকে প্রমাণিত করা যাইতে পারে :

রসের স্বশব্দবাচ্যত্ব ঃ

(১) হোঁ বলি চলি বাকো ছিনক লীজৈ আজু নিহার।
উমগত হৈ চহুঁ ওর ছবি মানহু রস শৃঙ্গার ॥
(রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৪৮)

(২) মুখ সুখহিঁ লোচন স্রবহিঁ শোকন হৃদয় সমায়।
মনহুঁ করুণ রস কটক লৈ উতরা অবধ বজায় ॥
(কাব্যদর্পণে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩০২)

স্থায়ীর স্বশব্দবাচ্যত্ব ঃ

(১) টুটে টাটি ঘুন ঘনে ঘুম-ঘুম সেন সনে,
ঝীঁগুর ছগোড়ী সাঁপ বিচ্ছিন্ কী ঘাত জূ;
কন্টক কলিত তৃন বলিত বিগন্ধ জল,
তিনকে তলপ তল তাকো ললচাত জূ।
ফুলটা কুচীল গাত অন্ধতম অধরাত,
কহি ন সকত বাত অতি অকুলাত জূ;
ছেড়ি মেঁ ঘুসে কি ঘর ঈঁধন কে ঘনস্যাম,
ঘর-ঘরনীনি য়হ জাত ন ঘিসাত জূ ॥
(রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৫০)

(২) শরদ নিশা প্রীতম প্রিয়া, বিহরতি অনুপম ভাঁতি।
জ্যোঁ-জ্যোঁ রাত সিরাত অতি, ত্যোঁ-ত্যোঁ রতি সরসাতি ॥
(সিদ্ধান্ত ঔর অধ্যয়ন হইতে গৃহীত, পৃঃ ১৬৫)

ব্যভিচারীর স্বশব্দবাচ্যত্ব ঃ

(১) নিসি জাগী লাগী হিয়ে প্রীতি উমঙ্গত প্রাত।
উঠি ন সকত আলস বলিত সহজ সলোনে গাত ॥
(জগদ্বিনোদ), (রসমঞ্জরী হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৫২)

(২) জানি গৌরি অনুকূল, সিয়-হিয়-হর্ষ ন জাত কহি।
(কাব্যদর্পণ হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩০২)

ইহা সত্য যে উল্লিখিত রচনাগুলির মধ্যে কোনটিতেও রসের সম্যক্ পরিপাক হয় নাই, কিন্তু এই দোষের জন্য স্বশব্দবাচ্যত্বকে দায়ী করা যাইতে পারে না। রস-বিষয়ক কবিতাগুলিতে প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গার ও করুণ রস গৌণ ও উৎপ্রেক্ষা অলংকার প্রমুখ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু শৃঙ্গার ও করুণের শুধু মাত্র কথনের জন্য রসে ব্যাঘাত হয় নাই। এইরূপে স্থায়ীভাব-সম্বন্ধিত কবিতাগুলিতে ও 'ঘিনাত' ও 'রতি' শব্দের কেবল মাত্র উপস্থিতির জন্য রসভঙ্গ হয় নাই। কেশব দাসের উদ্ধৃত কবিত্ত ছন্দে লেখা কবিতা

সম্বন্ধে শেঠ কনহৈয়ালাল পোদ্দার (রস-মঞ্জরী, পৃ০ ২৫০) বলিয়াছেন : "রসিক প্রিয়ায় এই কবিতাটিকে বীভৎস-রসের উদাহরণ বলা হইয়াছে। 'ঘিনাত' শব্দের দ্বারা স্পষ্ট কথন দোষ হইয়া পড়িয়াছে। যদিও 'অসূয়া' সঞ্চারী ভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়" ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এই কবিতায় সন্দর্ভানুসারে অসূয়ার অভিব্যক্তিই প্রমুখ রূপ ধারণ করিয়াছে কারণ সকল রসেরই শৃঙ্গারপরক বর্ণনা কেশবদাসের অভীষ্ট ছিল, তবুও ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত হইবে যে 'ঘিনাত' শব্দের অবস্থিতির জন্য বীভৎস রসের-উচিত পরিপাক এখানে সম্ভবপর হয় নাই। বক্তার দৃষ্টিতে নিশ্চিতরূপে 'অসূয়া'-র অভিব্যক্তিই উদ্দিষ্ট, কিন্তু অসূয়ার অভিব্যক্তি এখানে 'বীভৎস' রসের দ্বারা করা হইয়াছে—এবং ইহাতে কোন দোষও হয় নাই কারণ বীভৎস ও শৃঙ্গারের আলম্বন ভিন্ন : প্রথমটির আলম্বন প্রতিযোগিনী নায়িকা এবং অপরের আলম্বন নায়ক। 'জুগুপ্সা' ও 'ঈর্ষা'র একই বিষয়—নায়িকা; কিন্তু এই দুইটিই অবিরোধ ভাব সেইজন্য ঈর্ষা প্রায় ঘৃণারই রূপ ধারণ করে। অতএব ঈর্ষার পুষ্টি এখানে 'জুগুপ্সার' দ্বারা হইতেছে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে বিবেচ্য কবিতাটিতে বীভৎস রসের পরিপাক অবশ্যই হইয়াছে। (ইহা ভিন্ন কথা যে উহার স্থিতি গৌণ)—এবং 'ঘিনাত' এর স্বশব্দবাচ্যতার জন্য রসভঙ্গ হয় তাই। 'সিদ্ধান্ত ও অধ্যয়ন' পুস্তকে উদ্ধৃত এই দোহা—কবিতাটি এমনিও খুব সরস নয়, তবুও উহার সম্পূর্ণ দোষ 'রতি'র স্বশব্দবাচ্যতার উপর আরোপ করিলে ঠিক হইবে না। এই কথা ব্যভিচারী ভাবের পক্ষেও সঙ্গত। 'রসমঞ্জরী'তে উদ্ধৃত পদ্মাকরের দোহা-কবিতাটি রতিশ্রান্তা রমণীর একটি সুন্দর চিত্র। এখানে বিভাব অর্থাৎ আলম্বন এবং উহার উদ্দীপক অনুভাবের সজীব চিত্রণের দ্বারা, 'আলস'এ স্বশব্দবাচ্যত্বের দোষ থাকা সত্ত্বেও, শৃঙ্গার-রসের সাফল্যের সহিত অভিব্যক্তি হইয়াছে। 'কাব্যদর্পণে' উদ্ধৃত উদাহরণটি স্বয়ং খুব বেশী সরস নয়, কিন্তু উহার জন্যও 'হর্ষ' শব্দটি দায়ী নয়। কাব্যপ্রকাশের উদাহরণ এবং উহার যে সংশোধন তাহার বিশ্লেষণ করিলেও আমাদের এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। [দ্রষ্টব্য, কাব্যপ্রকাশ (জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ৩৫৮]

উল্লিখিত বিশ্লেষণের সারাংশ এই যে স্বশব্দবাচ্যত্ব—দোষের উদ্ভাবনার মূল উদ্দেশ্য 'রস ব্যঞ্জিত হয়' ইহা সিদ্ধ করা এবং রসের ব্যঞ্জনা তখনই সিদ্ধি লাভ করে যখন রসের অভিধানকে নিষিদ্ধ করা হয়। অতএব এখানে বাস্তবিক অর্থটিকেই গ্রহণ করা উচিত—শব্দ মাত্রের প্রয়োগ দোষ কারক নয়, ব্যঞ্জনার অভাব এবং রসের কথনমাত্র দোষ; এক-আধটি বাচক শব্দ থাকিলে পরেও যদি বিম্ব-বিধান স্পষ্ট ও পূর্ণ হয় তাহা হইলে সেখানে দোষ হইবে না কারণ অধিকাংশ প্রসঙ্গে রসের ব্যঞ্জনা প্রায় একটি শব্দের জন্য সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হয় না। এইজন্য 'হিন্দী কবিবৃন্দরা এই দোষটির উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেন নাই।'

(২) বিভাব এবং অনুভাবের কষ্ট-কল্পনা—রসের আধার স্থায়ী ভাব এবং স্থায়ী ভাবের উদ্‌বুদ্ধির কারণ বিভাব ও অভিব্যক্তির সাধন অনুভাব। পরিণামে রসের অভিব্যক্তি এবং সহৃদয়ের দ্বারা উহার প্রতীতি বিভাব ও অনুভাবের উপরেই মুখ্যরূপে

নির্ভরশীল। অতএব বিভাব, অনুভাবের স্পষ্ট প্রতীতি রস-পরিপাকের জন্য অনিবার্য এবং ইহাদের প্রতীতিতে বাধা আসিলে পরে রসের ব্যাঘাতও অনিবার্য—

পরিহরতি রতিং মতিং লুনীতে স্খলতি ভৃশং পরিবর্ততে চ ভূয়ঃ।
ইতি বত বিষমব দশাস্য দেহং পরিভবতি প্রসভং কিমত্র কুর্মঃ।।

—অর্থাৎ (এই নায়ক কামিনীর বিয়োগে) অস্থির, (উহার) বিবেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে (কর্তব্যাকর্তব্যের কোনও জ্ঞান নাই), সে (চলিতে-চলিতে বা উঠিয়া-উঠিয়া) পড়িয়া যাইতেছে, এবং (মাটিতে) বার-বার লুটিয়া পড়িতেছে। এইরূপে তাহার শরীরের দশা ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা খুব দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমরা এই (পরিস্থিতিতে কি সাহায্য) করিতে পারি (ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।)

এখানে (বর্ণিত) অস্থির প্রভৃতি অনুভাব (কেবল শৃঙ্গার রসেই নয় বরং) করুণ (প্রভৃতি পদের জন্য ভয়ানক ও বীভৎস রস) প্রভৃতিতেও হইতে পারে। এইজন্য কামিনী রূপ (আলম্বন) বিভাব (এখানে অভিপ্রেত, ইহার) প্রতীতি বেশ দুরূহ। (অতএব এখানে বিভাবের কষ্ট-কল্পনা রূপ দোষ বিদ্যমান।)

(কাব্যপ্রকাশ (জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ৩৬০)

অথবা

উঠতি গিরতি ফির-ফির উঠতি, উঠি-উঠি গিরি-গিরি জাতি।
কহা করৌঁ কাসে কহৌঁ, ক্যোঁ জাবৈ য়হ রাতি॥

এই কবিতায় ইহা বোধগম্য হওয়া কঠিন যে কি কারণে স্ত্রীর এমন দশা হইল, ইহাতে সাধারণ ব্যাধি ও বিরহের ব্যাধির মধ্যে অন্তর স্পষ্ট নয়।

(সিদ্ধান্ত ও অধ্যয়ন, পৃ০ ১৬৬)

(৩) **বিবক্ষিত রসের প্রতিকূল বিভাবাদির বর্ণনা**—প্রতিকূল বিভাবাদির দ্বারা রস-বিরোধের চর্চা আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি। সাহিত্যদর্পণে ইহার নিম্নলিখিত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ঃ

মানং মা কুরু তন্বঙ্গি জ্ঞাত্বা যৌবনমস্থিরম্।

—হে তন্বী! যৌবন নশ্বর ইহা বিচার করিয়া মান করা উচিত নয় (সা০ দ০ বিমলা টীকা, পৃ০ ২৪৯)

হিন্দীতে সেঠ কন্হৈয়ালাল মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা ও পণ্ডিত রাম দহিন মিশ্র বচ্চনের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

(১) মধু কহতা হৈ ব্রজবালে! উন পদ-পদ্মো কা করকে ধ্যান,
জাও জহাঁ পুকার রহা হৈ শ্রীমধুসূদন মোদ-নিধান।
করো প্রেম-মধু-পান শীঘ্র হী যথাসময় কর যত্ন-বিধান,
যৌবন কে সু-রসাল-যোগ মেঁ কাল-রোগ হৈ অতি বলবান॥

(রস মং০, পৃ০ ২৫৬)

(২) ইস পারে প্রিয়ে মধু হৈ তুম হো,
উস পার ন জানে ক্যা হোগা ? (কাব্যদর্পণ, পৃ০ ৩০৩)

এখানে প্রশ্ন এই যে 'যৌবন কী অস্থিরতা' বা 'উস পার'এর চিন্তা শান্ত রসের উদ্দীপন এবং শৃঙ্গার প্রসঙ্গে উহার বর্ণনা প্রস্তাবিত রসের পরিপাকে বাধক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে সংস্কৃতের পংক্তিতে কাব্যের মানের প্রসঙ্গে যৌবনের অস্থিরতার চিন্তা শৃঙ্গারের বাধক। এইরূপে উদ্ধৃত প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতায় যদি শৃঙ্গারের বিবক্ষাকে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সেখানেও রস বাধিত, কিন্তু বিরহিণী ব্রজাঙ্গনাবিতায় 'মধুরা ভক্তি' ও বচ্চনের কবিতায় রুগ্ন প্রেমিক কবির অবসাদ জন্য 'নির্বেদ'এর অভিব্যক্তিকে স্বীকার করিয়া লইলে পরে উল্লিখিত রসবাধার নিরাকরণ হইয়া যায়।

প্রবন্ধগত রসদোষ

(৪) বারংবার রসের বর্ণনা—কোন রসের পরিপাক হওয়ার পরেও উহার পুনঃ পুনঃ বর্ণনা বৈরস্য উৎপন্ন করে ঃ পরিপুষ্ট রসের বারংবার বর্ণনা পরিম্লান কুসুম-পরিমলের অনুরূপ বৈরস্যের কারণ হয়—সংস্কৃতে 'কুমারসম্ভব'এর চতুর্থ সর্গে বর্ণিত রতি-বিলাপ ও হিন্দীতে 'সাকেত'এর নবম সর্গে বা 'প্রিয়প্রবাস'এর কতিপয় সর্গে বিপ্রলম্ভের পুনঃ পুনঃ দীপ্তি (বর্ণনা) ইহার উদাহরণ। ধ্বনিকার 'পরিম্লান-কুসুম' -এর দৃষ্টান্তের অনুসরণে এই দোষের বাস্তবিক স্বরূপের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে করিয়াছেন। রসের পরিপোষ হওয়ার পরেও উহার বারংবার বর্ণনা করিলে বৈচিত্র্য ও চমৎকার-এর হানি হয় এবং শ্রোতা বা পাঠকের বিরক্তি ধরে, অতএব এইরূপ প্রসঙ্গ নিশ্চিতরূপে রসের বাধক হইয়া ওঠে।

(৫) **অনবসরে বিস্তার**—প্রসঙ্গের বিরুদ্ধে বা উহা হইতে অসম্বদ্ধ রসের বিস্তারও রসভঙ্গের প্রমুখ কারণ। জীবন এবং উহার প্রতিলেখরূপ কাব্যেও অবসরের অনুকূল ব্যবহারের নামই ঔচিত্য, অতএব প্রসঙ্গ হইতে অসম্বদ্ধ বা উহার বিপরীত রসের বর্ণনাও ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না—এমন রসের বিস্তারের তো প্রশ্নই ওঠে না। উদাহরণস্বরূপ 'বেণীসংহার'—নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে অনেক বীরের মরণের প্রসঙ্গ আরম্ভ হওয়ার পরে দুর্যোধন ও ভানুমতীর সম্ভোগ শৃঙ্গারের বর্ণনা এইধরণেরই একটি দোষ। হিন্দীতে 'রামচন্দ্রিকা'র অন্তর্গত দশরথ-মৃত্যু হইতে উৎপন্ন শোকের প্রসঙ্গে রামের কৌশল্যার প্রতি উপদেশ 'অকাণ্ড-প্রথন'এরই দৃষ্টান্ত।

(৬) **অনবসরে রসের বিচ্ছেদ**—অসময়ে রসের বিচ্ছেদ, যেমন—সংস্কৃতে 'মহাবীরচরিত'এর দ্বিতীয় অঙ্কে, রাম ও পরশুরামের সংবাদে বীররসের চরমোৎকর্ষের স্থিতিকালে রামের এই কথন যে, "আমি এখন কঙ্কণ খুলিতে যাইতেছি"। এইরূপ

হঠাৎ প্রসঙ্গে পরিবর্তন রস-পরিপাকের ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় এবং উহার প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে এইরূপ প্রসঙ্গে প্রায়ঃ রসভঙ্গের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু কখন-কখন, বিশেষ করিয়া নাটকে, কুশল নাট্যকার ইহার শিল্পিসুলভ প্রয়োগও করিয়া থাকেন। রোমান্টিক নাটকের এই ধরণের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কাব্যে যেখানে কবি নাটকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে চান এই ধরণের প্রয়োগ প্রায় চমৎকারিতার প্রসার করে। উদাহরণস্বরূপ, কামায়নীর 'কর্ম' সর্গে শ্রদ্ধা ও মনুর সম্ভোগ শৃঙ্গারের, চরম পরিণতির প্রসঙ্গটি দেওয়া যাইতেছে :

দো কাটেঁা কী সন্ধি-বীচ উস নিভৃত গুফা মে অপনে।
অগ্নিশিখা বুঝ গই জাগনে পর জৈসে সুখ-সপনে ॥

(কামায়নী, প্র০ স০, পৃ০ ১৩৬)

এখানে 'নির্বেদ' এর দ্বারা সহসা সম্ভোগ শৃঙ্গারে বিচ্ছেদ আসিয়াছে, কিন্তু কবি ইহা সচেষ্ট হইয়াই করিয়াছেন—প্রসঙ্গের আকস্মিক পরিবর্তনই কবির অভীষ্ট ছিল। রামচরিত মানসেও—

"আই গয়ে হনুমান জেঁ্যা করুনা মেঁ বীর রস।" ইহাতে রসভঙ্গ হয় তাই বাঞ্ছিত রস-পরিবর্তনই হইয়াছে।

(৭) অঙ্গের অত্যন্ত বিস্তৃতি—অঙ্গভূত রস বা পাত্র বা প্রসঙ্গের অত্যন্ত বিস্তৃতিও রসের সম্যক্ পরিপাকে বাধক হইয়া দাঁড়ায়। পঞ্চম রসদোষ ও ইহার (সপ্তম) মধ্যে প্রভেদ এই যে সেখানে অসম্বদ্ধ বা বিরোধী রসের বিস্তারের নিষেধ করা হইয়াছে এবং এখানে সম্বদ্ধ ও অঙ্গভূত রসের অত্যধিক বিস্তারের নিষেধ করা হইয়াছে। এই-রূপে অনুপাত নষ্ট হইয়া গেলে অঙ্গ ও অঙ্গীর সমানুপাত নষ্ট হইয়া যায়; অঙ্গকে অঙ্গীরই অধীন থাকা উচিত, কিন্তু গুরুত্ব বাড়িয়া গেলে উহা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে এবং সংহতি নষ্ট হইয়া যায়। অঙ্গ বলিতে অভিপ্রায় কেবল অঙ্গভূত রসই নয়, অঙ্গভূত পাত্র ও বস্তুর বর্ণন-বিস্তারও রসে বাধক হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে উদাহরণরূপে মম্মট সংস্কৃতের 'হয়গ্রীববধ' কাব্যের প্রতিনায়ক হয়গ্রীবের ক্রিয়া-কলাপের বিস্তারের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন ও বিশ্বনাথ 'কিরাতার্জুনীয়ম্'এর অষ্টম সর্গে সুরাঙ্গনাদের বিলাস-বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। কাশ্মীরী কবি ভর্তৃমেণ্ঠের 'হয়গ্রীববধ' কাব্যে হয়গ্রীবের জলক্রীড়া, বন-বিহার, রতোৎসব প্রভৃতির এতই অধিক বিস্তারের সহিত বর্ণনা উহার তুলনায় মূল্যহীন হইয়া পড়ে। সামান্যতঃ নাটকের প্রতাপাতিশয়ের ব্যঞ্জনার জন্য প্রতিনায়কের ঐশ্বর্যের বর্ণনা কাব্যে বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উহার অতিবিস্তার নায়কের প্রতাপকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে—এবং পরিণামে উহা বাধক হইয়া দাঁড়ায়। এখানে বাংলার প্রসিদ্ধ কাব্য 'মেঘনাদবধ'এর উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। মেঘনাদের প্রতাপাতিশয় রাম-লক্ষ্মণের তেজকে নিশ্চিতরূপে ক্ষীণ করিয়াছে। এমন অবস্থায় 'মেঘনাদবধ' কব্যে রস-বিঘ্নতা কি স্বীকার করা উচিত ? এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর হইতে প্যারে। প্রথমটি এই যে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র এবং

সাংস্কৃতিক ধারার অনুসরণে রাম-লক্ষ্মণকে প্রমুখ পাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, রসে বিঘ্ন স্বীকার করিতেই হইবে এবং নানা বিদ্বানগণ—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও—'মেঘনাদ বধ'-এর সম্বন্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন, এবং আজও অনেকে এই কথাই বলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও অধিক ন্যায়সঙ্গত উত্তরটি এই যে 'মেঘনাদবধ-এর রচনা পাশ্চাত্য কাব্যপরম্পরার অনুসরণে হইয়াছে, উহা বিয়োগান্ত কাব্য যাহার নায়ক মেঘনাদ অতএব উহার প্রতাপের বর্ণনা রস-পরিপাকে বাধক নয়। 'কিরাতার্জুনীয়ম্'-এ সুরাঙ্গনাদের শৃঙ্গারক্রীড়ার বর্ণনা অঙ্গীরসের উচিত পরিপোষ নিশ্চিতরূপে বাধক হইয়াছে। হিন্দাতে 'পদ্‌মাবত'-এর অন্তর্গত কোথাও অস্ত্রশস্ত্র এবং কোথাও ব্যঞ্জন প্রভৃতির বর্ণনা, 'রামচরিত মানস'-এ স্থানবিশেষে নীতি, ভক্তি ও জ্ঞান প্রভৃতির বিবেচনা, 'প্রিয় প্রবাস'-এ প্রকৃতি বর্ণনা, 'জয়দ্রথবধ'-এ 'স্বর্গ-বর্ণনা' ও 'কামায়নী'তে দার্শনিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক বিবেচনা এই দোষের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরণের বর্ণনায় নিজস্ব কোন দোষ নাই—ঔচিত্যের পরিধির মধ্যে থাকিয়া ইহারা কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে। এইজন্য মহাকাব্যের সংজ্ঞায় জীবনের বিভিন্ন সুন্দর এবং রুচিকর প্রসঙ্গের আগ্রহের সহিত অন্তর্ভাব করা হইয়াছে—কুন্তক তো রসময় প্রসঙ্গের বর্ণনাকে প্রকরণ-বক্রতার একটি প্রমুখ ভেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে কবি-কল্পনার উন্মুক্ত বিলাসের জন্য প্রচুর অবকাশপ্রদানকারী এইসকল বর্ণনা আপনা হইতে রসের বাধক না হইয়া সাধকই হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে ঔচিত্যের সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে উহারা দোষের রূপ গ্রহণ করে।

(৮) **অঙ্গীর উপেক্ষা**—প্রমুখ রস, পাত্র বা কথা-প্রসঙ্গের উপেক্ষা করাও রস-ভঙ্গের কারণ হয়। মম্মট 'রত্নাবলী' নাটিকার চতুর্থ অঙ্কে 'উদয়নের দ্বারা সাগরিকার বিস্মরণ' প্রসঙ্গটিকে প্রস্তাবিত দোষের উদাহরণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। সিংহলেশ্বরের কঞ্চুকী বাভ্রব্যের আসিয়া যাওয়াতে উদয়ন বিজয় বর্মার বৃত্তান্ত শুনিতে এতই তল্লীন হইয়া পড়েন যে প্রমুখ পাত্রী সাগরিকাকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া যান। এইরূপে শৃঙ্গার রসের পরিপাকে বিচ্ছেদ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই দোষ ইহার পূর্ববর্তী দোষেরই পরিণাম : অঙ্গের বিস্তৃতির জন্য অঙ্গীর গুরুত্বের ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিকই। অনেক প্রবন্ধ কাব্যে যেখানে নায়কত্বের বিষয়ে সন্দেহ থাকে, অঙ্গীর উপেক্ষাই তো সন্দেহের কারণ হয়। প্রসাদের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের প্রবল চরিত্র-চিত্রণে নায়ক চন্দ্রগুপ্তের প্রতি উপেক্ষ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রেমচন্দের 'প্রেমাশ্রম' নামক উপন্যাসে জ্ঞান শংকরের চরিত্রের দুর্ধর্ষতা অঙ্গী পাত্র প্রেমশংকরের গুরুত্বকে স্থান-বিশেষে খর্ব করিয়াছে; সাকেতের উত্তরার্ধে রামের মহিমায় অভিভূত কবি ও তাঁহার সহিত পাঠকও উর্মিলাকে বিস্মৃত হন। এইরূপে নিঃসন্দেহ বিবক্ষিত রসের হানি হয়।

(৯) **প্রকৃতিগত বিপর্যয়**—আনন্দবর্ধন ইহাকেই বৃত্তি বা ব্যবহারের অনৌচিত্য বলিয়াছেন। প্রবন্ধ কাব্যের পাত্রদের স্ব-স্ব বিশিষ্ট স্বভাব ও চরিত্র হয় যাহার নির্বাহ

কবির পক্ষে আবশ্যক। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে দিব্য, অদিব্য ও দিব্যাদিব্য এই তিনটি প্রকৃতিগত ভেদ এবং আবার ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরপ্রশান্ত—এই চারটি চরিত্রগত ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পাত্রের ব্যবহারের বর্ণনা উহার নিজস্ব প্রকৃতি ও চরিত্রের অনুকূলই হওয়া উচিত, নচেৎ রসভঙ্গের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, উত্তম পাত্রের বিবৃত শৃঙ্গার, ধীরোদাত্ত নায়কের কাপুরুষতা, ধীরপ্রশান্তের ঔদ্ধত্য প্রভৃতির বর্ণনা রসে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। 'রঘুবংশ'এ শিব-পার্বতীর সম্ভোগ, 'মেঘনাদবধ'এ রাম-লক্ষ্মণের ভীরুতা, 'পদ্মাবত'এ নাগমতী ও পদ্মাবতীর গ্রাম্য সপত্নী কলহ, 'রামচরিতমানস'এ রাবণের সভায় অঙ্গদের অশিষ্টতা, 'সাকেত'এ দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রতি লক্ষ্মণের উদ্দণ্ডতা, 'কামায়নী'-তে ইহার প্রতি মনুর পাশব ব্যবহার প্রভৃতি প্রকৃতি-বিপর্যয়ের নিদর্শন—এই সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনৌচিত্যের জন্য রসভঙ্গ হয়।

(১০) **অনঙ্গ-কথন**—অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাতেও রসে ব্যবধান উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অপ্রাসঙ্গিক চর্চা সামান্য ব্যবহারেও অসহ্য বোধ হয়, কাব্যের কথা তো বলা বাহুল্য। এমন প্রসঙ্গের বর্ণনা যাহার প্রস্তাবিত কথা বা বিবক্ষিত রসের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, নিঃসন্দেহ রসে বাধা উপস্থিত করে। কিন্তু ইহা কোন গুরুত্বপূর্ণ রস-বিঘ্ন নয়; সামান্য রূপে ইহার অন্তর্ভাব অকাণ্ড-প্রথনেই হইয়া যায় এবং স্বতন্ত্ররূপে এই দোষ এতই স্পষ্ট যে কোন বিবেকশীল কবি এই ধরণের ভুল প্রায় করেন না। এইজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক খুঁজিয়া ইহার একটি মাত্র উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে: "কর্পূর মঞ্জরী"তে রাজা যখন নিজের এবং নায়িকা দ্বারা কৃত বসন্ত বর্ণনার উপেক্ষা করিয়া বন্দিজন-কৃত বসন্ত-বর্ণনার প্রশংসা করেন।

ইতিপূর্বে প্রসঙ্গের প্রারম্ভে আমরা ইহা বলিয়াছি যে প্রবন্ধ কাব্যের সহিত শেষের সাতটি দোষ বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত যদিও অনিবার্যতঃ ভাবে নহে, কারণ রীতিকালের দাস প্রভৃতি কবি আচার্যরা, যাহারা মুক্তককেই কাব্যের আদর্শরূপে বেছে নিয়েছিলেন স্বতন্ত্র কবিতার দ্বারাই এই সকল দোষের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন:

বারংবার রসের বর্ণনা (দীপ্তি)—

পঙ্কজ পাইঁন পৈজনিয়াঁ, কটি ঘাঁঘরো কিঙ্কিনিয়াঁ জরবীলী।
মোতিন হার-হুঁমেল বলীঁন পৈ, সারী সুহাবনী কঞ্চুকী নীলী।
ঠোড়ী পৈ স্যামল-বূঁন্দ অনুপ, তরোনঁন কী চুনিয়াঁ-চটকীলী।
ঈঁগুর কী সুরখী চুরকী নথ, ভাল মেঁ বাল কেঁ বেঁদী ছবীলী।

"উপমাদি ব্যতীত একই রসের বারংবার দীপ্তি-শোভা প্রদর্শিত করাও একটি 'রস-দোষ'—এই কথাই দাস কবি এখানে বলিয়াছেন। কোন রসের পরিপাক হইলে পরে—উহার প্রসঙ্গের সমাপ্তির পরেও আবার উহার বর্ণনাকে 'দীপ্তি' করা বলা হয়। দাস কবির এই উদাহরণে এই দোষেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, কারণ পরিপুষ্ট ও উপভুক্ত শৃঙ্গার রসের কবি দ্বারা পুনর্বার দীপ্তির জন্য কাব্য মর্দিত-পুষ্পের ন্যায়

অশোভন হইয়া পড়িয়াছে, অতএব উপর্যুক্ত দোষ দেখা দিয়াছে।"[১]

অকাণ্ড-প্রথন ("অসমৈ জুক্তি কথন") :

সজি সিঙ্গার-সর পৈ চঢ়ী, সুন্দরি নিপট সুবেস।
মঁনো জীতি ভুব-লোক সব, চলী জিতন দিবি-দেস ॥[২]

অকাণ্ড-ছেদন :

রাম-আগমন-সুনি কহ্যৌ, রাম বন্ধু সোঁ বাত।
কঙ্কন মোহি ছুরাইবৌ, উতৈ জাহু তুম তাত ॥[৩]

অঙ্গের প্রধানতা :

দাসী সোঁ মণ্ডন-সমৈঁ, দরপন মাগ্যো বাম।
বৈঠি গঈ সো সামনেঁ, করি আনন অভিরাম ॥[৪]

অঙ্গীর উপেক্ষা :

পীতম পঠৈ সহেট কোঁ, খেলন অটকী জাই।
তকি তিহি আবত উতৈঁ তে, তিয় মন-মন পছিতাই ॥[৫]

ইহাতে সন্দেহ নাই যে দাস কবি সকল দোষের উল্লেখ মুক্তক কাব্যের মাধ্যমে করিয়াছেন, তবুও উদাহরণগুলির বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে উপর্যুক্ত সাতটি দোষের বাস্তবিক ক্ষেত্র মুক্তককাব্য নয়, প্রবন্ধ কাব্য। এবং, ইহার প্রমাণ এই যে দাস কবির একটি উদাহরণও দোষের সম্পূর্ণরূপকে প্রকাশিত করিতে পারে নাই।

'অকাণ্ড-ছেদন'-এর উদাহরণটি তো মম্মটের এই বাক্যের অনুবাদ মাত্র : অকাণ্ডে ছেদো যথা বীরচরিতে দ্বিতীয়েঽঙ্কে রাঘবভার্গবয়োর্ধারাধিরূঢ়ে বীররসে কঙ্কণমোচনায় গচ্ছামি ইতি রাঘবস্যোক্তৌ।[৬] কিন্তু এখানে তো বীর রসের পরিপাকই হয় না, উহার অকাণ্ড ছেদন তাহা হইলে কেমন করিয়া হইবে? এইরূপে অঙ্গের প্রধানতা' ও 'অঙ্গীর উপেক্ষা' দোষের উদাহরণগুলিতেও অভীষ্ট অর্থের সিদ্ধি হয় না। অতএব সব দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা স্বীকার করাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে শেষের সাতটি রসদোষ মুখ্যতঃ প্রবন্ধ কাব্যের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত।

রস-দোষের বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু মম্মট নিজের কারিকায় 'এই সকলই রস-দোষ' এমন না বলিয়া 'এই ধরণেরই রস-দোষ হয়' বলিয়াছেন : দোষাঃ স্যুরীদৃশাঃ ৭·৬২। ইহার অর্থ এই যে ইহা ব্যতীত, এই ধরণের অন্য কারণও রসভঙ্গের হইতে পারে। এই মতানুসরণে পরবর্তী আচার্যরা দেশ, কাল প্রভৃতির

১. কাব্যনির্ণয় (সম্পাদক জহবলাল চতুর্বেদী) পৃ০ ৬৮৩
২. ঐ, পৃ০ ৬৮৩
৩. ঐ, পৃ০ ৬৮৪
৪. ঐ, পৃ০ ৬৮৪
৫. ঐ, পৃ০ ৬৮৫
৬. কাব্যপ্রকাশ (জ্ঞানমণ্ডল), পৃ০ ৩৬২

অন্যথা—বর্ণনাকেও রস-ভঙ্গের কারণ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই সকল বর্ণনার জন্য কাব্যের অসত্যতা প্রকট হইয়া পড়ে—এবং কাব্যের বর্ণনায় যদি প্রত্যয় না জন্মে তাহা হইলে রসের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অন্যদৌচিত্যং দেশকালাদীনামন্যথা যদ্বর্ণনম্। তথা সতি হি কাব্যস্যাসত্যতাপ্রতিভাসেন বিনেয়ানামুন্মুখীকারাসম্ভবঃ। (সা০ দ০, বিমলা টীকা, পৃ০ ২৫০)।

প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত সকল রস-বিঘ্ন অনৌচিত্যেরই বিবিধ প্রকার—এবং এই সম্বন্ধে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন : অনৌচিত্য ব্যতীত রস-ভঙ্গের অন্য কোন কারণ নাই এবং ঔচিত্য ব্যতীত রস-পরিপোষের অন্য কোন রহস্য নাই :

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্ রসভঙ্গস্য কারণম্।
ঔচিত্যোপনিবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎপরা ॥

ইহারই ভিত্তিতে মহিমভট্ট দোষের জন্য 'অনৌচিত্য' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন এবং ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্য-সিদ্ধান্তের বিকাশ করিয়াছেন।

(খ) সহৃদয়ের দৃষ্টিতে

সহৃদয়ের দৃষ্টিতে রস-বিঘ্নের বিস্তৃত বিশ্লেষণ সর্বপ্রথম অভিনবভারতীতে করা হইয়াছে। প্রথমে অভিনবগুপ্ত ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে ভাব যখন সর্বপ্রকারে রসনাত্মক অর্থাৎ আস্বাদনাত্মক এবং বিঘ্ন-মুক্ত প্রতীতি দ্বারা গ্রাহ্য হয়, তখন হয় রস। —'সর্বথা রসনাত্মকবীতবিঘ্নপ্রতীতিগ্রাহ্যো ভাব এব রসঃ'। ইহার পরে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম-গম্ভীর রীতিতে তিনি রস-বিঘ্নের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিঘ্নসমূহ সাত প্রকার,—প্রতিপত্তাবযোগ্যতা সম্ভাবনাবিরহো নাম স্বগতপরগতত্বনিয়মেন দেশকাল-বিশেষাবেশো নিজসুখাদিবিবশীভাবঃ প্রতীত্যুপায়বৈকল্যম্ স্ফুটত্বভাবো অপ্রধানতা সংশয়যোগশ্চ। (অভিনবভারতী, গায়কবাড় সংস্করণ, পৃ০ ২৮০)। এই উদ্ধরণের ব্যাখ্যার বিষয়ে অল্পবিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। আচার্য বিশ্বেশ্বরের মতে এই সাতটি বিঘ্ন এইরূপ,—(১) উপলব্ধি বিষয়ে অযোগ্যতা অর্থাৎ রস-প্রতীতির সম্ভাবনার অভাব; (২) স্বগতত্ব (সামাজিকগত) এবং পরগতত্ব (নটগত) নিয়মে দেশবিশেষের ও কাল-বিশেষের অবস্থান, (৩) নিজ সুখ প্রভৃতি দ্বারা বিবশভাব, (৪) প্রতীতির উপায়-বিষয়ে বৈকল্য, (৫) স্ফুটত্বের অভাব, এবং (৬) অপ্রধানতা, (৭) সংশয়-যোগ।[১] অপরদিকে পণ্ডিত রামদহিন মিশ্রের মতানুসারে সংখ্যাক্রম এইরূপ : (১) প্রতিপত্তির বিষয়ে অযোগ্যতা অর্থাৎ সম্ভাবনা-বিরহ; (২-৩) স্বগত এবং পরগতত্ব নিয়মে দেশ ও কাল বিশেষের অবস্থান, (৪) নিজ সুখ প্রভৃতি দ্বারা বিবশভাব; (৫) প্রতীতির উপায়-বিষয়ে বৈকল্য এবং উহার স্ফুটত্বের অভাব, (৬) অপ্রধানতা, এবং (৭) সংশয়-যোগ অর্থাৎ

---

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৭৪

সংশয় উপস্থিত হওয়া।[১] উভয়ের বিশ্লেষণে মূল পার্থক্য এই যে আচার্য বিশ্বেশ্বর স্বগত-পরগত নিয়মে দেশকালের আবেশকে একটি বিঘ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতীতি-উপায়-বৈকল্য ও স্ফুটত্বের অভাবকে দুইটি পৃথক্-পৃথক্ বিঘ্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ইহার বিপরীতে পণ্ডিত রামদহিন মিশ্র স্বগত-নিয়মে দেশকালের আবেশকে এবং পরগত ভাবে দেশকালের সম্বন্ধকে দুইটি পৃথক বিঘ্ন এবং প্রতীতি-উপায়-বৈকল্য এবং স্ফুটত্বভাবকে একটি বিঘ্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই দুইটি বিকল্পের মধ্যে দ্বিতীয়টি অধিক স্বীকার্য কারণ প্রতীতির উপায়ের বৈকল্য এবং স্ফুট প্রতীতির অভাব দুইটি ভিন্ন তথ্য না হইয়া একই তথ্যের কারণ কার্যরূপ, অর্থাৎ উপায়ের বিফলতার-পরিণামই তো প্রতীতির অস্ফুটতা। আর একটি বিকল্প আছে, তদনুসারে বিঘ্নের সংখ্যা সাত ইহা যেন স্বীকারই না করা হয়। উদাহরণস্বরূপ গায়কবাড় সংস্করণে পাঠ হইতে 'সপ্ত' শব্দটিই বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিচারে স্বগত ও পরগত ভাবে দেশকালের আবেশের কল্পনাকে আলাদা-আলাদা রূপে স্বীকার করিলে কোন দোষ নাই।

(১) প্রতীতিতে অযোগ্যতা অথবা সম্ভাবনা-বিরহ—পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে যেখানে বর্ণনীয় বস্তুর প্রতীতি সম্ভবপর নয় এবং ফলে উহাকে অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে যেখানে শ্রোতা বা পাঠক অসমর্থ সেখানে রসানুভূতিও সম্ভব নয়। যেখানে সংবেদ্য বিষয়ের প্রতি কোন প্রত্যয়ই জন্মে নাই সেখানে বিশ্রান্তির প্রশ্ন ওঠে না। ইহা প্রথম বিঘ্ন। এরিস্টটল নিজের পোয়েতিক্সে ঘটনার তিনটি রূপের উল্লেখ করিয়াছেন—ঘটিত, সম্ভাব্য এবং অসম্ভব এবং এই তিনটির মধ্যে সম্ভাব্যকে কাব্যের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে 'ঘটিত' ইতিহাসের বিষয়, 'সম্ভাব্য' কাব্যের। 'অসম্ভব' ঘটনার ইতিহাসে কোন স্থান নাই কাব্যেও উহার অভিব্যক্তির কোন সুযোগ নাই। কবির দৃষ্টিতে যে সব বিঘ্নের উল্লেখ আনন্দবর্ধন, মম্মট ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিরা করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে অনৌচিত্য বা প্রকৃতির বিপর্যয়ের ব্যাখ্যার অন্তর্গত এই বিঘ্নের আভাস দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি কৃত্যের বর্ণনা দিব্য পাত্রের সন্দর্ভেই করা উচিত, সামান্য পাত্রের প্রসঙ্গে নয়। বিশ্বনাথ এই সন্দর্ভে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে দেশকালাদির অন্যথা বর্ণনা করিলে কাব্যে অসত্যতার প্রতিভাস দেখা দিতে পারে এবং পাঠক উহার প্রতি উন্মুখ হইবে না। ইহা প্রকৃতপক্ষে কবির দৃষ্টিতে রস-বিঘ্নের কল্পনা।

(২) স্বগত ভাবে দেশকালের আবেশ—নাট্যের প্রেক্ষণ করিবার সময় যদি সামাজিকের নাট্য প্রসঙ্গে স্বগত সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রতীতি হইতে থাকে তাহা হইলে রসানুভূতিতে বাধা উপস্থিত হয়। প্রমাতা যদি নাট্যগত শোকের দ্বারা সন্তাপ, ভয়ের

১. কাব্যদর্পণ, পৃ০ ১২৬

দ্বারা ভীতি, রতির দ্বারা আনন্দ প্রভৃতির স্বয়ং অনুভব করিতে লাগে তাহা হইলে লৌকিক ভাবের সহিত সম্বদ্ধ নানা ধরণের ইচ্ছা ও প্রতিক্রিয়া তাহার হৃদয়ে দেখা দিবে ঃ কটু ভাবের প্রতি অনিচ্ছা ও মধুর ভাবের পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে, ভয় প্রভৃতি গোপন করিবে এবং উৎসাহ প্রভৃতি প্রকট করিবে। এইরূপে দেশকালের দ্বারা পরিবদ্ধ তাহার নিজস্ব রাগদ্বেষ চিত্তের বিশ্রান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

(৩) **পরগত-ভাবে দেশকালের আবেশ**—রসের প্রতীতি পরগত ভাবে হইলে পরেও রসানুভূতিতে বাধা আসিবে। যদি প্রমাতা এই অনুভব করে যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ব্যক্তিই শোক, ক্রোধ প্রভৃতির অনুভব করিতেছে, তবুও তাহার নিজের ভিতরে সুখ-দুঃখ, মোহ, তটস্থতা প্রভৃতির পরিজ্ঞান হইতে থাকিবে। প্রমাতা সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিকে মূল পাত্র রামাদি বলিয়াও স্বীকার করিতে পারে এবং নটও, কিন্তু উভয় পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তি প্রমাতা হইতে ভিন্ন থাকিবে এবং উহার অনুভব পরগতই হইবে। প্রমাতা এই অনুভবই করিবে যে পাত্র বা নট সুখের দ্বারা আবিষ্ট বা দুঃখগ্রস্ত; অপরকে সুখী বা দুঃখীরূপে দেখিয়া মানব স্বভাববশতঃ তাহার নিজস্ব হৃদয়েও কোন-না-কোন প্রকারের প্রত্যক্ষ সংবেদনের উদয় হইবে যাহার পরিণামস্বরূপ হৃদয়ের বিশ্রান্তি অনিবার্যতঃ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

ব্যক্তিবদ্ধ অর্থাৎ দেশকালের দ্বারা আবদ্ধ ভাবের প্রতীতি উল্লিখিত দুইটি বিঘ্নের আধাররূপ যাহা পাত্র ও পরিস্থিতি অনুসারে সুখময়, দুঃখময় বা মোহযুক্ত হওয়ার জন্য রসানুভূতি হইতে নিয়মতঃ ভিন্ন হয়। এই দুইটি বিঘ্নের নিরাকরণ সাধারণীকরণের দ্বারাই সম্ভবপর যাহা কাব্যে গুণালঙ্কার ও নাট্যে চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে। কবি বা নটের কল্পনা হইতে উদ্ভূত গুণালঙ্কার ও চতুর্বিধ অভিনয় সামাজিকের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উহার চেতনাকে ব্যক্তিসংসর্গ হইতে—দেশকালের বন্ধন হইতে—মুক্ত করে। কাব্য-কৌশল এবং নাট্য-কৌশল হইতে উদ্বুদ্ধ কল্পনার দ্বারা আবিষ্ট প্রমাতা ইহা স্বীকার করেন না যে—অস্যৈব, অত্রৈব, এতর্হ্যেব চ সুখং দুঃখম্ [১] অর্থাৎ এই ব্যক্তি এখানেই এবং এই ভাবেই সুখ বা দুঃখ লাভ করে।

(৪) **নিজ সুখাদির আবেশ**—নিজস্ব সুখ-দুঃখ প্রভৃতির দ্বারা বিবশ ব্যক্তি কোন অন্য বস্তুতে—কাব্য বা নাট্য প্রসঙ্গে কেমন করিয়া চিত্ত একাগ্র করিতে পারে? যদি সামাজিক নিজস্ব সুখ-দুঃখের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া পূর্বকৃত ধারণার বশীভূত হইয়া —প্রেক্ষাগৃহে যায় বা কাব্যের মননে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলেও উহার রসানুভূতি হইবে না। যেহেতু এমন পরিস্থিতিতে উহার সহৃদয়তা পূর্বকৃত ধারণার দ্বারা দুষ্ট থাকিবে অর্থাৎ নিজের মধ্যে বিস্মৃত থাকিবার জন্য সে কাব্য বা নাট্যের প্রভাবকে গ্রহণ করিতে অক্ষম হইবে, অতএব রসাস্বাদের কোন প্রশ্নই উঠিবে না। এই পরিস্থিতি এবং স্বগত ভাবের দ্বারা কাব্যগত বা নাট্যগত সংবেদনের প্রতীতির মধ্যে প্রভেদ এই যে এখানে

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৪৭৫

সহৃদয় নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত থাকে এবং সেখানে সে কাব্য বা নাট্যের দ্বারা অভিব্যক্ত রতি বা শোক প্রভৃতির সাক্ষাৎকারের দ্বারা স্বয়ংও সেইরূপ ভাবের অনুভব করে।

এই বিঘ্নের দূরীকরণের উপায়ও কাব্য বা নাট্যের সৌন্দর্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাব্য-কলার মধ্যে এমন শক্তি বর্তমান আছে যাহা প্রমাতার চিত্তকে ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ, হর্ষবিষাদ প্রভৃতি হইতে মুক্ত করে—অরসিক ও শুষ্ক, জীবনের নীরস ব্যাপারে লীন ব্যক্তিও প্রেক্ষাগৃহে যাইয়া গীত, নৃত্য, কাব্য-সৌন্দর্য প্রভৃতির প্রভাবে নিজস্ব ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে ভুলিয়া চিত্ত-বৈশদ্য অনুভব করেন। বস্তুতঃ ইহা সাধারণীকরণ ব্যাপারেরই দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষে বিভাবাদি দেশ কালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় পক্ষে প্রমাতার চিত্ত ব্যক্তি সংসর্গের উর্দ্ধে চলিয়া যায়।

(৫) উপায়গুলির অক্ষমতা এবং পরিণামস্বরূপ প্রতীতির স্ফুটত্বের অভাব—প্রতীতির উপায় বলিতে আমরা বুঝি অভিব্যক্তির সাধন, অর্থাৎ কাব্যের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা ও নাট্যের ক্ষেত্রে রঙ্গ--কৌশল এবং অভিনয়াদি। ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে রসের শব্দ দ্বারা কথন হয় না বরং ব্যঞ্জনার দ্বারা সাক্ষাৎকারাত্মক প্রতীতি হয়। অতএব কবি ও নাট্যকার এমন সব সাধনের প্রয়োগ করেন যেগুলির দ্বারা অর্থের কেবল সামান্য বোধ বা অনুমান না হইয়া সাক্ষাৎ প্রতীতি সম্ভবপর হয়। যদি এই উপায়গুলি অপূর্ণ থাকে তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে রসের প্রতীতি বাধিত হইবে। এই-রূপে অভিব্যক্তির অসমর্থতাও রসের আর একটি প্রমুখ বিঘ্ন। প্রকৃতপক্ষে কবিগত রস ও সহৃদয়গত রসের মাধ্যম অভিব্যঞ্জনাই, এবং উহা যদি অপূর্ণ হয় তাহা হইলে সম্প্রেষণ সিদ্ধান্তের অনুসরণে রসের সম্প্রেষণই সম্ভবপর হইবে না এবং অভিব্যক্তি বাদের অনুসরণে রসের ব্যঞ্জনাও হইবে না। রসাস্বাদন প্রক্রিয়ায় অভিব্যঞ্জনার গুরুত্ব অসন্দিগ্ধ—ক্রোচে প্রভৃতি অভিব্যঞ্জনাবাদিরা ইহাকেই কলার সমার্থক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ঃ উহার পূর্ণতাই সৌন্দর্য এবং অপূর্ণতাই বিকৃতি।

অভিব্যক্তির প্রশ্ন কবির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব প্রস্তাবিত রস-বিঘ্নের সম্বন্ধ ও প্রারম্ভে কবির সহিতই স্বীকার করা উচিত। কিন্তু শেষে প্রতীতির কর্তা সহৃদয়ই, অতএব এই বিঘ্নের পরিণাম অবশেষে তাহাকেই ভোগ করিতে হয়। কবির দৃষ্টিতে বিবেচিত স্বশব্দবাচ্যত্বের দোষ প্রায় এই পর্যায়ে পড়ে।

(৬) অপ্রধানতা—রসের অপ্রধানতার অনুভব ষষ্ঠ রস-বিঘ্ন। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ রস-প্রপঞ্চে স্থায়ী ভাবেরই স্থিতি সবার উর্দ্ধে কারণ বিভাব, অনুভাব তো অচেতন এবং ব্যভিচারী ভাব চেতন হইয়াও পরমুখাপেক্ষী। এইজন্য এইগুলির মধ্যে যদি কোন একটি প্রমুখ হইয়া পড়ে এবং স্থায়ী ভাব গৌণ অর্থাৎ কাব্য অথবা নাটকের কোন প্রসঙ্গের দ্বারা প্রমাতার চিত্তে স্থায়ী ভাবের সম্যক্ উদবোধ সম্ভবপর না হয় সেখানেও রস বাধিত হইয়া পড়ে। অভিনব গুপ্তের দৃষ্টি সর্বথা বিষয়িগত ছিল, অতএব তিনি কাব্যে বিভাবের অপেক্ষা স্থায়ী ভাবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

এই সন্দর্ভে সামান্য সিদ্ধান্ত স্থাপনার দৃষ্টিতে মতভেদের কোন সুযোগ ন্যাই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুসরণে কখনই এই ভ্রান্ত ধারণা হওয়া উচিত নয় যে কাব্যে বিভাব, অনুভাবের স্বতন্ত্র চিত্রণ বা ব্যভিচারীর স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা রসের অভিব্যক্তি এবং অনুভূতির জন্য সর্বত্র এবং সম্পূর্ণ রূপে অপর্যাপ্ত। সংস্কৃত এবং হিন্দীতে এমন অসংখ্য সরস ছন্দ আছে যাহাতে মুখ্যরূপে বিভাবের চিত্রণ বিদ্যমান আছে। অনুভব-চিত্রণের মাধ্যমেও রসের প্রতীতি হয় এইরূপ অনেক কবিতা সহজেই উপলব্ধ হয় এবং ব্যভিচারীর দ্বারা রসের প্রতীতির উৎকৃষ্ট প্রমাণ অধিকাংশ ছায়াবাদী কবিতায় পাওয়া যায়। অভিনব গুপ্তের ন্যায় রসমর্মজ্ঞের নিকট এই সামান্য তথ্যটি অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল স্থায়ীভাবের গুরুত্বকে স্পষ্ট করা ছিল। বিভিন্ন কাব্যে—প্রসিদ্ধ কাব্যেও—এমন অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায় যেখানে কবি আলম্বনের নখশিখ প্রভৃতির বর্ণনায় বা উদ্দীপন-প্রকৃতি, নগর প্রভৃতির বর্ণনায় এইরূপ জড়াইয়া পড়েন যে এই ধরণের বিবরণ নিশ্চিতভাবে রসানুভূতিতে বাধক হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে আনন্দবর্দ্ধন ও মম্মট প্রভৃতি আচার্যগণ কবির দৃষ্টিতে রস-বিঘ্নের বিবেচনা করিতে গিয়া ‘সম্বদ্ধ হইলে পরেও অন্য বস্তুর বিস্তারের সহিত বর্ণনা’ অথবা ‘অঙ্গের অত্যন্ত বিস্মৃতি’র অন্তর্গত ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে “কখনও-কখনও কবি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার প্রভৃতির বর্ণনা প্রারম্ভ করিয়া চমৎকারিতা প্রদর্শনের মোহে পড়িয়া সবিস্তার পর্বত প্রভৃতির বর্ণনায় সংলগ্ন হইয়া পড়েন” এবং এইরূপে রসের হানি করিয়া বসেন।

অভিনবগুপ্ত এই সন্দর্ভে রসের পরস্পর প্রধানতা-অপ্রধানতার উল্লেখ করিয়াছেন আবার গুণালঙ্কার প্রভৃতির অপেক্ষা রসের অপ্রধানতারও কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে, যে সকল রস পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সেই সকল রস প্রমুখ এবং অবশিষ্ট রসগুলি গৌণ; প্রবন্ধকাব্য ও রূপকের বিভিন্ন ভেদের অন্তর্গত রস-পরিপাকের ব্যাপারে এই কথাটি মনে রাখা দরকারী কারণ এই ক্রম পর্যায়ে বিপর্যয় দেখা দিলে রসে বাধা উপস্থিত হয়। এইরূপে গুণ বা অলঙ্কারের অপেক্ষা রস যদি গৌণ হইয়া পড়ে তাহা হইলেও নিশ্চিতরূপে বিঘ্ন হয় কারণ প্রমাতার মন স্বভাবতঃ অপ্রধানকে ছাড়িয়া প্রধানের দিকে অগ্রসর হয়—অতএব যেখানে গুণ অথবা অলংকারের প্রাধান্য সেখানেও রসের প্রতীতিতে নিশ্চিতরূপে বাধা উপস্থিত হয়।

(৭) **সংশয়যোগ**—রসের অবয়বগুলির বাস্তবিক স্থিতির বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইলে রসের প্রতীতি খণ্ডীকৃত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে অনুভাব, বিভাব ও ব্যভিচারী ভাবের স্থায়ী ভাবের সহিত সম্বন্ধ স্থির নয়ঃ একই অনুভাবের—উদাহরণস্বরূপ ‘কম্পন’ এর—ভয়ানক ও শৃঙ্গারের অনুরূপ বিরোধী রসের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে; একই বিভাব—যেমন ব্যাঘ্র—ভয়ানক ও রৌদ্র উভয়ের কারণ হইতে পারে; শম, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবসকল অনেক রসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। এমন অবস্থায় যদি ইহাদের বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে রসানুভূতিতে নিশ্চিত ভাবে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এইজন্য ভরত-সূত্রে ‘সংযোগ’ শব্দের স্পষ্ট ব্যবহার হইয়াছে,

কারণ 'সংযোগ' এর দ্বারা সন্দর্ভের সহিত রসাবয়বগুলির সম্বন্ধ নিশ্চিতরূপে স্থির হইয়া যায় এবং সংশয়জন্য বাধার অবসান ঘটে। মম্মট প্রভৃতিরা 'কষ্টকল্পনয়া ব্যক্তি-রনুভাববিভাবয়োঃ'— অর্থাৎ 'বিভাব-অনুভাবের কষ্ট কল্পনা'র অন্তর্গত কবির দৃষ্টিতে এই বাধার উল্লেখ করিয়াছেন।

রস-বিঘ্ন প্রসঙ্গের বিবেচনার এখানেই অবসান। এই বিবেচনার দুইটি অংশ আছে—কবির দৃষ্টিতে অথবা বিষয়গত বিবেচনা, এবং সহৃদয়ের দৃষ্টিতে অথবা বিষয়িগত বিবেচনা, যদিও তত্ত্ব দৃষ্টিতে রস-বিঘ্নের সত্তা বিষয়িগত বলিয়াই স্বীকার করা উচিত, কারণ রসের স্থিতি বস্তুতঃ সহৃদয়গতই এবং রস-বিঘ্ন সেখানেই উপস্থিত হয় যেখানে রস বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উল্লিখিত বর্গীকরণটি উপযোগী মনে হয়। যে-সকল বিঘ্নের বর্ণনা আনন্দবর্দ্ধন ও মম্মট প্রভৃতিরা রস-দোষ বলিয়া করিয়াছেন সেই সকল দোষ অবশেষে সহৃদয়ের প্রতীতির বিষয় হইয়া পড়ে, কিন্তু সেগুলি মূলরূপে কবি-কর্ম বা কবি-কৃতি (কাব্য)র সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে—সেগুলি কবি-কর্মেরই দোষ যাহা শেষে সহৃদয়ের প্রতীতিকে দোষযুক্ত করে। ইহা ব্যতীত যে সকল বিঘ্নের বর্ণনা অভিনব গুপ্ত করিয়াছেন, সে-গুলির কারণভূত দোষের স্থিতি প্রায় সহৃদয়ের চেতনায় বিদ্যমান থাকে—স্বগত ভাবে দেশকালের আবেশ, পরগত ভাবে দেশকালের আবেশ, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আবেশ প্রভৃতি দোষ এইরূপ যাহা সহৃদয়ের চেতনায় বিদ্যমান থাকে। অবশিষ্ট বিঘ্নগুলিকে উভয়গত বলিয়া স্বীকার করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে রসানুভূতিতে দুইটি কারণে বাধা উপস্থিত হয়—অভিব্যক্তির বিকলতা এবং অনুভূতির বিকলতা। প্রথমটি কবিগত দোষ, অপরটি সহৃদয়গত দোষ। কিন্তু অবশেষে কবিগত দোষের ফল সহৃদয়কেই ভোগ করিতে হয়। এইজন্য সহৃদয়ই দোষের ভোক্তা। যদিও কবি রসের বাধার যথার্থ কারণ।



(ঘ) রসাভাস

রসাভাসের প্রসঙ্গটিও প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অতএব ইহার বিবেচনাও এই সন্দর্ভে করিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে। রসভঙ্গ এবং রসবিরোধের অনুরূপই ভরত রসাভাসের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু প্রত্যেকটি রসের বিভাবাদির যেরূপ বিস্তৃত বিবেচনা হইয়াছে তাহাতে ইহা অবশ্যই স্পষ্ট হয় যে ইহাদের মধ্যে ব্যতিক্রমের কোন সুযোগ নাই : আলম্বনাদির বিষয়ে দোষ আসিয়া পড়িলে রস বাধা-প্রাপ্ত হইতে পারে। ভরতের পরবর্তী আচার্যগণ রসকেই অত্যন্ত গৌণ স্থান দিয়াছিলেন অতএব রসাভাসের কোন প্রশ্নই তাঁহাদের সম্মুখে উত্থাপিত হয় নাই। কেবল উদ্ভটের ঊর্জস্বি অলংকারে রসাভাসের অল্পবিস্তর আভাস পাওয়া যায় : যেখানে কোন রস বা ভাবের অনুচিত প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ উহার প্রকাশ সত্য বা মর্যাদাকে অতিক্রম করিয়া যায়, সেখানে ঊর্জস্বি অলংকারের কল্পনা করা হইয়াছে :

অনৌচিত্যপ্রবৃত্তানাং কামক্রোধাদিকারণাৎ।
ভাবানাং চ রসানাং চ বন্ধ ঊর্জস্বি কথ্যতে ॥

(কা০ সা০ সং০, পৃ০ ৫৯)

উদ্ভটের পরে ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধন অনৌচিত্যকে রসভঙ্গের একমাত্র কারণ বলিয়া রসাভাসের বিষয়ে বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রামাণিক সংকেত করেন :

রসভাবতদাভাসতৎপ্রশান্ত্যাদিরক্রমঃ।
ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২.৩ ॥

× × ×

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা ॥

(ধ্বন্যালোক, জ্ঞানমণ্ডল, পৃ০ ১৯০)

অনৌচিত্য ব্যতীত রসভঙ্গের আর অন্য কোন কারণ নাই এবং প্রসিদ্ধ ঔচিত্যানুযায়ী রচনা রসের পরম রহস্যস্বরূপ অর্থাৎ ভরতাদির দ্বারা নিরূপিত বিভাবাদির যথাযথ নিবন্ধন রসের সাধকরূপে এবং ইহার বিপরীত ব্যবহার—অনুচিত বিভাবাদির নিয়োজন রসের বাধকরূপে গণ্য হয়। রসভঙ্গ এবং রস বিরোধের এই বিবেচনার আশ্রয়ে পরবর্তী কালে রসাভাসের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।

রসাভাসের অর্থ ও লক্ষণ—আভাসের অর্থ হইতেছে প্রতিবিম্বের অনুরূপ

অবাস্তব রূপ—প্রতিবিম্বাদিবদবাস্তবস্বরূপম্ ।[১] যেরূপ ঝিনুকে রজতের আভাস হয়—শুক্তৌ রূপ্যাভাসবৎ,[২] সেইরূপ রসাভাসেও রসের প্রকৃত এবং শুদ্ধ প্রতীতির স্থানে উহার আভাস মাত্র হয় । রসাভাসের কয়েকটি আপ্ত লক্ষণ এইরূপ ঃ

অভিনব গুপ্ত—ঔচিত্যেন প্রবৃত্তৌ চিত্তবৃত্তেরাস্বাদ্যত্বে স্থায়িন্যা রসো, ব্যভিচারিণ্যা ভাবঃ, অনৌচিত্যেন তদাভাসঃ,[৩] অর্থাৎ স্থায়ী চিত্তবৃত্তি যদি ঔচিত্যের সহিত আস্বাদ্যমান হইতে থাকে তাহা হইলে তদ্দ্বারা রসের উদ্ভব হয়; ব্যভিচারী চিত্তবৃত্তির ঔচিত্যময় আস্বাদন হইলে তদ্দ্বারা ভাবের সৃষ্টি হয়; চিত্তবৃত্তি যেখানে অনুচিত ভাবে আস্বাদিত হয় সেইখানে হয় 'আভাস' । সার কথা এই যে অনৌচিত্যের সহিত প্রবৃত্ত স্থায়ীভাবের আস্বাদই 'রসাভাস' ।

মম্মট—তদাভাসা অনৌচিত্যপ্রবর্ত্তিতাঃ[৪]—সেই রস ও ভাবের অনুচিত প্রবর্তনই 'রসাভাস' এবং 'ভাবাবাস' ।

জগন্নাথ—অনুচিতবিভাবালম্বনত্বং রসাভাসত্বম্[৫]—যেখানে রসের আলম্বন বিভাব অনুচিত সেখানে 'রসাভাস' হয় ।

উল্লিখিত লক্ষণগুলির বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট হয় যে রসের ঔচিত্যহীন প্রবৃত্তির নামই রসাভাস । রসের ঔচিত্যহীন প্রবৃত্তির বাস্তবিক অর্থ কি এই বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে । কতিপয় বিদ্বান্ বিভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; তাঁহাদের মতানুসারে রত্যাদি স্থায়ীভাব অনুচিত বিষয়ে প্রবৃত্ত অথবা অনুচিত আলম্বনের প্রতি উন্মুখ হইলে পরে 'রসাভাস' হয়; এখানে অনৌচিত্যকে বিভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হইয়াছে । বিদ্বানদিগের আর একটি শ্রেণী স্থায়ী ভাবের সহিত অনৌচিত্যের সম্বন্ধ স্বীকার করে—অর্থাৎ স্থায়ীভাব যেখানে অনুচিত রীতিতে প্রবৃত্ত হয় সেখানে রসাভাস হয় । প্রকৃতপক্ষে উভয় মতে কোন মৌলিক ভেদ নাই । ইহা সত্য যে স্থায়ীভাবই রসপ্রপঞ্চের আধার-ভিত্তি, উহারই নির্বিঘ্ন চর্বণা রস । অতএব অনৌচিত্যকে উহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কারণ উহার চর্বণায় অনৌচিত্যের বাধা উপস্থিত হইলে রস রসাভাসে পরিণত হইয়া পড়ে । যদিও বিভাবাদির অনৌচিত্যের কথাটি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত সার্থক কারণ ভাবের উচিত-অনুচিত প্রবৃত্তির নির্ণয় প্রায় উহার বিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্যের দ্বারাই হয় । এই যুক্তিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় যে গুরুপত্নী বিষয়ক রতিপ্রভৃতির সন্দর্ভেই অনুচিতবিভাবত্ব সিদ্ধ হয়, অনুভয়নিষ্ঠ অথবা বহুনিষ্ঠ রতির সন্দর্ভে নয়, কারণ বহুনায়ক-রতিতে রতির

১. শব্দকল্পদ্রুম
২. হিন্দী-অভিনবভারতী, পৃ০ ৫১৮
৩. ধ্বন্যালোক প্রথম উ০ (ডঃ রামসাগর ত্রিপাঠী) পৃ০ ১৪৫
৪. কাব্যপ্রকাশ (জ্ঞানমণ্ডল) পৃ০ ১২১
৫. রসগঙ্গাধর (চৌ০) প্রথম আনন, পৃ০ ৩৩৫

প্রকৃতিই ঔচিত্যহীন। প্রকৃতপক্ষে এই যুক্তির আধার এই যে রতির জন্য নিষ্ঠা আবশ্যক অতএব নৈতিক দৃষ্টিতে উহার একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। বহুনায়ক-রতির দোষ এই যে উহার একজন ব্যতীত অন্য আলম্বনও থাকে : আলম্বনের অনৌচিত্য এইরূপ এখানেও প্রকাশ পায়। অতএব বিভাবের অনৌচিত্য এবং ভাবের অনৌচিত্যের মধ্যে এই ধরণের কোন স্পষ্ট ও প্রামাণিক প্রভেদ নাই যাহার দরুণ লক্ষণে সংশোধন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে। অভিনবগুপ্ত এই রহস্য সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত ছিলেন। সেইজন্য আভাসের স্থিতি তিনি বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর মধ্যে স্বীকার করিয়া শেষে স্থায়ী ভাবের মধ্যে, এবং পরিণামতঃ রসে স্বীকার করিয়াছেন : যতো বিভাবাভাসা-দনুভাবাভাসাদ্ ব্যভিচার্যাভাসাদ্ রত্যাভাসে প্রতীতে চর্বণাভাসসারঃ শৃঙ্গারসাভাসঃ—কারণ বিভাবাভাস, অনুভাবাভাস, ব্যভিচার্যাভাসের দ্বারা রত্যাভাসের প্রতীতি হইলে পরে (রতির বাস্তবিক পরিপাক না হইলে যখন) কেবল চর্বণাভাস হয়, তখন উহাকে কেবল শৃঙ্গারাভাস বলা হয়।[১] নিজের বক্তব্যটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া অভিনবগুপ্ত লিখিয়াছেন :

উহাতে (শৃঙ্গারাভাসের চর্বণায়) রতির ইচ্ছা বা অভিলাষা মাত্র হয় যাহা কোন মতেই স্থায়ীভাব নয় বরং ব্যভিচারীভাব মাত্র হয়। কিন্তু তাহার (যে শৃঙ্গারাভাসের অনুভব করিতেছে) স্থায়ীভাবের অনুরূপই প্রতীতি হয়। ইহার (রত্যাভাস বা ব্যভিচারিভাব রূপ রতির) জন্য বিভাবাদ্যাভাস হইয়া যায়। এইজন্য (পরস্ত্রী অথবা অননুরক্তা স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ক) রতি স্থায্যাভাস (রূপে উপস্থিত হয়)। (উদাহরণস্বরূপ রাবণ সীতার প্রতি অনুরক্ত। এই রাবণের সীতা-বিষয়ক রতি বাস্তবিক রতি নয়, বরং রত্যাভাস মাত্র।) কারণ রাবণের প্রতি সীতার দ্বেষযুক্ত অথবা উপেক্ষাযুক্ত মনোভাব বিদ্যমান (সে রাগবতী নয়।) এইজন্য সে (রাবণের) হৃদয়ের আলিঙ্গন করে না। যদি উহাকে (রাবণের হৃদয়কে) স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহার (পাতিব্রত্য ধর্মের) অভিমান বিলীন হইয়া যাইবে। (রাবণের এই ধারণা যে) সে তাহার প্রতি অনুরক্ত, ইহা প্রকৃতপক্ষে কেবল কাম-জন্য মোহ মাত্র এবং ফলে (রসোৎপত্তির পক্ষে) অনুপযুক্ত এবং শুক্তিতে রজতাভাসের সমান (ভ্রমমাত্র)।[২]

উল্লিখিত উদ্ধরণে দুইটি তথ্য স্পষ্ট : (১) আভাসের অর্থ মিথ্যা বা অবাস্তবিক প্রতীতি : উচিত বিষয়ে ভাবের প্রতীতি বাস্তবিক এবং অনুচিত বিষয়ে অবাস্তবিক বা আভাসরূপ হয়। এইরূপে এই প্রসঙ্গে আভাসের অনৌচিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—আভাস=অবাস্তবিক প্রতীতি=অনুচিত বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্য প্রতীতি। (২) স্থায়ী ভাবের অনুচিত প্রবৃত্তির জন্য, যাহা স্থায়ীর বাস্তবিক প্রতীতি না হইয়া উহার আভাস মাত্র হয়, রসের সম্পূর্ণ সামগ্রীতেই অনৌচিত্য বা আভাসের

---

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৫১৮

২. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৫১৮

স্থিতি উৎপন্ন হইয়া পড়েঃ আলম্বন বাস্তবিক প্রতীতি না হইয়া আলম্বনের-মতন প্রতীত হয়, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবও বাস্তবিক হয় না বাস্তবিকের মত প্রতীত হয় ।

এখন কেবল অনৌচিত্যের ব্যাখ্যা অবশিষ্ট আছে। নঞ্‌সমাসসূচক চিহ্ন—অন্ 'অভাব' ও 'বিপরীত ভাব' উভয়েরই বাচক, অতএব অনৌচিত্যের অর্থ 'ঔচিত্যের অভাব' বা 'ঔচিত্যের বিপরীত রূপ'। ঔচিত্যের নিরুক্তি ক্ষেমেন্দ্র করিয়াছেন ঃ

উচিতং প্রাহুরাচার্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ ।
উচিতস্য চ যো ভাবস্তদৌচিত্যং প্রচক্ষতে ॥

যৎকিল যস্যানুরূপং তুচিতমুচ্যতে, তস্য ভাবমৌচিত্যং কথয়ন্তি ।

অর্থাৎ যে যাহার অনুরূপ, তাহাকে উচিত বলা হয় এবং উহার ভাবকে ঔচিত্য।[১] এই দৃষ্টিতে অনুরূপতা ঔচিত্যের আধার-স্বরূপ—এবং উহার অভাব বা বিরোধ অনৌচিত্যের ভিত্তি রূপ। এই অনুরূপতা নানা প্রকারের হইতে পারে এবং পরিণামস্বরূপ উহার অভাব বা বিরোধ নানা প্রকার হইতে পারে। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অনৌচিত্যের অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রামাণিক আলোচনা করিয়াছেন ঃ তচ্চ জাতি-দেশকালবর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাপ্রকৃতিব্যবহারাদেঃ প্রপঞ্চ জাতস্য তস্য তস্য, যল্লোকশাস্ত্র-সিদ্ধমুচিতদ্রব্যগুণক্রিয়াদি, তদ্‌ভেদঃ—এ জ্ঞেয় জগতে জাতি, দেশ, কাল, অবস্থা, আশ্রম, বয়স, অবস্থা প্রকৃতিধর্ম ব্যবহার প্রভৃতির অনুযায়ী লোকশাস্ত্রসম্মত যে সমুচিত দ্রব্য, গুণ ক্রিয়াদির প্রয়োগ তাহার অন্যথা হইলে অনৌচিত্যের দোষ ঘটিয়া থাকে।[২] এই উদ্ধরণের অনুসারে অনৌচিত্যের মূলাধার হইতেছে লোক ও শাস্ত্রের বিরোধ—'লোক'এ (লোক-) স্বভাব ও (লোক-) ব্যবহার দুইই অন্তর্ভূ'ত এবং শাস্ত্রের অর্থ নীতি-শাস্ত্র অথবা এমন সব নিয়মের সংহিতা যাহার দ্বারা জীবনে কর্তব্যাকর্তব্যের নির্ণয় হয়। প্রকৃতপক্ষে লোক ও শাস্ত্রের অর্থ প্রকৃতি ও নীতি এবং পাশ্চাত্য আলোচনা-শাস্ত্রে প্রারম্ভ কাল হইতে কাব্যের ক্ষেত্রে ইহাদের অনুসরণ স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতি বা লোকের অর্থ যথার্থ জীবন অর্থাৎ যেমন সাধারণতঃ জীবন বা সংসারে ঘটিয়া থাকে এবং নীতি বা শাস্ত্রের অর্থ—যেমন জীবনে হওয়া উচিত। লোক এবং শাস্ত্রের কল্পনা প্রায় পরস্পর সহায়ক তত্ত্বরূপে করা হইয়াছে—কীরূপ ঘটিয়া থাকে, ইহারই আশ্রয়ে নীতিকার এই নির্ণয় করেন যে জীবনে কীরূপ ঘটা উচিত; এইরূপে যুগ-যুগান্তর হইতে নাতিনিয়মের দ্বারা পরিচালিত মানব-জীবনের ব্যবহারও স্বভাবতঃ বেশ কিছুটা নৈতিক হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ভারতীয় বাঙময়ে লোক ও শাস্ত্রের প্রয়োগ প্রায় একসঙ্গেই প্রসার লাভ করিয়াছে ঃ

লোক-রীতি, বিধি বেদ কী করি কহ্যো সুবানী ।

(তুলসীদাস, গীতাবলী ১.৬)

১. ঔচিত্যবিচারচর্চা, কারিকা ৭ ওর বৃত্তি।
২. রসগঙ্গাধর (চৌখম্বা বি০ ভ০) প্রথম আনন, পৃ০ ১২৫

কিন্তু কখনও-কখনও উভয়ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ দেখা দেয়ঃ নীতি-নিয়ম রূঢ় এবং প্রভাবহীন হইয়া পড়ে, নীতি-নিয়মের শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ প্রকৃতি ইহার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ করে এবং ফলে জীবনের নবীন প্রয়োজনানুসারে নীতিতে পরিবর্তন ঘটে। এইরূপে প্রকৃতি ও নীতির দ্বন্দ্বে জীবন বিকাশ লাভ করে—প্রকৃতি নীতি হইতে সংযম এবং নীতি প্রকৃতি হইতে গতি লাভ করে। ভারতীয় রস-সিদ্ধান্ত উভয়ের এই সমন্বিত রূপটিকে গ্রহণ করিয়া চলে এবং উভয়ের বিরোধকে কাব্যাস্বাদে বাধক বলিয়া স্বীকার করে। ইহাই রসাভাস-কল্পনার আধার এবং এই কল্পনা রস-সিদ্ধান্তকে স্থায়ী নৈতিক মূল্যের আধার-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

প্রাগুক্ত বিবেচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে রস-প্রক্রিয়ায় অনৈতিকতা, অস্বাভাবিকতা, অব্যবহারিকতা প্রভৃতির সমাবেশ হইলে পরে বা অপূর্ণতা থাকিয়া গেলে বাধিত অথবা অপূর্ণ রসানুভূতি রসাভাসে পরিণত হয়। অনৌচিত্যের এই বিবিধ রূপ প্রায় ভাব পক্ষ এবং বিভাব পক্ষ উভয়ের সহিতই সম্বন্ধ-যুক্ত, কিন্তু শেষে অর্থাৎ আস্বাদের স্থিতিতে স্বভাবতঃ ভাব-পক্ষের অনৌচিত্যই প্রমুখ হইয়া পড়ে।

রসাভাস ও রস—প্রায় সকল আচার্যগণ রসাভাসকে রসেরই অন্তর্গত স্বীকার করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন রস ও ভাবের অনুরূপ রসাভাস ও ভাবাভাসকেও অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য অথবা রস-ধ্বনির ভেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরবর্তী আচার্যগণ তাঁহাকে যথাবৎ অনুসরণ করিয়াছেনঃ

রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদযৌ।
সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ॥

—রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবের শান্তি, ভাবের উদয়, ভাব-সন্ধি ও ভাব-শবলতা এই আট প্রকার পদার্থগুলিই আস্বাদন যোগ্য বলিয়া রসপদ প্রতিপাদ্য।[১] কিন্তু কয়েকজন আলোচকেরা এই বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে রস যখন স্বরূপতঃ পূর্ণ ও নির্মল তখন রসাভাস রসত্বের অধিকারী কেমন করিয়া হইতে পারে? প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা ন্যায়-দর্শনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে যেখানে হেত্বাভাস সেখানে হেতু হয় না। কিন্তু রসাভাসের সমর্থকের পূর্ণ প্রত্যয়ের সহিত নিজস্ব বিচারানুসারে ইহার উত্তর দিয়াছেনঃ ন হ্যনুচিতত্বেনাত্মহানিঃ, অপি তু সদোষত্বাদাভাসব্যবহারঃ অশ্বাভাসাদিব্যবহারবৎ, অর্থাৎ রস-দোষ থাকিলেও আত্মহানি (স্বরূপহানি) হয় না কেবল দোষযুক্ত বলিয়াই আভাস এই পদের ব্যবহার হয়, যেমন দোষযুক্ত অশ্বকে অশ্বাভাস বলা হয় কিন্তু উহার অশ্বত্ব নষ্ট হয় না।[২] ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, আভাসের অর্থ অবাস্তব প্রতীতি—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে শুক্তিতে রজতের আভাস রজতের অবাস্তব প্রতীতি মাত্র, কিন্তু অবাস্তবিকতার

১. সাহিত্যদর্পণ, বিমলা টীকা, পৃ০ ১২৪

২. রসগঙ্গাধর (চৌখম্বা বি০ ভ০), প্রথম আনন, পৃ০ ৩৩৭

জ্ঞান তখনই হয় যখন প্রতীতি নষ্ট হইয়া যায়—শুক্তিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রজতের প্রতীতি হয় ততক্ষণ অবাস্তবিকতার জ্ঞান হয় না। । এই রূপে রসাভাসে অনৌচিত্যের জ্ঞান পরে উৎপন্ন হয়, রসের প্রতীতি ইহার পূর্বেই হইয়া যায় ঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতীতি বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনৌচিত্যের জ্ঞান হয় না এবং যখন অনৌচিত্যের জ্ঞান হয় তখনই প্রতীতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব রসাভাস রসেরই অন্তর্ভূ'ত, এই সম্বন্ধে অন্য কোন বিকল্প হইতে পারে না। ভারতীয় রসশাস্ত্রের পরম্পরাগত সিদ্ধান্তই স্বীকার্য।

অভিনবগুপ্তের বিচার—এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত একটি রুচিকর উদ্‌ভাবনা করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে প্রত্যেকটি রসের আভাস অবশেষে হাস্যে পরিণত হয়, কারণ আভাস এক ধরণের বিকৃতি রূপ এবং বিকৃতি হাস্যের মূলাধার। অনুচিত বিষয়ে স্থায়ী ভাবের প্রবৃত্তি অথবা স্থায়ী ভাবের অনুচিত প্রবৃত্তি উহার বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়, অতএব উহার দ্বারা প্রমাতার চিত্তে অনুকূল ভাবের উদ্‌বুদ্ধি না হইয়া হাস্যেরই উদ্‌বুদ্ধি হয়। কিন্তু, ইহা রসাস্বাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত দ্বিতীয় অবস্থান—হাস্যের অনুভূতি অনৌচিত্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পরে হয় উহার পূর্বে শৃঙ্গারাদি রসের অস্থায়ী প্রতীতি হইয়া যায়। এইরূপে প্রারম্ভে সহৃদয় শৃঙ্গারাভাস প্রভৃতির অনুভব করে এবং পরিণতিতে হাস্যরসের। উদাহরণস্বরূপ সীতার প্রতি রাবণের এই উদ্‌গার দ্রষ্টব্য ঃ

দূর হইতে আকর্ষণকারী মোহমন্ত্রের সমান তাহার (সীতার) নাম শোনামাত্র চিত্ত এক মুহূর্তের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। (কিন্তু) ব্যাকুল ও চঞ্চল আমার এই কামসন্তপ্ত অঙ্গসকল উহাকে কেমন করিয়া (আলিঙ্গন) লাভ করিয়া সুখী হইবে, ইহা ঠিকভাবে বুঝা যাইতেছে না।

রাবণের এই বাক্যে প্রারম্ভে রত্যাভাসেরই প্রতীতি হয় হাস্যের নয়। তবুও (রাবণের সীতার প্রতি এই অনুরাগ-প্রদর্শন) সীতা (রূপ আলম্বন) বিভাবের (বিপরীত), রাবণের আত্ম ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে চিন্তা, দৈন্য, মোহ প্রভৃতি রূপ ব্যভিচারিগণের (অভিব্যক্তি) এবং রুদন, বিলাপ প্রভৃতি অনুভাব সমুদায়ের অনুচিত হওয়ার জন্য, তদাভাসাত্মক হইয়া হাস্যের বিভাবে পরিণতি ঘটে। পরবর্তী ব্যাখ্যায় এই সকল বিভাবাদির 'অপরের বিকৃত বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির জন্য' (হাস্য রস হয়) ইহা বলিব।

এই (উদাহরণের) জন্য করুণাভাস প্রভৃতি সকলের (রসাভাসের) মধ্যে হাস্যত্ব হয় ইহা বুঝা উচিত। কারণ অনুচিত প্রবৃত্তির জন্যই (কোন ব্যক্তি) হাস্যের বিভাবরূপ গ্রহণ করে। এবং সেই অনৌচিত্য সকল রসের বিভাব, অনুভাব প্রভৃতিতে হইতে পারে। ১

রসাভাসের বিভিন্ন-ভেদ—প্রত্যেক রসের আভাস হইতে পারে, অতএব রসভেদের অনুসারে রসাভাসেরও বিভিন্ন ভেদ হয়। প্রস্তাবিত সন্দর্ভেও শৃঙ্গারের

১. হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৫১৯

গুরুত্বের অনুরূপ আচার্যগণ শৃঙ্গারাভাসেরই প্রমুখরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :

উপনায়কসংস্থায়াং, মুনিগুরুপত্নীগতায়াং চ।
বহুনায়কবিষয়ায়াং, রতৌ তথানুভয়নিষ্ঠায়াম্ ॥

—নায়িকার রতি উপনায়কাশ্রিত, অথবা নায়কের রতি মুনি বা গুরুপত্নীগত, অথবা নায়িকার রতি বহুনায়ক বিষয়ক অথবা নায়ক-নায়িকার অনুভয়নিষ্ঠ রতি হইলে রসাভাস হয়।[১]

এখানে উপনায়ক রতি ও মুনিগুরুপত্নীর প্রতি রতি নৈতিক দৃষ্টিতে অনৌচিত্য যুক্ত, বহুনায়ক রতি বোধ হয় প্রকৃতি ও রীতি—লোক ও শাস্ত্র উভয়ের বিরুদ্ধ, কারণ রতি স্বভাবতঃ একনিষ্ঠই হয়, অনেক-নিষ্ঠতা রতির স্বরূপকে দুষ্ট করে। সাধারণতঃ কাব্যে এই সব নীতি-নিয়মেরই পালন হইয়াছে, কিন্তু নানা কবিগণ ইহার বিরোধিতাও করিয়াছেন এবং কখনও-কখনও কেবল একজন কবি নয়, একটি সম্পূর্ণ যুগ নীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছে। ভারতীয় ধর্মসাধনার ইসিহাসে একটি যুগ এই রকম আসিয়াছিল যখন পরকীয়া-ভাব, ভক্তির প্রাণ-তত্ত্ব এবং মানদণ্ড বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। হিন্দী রীতিকাব্যে পরকীয়া-ভাব ও বহুবল্লভত্বের প্রাচুর্য দৃষ্ট হয় যদিও কোন কবিই সিদ্ধান্তরূপে ইহার সমর্থন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণে বহুনায়ক রতি এবং বহুনায়িকা রতির মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে যাহা নীতি-সম্মত হইলেও ন্যায়-সম্মত নয় এবং এইজন্য ইহা সার্বভৌম স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। সময়ে-সময়ে এই ধরণের নৈতিকতার বিরোধ হইয়াছে এবং বর্তমান যুগে এই বিদ্রোহ আরও বেশী মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অনুভয়নিষ্ঠ বা একাঙ্গী রতির বিষয় আরও অধিক বিবাদাস্পদ। উহাকে যদি সম্পূর্ণরূপে রসাভাস বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ভারত ব্যতীত অন্য দেশের বিশেষ করিয়া ফার্সী, উর্দুর অনুরূপ ভাষার—সমৃদ্ধ কাব্যের বহুলাংশ রসাভাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অনুভয়নিষ্ঠ রতির বিপক্ষে এবং সপক্ষে নানা কথা বলা যাইতে পারে। বিপক্ষে এইরূপ বলা যাইতে পারে—(১) যদি আলম্বন আশ্রয়ের রতির প্রত্যুত্তর না দেয় তাহা হইলে কারণ ইহাও হইতে পারে যে আলম্বন এই ধরণের প্রণয় নিবেদনকে কোন-না-কোন সূত্রে অনুচিত বলিয়া স্বীকার করে—অতএব রতির মধ্যে অনৌচিত্যের সমাবেশ এখানেও হইয়া যায়। (২) উপেক্ষা বা বিরতি বা বিতৃষ্ণার জন্য আলম্বনের প্রত্যুত্তর ব্যতীত, রতিভাব অপুষ্ট এবং অপূর্ণ থাকিয়া যায় অতএব রস-পরিপাক সম্ভবপর হয় না। (৩) বিরতি এবং বিতৃষ্ণা শৃঙ্গারের বিরোধীভাব। অতএব আলম্বন যদি ইহার প্রদর্শন করে তাহা হইলে রস বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার সপক্ষেও অনেক কথা বলা যাইতে পারে (১) বিশ্বকাব্যে অনুভয়নিষ্ঠ রতির প্রভূত উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সব

১. রসগঙ্গাধর (চৌ০ বি০) প্রথম আনন, পৃ০ ৩৪১

ক্ষেত্রে সরসতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকট করিলে অরসিকতারই প্রচার করা হইবে—এই কাব্য হইতে প্রাপ্ত রস-প্রতীতি কোন প্রকারেই বাধিত বা অপূর্ণ নয় যে উহাকে রসাভাস বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। (২) অনুভয়নিষ্ঠ রতিতে নীতিগত বাধা-বন্ধন আবশ্যক নয়। (৩) প্রতিদানের চিন্তা হইতে মুক্ত নিঃস্বার্থ প্রেমকে রসিকজনেরা প্রেমের বা আত্মদানের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব উহাকে নিয়মানুযায়ী রসাভাস বলিয়া স্বীকার করা কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? (৪) ভারতীয় কাব্যেও পূর্বরাগের বর্ণনায় রতির অনুভয়নিষ্ঠ হওয়ার অনেক সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। (৫) অতএব অনুভয়নিষ্ঠ শৃঙ্গারকে সম্ভোগ শৃঙ্গাররূপে স্বীকার না করিলে আপত্তি নাই, কিন্তু উহাকে বিপ্রলম্ভের ভেদরূপে স্বীকার করিতে কি কোন আপত্তি হইতে পারে?—সপক্ষ ও বিপক্ষের এই বিচার-বিবেচনার তুলনা করিলে ইহা প্রমাণিত করা কঠিন হইয়া পড়ে যে অনুভয়নিষ্ঠ রতির পরিপাক সর্বত্রই শৃঙ্গারাভাসে হয়; যেখানে লোক ও শাস্ত্রের কোন বাধা নাই এবং ভাবনার ঔচিত্য ও উৎকর্ষ যেখানে ব্যক্ত হইয়াছে সেখানে উহাকে রসরূপে স্বীকার না করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই।

সামাজিক ক্রান্তির ফলে আদর্শের দ্বারা প্রেরিত হইয়া কখনও বিদ্রোহের স্বর অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত গুরুপত্নী তারা ও চন্দ্রমার প্রণয়-সম্বন্ধকে রসময়রূপ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দীতে ভগবতীচরণ বর্মা 'তারা' কবিতার আধাররূপে এই প্রণয়-সম্বন্ধকে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে এই সকল কবিতায় রসের স্থানে কি রসাভাস স্বীকার করিতে হইবে? শাস্ত্রানুসারে ইহাদের মধ্যে রসাভাসই স্বীকার করিতে হইবে। তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই যে উভয় কবি অনৌচিত্য নিবারণের জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। মাইকেল বিষম বিবাহের অনৌচিত্যের উল্লেখ করিয়া সমান বয়-রূপ নর-নারীর প্রকৃত প্রণয়-ভাবনার ঔচিত্যের সিদ্ধি করিয়া রস-বাধের নিবারণ করিয়াছেন। ভগবতীচরণ বর্মা শৃঙ্গার-প্রসঙ্গকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়া নারী-হৃদয়ের পীড়া ব্যক্ত করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য ১. 'বীরাঙ্গনা'—'সোমের প্রতি তারার পত্র' এবং 'মধুকণ'—'তারা' গীতিনাট্য)।

শৃঙ্গারাভাসের এই দুইটি প্রভেদ ছাড়াও কাব্যশাস্ত্রে আরও দুইটি ভেদের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়: অচেতন-বিষয়ক রতি এবং তির্যগ্-রতি—অর্থাৎ পশু-পক্ষিদের রতি। অনৌচিত্যের দুইটি রূপ বর্তমান আছে: অসত্যত্ব এবং অযোগ্যত্ব। উল্লিখিত দুইটি রতি-ভেদ অসত্যত্বের অন্তর্ভুক্ত; রতি নানা সূক্ষ্ম ভাবনার দ্বারা সংস্কৃত একটি চিত্তবৃত্তি যাহার স্থিতি নিরিন্দ্রিয় পদার্থের মধ্যে কোন মতেই সম্ভবপর নয়। মনঃশক্তি হইতে রহিত পশু-পক্ষিদের মধ্যে উহার কল্পনা করাও অধিক সমীচীন নয়। যেহেতু উহাদের সহিত সহৃদয়ের তাদাত্ম্য সম্ভবপর নয়। বৃক্ষ ও লতা বা চন্দ্র ও রজনী এবং অপর দিকে মৃগদম্পতী ও কপোত-কপোতীর প্রণয়-ব্যাপারের সহিত আমাদের হৃদয়-সংবাদ সম্ভবই নয়। অতএব যেখানে সাধারণীকরণের সম্ভাবনাই নাই সেখানে রস-পরিপাকও অস্বীকার্য: রস-সামগ্রীর আরোপণের দ্বারা

রসের আভাস অবশ্যই হয় কিন্তু রস-পরিপাক হয় ইহা কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? দুষ্মন্তের শরপাতে ভয়ভীত মৃগশাবকের অপেক্ষা স্বয়ং মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্ত বা এই দৃশ্যের প্রশস্তিপরক বর্ণনকারী মাতলির সহিত তাদাত্ম্য করা সহৃদয়ের পক্ষে সহজ হয়। শাস্ত্রের বহিরঙ্গ চিন্তা-পদ্ধতির সরণি অনুসারে এই তর্ক যুক্তিযুক্ত এবং ইহার ভিত্তিতে পরম্পরানিষ্ঠ আলোচকগণ ইহা বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে ছায়াবাদী[১] কবিরা রসাভাসে সিদ্ধহস্ত।[২] কিন্তু ইহা বলা কি উচিত? কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিদের প্রকৃতি-বর্ণনায়, পশ্চিমা ভাষায় রচিত প্রকৃতি-কাব্যে অথবা ছায়াবাদের সচেতন প্রকৃতি-চিত্রে কি সহৃদয় রসের স্থানে কেবল রসাভাসের উপলব্ধি করেন? উল্লিখিত কাব্যের সমর্থকেরা এই সকল কাব্যের রসগর্ভতার সপক্ষে দুইটি যুক্তির উল্লেখ করিতে পারেন। প্রথম যুক্তি এই যে সমস্ত সচরাচর জগতে একই চৈতন্য তত্ত্ব অনুব্যাপ্ত, অতএব সহৃদয় মানবেতর প্রকৃতির মধ্যেও চৈতন্যের অনুভব করেন এবং উহার সহিত মানব-প্রকৃতির অনুরূপই তাদাত্ম্য স্থাপনা করিয়া লন। এই যুক্তিটি অনেকাংশে সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক, অতএব ইহাকে যথাবৎ স্বীকার করিয়া লওয়া সামান্য সহৃদয়ের পক্ষে সম্ভব নয়; আমার স্বয়ং ইহাতে প্রত্যয় নাই। অপর যুক্তিটি এই যে এই ধরণের চিত্রে কবির নিজস্ব ভাবনার আরোপ থাকে—প্রাকৃতিক পদার্থ তো প্রতীক মাত্র, মূল ভাবনা কবির নিজস্ব অতএব সহৃদয় কবির সহিত তাদাত্ম্য করিয়া রসাস্বাদনে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে প্রতীক-শৈলী কাব্যের চির-পুরাতন শৈলী। ভারতে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নবীনতম কাব্য ধারা পর্যন্ত ইহার নিরন্তর প্রয়োগ পাওয়া যায়। এই ধরণের কবিতায় রস-ব্যঞ্জনা সরাসরি অভিধা-লক্ষণার দ্বারা হয় না, বরং প্রতীকের দ্বারা হয় অতএব এই রস-ব্যঞ্জনা সামান্য রস-ব্যঞ্জনার অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ এবং সমমাত্রায় গূঢ় এবং সূক্ষ্মতর। কিন্তু এখানেও হয় রসেরই ব্যঞ্জনা—রসাভাসের নয়। অচেতন অথবা অমানব প্রকৃতির উপর মানব-ভাবনার আরোপণের দ্বারা রসানুভূতি বাধিত বা দূষিত হয় না, প্রায় গূঢ় এবং অপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এই ধরণের কাব্যে রসাভাসের স্থানে রসেরই সঞ্চার হয়। ইহার প্রমাণ এই যে শাস্ত্রের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কবি প্রত্যেক যুগে চাতক-চাতকীর মাধ্যমে তীব্র রসময়ী কবিতার রচনা করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় কাব্যেও একটি যুগ এমন আসিয়াছিল যখন 'বিবেক-যুক্ত' আলোচকদের প্রকৃতির ভাবনাত্মক চিত্রের মধ্যে চৈতন্যাভাস বা 'ভাবাভাস' (Pathetic Fallacy) নামক দোষের কল্পনা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে কল্পনার দ্রুত প্রসারকে সীমিত করিবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল এবং প্রকৃতির রাগাত্মক ব্যাপারের অভিব্যক্তি কাব্যে নিরন্তর চলিতে থাকিল।

---

১. আধুনিক যুগের তৃতীয়-চতুর্থ শতকে রচিত রোমান্টিক ভাব-ধারা-যৈষা হিন্দী কবিতাকে ছায়াবাদী কবিতা বলা হয়।

২. দ্রষ্টব্য কাব্যদর্পণ, পণ্ডিত রামদহিন মিশ্র, পৃ০ ২১২

অন্য রসাভাসের আধার-ভিত্তিও প্রথমতঃ বিভাব-বিষয়ক এবং শেষে ভাব-বিষয়ক অনৌচিত্যই এবং সেখানেও লোক এবং শাস্ত্র অথবা প্রকৃতি এবং নীতির বিরোধিতাই অনৌচিত্যের ভিত্তি বলিয়া গৃহীত।" "যেরূপ শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব (রতি) উক্ত রীতির ভিত্তিতে অনুচিত হইলে শৃঙ্গারাভাসে পরিণত হয় সেইরূপে কলহশীল কুপুত্র বিষয়ে এবং বীতরাগাদিনিষ্ঠাহেতু বর্ণনীয় শোকে, ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী চাণ্ডালাদি-নিষ্ঠ নির্বেদে, কৃপণকাতর প্রকৃতিগত অথবা পিত্রাদি বিষয় ক্রোধ ও উৎসাহে, ঐন্দ্র-জালিক বিষয়ক বিস্ময়ে, গুরু প্রভৃতি বিষয়ক হাস্যে, মহাবীরনিষ্ঠ ভয়ে, যজ্ঞীয়-পশুর মজ্জা, শোণিত, মাংস প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণ্যমান জুগুপ্সা রসাভাসে পরিণত হয়।"[১]

উল্লিখিত রসাভাসের ভেদগুলির মধ্যে অধিকাংশের স্বরূপ স্পষ্টই, কিন্তু কয়েকটির বিষয়ে আধুনিক যুগের আলোচকেদের চিত্তে সন্দেহ উৎপন্ন হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, কলহশীল কুপুত্রের বিষয়ে শোকের অনৌচিত্যকে যথাবৎ স্বীকার করিয়া লওয়া নীতিবিরুদ্ধ হইলেও লোকবিরুদ্ধ নয়। অতএব এখানে কুপুত্র বলিতে সর্বথা অশোচ্য ব্যক্তিই বুঝিতে হইবে যে নিজস্ব দুষ্কর্মের জন্য সহৃদয়-সমাজে আক্রোশ ও ঘৃণার পাত্র বলিয়া বর্ণিত এবং যাহার অধঃপতনে সকলের শান্তি কাম্য। এই ধরণের ব্যক্তির প্রতি যদি উহার বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে কবি শোক অভিব্যক্ত করেন তাহা হইলে সর্বপ্রথম উহার সহিত কবিরই তাদাত্ম্য হইবে না এবং আবার সহৃদয়-সমা-জের পক্ষেও ইহার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কারণ এখানেও মানব-সম্বন্ধের নৈসর্গিক শক্তির ফলেও হত ব্যক্তির পুত্রত্ব অথবা পতিত্বের আশ্রয়ে, অনৌচিত্যের নৈতিক বন্ধন হইতে দূরে, শুদ্ধ মানবিক ভাবভূমিকায় সাধারণী করণ সম্ভবপর। 'মেঘনাদবধ'এ মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণ ও সুলোচনার (প্রমীলা) বিলাপকে কি করুণ রস রূপে স্বীকার না করিয়া করুণাভাস বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? এখানে আমরা বিধর্মী কবিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিতে পারি, কিন্তু রামভক্ত কবির 'সাকেত'এ কুম্ভকর্ণ-বধের দৃশ্যে এই একই ব্যাপার ঘটিয়াছে:

আ ভাই, বহ বৈর ভুল কর, হম দোনোঁ সমদুঃখী মিত্র
আ জা, ক্ষণভর ভেঁট পরস্পর, কর লেঁ অপনে নেত্র পবিত্র!
হায়! কিন্তু ইসকে পহলে হী মূর্চ্ছিত হুআ নিশাচর-রাজ
প্রভু ভী যহ কহ গিরে—'রাম সে রাবণ হী সহৃদয় হৈ আজ'।

(সাকেত, ২০০৫ বি০, পৃ০ ২৯২)

উল্লিখিত প্রসঙ্গটিতে কি করুণাভাস বর্তমান? এখানে তো মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের সহিত রাবণের তাদাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যাধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত চাণ্ডাল প্রভৃতির আশ্রয়ে বর্ণিত নির্বেদে শান্তরসাভাসের

১. রসগঙ্গাধর (চৌ০ বি০) প্রথম আনন, পৃ০ ৩৪৪

কল্পনাও আজ স্বীকার্য নয়—ইহাকে স্বীকার করিলে হিন্দীর সম্পূর্ণ নির্গুণ কাব্যে শান্তরসাভাস স্বীকার করিতে হইবে। এই ধরণের প্রসঙ্গের অপেক্ষা শান্তরসাভাসের কল্পনা সেখানে অধিক সঙ্গত হইবে যেখানে শৃঙ্গারিক উপকরণের মাধ্যমে জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রতিপাদন হয়।[১]—এবং, এই ধরণের সন্দেহ যজ্ঞীয় পশুর মজ্জা, শোণিত ও মাংস প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা (বীভৎসের স্থানে) বীভৎসরসাভাসের সিদ্ধির সম্বন্ধে করা যাইতে পারে। কতিপয় সাম্প্রদায়িক ভক্ত বা সাধক ব্যতীত এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের হৃদয়ে কামায়নীর নিম্নোক্ত প্রসঙ্গটি জুগুপ্সা উৎপন্ন করিতে সমর্থ নয়ঃ

---

১. অকথনীয় থা সত্য, জ্যোতি মেঁ লিপটা শাশ্বত,
অণু সে ভী লঘু দেহ জ্বলিত গিরি শৃঙ্গ-সী মহৎ!
দৃষ্টি রশ্মি থী জ্যোতি পথিক ঔ' স্বয়ং জ্যোতি পথ,
চির জাজ্বল্যমান স্থির ধাবিত সপ্ত অশ্ব-রথ;
কিরণোঁ কে দূর্বাপ্রভ নভ-সী মুক্তি থী অমিত,
শুভ্র হংস ঘেরে থে উসকো পংখ খোল স্মিত!
থা আনন্দ উদধি অকূল উর মেঁ উদ্বেলিত,
জ্যোতি চূর্ণ ঝরতা অঙ্গো সে মুক্ত অনাবৃত!
অর্দ্ধবিবৃত জঘনোঁ পর তরুণ সত্য কে শির ধর
লেটী থী বহ দামিনী-সী রুচি গৌর কলেবর!
গগন ভঙ্গ সে লহরাএ মৃদু কচ অঙ্গো পর,
বক্ষোজোঁ কে খুলে ঘটোঁ পর লসিত সত্য কর!
সমাধিস্থ থা শ্রেয়, সত্য আরূঢ় নিরন্তর,
ধরে অঙ্ক মেঁ ভূ কো, সুর জল স্রোত শীর্ষ পর;
তাপ গলে মেঁ, সুধা শান্তি মস্তক পর ভাস্বর,
লিপটা তন সে ভাব অভাব ভূতি ঔ' বিষধর!
সদসদ্ দেশ কাল সে পর, ত্রিক্ তপস মূল ধর,
দেবোঁ কা পোষক থা বহ, দৈত্যোঁ কা স্তিত্বর;
কাম ক্রোধ মদ মৎসর থে উসকে পদ অনুচর,
বহ স্বর্ণিম কিরণোঁ সে মণ্ডিত, পাপ তমস হর!
ইস প্রকার চির স্বর্গ চেতনা হুই প্রতিষ্ঠিত,
জীবন শতদল পর, মন কে দেবোঁ সে ভূষিত!
জড় ধরণী কে তাপ শাপ দুখ দৈন্য অপরিমিত।
কাকোঁ সে পর খোল হুএ লয় তমস মেঁ অচিৎ!

কবি পন্ত—স্বর্ণকিরণ, প্রথম সং০, পৃ০ ৬২-৬৩

দারুণ দৃশ্য ! রুধির কে ছীঁটে !
অস্থি-খণ্ড কী মালা !
বেদী কী নির্মম প্রসন্নতা,
পশু কী কাতর বাণী,
মিল কর বাতাবরণ বনা থা,
কোই কুৎসিত প্রাণী ।১

অতএব সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার ভিত্তিতে এই ধরণের বর্ণনাতে বীভৎস রসকে অস্বীকার করা অসহৃদয়তার পরিচায়ক, কারণ সাম্প্রদায়িক পূর্বকৃত ধারণা স্বয়ংই সহৃদয়তার একটি প্রধান দোষ । প্রকৃত পক্ষে কাব্যে বীভৎসের আভাস পাওয়া কঠিন, কারণ প্রথমতঃ বীভৎসের বর্ণনা কাব্যে দুর্লভ এবং দ্বিতীয়তঃ বীভৎসের স্পর্শ স্বয়ংই শৃঙ্গারাদি রসের ঔজ্জ্বল্যকে মলিন করিয়া দেয় এবং এইরূপ রসকে মলিন করিবার সামর্থ্য সাধারণতঃ কাহার মধ্যে হইতে পারে ?

উল্লিখিত বিবেচনার ভিত্তিতে আমাদের সার কথা এই যে রসাভাসের স্বরূপ নির্ণয়ের ব্যাপারে আমাদের খুবই সর্তক থাকা উচিত । আমাদের রসাভাসকে হয় অপ্রত্যক্ষ রসানুভূতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা মানবিক ভাব-ভূমিকার আশ্রয়ে ঔচিত্যের ব্যাপকরূপের কল্পনা করিয়া রসাভাসের ক্ষেত্রকে পরিসীমিত করিতে হইবে । অন্যথা, রসাভাসকে বাধিত বা দূষিত রসানুভূতিরূপে গ্রহণ করিলে রস-সিদ্ধান্তের শক্তি ও প্রভাব সীমিত হইয়া পড়িবে ।

■ ■ ■

১. কামায়নী [প্র০ সং০], 'কর্ম' সর্গ, পৃ০ ১১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

রস-সিদ্ধান্ত ঃ শক্তি ও সীমা

রস-সিদ্ধান্ত ঃ শক্তি ও সীমা

১. রসের বাস্তবিক অর্থ—রসের পরিধি

রস-সিদ্ধান্তের যথার্থ মূল্যাঙ্কনের জন্য উহার প্রকৃত অর্থের জ্ঞান আবশ্যক। ইতিপূর্বে রসের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে আমরা ইহা স্পষ্ট করিয়াছি যে ভারতীয় কাব্য-শাস্ত্রে রসের তিনটি অর্থ প্রচলিত ঃ (ক) বস্তুগত অর্থ যাহার অনুসারে রস কাব্যনিষ্ঠ অর্থাৎ উহা শব্দার্থের মাধ্যমে কবির সৃজনশীল ভাবনার কলাত্মক অভিব্যক্তি। রস কাব্য-ভাবনার শব্দ-মূর্ত রূপ। এই ভাব-চিন্তা কবির প্রকৃত ভাবনা নয় বরং কল্পনার দ্বারা জীবনগত অনুভূতির সৃজনে (বা পুনঃসৃজনে) প্রবৃত্ত ভাবনা। সরল ভাবে এই অর্থ অনুসারে রস ভাবের উপর আশ্রিত কাব্য-সৌন্দর্য। (খ) রসের ভাবনিষ্ঠ অর্থ— এই অর্থ অনুযায়ী রসের অবস্থান সহৃদয়ে— অর্থাৎ উহা নানা ভাবময় কাব্যের দ্বারা সহৃদয়ের চিত্তে উদ্‌বুদ্ধ সুখদুঃখময়ী রাগাত্মক চেতনা-বিশেষ। (গ) আনন্দনিষ্ঠ অর্থ, এই অর্থ অনুসারে রস সহৃদয়গতই; কাব্যের মননের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ—ব্যক্তি-সংসর্গ হইতে মুক্ত—বিশুদ্ধ ভাবের মাধ্যমে আত্ম বিশ্রান্তিময়ী (আনন্দময়ী) চেতনার নাম রস—আধুনিক শব্দাবলীতে চিত্তের সমীকৃত অবস্থার আস্বাদের নাম রস। এই তিনটি অর্থের দ্বারা দুইটি তথ্য স্পষ্ট হয় ঃ রসে ভাবতত্ত্বের প্রাধান্য বর্তমান, তাহাই উহার সার-রূপ; কিন্তু কলা তত্ত্বের (শব্দ-অর্থের কল্পনাত্মক প্রয়োগ) গুরুত্বও কম নয়। ভরত-সম্মত বস্তুগত অর্থে কলাতত্ত্বের গুরুত্ব স্পষ্ট, ব্যক্তিগত অর্থেও আস্বাদনের প্রমুখ সাধন কলা-তত্ত্বই। ভট্টনায়কের 'ভাবকত্ব ব্যাপার' বস্তুতঃ কলাতত্ত্বই যাহাকে অভিনবগুপ্তও শব্দভেদে সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার পূর্বার্দ্ধে যথাবৎ স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে রস-কল্পনা প্রারম্ভ হইতেই কাব্যাস্বাদের একটি পরিপূর্ণ কল্পনা ঃ ভাব-তত্ত্বের প্রাধান্যকে স্বীকার করিলে পরেও ইহা কলা তত্ত্বের উচিত গুরুত্ব-কে প্রারম্ভ হইতেই স্বীকার করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উহাকে অনিবার্য বলিয়া গ্রহণ করি-য়াছে, কারণ কলাতত্ত্বের অভাবে (রস-সিদ্ধান্তের শব্দাবলীর অনুসরণে, বিভাবাদির সাধারণীকরণ ব্যতীত) 'ভাব'এর রসে পরিণতি সম্ভবপরই নয়। অতএব লক্ষণ অনু-সারে রসের পরিধিতে ভাব-তত্ত্বের সঙ্গে কল্পনা তত্ত্ব এবং উভয়ের সঞ্চালিকা কবি-প্রজ্ঞার প্রকল্পনা অর্থাৎ বুদ্ধি-তত্ত্বও স্পষ্টরূপে অন্তর্ভুক্ত।

রসশাস্ত্রের সরণি অনুসরণে ভাব-তত্ত্বের পরিধির মধ্যেও রসের যে স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অত্যন্ত ব্যাপক। শাস্ত্রে রসের পরিধির অন্তর্গত রস, রসাভাস, ভাব,

ভাবাভাস, ভাবোদয়, ভাব-সন্ধি, ভাব-শবলতা ও ভাব-শান্তি প্রভৃতি স্পষ্টরূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখানে 'রস' বলিতে অভিপ্রায় বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী দ্বারা পরিপুষ্ট স্থায়ীর নির্বিঘ্ন প্রতীতি—অর্থাৎ রস শব্দ পরিপাকের অবস্থার বাচক। স্থান-বিশেষে রসের কোন একটি বা একাধিক অবয়বের স্পষ্ট উল্লেখ না হইলে পরেও সেখানে উহার অধ্যাহার করিয়া লওয়া হয় এবং সহৃদয়ের কল্পনা স্বয়ংই এই উহ্য পূর্তি করিয়া লয়। 'রসাভাস'ও পরিপাকের অবস্থার সূচক, কিন্তু ইহাতে প্রতীতি নির্বিঘ্ন হয় না—অর্থাৎ কোন-না-কোন মনোস্তাত্ত্বিক বা নৈতিক বাধার জন্য প্রতীতি যৎকিঞ্চিৎ দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। রসের পরিধির মধ্যে 'রসাভাস'এর অন্তর্ভুক্তি ইহাই প্রমাণিত করে যে নৈতিক মূল্যের দ্বারা পরিপুষ্ট বলিয়া স্বীকার করিলেও রস-সিদ্ধান্ত উহার দ্বারা পরিবদ্ধ নয়—রস মানব-চিন্তাধারাকে প্রমাণরূপে স্বীকার করে, নিয়মগুলিকে নয়—এবং রূঢ় বিচার-নিয়ম হইতে স্বভাবতঃ ইহা মুক্ত। 'ভাব' রসের অপুষ্ট অবস্থার সূচক—উহা হয় অপুষ্ট স্থায়ীর বাচক নতুবা পুষ্ট ব্যভিচারীর: উভয় ক্ষেত্রে উহার দ্বারা পরিপাক সম্ভব নয়। 'ভাবাভাস' ভাবের বাধিত বা অপূর্ণ প্রতীতি। এইগুলিকেও, রসের অন্তর্গত স্বীকার করিবার অর্থ এই যে প্রকৃতপক্ষে ভাবই কাব্যের সরসতার মূলাধার—বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা ইহার পোষণ হইলে পরে রস-প্রতীতি অধিক স্পষ্ট হয়, কিন্তু অপুষ্ট অবস্থাতেও রসবত্তার নিষেধ করা যাইতে পারে না: স্থায়ী অথবা ব্যভিচারী ভাবের সফল অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই রসযুক্ত হয়। 'ভাবোদয়', 'ভাবশান্তি' এবং 'ভাবসন্ধি'র দ্বারা এই তথ্যটি আরও স্পষ্ট হয় যে ভাবের সূক্ষ্মতর অবস্থাগুলিও রস-প্রতীতির জন্য পর্যাপ্ত। 'ভাবশবলতা'য় কোন একটি ভাবের পৃথক সত্তার স্থানে নানা ভাবের সমষ্টি বর্তমান থাকে—রস-পর্যায়ে "ভাব-শবলতার" পরিসংখ্যান আধুনিক আলোচনা শাস্ত্রের এই প্রচলিত ধারণার পূর্বাভাস যে কাব্যানুভূতি কোন একটি ভাবের অনুভূতি বা একাত্মক অনুভূতি নয় বরং "নানা অনুভূতির সমবায়-রূপ"। আবার গুণগুলিকেও রসের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে অতএব চিত্তের দ্রুতি, দীপ্তি ও বিশদতাও, অর্থাৎ চিত্তের সেই সকল বিকারও যেগুলির স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট নয়, রস-পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে 'রস' একটি ব্যাপক শব্দ, উহা কেবল 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযুক্ত স্থায়ী'—অর্থাৎ পরিপাক-অবস্থারই বাচক নয় বরং উহাতে কাব্যগত সম্পূর্ণ ভাব-সম্পদ অন্তর্নিহিত। অপারিভাষিকরূপে উহা কাব্যগত ভাব-সৌন্দর্যের সমার্থক; শব্দার্থগত চমৎকারিতার মাধ্যমে ভাবের আস্বাদ অথবা ভাবের ভূমিকায় শব্দার্থের সৌন্দর্যের আস্বাদই বস্তুতঃ রস। কাব্যের অনুচিন্তনের দ্বারা প্রাপ্ত রাগাত্মক অনুভূতির সকল রূপ ও প্রকার—সূক্ষ্ম ও প্রবল, সরল ও জটিল, ক্ষণিক ও স্থায়ী: সংবেদন, স্পর্শ, চিত্ত-বিকার, ভাব-বিম্ব, সংস্কার, মনোদশা, শীল—সমস্তই রসের পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

অতএব নিজের প্রকৃত অবস্থায় রসের স্থিতিকে মনোময় কোষের মধ্যই স্বীকার করা উচিত। উহা আত্মানন্দের সমার্থক নয়। রসের প্রাথমিক কল্পনা বস্তুনিষ্ঠই ছিল,

রস-সিদ্ধান্তের প্রবর্তক ভরতের দৃষ্টিতে রস পদার্থরূপে স্বীকৃত হয়—রস ইতি কঃ পদার্থঃ; লোল্লট ও শঙ্কুকের সময় পর্যন্ত রসের এই স্বরূপটিই সর্বমান্য ছিল এবং ভট্টনায়কও রসকে ব্রহ্মানন্দ-সহোদর রূপে স্বীকার করিয়াও, উহার পদার্থরূপটিকে সর্বথা অমান্য করেন নাই। আবার অভিনবগুপ্ত শৈবাদ্বৈতের আনন্দ-কল্পনায় সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিয়া উহাকে গভীর আধ্যাত্মিক স্বরূপ প্রদান করেন যাহা পরবর্তী কালে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু অভিনবগুপ্তও উহাকে আত্মানন্দ হইতে নিশ্চিত রূপ ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; তবুও উহাতে আত্মানন্দ তত্ত্বটি যে অন্তর্নিহিত ছিল তাহার কারণ এই যে অভিনবগুপ্তের দার্শনিক মতানুসরণে আনন্দ মাত্রের কল্পনা আত্মানন্দের সন্দর্ভেই সম্ভবপর—সেখানে লৌকিক ও অলৌকিক আনন্দের মধ্যে কোন পারমার্থিক প্রভেদ নাই। অতএব ব্যবহারিক দৃষ্টিতে রস ভাবাভিব্যঞ্জক শব্দার্থ (প্রভৃতি) হইতে উদ্‌বুদ্ধ আনন্দময়ী চেতনারই অপর নাম—এই আনন্দের স্বরূপের ব্যাখ্যা আত্মবাদী[১] আচার্যগণ স্বীয় বিচারানুসরণে করিয়াছেন এবং অপর [২] আচার্যগণ নিজস্ব বিচারানুসরণে।

রস এবং ভারতীয় কাব্য-সিদ্ধান্ত

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে রস-সিদ্ধান্ত সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রধান কাব্য-সিদ্ধান্ত। অলংকার, রীতি, ধ্বনি, বক্রোক্তি ও ঔচিত্য সিদ্ধান্তের বিকাশ ইহার পশ্চাতে এই সন্দর্ভেই হইয়াছে। কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—আত্মা ও দেহের ভিত্তিতে যদি বর্গ বিভাজন করা হয় তাহা হইলে অলংকার, রীতি ও বক্রোক্তিকে দেহবাদী বা বস্তুবাদী এবং ধ্বনি ও ঔচিত্যকে আত্মবাদী সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। আত্মবাদী সম্প্রদায়গুলির সহিত রস-সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান—বলিতে গেলে ধ্বনি ঔচিত্য উভয়েরই কল্পনা রসের ভিত্তিতেই করা হইয়াছে। ঔচিত্য-সিদ্ধান্তের প্রবর্তক স্পষ্টরূপে প্রারম্ভেই বলিয়াছেন: ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্ ॥ ঔ০ বি০ চ০ ১.৫ ॥ প্রকৃতপক্ষে আনন্দবর্দ্ধনের এই প্রসিদ্ধ বাক্যটির উপরই ঔচিত্যের ভিত্তি গড়িয়া উঠে: প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ধ্বনিকার ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তবুও সম্পূর্ণ ধ্বনি-সিদ্ধান্ত রস-ভাবনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আনন্দবর্ধন এবং তাঁহার অনুযায়ীগণ সকলেই স্থানে-স্থানে রসের গুরুত্বের কীর্তন করিয়াছেন এবং রসধ্বনিকে কাব্যের উত্তমোত্তম রূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে কাব্যের আত্মা ধ্বনি এবং ধ্বনির আত্মা রস। বাচ্য হইতে চারুতর ব্যঙ্গ্যের নাম ধ্বনি এবং চারুতার মাপদণ্ড রসাত্মকতা এইরূপে ধ্বনির শুদ্ধ রূপ রস-ধ্বনিই। এই বিচারে রস ও ধ্বনি-সিদ্ধান্ত

১. অভিনবগুপ্ত হইতে জগন্নাথ পর্যন্ত

২. জৈন আচার্য হেমচন্দ্র, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র প্রভৃতি

প্রায় একাকারই হইয়া পড়ে এবং সাধারণতঃ কোন আচার্যই এই দুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন প্রভেদও করেন নাই। বর্তমান কালেও এই দুইটির মধ্যে কোন প্রভেদ করা সম্ভবপর নয়। প্রভেদ কেবল আপেক্ষিক গুরুত্বের দিক দিয়াই দৃষ্ট হয়; ধ্বনি-সিদ্ধান্ত ভাবের ব্যঞ্জনা—আধুনিক শব্দাবলীতে কল্পনাত্মক অভিব্যক্তির উপর এবং রস-সিদ্ধান্ত ভাবতত্ত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, যদিও ধ্বনিবাদীরা ভাবের এবং রস-বাদীরা ব্যঞ্জনার অবমাননা করেন নাই। এইরূপে কাব্যে ধ্বনি ও রসের সহযোগ কল্পনা ও ভাবের সহযোগ এবং উভয়ের প্রতিযোগও কল্পনা ও ভাবেরই প্রতিযোগ। যেইরূপে কেবল ভাব বা কেবল কল্পনার দ্বারা কবিত্বের সিদ্ধি সম্ভবপর নয় সেইরূপে কেবল ভাব বা কেবল ধ্বনির ভিত্তিতেও কাব্যের অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না—উভয়ের পূর্ণ সহ-যোগিতায় কাব্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়—উভয়ের মধ্যে যদি আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা ওঠে তাহা হইলে আমাদেরও কল্পনা ও ভাবের প্রতিযোগ অথবা আপেক্ষিক গুরুত্বের ভিত্তিতেই নির্ণয় দিতে হইবে এবং এই নির্ণয় করা কোন কঠিন কার্য নয়। আধুনিক আলোচনা-শাস্ত্র নির্বিবাদ রূপে ইহা স্বীকার করে যে কল্পনা ও ভাবের মধ্যে, ভাবেরই গুরুত্ব অধিক কারণ কাব্যের সংবেদ্য ভাবই, কল্পনা উহার সমাযোজনার মাধ্যমরূপ—এবং যদিও কাব্যের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটি অনিবার্য, তবুও উহা সংবেদ্যের সমকক্ষ কখনই হইতে পারে না। এই যুগের সর্বাধিক প্রামাণিক আলোচক আই. এ. রিচার্ড্‌স মনোবিজ্ঞানের আলোকে কবিতাকে 'অনু-ভূতি' রূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ঠিক যে তাঁর অভিপ্রেত অনুভূতি শুদ্ধ ভাবের সমার্থক নয়, উহাতে কল্পনা ও বিচার-তত্ত্বও সম্বন্ধযুক্ত, তবুও অনুভূতিতে ভাবের প্রাধান্য অসন্দিগ্ধ—স্বয়ং 'অনুভূতি' শব্দটিই ভাবের প্রাধান্যের প্রমাণ রূপ।

বস্তুবাদী আচার্যগণ কাব্যের বাহ্য সৌন্দর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন: ভাবের উপেক্ষা তাঁরাও করেন না, কিন্তু তাঁদের বিচারে ইহার স্থিতি গৌণ। কবিত্ব, তাঁদের মতে, কথনের চারুতার অপর নাম; কথ্য যার মধ্যে ভাব ও বিচার দুইটিই অন্তর্ভূ'ত, কথনের চারুতারই অঙ্গ বা উপকরণ। এইরূপে এই সিদ্ধান্তানুসরণে রস বা ভাব-বিভূতি কবিত্বের সারতত্ত্ব না হইয়া কেবল উপকরণ মাত্র। উদাহরণস্বরূপ অলংকার-সিদ্ধান্তানুসরণে অলংকারই কাব্যশোভার কারণ-রূপ—অর্থাৎ কাব্যের সৌন্দর্য অলংকারের উপর আশ্রিত, কবিত্ব অলংকারের মধ্যেই নিহিত। অলংকার শব্দার্থের ধর্ম, সাধারণ ধর্ম নয়—অর্থাৎ এমন ধর্ম নয় যাহার প্রয়োগ সাধারণ ভাষায় হয়, বরং ইহা বিশেষ ধর্মরূপ যাহা শব্দার্থে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া উহাকে কাব্যরূপ প্রদান করে। অলংকারের দুইটি ভেদ করা হইয়াছে: সামান্য ও বিশেষ। সামান্যের অন্তর্গত কাব্যের প্রসিদ্ধ বর্ণনীয় বিষয়গুলির বর্ণনা-শৈলীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত সেই সকল বিষয় অথবা বস্তুর বর্ণনা করা হইয়াছে যেগুলির সমাবেশ কাব্য, সৌন্দর্য বা চমৎকারিতার সৃষ্টি করে। এখানে কাব্যের অর্থ শব্দার্থই—'শব্দার্থৌ কাব্যম্'। এখানেও বস্তু মুখ্য নয়, উহার বর্ণনা-শৈলীই মুখ্য;

এই জন্যই, 'সামান্য অলংকার'-এর পরিধির মধ্যে দণ্ডী বর্ণনীয় বিষয়গুলির সঙ্গে কলাশিল্পের বিভিন্ন অঙ্গগুলি, সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গ প্রভৃতিগুলিকেও আগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন। 'সামান্য' অলংকারের ক্ষেত্র প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধকাব্য। বিশেষ-অলংকার-বর্গে অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দালংকার ও উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালংকারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সকল অলংকারের ক্ষেত্র প্রায় উক্তি বা বাক্য পর্যন্তই সীমিত—'প্রায়' আমরা এইজন্য বলিতেছি যে শব্দালংকারের ব্যাপ্তি কখন-কখন সম্পূর্ণ সর্গ বা সম্পূর্ণ প্রবন্ধেও দৃষ্ট হয়, উদাহরণরূপে 'রাঘবপাণ্ডবীয়ম্' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। তবুও 'বিশেষ অলংকার' বাক্য বা উক্তিরই চমৎকার— এবং এই জন্য কুন্তক অর্থালংকারের বিবেচনা বাক্য-বক্রতার অন্তর্গত করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে 'সামান্য অলংকার' এর প্রবন্ধ বা কথা-কাব্যের সহিত সম্বন্ধ বর্তমান এবং 'বিশেষ অলংকার' মুক্তক বা সূক্তি-কাব্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহাদের মধ্যে, পরবর্তী কালে, বিশেষ অলংকারগুলি যথাবৎ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং রসও অলংকারের দ্বন্দ্ব-প্রসঙ্গে অলংকারের অর্থ শব্দালংকার ও অর্থালংকারই মান্য হইয়াছে। আধুনিক শব্দাবলীর অনুসরণে ব্যাপক অর্থে অলংকার কাব্য-শিল্পের সমার্থক এবং সীমিত অর্থে উক্তি-চমৎকারিতা বা অভিব্যঞ্জনা-শিল্পের। অলংকার-সম্প্রদায়ের জন্মই এই ধারণার ভিত্তিতে হইয়াছিল যে রস নাট্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যেখানে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ উপস্থাপনের দ্বারা রসের সহজেই সিদ্ধি লাভ হয়। এই ধারণার অনুসরণে শব্দার্থ-রূপ কাব্যের সহিত উহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধকে স্বীকার করা হয় নাই—স্বীকার করার সম্ভাবনাও ছিল না। কাব্যের সার অর্থাৎ শব্দার্থের সৌন্দর্য— অলংকারই হইতে পারে; প্রবন্ধের ব্যাপক ক্ষেত্রে অলংকার বলিতে অভিপ্রায় বর্ণনা-শৈলীর সৌন্দর্য এবং মুক্তক বা সূক্তির ক্ষেত্রে উহার অর্থ উক্তি-চমৎকার। এই দুইটির মধ্যেও 'সামান্য অলঙ্কার'-এর কল্পনা রস হইতে খুব ভিন্ন নয় কারণ এই সকল অলকংারগুলির রসের বিভাব-অনুভাব অংশের সহিত সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বিদ্যমান থাকে : কাব্যের যাহা 'বর্ণনীয় বস্তু' তাহাই আবার রসের বিভাব ও অনুভাবই। অনুমান করা যাইতে পারে যে অলংকারবাদী প্রাচীন আচার্যগণ এই সম্বন্ধ-সূত্রটিকে ধরিতে পারেন নাই এবং এইজন্য তাঁহারা কাব্যে রসের উপেক্ষা করিয়াছেন। 'বিশেষ অলংকার'-এ চমৎকারিতা প্রায় বাক্য পর্যন্তই সীমিত থাকে; অলংকারবাদীরা এই শব্দার্থগত চমৎকারিতাকেই কবিত্বের আধার বলিয়া স্বীকার করেন, ইহার দ্বারা ব্যক্ত ভাববিশেষকে নয়। অলঙ্কারবাদীরা ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে কবিতায় প্রযুক্ত শব্দার্থের সঙ্গীত অথবা শব্দার্থে নিহিত সাদৃশ্য, বিরোধ, সঙ্গতি প্রভৃতির চমৎকারময়ী কল্পনার উপর কবিতার সৌন্দর্য আশ্রিত অর্থাৎ এই সকল উপকরণের দ্বারা ব্যক্ত বা উদ্‌বুদ্ধ ভাবের উপর এই সৌন্দর্য আশ্রিত নয়। শব্দার্থগত চমৎকারিতা হইতে সহজেই কাব্যানন্দের প্রতীতি হয় ইহা অলংকারবাদীরা স্বীকার করেন—ভাবকে তাঁহারা ছাড়িয়া দেন। শব্দার্থগত চমৎকারিতা হইতে সহৃদয়ের চিত্তে প্রথমে কোন-না-কোন প্রকারের ভাব-সংস্কার উৎপন্ন

হয় এবং উহার মাধ্যমে আনন্দের প্রতীতি হয়,—এই সূত্রটিকে তাঁহারা স্বীকার করেন না এবং বোধ হয় এই সম্বন্ধে কিছু জানেনও না। শব্দার্থের যে চমৎকৃতিকে তাঁহারা কবিত্বের সমার্থক বলিয়া স্বীকার করেন তাহার আধার তন্নিহিত ভাব-বিশেষ ইহাও তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজি নন। কবি-প্রতিভা অর্থাৎ সর্জনাত্মক কল্পনাশক্তিকে তো তাঁহারা আগ্রহের সহিত স্বীকার করেন কিন্তু উহার প্রেরক ভাব-সংস্কারগুলির অলংকারবাদীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব নাই—অনন্তপক্ষে প্রাথমিক বা মৌলিক কোন গুরুত্ব নাই। ইহার বিপরীতে অলংকারবাদীগণ ইহা স্বীকার করেন যে রস-সামগ্রী বা ভাব-সামগ্রী অলংকার-সৃষ্টির সাধন অবশ্যই হইতে পারে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারাও কবিত্বের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু এই সকল বিভাবাদি প্রত্যক্ষরূপে কবিত্বের সৃষ্টি করে না—ইহারাও শব্দার্থের উপকার করিয়া উহার মধ্যে চমৎকারিতা উৎপন্ন করে, অর্থাৎ রসও অলংকারেরই অঙ্গরূপ। অলংকার-সম্প্রদায়ের স্থাপনার পূর্বে রস-সিদ্ধান্তের বিস্তৃত এবং সর্বাঙ্গ বিবেচনা হইয়া গিয়াছিল এবং রসময় কাব্য প্রচুর মাত্রায় উপলব্ধ ছিল, অতএব উহার সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। এইজন্য অলংকারবাদীরা 'রস' এবং 'ভাব'কে সর্বথা রূঢ় এবং স্থূল অর্থে গ্রহণ করিয়া উহাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে অন্তর্লীন করিবার জন্য রসবৎ এবং ঊর্জস্বি অলংকারের উদ্ভাবনা করিলেন এবং রস নিজস্ব ভাব-বিভাবের সম্পত্তি লইয়া অলংকারের দরবারে সামান্য সামন্ত রূপে সমভুক্ত হইল। তবুও রসের প্রতি সকল অলংকারবাদীদের দৃষ্টিকোণ সমান ছিল না—ভামহ এবং উদ্ভট একদিকে যেমন রসের প্রতি উদাসীন ছিলেন তেমনি অন্যদিকে দণ্ডী ও রুদ্রটের দৃষ্টিকোণ বেশ সহানুভূতি পূর্ণ ছিল। পরবর্তী অলঙ্কারবাদীরা রসের গুরুত্বের ব্যাপারে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন—জয়দেবের অনুরূপ উগ্র অলঙ্কারবাদীর কাব্য-সিদ্ধান্ত রস ও ধ্বনির প্রভাবে ওতপ্রোত। ইহার সারতত্ত্ব এই যে প্রারম্ভে যখন এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে রস মূলতঃ নাটকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তখন অলংকার-সম্প্রদায়ে রস উপেক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রান্তি দূর হইবামাত্রই অলংকার ও রসের মধ্যে সম্বন্ধ অধিক মধুর হইয়া উঠিল—বিশুদ্ধ অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতেও রস ও ধ্বনির বিস্তারের সহিত বিবেচনা হইতে লাগিল; অলংকারের গুরুত্ব কম হইল না, কিন্তু রসের মূল্য বাড়িয়া গেল—এইরূপ বাড়িল যে তাহা দেখিয়া পরবর্তী আলংকারিকদের (যেমন জয়দেবকে) অলংকারবাদী না বলিয়া অলংকারপ্রেমিক বলাই অধিক যুক্তিসংগত হইয়া পড়িল। এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে কোন বিবাদ নাই। সাদৃশ্য-মূলক অলংকার বিভাবের স্বরূপকে বিশদ ও গ্রাহ্য করিয়া তোলে এবং অনেক অলংকার এমনও আছে যাহা কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া ভাবকে তীব্রতা প্রদান করে। কিন্তু কেবল এই পর্যন্তই নয়—বাস্তবিক পক্ষে অলংকার কেবল রসের উপকারকই নয়, উহা রসাভিব্যক্তির অনিবার্য মাধ্যম-স্বরূপ। কাব্যের ভাষা (রসের অভিব্যক্তি)—ব্যাপক অর্থে—অলংকৃতই হয়—কোনও কৃতকর্মা কবির পক্ষে চমৎকারহীন শব্দার্থের

মাধ্যমে রমণীয় অর্থ বা ভাবের প্রতিপাদন করা সম্ভবপর নয় এবং কোন কৃতকর্মা আলোচকের পক্ষে ইহা প্রমাণিত করাও সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইহার পরে ভাব-সৌন্দর্য হইতে অসম্পৃক্ত শব্দার্থের যে চমৎকারিত্ব—পারিভাষিক শব্দাবলীতে যে চিত্রকাব্যের সৃষ্টি আলংকারিক করিবেন, উহাকে কি সহৃদয়ের মনঃপ্রীতির পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া ধরা চলিবে ? আমার ধারণা, এখানে এই প্রশ্নে আসিয়া রস ও অলংকারের তারতম্যের নির্ণয় হইয়া যায়। আধুনিক আলোচনাশাস্ত্রে অলঙ্কার বা অপ্রস্তুত বিধান অথবা বিম্ব-যোজনার গুরুত্ব কেবল কেয়ূর বা ভুজবন্ধের সমতুল্য নয়, যেগুলিকে যথাসময় খুলিয়া রাখা যাইতে পারে,— উহার গুরুত্ব শরীরের রূপ-রঙ্গ হইতেও অধিক; তবুও উহাকে প্রাণ-তত্ত্বরূপে প্রায় স্বীকার করা হয় নাই এবং ইহা ঠিকও—অলঙ্কারকে কবিত্বের সমার্থক রূপে স্বীকার করিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে যে কলা চমৎকারিতার সৃষ্টিমাত্র, অনুভূতির সমাযোজনা বা অভিব্যক্তি নয়। এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কলার বহুমান্য ভব্য উদ্দেশ্যের স্থানে কেবল কুতূহলের উদ্‌বুদ্ধির দ্বারাও কাব্যের কার্যকারিতা পূর্ণ হইতে পারে।

রীতি-সিদ্ধান্তও অলঙ্কার-সম্প্রদায়ের অনুরূপ রসের খুব অনুকূল নয়। বামনের মতানুসারে রীতি কাব্যের আত্মা এবং রস রীতির আধারভূত বিশটি গুণের মধ্যে একটি অর্থগুণ কান্তির মূল তত্ত্ব রূপ। এই রূপে রীতি-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত রস রীতির একটি পোষক তত্ত্ববিশেষ—রসের দীপ্তি রীতির শোভার পোষণ করে, এবং ইহাই ইহার সার্থকতা। রসের সম্বন্ধ গুণের সহিত প্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান এবং গুণ শব্দার্থ-রূপ কাব্যের নিত্য ধর্ম, অতএব রস কাব্যের নিত্য ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু উহার অবস্থিতি একটি গুণের মধ্যেই, অতএব রীতির ক্ষেত্রে রসের মূল্য সীমিতই। অপর দিকে রস-সিদ্ধান্তে রস কাব্যের আত্মা এবং পদসংঘটনা রীতি অঙ্গ-সংস্থানের অনুরূপ। বর্ণবিন্যাস এবং শব্দবিন্যাসের দ্বারা নির্মিত রীতি গুণের উপর আশ্রিত এবং গুণ রসের ধর্ম, অতএব গুণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার জন্য রীতিও রসের সহিত সম্বদ্ধ। অলংকারের অনুরূপ রীতিও রসের উপকারক, যেরূপে উক্তি-চমৎকারিতার দ্বারা রস-ব্যঞ্জনাতে সাহায্য লাভ হয়, সেইরূপ সুন্দর পদরচনার দ্বারাও হয়। শব্দ ও অর্থের উপর আশ্রিত রচনা-চমৎকারিতার নাম রীতি যাহা মাধুর্য, ওজ, অথবা প্রসাদ গুণের দ্বারা চিত্তকে দ্রবিত, দীপ্ত ও নির্মল করিয়া রস-দশা পর্যন্ত পৌঁছাইতে সাধন রূপে সহায়ক হয়। অতএব রস-সিদ্ধান্তে রীতির জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট এবং রসাভিব্যক্তির ব্যাপারে ইহার উচিত প্রয়োগ সুবিদিত। আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে উভয়ের স্থিতি স্পষ্ট। 'রীতি'র শব্দার্থ ইহা প্রমাণিত করে যে উহা কেবল বিধিমাত্র, তত্ত্ব নয়। বিধিরও একটি নিজস্ব গুরুত্ব থাকে এবং নানা সন্দর্ভে—কাব্যের সন্দর্ভেও—ক্রিয়ার মূলাধার রূপে উহা প্রতিফলিত হয়; তবুও উহা তত্ত্বের সমকক্ষ বা উহার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে না। রমণীয় শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা অর্থে রমণীয়তার প্রসার হয় বা রমণীয় অর্থের সংস্পর্শে আসিয়া শব্দাবলী চমৎকৃতি লাভ করে—ইহাদের মধ্যে

কোনটি ঠিক? ইহার উত্তর স্পষ্ট: অর্থের রমণীয়তার দ্বারাই শব্দ-বিন্যাস রমণীয় হইয়া ওঠে। কখন-কখন এমনও বোধ হয় যে রমণীয় শব্দের দ্বারা অর্থের সংস্কারও সম্ভবপর হয়—একটি শব্দের স্থানে অপর সমানার্থক শব্দের প্রয়োগের দ্বারা বা শব্দের অনুক্রমে পরিবর্তন করিলে অর্থ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমনটি হয় না, কেবল অনুভব হয়। অভীষ্ট ভাবের অভিব্যক্তির জন্য মূল শব্দ বা মূল ক্রম উপযুক্ত না হইলে পরে অর্থের রমণীয়তায় বাধা উপস্থিত হয়। উপযুক্ত শব্দ এবং ক্রমের মধ্যে ব্যবস্থা ঠিক হইলে অভীষ্ট অর্থের অভিব্যক্তি অনায়াসই হইয়া যায়। অভীষ্ট অর্থই রমণীয় অর্থ। শব্দ বা শব্দের ক্রম আপন হইতে রমণীয় হইতে পারে না। বাস্তবিক দৃষ্টিতে শব্দ প্রতীক মাত্র, উহার তথাকথিত রমণীয়তার আধার 'রমণীয় অর্থ' যাহার উহা প্রতীক রূপ এবং অর্থের রমণীয়তার আধার নিশ্চিত রূপে ভাবই। রমণীয়তার অর্থ, 'যাহাতে শ্রোতার চিত্ত রমণ করে' এবং শ্রোতার চিত্তবৃত্তির সংবাদ চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ ভাবের সঙ্গেই সম্ভবপর; এইরূপে অর্থের রমণীয়তা ভাবরঞ্জিতই হয়—সেই অর্থই রমণীয় যাহা আমাদের বোধবৃত্তির সাথে-সাথে চিত্তবৃত্তিকেও প্রভাবিত করে—এবং পরিণামে সেই শব্দই রমণীয় হয় যাহার দ্বারা অর্থবোধের সাথে-সাথে ভাবের উদ্‌বোধও হয়। শব্দের ক্রম বা বিন্যাসের বিষয়েও ইহাই সত্য। অতএব প্রকৃতপক্ষে শব্দার্থ এবং উহার বিন্যাসজন্য চারুতার আধার ভাবই। এই সম্বন্ধে বিবাদ করিবার কেন সুযোগ নাই। রীতি-সিদ্ধান্ত এই নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ক্রমটিকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল এবং এইজন্য ইহার পতনও ঘটিল।

বক্রোক্তিকারের দৃষ্টি ইহার অপেক্ষা অধিক উদার ছিল। কুন্তক কাব্যলক্ষণ এবং প্রয়োজনের অন্তর্গত রসের গুরুত্বের মুক্ত কণ্ঠে উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষণের অন্তর্গত কুন্তক বক্র কবিব্যাপারের সহিত তদ্বিদাহ্লাদকারিতাকেও অনিবার্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রয়োজনের বিষয়ে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন:

চতুর্বর্গফলাস্বাদমপ্যতিক্রম্য তদ্বিদাম্।
কাব্যামৃতরসেনান্তশ্চমৎকারো বিতন্যতে ॥১.৫॥

—অর্থাৎ কাব্যামৃতের রস রসজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে চতুর্বর্গ রূপ ফলের আস্বাদের অপেক্ষাও অধিক চমৎকারিতা উৎপন্ন করে। এবং 'তদ্বিদ্' এর অর্থ কুন্তকের অনুসরণে কেবল কাব্য মর্মজ্ঞ নয়—'তদ্বিদ্' এর স্পষ্ট অর্থ 'সরসাত্মা' 'আর্দ্রচেতা', 'রসাদিপরমার্থজ্ঞ'—অর্থাৎ রসমর্মজ্ঞ। এইরূপে কাব্যভেদ, কাব্যবস্তু এবং কাব্য-মার্গেও রসের স্থান অত্যন্ত প্রমুখ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। প্রবন্ধ কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ এবং প্রবন্ধের আধার-তত্ত্ব (কথা নয়) রস:

নিরন্তররসোদ্গারগর্ভসন্দর্ভনির্ভরাঃ।
গিরঃ কবীনাং জীবন্তি ন কথামাত্রমাশ্রিতাঃ॥

৪.৩-৪ অন্তরশ্লোক ॥

—অর্থাৎ বক্রোক্তি-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত রসই কাব্যের পরম তত্ত্ব। কাব্য-বস্তুর

কুন্তক দুইটি ভেদ করিয়াছেন ঃ স্বভাব-প্রধান এবং রস-প্রধান এবং উভয়কে রস-স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ঃ

"এইরূপে স্বভাব-প্রাধান্য এবং রস-প্রাধান্যের আশ্রয়ে উভয় প্রকারের বর্ণনীয় বিষয়-বস্তুর সহজ সৌকুমার্যের দ্বারা রস-স্বরূপ শরীরই অলংকার্যতার যোগ্য হয়"। (ব০ জী০ ৩/১১র বৃত্তি)। এই বর্ণনীয় বস্তুর চেতন ও জড় নামে দুইটি ভেদ আরও আছে। এইগুলির মধ্যে চেতনই মুখ্য এবং উহার জন্য রসাদির পরিপোষণ অনিবার্য; জড়ের বর্ণনাও কাব্যের অঙ্গরূপেই হয়, কিন্তু জড় অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পদার্থের বর্ণনা রসোদ্দীপন সামর্থ্যের জন্যই কাব্যরূপ গ্রহণ করে। সারাংশ এই যে বর্ণনীয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে রস-নির্ভরতার জন্যই কাব্যে স্বীকার্য হয়। কাব্য-মার্গের বিবেচনাতেও রসের গুরুত্ব অসংদিগ্ধ ঃ সুকুমার ও বিচিত্র উভয় মার্গে রসের চমৎকারিত্বের যোগ থাকে। সুকুমার মার্গ 'রসাদিপরমার্থজ্ঞমনঃসংবদাসুন্দরঃ' অর্থাৎ রসের রহস্য যিনি জানেন সেই সহৃদয়ের মনের অনুরূপ হওয়ার জন্য সুন্দর হয় এবং বিচিত্র মার্গ কমনীয় বৈচিত্র্যের দ্বারা পরিপোষিত হওয়ার সাথে-সাথে সরসাকৃত—কুন্তকের নিজের ভাষায়, রসনির্ভরাভিপ্রায় (রস নির্ভর অভিপ্রায়ের দ্বারা যুক্ত-ও) হয়। অপর দিকে তৃতীয় মার্গটিরও যাহা মধ্যম মার্গ, উভয়ের মিশ্ররূপ হওয়ার জন্য, রসপুষ্ট হওয়া উচিত। এইরূপে তিনটি মার্গেই রসের অভিষেক অনিবার্য।—পরিশেষে রসবৎ অলংকারের নিষেধ এবং রসের অলংকার্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া কুন্তক রসের প্রতি নিজের পক্ষপাতিত্ব আরও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অলংকারবাদীরা যে অস্ত্রের বলে রস-সিদ্ধান্তের মুকাবিলা করিতেছিলেন, কুন্তক উহাকেই নিষ্প্রভ করিয়া দিলেন। তাঁহার মতানুসারে রসকে অলংকার রূপে গ্রহণ করা সর্বথা অনুপযুক্ত, কিন্তু 'রসতত্ত্বের বিধানে, সহৃদয়ের পক্ষে আহ্লাদকারী হওয়ার জন্য সেই অলংকারকে রসবৎ বলা যাইতে পারে যাহা রসের অনুরূপ হইয়া যায়'। এবং 'এইরূপে অর্থাৎ রসের চমৎকারিতার ভিত্তিতে এই অলংকার সমস্ত অলংকারের প্রাণ এবং কাব্যের অদ্বিতীয় সার-সর্বস্ব হইয়া যায়।' (১.১৪) এখানে কুন্তক রস-সিদ্ধান্তের মূল কেন্দ্রে উপনীত হইয়াছেন ঃ অলংকারের তাহাই যথার্থ রূপ যাহা রসের প্রভাবে চমৎকারিতা লাভ করে—যাহা ভাবের রঙ্গে রঞ্জিত, অর্থাৎ অলংকারগুলিতেও রসের অভিষেকের দ্বারা কবিত্বের উদ্ভাবনা হয়--কেবল শব্দার্থ-ক্রীড়া কাব্য নয়। ইহা অপেক্ষা রসের জয় আর কি ভাবে ঘোষিত হইতে পারে?

এখন এই প্রশ্নটি অবশিষ্ট থাকে যে কুন্তক একদিকে ইহা বলিতেছেন যে সালংকারস্য কাব্যত এবং বক্রোক্তি কাব্যজীবিতম্— অর্থাৎ অলংকাররূপিণী বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ এবং অপর দিকে ইহাও বলিতেছেন যে রস কাব্যের পরম তত্ত্ব, তাহা হইলে এই দুইটি মতবাদের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য স্থাপিত করা যাইতে পারে? উভয়ের মধ্যে বাস্তবিক সম্বন্ধ কি এবং উভয়ের মধ্যে তারতম্যের নির্ণয়ই বা কিরূপে সম্ভবপর? এই প্রশ্নের উত্তরও অসম্ভব নয়। বক্রোক্তি-সিদ্ধান্তের অনুসরণে

বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ এবং ইতিপূর্বে যাহা আমরা "বক্রোক্তি জীবিতম্" এর ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়াছি যে বক্রোক্তি মাত্র উক্তি-চমৎকার নয় উহা কাব্য-কলারই সমার্থক। "বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্"-এর অভিপ্রায় এই যে কাব্য স্বরূপতঃ কলা-বিশেষ—অনুভূতি নয়। মনোস্তাত্ত্বিক আলোচকগণ ইহাই স্বীকার করেন। এই কলার রচনার জন্য কবি শব্দার্থের নানা উপাদান ব্যবহার করেন এবং অর্থের নানা উপাদানের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান হইতেছে রস। অতএব রস বক্রোক্তির পরমনিধি—কাব্যের প্রাণচেতনা তো বক্রতাই, কিন্তু এই বক্রতার সমৃদ্ধির প্রমুখ আধার রস-সম্পদ্। এই-রূপে রসের সহিত বক্রোক্তির সম্বন্ধ প্রায় ঠিক সেইরূপ বিদ্যমান যেরূপ রসের ধ্বনির সহিত বিদ্যমান আছেঃ কাব্যের আত্মা বক্রতা, কিন্তু রস বক্রতার সার-সর্বস্ব। উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ সেই সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে আবার, কাব্যের কলা-পক্ষ ও ভাব-পক্ষের আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্নটি আসিয়া পড়ে যাহার উত্তর ইতিপূর্বে আমরা দিয়াছি।

ঔচিত্য-সিদ্ধান্তের বিষয়ে পৃথক বিবেচনার প্রয়োজন নাই কারণ উহার কল্পনা রস-সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবেচনার দ্বারা ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে প্রচলিত অন্য মূল-সিদ্ধান্তগুলির সহিত রস-সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ স্পষ্ট হইয়া যায়। এই বিষয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সার-কথা নিম্নলিখিত রূপে গৃহীত হইতে পারেঃ

(১) রস-সিদ্ধান্ত ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রাচীন ব্যাপক ও বহুমান্য সিদ্ধান্ত। প্রারম্ভে এই সম্বন্ধে এই ধরণের ভ্রান্তির প্রসার হইয়াছিল যে রসের বিভাব অনুভাব প্রভৃতির উপস্থাপনা নাট্যেই সম্ভবপর অতএব উহার বাস্তবিক ক্ষেত্র নাট্যই। এই ভ্রান্তির পরিণামস্বরূপ কাব্যের ক্ষেত্র শব্দার্থের পরিধির মধ্যে, রস হইতে ভিন্ন আত্মভূত তত্ত্বের সন্ধান প্রারম্ভ হয় এবং শব্দার্থগত চমৎকারিতার দুইটি প্রমুখ রূপ প্রসার লাভ করে অলংকার ও রীতি। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণার খুব শীঘ্রই অবসান ঘটে এবং শব্দার্থের ক্ষেত্রেই বিভাদির প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আনন্দবর্ধন ধ্বনির উদ্‌ভাবনার দ্বারা শব্দার্থে নিহিত শক্তির উদ্‌ঘাটন করিলেন এবং ব্যঞ্জনার দ্বারা বিভাবাদির উপস্থাপনকারী নাট্যসামগ্রীর অভাব দূর করিলেন। অভিনবগুপ্ত এই তথ্যটিকে আরও স্পষ্ট করিলেন কাব্যের সহিত রসের উচিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং শব্দার্থের সন্দর্ভেও রস-সিদ্ধান্ত পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

(২) ধ্বনির প্রতিষ্ঠার পূর্বে অলংকার ও রীতি-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ও রস সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষিত হয় নাই। অলংকারবাদিরা রসবৎ অলংকার রূপে এবং রীতিকারেরা রীতির আধারভূত গুণের পোষকতত্ত্বরূপে উহাকে শব্দার্থ=কাব্যের শোভাবিধায়ক ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ধ্বনির প্রতিষ্ঠার পরেও এই চিন্তাধারাটি বক্রোক্তি-সিদ্ধান্ত রূপে প্রকট হয়। কুন্তক যদিও বক্রতাকেই কাব্যের প্রাণ-চেতনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তবুও রসের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে অবাধ আকর্ষণ ছিল—রসকে তিনি বক্রতার সমৃদ্ধির মুখ্য আধার বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

(৩) এইরূপে ভারতীয় কলাবাদ ক্রমশঃ অলংকার, রীতি ও বক্রোক্তি-সিদ্ধান্ত-রূপে প্রস্ফুটিত হইল— এবং বক্রোক্তির পরিকল্পনায় উহা পূর্ণ বিকশিত রূপে দেখা দিল। এই সকল সিদ্ধান্তগুলির সার কথা এই যে কাব্য কলারূপ এবং অনুভূতি উহার পোষক তত্ত্ব।

(৪) অপর দিকে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রস-সিদ্ধান্তও অলংকার, রীতি ও কলার অন্যান্য তত্ত্বগুলির উচিত প্রয়োগ করিতে লাগিল। সাধারণতঃ অলংকারকে ভূষণ ও রীতিকে অঙ্গ-সংস্থানের অনুরূপই স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা কেবল মাত্র স্থূল কল্পনা ছিল। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে—গুণ, অলংকার এবং অন্য কলা-উপকরণ-গুলিকে বিভাবাদির সাধারণীকরণের জন্য এবং ইহার পরে এইগুলির সাহায্যে ভাবকে ব্যক্তি-সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া আস্বাদের বিষয় রূপ প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া ধরা হইল। শব্দার্থের কলাত্মক প্রয়োগ ব্যতীত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সাক্ষাৎ উপস্থাপনা এবং উহার সাধারণীকরণও সম্ভবপর নয় অর্থাৎ দেশ-কালের বন্ধন হইতে মুক্ত সর্বসহৃদয়-গম্য রূপের মাত্র কল্পনাই করা যাইতে পারে—এবং,উহা ব্যতীত স্থায়ী ভাবের নির্বিঘ্ন প্রতীতি সম্ভবপর নয়। অতএব অলংকার, গুণ (রীতি), বিম্ব-বিধান, প্রবন্ধ-কল্পনা প্রভৃতি সমস্তই রসের সহায়ক উপকরণ এবং রসের প্রতীতির জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য।

(৫) অলংকার, রীতি ও বক্রোক্তি রসের সহিত ঠিক সেই ভাবই সম্বন্ধযুক্ত যে ভাবে আধুনিক আলোচনাশাস্ত্রের ভাষায় কাব্যের অন্তর্গত কলা (শিল্প) তত্ত্ব ও অনুভূতি তত্ত্ব পরস্পরে যুক্ত। কাব্যে উভয়ের সমন্বয়যুক্ত হওয়া অনিবার্য ঃ প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগে উভয়ের সমন্বিত রূপটিকেই কাব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। কলা বা কলাত্মক অভিব্যক্তি ব্যতীত ভাব-বিভূতি কেবল অনুভূতিরই বিষয় এবং ভাবের সংস্পর্শ ব্যতীত কলা শব্দ-ক্রীড়া মাত্র। উভয় ক্ষেত্রে অতিবাদের ফলে হানি হইয়াছে। কলার ক্ষেত্রে অতিবাদের জন্য অনর্থ তো ঘটিয়াছেই, কিন্তু তাহা বলিয়া রস-বিষয়ক অতিবাদও গ্রহণযোগ্য নয়; যেইরূপ ভাব-বিরহিত কলা (শিল্প) কাব্য নয়, সেইরূপ কেবল ভাবের উদ্‌গারও কাব্য নয় কারণ ইহা স্বীকার করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির হর্ষ-বিষাদের উদ্রেক কাব্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

(৬) ধ্বনি ও রসের সম্পর্ক আরও অন্তরঙ্গ কারণ উভয়ের পরিকল্পনা সহৃদয় নিষ্ঠ রূপে হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে রস-সিদ্ধান্ত যেখানে কল্পনাত্মক ভাবধারাকে কবিত্বের প্রাণতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করে, সেখানে ধ্বনি-সিদ্ধান্ত ভাব-রঞ্জিত কল্পনাকে গ্রহণ করে; এবং এই প্রভেদটি প্রকৃতপক্ষে এতই সূক্ষ্ম যে কালান্তরে ইহার একপ্রকারে বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু যদি উভয়ের মধ্যবর্তী পৃথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে এই প্রভেদটিকে মনে রাখিতেই হইবে।

(৭) ঔচিত্য-সিদ্ধান্তের বিকাশ রস-সিদ্ধান্তেরই আশ্রয়ে হইয়াছে; অতএব উহা বলিতে গেলে তাহার অঙ্গরূপ। রসের পরিধির মধ্যেই ঔচিত্যের সত্তা ও সার্থকতা।

(৮) এইরূপে রস-সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ব্যাপক সিদ্ধান্ত এবং উহার দৃষ্টি কোন বিবেক-পুষ্ট সহিষ্ণুতার দ্বারা সংযুক্ত : অনুভূতির সীমার মধ্যে পরিবদ্ধ থাকিয়াও রস অলঙ্কার, রীতি, গুণ, বক্রতা এবং ধ্বনি সকলের সঙ্গেই পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং সকলের নিকট হইতে উচিত সহযোগিতা লাভও করে—উহার ধৈর্য সেখানেই নষ্ট হয় যেখানে শব্দার্থের সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। এই দৃষ্টিতে ধ্বনি সিদ্ধান্তটিকে আরও উদার বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই উদারতার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। ইহার জন্য দাতার স্বরূপ হানি ঘটে এবং অদাতাকে 'অধম' বিশেষণের ভাগী হইতে হয়। তাহা হইলে এই উদারতার কি লাভ?

(৯) সহযোগিতার অভাবে যখন প্রতিযোগ বা প্রভেদের প্রশ্ন ওঠে তখন রসের রূপ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্য সিদ্ধান্তগুলির সন্দর্ভে রসের স্থিতির মানচিত্রটি অনেকটা এইভাবে তৈরী হয়:

অলঙ্কার-সিদ্ধান্ত : শব্দার্থ-(উক্তি—) চমৎকার + আনন্দ = কাব্যাস্বাদ।
রীতি-সিদ্ধান্ত : শৈলী-সৌন্দর্য + আনন্দ = কাব্যাস্বাদ
বক্রোক্তি-সিদ্ধান্ত : কবিব্যাপার বা কলা + আনন্দ = কাব্যাস্বাদ
ধ্বনি-সিদ্ধান্ত : রমণীয় (ভাব-প্রেরিত) কল্পনা + শব্দার্থময়ী অভিব্যক্তি + আনন্দ = কাব্যাস্বাদ
ঔচিত্য-সিদ্ধান্ত : ভাব-প্রেরিত বিবেক + শব্দার্থময়ী অভিব্যক্তি + আনন্দ = কাব্যাস্বাদ
রস-সিদ্ধান্ত : কল্পনাত্মক ভাব + শব্দার্থময়ী অভিব্যক্তি + আনন্দ = কাব্যাস্বাদ

এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে আনন্দ তত্ত্ব সমান রূপে বিদ্যমান : উহাকে সরাইয়া দিলে—অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি, ধ্বনি এবং ঔচিত্যের সঙ্গে রসের প্রভেদের অর্থ দাঁড়ায় ক্রমশঃ উক্তি চমৎকার, শৈলী, কলা (শিল্প) রমণীয় কল্পনা এবং ভাবপ্রেরিত বিবেকের সঙ্গে কল্পনারমণীয় ভাবধারার প্রভেদ। এবং ইহার নির্ণয়—খুব কঠিন নয়—প্রকৃতপক্ষে কাব্যের অন্তর্গত সকলের গুরুত্ব সমানরূপে বজায় থাকিলেও, ইহাদের মধ্যে কোন একটি তত্ত্ব স্বতন্ত্র ভাবে ভাবের সমতুল্য হইতে পারে না, কারণ ভাব সম্পূর্ণ জীবনেরই প্রেরক তত্ত্ব; জীবনে রস ভাবের অভিষেকের দ্বারা উপস্থিত হয়। চারিত্রিক সমৃদ্ধি এবং জীবনের সকল মূল্যের আধার ভাবই এবং আনন্দের সেই রূপই প্রবল এবং গম্ভীর যাহা ভাবের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়: ভাব হইতে অসম্পৃক্ত কল্পনার চমৎকারিতা বা শৈলী অথবা উক্তির বৈচিত্র্য কুতূহল অপেক্ষা আর কিছু নয়। তর্ক ছাড়া অনুভবের ভিত্তিতেও ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে কাব্যের সেই তত্ত্বই স্থায়ী যাহা সহৃদয়ের সংস্কারে স্থান করিয়া লয় এবং ইহা ভাব ব্যতীত আর অন্য কোন তত্ত্ব হইতে পারে না। অতএব কাব্যের অন্য সমস্ত তত্ত্বের তুলনায় ভাবের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়াছে ও থাকিবে এবং এই অনুপাতে কাব্যের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলির অপেক্ষা রস-সিদ্ধান্তের গুরুত্বও অব্যাহত থাকিয়াছে ও থাকিবে।

রস ও পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদ

পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসে সময়ে-সময়ে বিভিন্ন বাদের প্রবর্তন হইয়াছে। এই সকল বাদের প্রায় দুইটি রূপ দৃষ্ট হয়—একটি ঐতিহাসিক এবং অপরটি তাত্ত্বিক। প্রত্যেকটি বাদ একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অতএব উহার একটি প্রারম্ভিক সময়-সাপেক্ষ অর্থ থাকে—কিন্তু কালান্তরে উহা একটি ধারণার—জীবন ও কাব্যের প্রতি একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের বাচক হইয়া যায় যাহা কোন দেশ এবং যুগ-বিশেষের সহিত আবদ্ধ থাকে না। যদিও প্রত্যেকটি বাদের কাব্যের তত্ত্ব এবং রূপ উভয়ের প্রতি একটি নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থাকে তবুও কতকগুলিতে তত্ত্বের প্রাধান্য এবং কতকগুলিতে রূপের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়—এবং, এই দৃষ্টি অনুসরণে ইহাদের স্থূলরূপে দুইটি বর্গে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ক্লাসিসিজ্‌ম, রোমাণ্টিসিজ্‌ম, আদর্শবাদ ও বাস্তববাদে বস্তুর (ভাব-বিচারের) প্রাধান্য বর্তমান ও রূপ অপেক্ষাকৃত গৌণ এবং অভিব্যঞ্জনাবাদ (Expressionism), প্রভাববাদ (Impressionism), প্রতীকবাদ প্রভৃতিতে রূপই প্রমুখ ও বস্তু গৌণ। প্রারম্ভে এই সকলের মধ্যে প্রায় উগ্র বিরোধ থাকে, ইহার পর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের প্রযত্ন চলে এবং পরিশেষে বিরোধিতার উগ্রতা প্রশমিত হইয়া পড়ে এবং ফলে সাম্যের ভিত্তিতে বৈষম্যের ভাবধারাটি অনেকটা স্পষ্টরূপে প্রকাশ লাভ করিতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল দৃষ্টিকোণ স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যুক্তিযুক্ত হইলেও কোন একটি তত্ত্ব-বিশেষের প্রতি আগ্রহ থাকিবার জন্য এই সকল মতবাদগুলি সর্বাঙ্গীণ রূপ ধারণ করিতে পারে নাই এবং পরিণামে বিশ্ব-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট অংশ ও রূপ এমন দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলিকে কোন একটি মতবাদের অন্তর্ভুর্ক্ত করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের ধারণা এই যে রস-সিদ্ধান্ত এমন একটি ব্যাপক সিদ্ধান্ত যাহার দ্বারা এই সকল বাদগুলির বিবাদ মিটিয়া যায়, যাহা সকলের অনুকূল এবং যাহা সমস্ত মতবাদগুলিকে নিজস্ব স্বরূপের মধ্যে সমন্বয়যুক্ত করিয়া লয়।

প্রথমে ক্লাসিসিজ্‌ম ও রোমাণ্টিসিজ্‌মের কথাই ধরা যাক যাহা পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কাব্য-সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত। এই দুইটি মতবাদের বিভিন্ন ধারণাগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত—এমন কি একটির স্বরূপ অপরটির সন্দর্ভেই স্পষ্ট হয়। উভয়েরই ঐতিহাসিক রূপ বা অর্থ বর্তমান আছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে উহার কোন বিশেষ সার্থকতা নাই—অতএব আমরা এই দুই বাদের কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বিবেচনাই করিব। ক্লাসিসিজ্‌মকে কলার স্বাস্থ্যশ্রী বলা হইয়াছে—এই মতানুসরণে কলার মূল তত্ত্বগুলির পূর্ণ সামঞ্জস্যই ক্লাসিসিজ্‌মের আধাররূপ। বিচারের ক্ষেত্রে বিবেক অর্থাৎ ঔচিত্য-ভাবনা এবং নীতি ও পরম্পরার প্রতি আস্থা ঃ ভাবের ক্ষেত্রে—সংবেদ্য ও আস্বাদ উভয়ের মধ্যে--সংযম ও শান্তি অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির সমীকরণ; অপর দিকে কলার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ও ভারসাম্য-তত্ত্বের সহিত রূপের এবং রূপের বিভিন্ন উপকরণের

পারস্পরিক সৌসাম্য, সংক্ষেপে এই সকলই ক্লাসিসিজ্‌মের প্রমুখ লক্ষণ। ক্লাসিসিজ্‌মে কলার মূল বিচার এবং অভিব্যঞ্জনার মধ্যে পূর্ণতার একটি আদর্শ বর্তমান থাকে এবং এই আদর্শ হয় মূর্ত, স্পষ্ট এবং সর্বাঙ্গপূর্ণ। 'বৈচিত্র্য' এবং 'বৈবিধ্য' ইহাতে সংযুক্ত থাকে এবং 'অদ্‌ভুত' বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপে উপস্থিত হয়। এইজন্য ভারতের নানা ভাষায়, উদাহরণস্বরূপ গুজরাতীতে, 'ক্লাসিসিজ্‌ম'এর জন্য 'স্বাস্থ্য' শব্দেরই প্রয়োগ হইতে লাগিয়াছে। কিন্তু ক্লাসিসিজ্‌ম রীতিবাদের সমার্থক নয়—উহা কেবল মাত্র শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল নয়; গরিমা উহার সহজধর্ম—উদাত্ত বিষয়-বস্তু, উদাত্ত বিচার ও উদাত্ত ভাব ইহার প্রমুখ তত্ত্ব, যদিও ইহাদের উপর বিবেকের অনুশাসন অনিবার্য। ইহাতে শক্তি ও কল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু উহার শক্তি উচ্ছৃঙ্খল ও কল্পনা নির্বাধ হয় না। রস-সিদ্ধান্তে এই সকল বিচারের সমর্থন পাওয়া যায়। যে 'ঔচিত্য' ক্লাসিসিজ্‌মের আধার তত্ত্ব, তাহাই রসেরও 'উপনিষদ্'। রস-সিদ্ধান্তে নীতি এবং পরম্পরার প্রতি আস্থা এবং ভাবাত্মক সংযমে বিশ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। পরম্পরা ও নীতির বিরোধে রস-ভঙ্গ হইয়া যায় এবং ভাবের অনিয়ন্ত্রিত উদ্‌গার রসকে রসভাসে পরিণত করে। এইরূপ শান্তি অথবা চিত্তবৃত্তির সমীকরণ, ভারতীয় শাস্ত্রের শব্দাবলীতে আত্মবিশ্রান্তি রসের চরম লক্ষণ। রস-সিদ্ধান্তও মূলতঃ কলার একটি পরিপূর্ণ ও মূর্ত রূপকে লইয়াই অগ্রসর হয়—বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী প্রভৃতির বিধান এই পরিপূর্ণতা ও মূর্ততার নিমিত্তে করা হইয়াছে। অতএব রস-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ক্লাসিসিজ্‌মের প্রায় সমস্ত ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত।

রোমান্টিসিজ্‌মকে কখন-কখন ক্লাসিসিজ্‌মের বিপরীত রূপ বলিয়া ধরা হয়। যদিও ইহা ঠিক নয়, তবুও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে উভয়ের মধ্যে বেশ বিরোধ আছে। ইহা স্বচ্ছন্দ কাব্য প্রবৃত্তির সিদ্ধান্তে ও স্বাস্থ্যের অপেক্ষা শক্তিতে বিশ্বাসী। ইহা বিবেক ও নীতির অপেক্ষা প্রকৃতি বা স্বভাবকে, সংযমের অপেক্ষা মুক্ত অভিব্যক্তিকে, পরম্পরার অপেক্ষা প্রবাহকে এবং বিধানের অপেক্ষা বিদ্রোহকে প্রাধান্য দেয়। ইহা আত্মার শক্তির তুলনায় আত্মার উদ্বেলন অথবা মন্থন অথবা উল্লাসকে অধিক মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করে। রোমান্টিসিজ্‌ম গরিমার উপাসক, উদাত্ত ও ভব্যতার প্রতি এই মতবাদে অবাধ আকর্ষণ বিদ্যমান আছে—কিন্তু উহার উদাত্ততা ও ভব্যতা অসীমের সহিত সংযুক্ত। ব্যক্তের অপেক্ষা অব্যক্ত বা অর্দ্ধ-ব্যক্ত, গোচরের অপেক্ষা রহস্যময়ের কামনাই এখানে মুখর। অনুভূতির ক্ষেত্রে জ্ঞানের অপেক্ষা জিজ্ঞাসার গুরুত্ব এখানে অধিক, বোধের তুলনায় সংবেদন এখানে অধিক মূল্যবান—বিচারের অপেক্ষা বাসনার শক্তি এখানে অধিক প্রবল। কলার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের পরিভাষা ইহার নিজস্ব। রোমান্টিসিজ্‌মে সাম্যকে অন্তপক্ষে বহিরঙ্গ সাম্যকে কলার ক্ষুদ্র উপায় বলিয়া ধরা হয়; এই মতবাদে সামঞ্জস্যের গম্ভীর ও আধ্যাত্মিক অং আছে: এখানে সামঞ্জস্য বলিতে অভিপ্রায় বহিরঙ্গ বা যান্ত্রিক কর্ম নয় বরং কবি প্রকাশ-রত চেতনার ক্রিয়া বিশেষ—এই সামঞ্জস্য মূলতঃ কবির চেতনায় সম্পন্ন হই

শব্দ-অর্থে অনায়াসেই প্রস্ফুটিত হয়। বৈশদ্যের স্থানে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির প্রতি এবং মূর্তের স্থানে অমূর্তের প্রতি ইহা অনুরাগী। সুন্দর ইহার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, অদ্‌ভুতের যোগ ইহাতে অনিবার্য—অদ্‌ভুত ব্যতীত ইহা প্রাণবন্ত হইতে পারে না। এই জন্য পেটর 'সুন্দরের সহিত অদ্‌ভুতের সংযোগ'কে রোমান্টিসিজ্‌মের প্রাণ-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা কল্পনা ও ভাবের উপাসক, কিন্তু ক্লাসিসিজ্‌মের অনুরূপ এইগুলিকে সীমিত ও সংযত রাখার প্রতি আনুগত্যপূর্ণ নয়—ইহার ধারণা এই যে—কল্পনা ও ভাবকে দমন করিলে কলাকে দমন করা হয় এবং ইহাদের মুক্তি কলারই মুক্তি। এইরূপে রোমান্টিসিজ্‌ম একটি গতিশীল ও প্রাণবন্ত কাব্যসিদ্ধান্ত যাহা ভাব ও কল্পনার সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ও শক্তিতে আস্থাশীল। উল্লিখিত তত্ত্ব এবং লক্ষণগুলির মধ্যে এমন একটিও নাই যাহার সহিত রস-সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি বর্তমান আছে অথবা যাহার রস-সিদ্ধান্তের সরণি অবলম্বনে উচিত মূল্যাঙ্কন সম্ভব নয়। রস-সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন কলার স্বাস্থ্যের সমর্থক অপরদিকে তেমনি শক্তির উপাসক—উহাতে বিবেক ও নীতির সহিত প্রকৃতি বা স্বভাবের মুক্ত অভিব্যক্তির পূর্ণ সুযোগ আছে, জিজ্ঞাসা রসের পক্ষে অকাম্য নয় এবং বাসনার সহিত উহার জন্মজাত সম্বন্ধ বিদ্যমান। পরম্পরার প্রতি উহাতে আস্থা নিহিত আছে, কিন্তু বিদ্রোহের সহিত উহার কোন বিরোধ নাই। উহার আধার ভাবের সমৃদ্ধি—বিভাব ও ভাব-পক্ষের বিস্তৃতি ইহার প্রমাণ। কল্পনার বৈভব-বৈচিত্র্য এবং বৈবিধ্যকে রস-সিদ্ধান্ত আগ্রহের সহিত স্বীকার করে—লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার সম্পদ্—গুণালঙ্কার-সম্পদ্, যাহাকে রস-সিদ্ধান্ত সাধনরূপে স্বীকার করে, তাহা কল্পনারই তো বিভূতি রূপ। প্রকৃতপক্ষে রসের প্রেরক সিদ্ধান্ত আনন্দবাদী প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন—আত্মার ঐশ্বর্যের দর্শন এবং উহা ভাব ও কল্পনার রসময় বিভূতির অনন্ত ভাণ্ডার। উহাতে ব্যক্তিবাদ এবং সমষ্টিবাদ সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত; রসের ভূমিকা ব্যক্তিনিষ্ঠ কিন্তু উহার পরিণতি সার্বজনীন এবং সার্বভৌম। রোমান্টি-সিজ্‌মের কেবল একটি লক্ষণ এমন থাকিয়া যায় যাহার সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারে। রোমান্টিসিজ্‌মে শান্তির স্থানে আধ্যাত্মিক উদ্বেলন এবং উচ্ছলনের প্রাধান্য বর্তমান এবং অপরদিকে রসের লক্ষণ হইতেছে আত্ম-বিশ্রান্তি, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কেমন করিয়া স্থাপিত হইতে পারে? ইহার একটি উত্তর তো এই যে রোমান্টি-সিজ্‌মে সর্বত্র শান্তির অভাব নাই—উদাহরণস্বরূপ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অধিকাংশ কবিতা-গুলিতে আধ্যাত্মিক শান্তি পরিব্যাপ্ত এবং অপরদিকে রস-কল্পনাতেও দ্বন্দ্ব ও উচ্ছলনের অভাব নাই, বিশ্রান্তি তো পরিণতির লক্ষণ—উহার পূর্বের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব, উদ্বেলন, সমস্তই অন্তর্ভাব্য—ভাব-সবলতা, ভাব-সন্ধি, বিরোধী রসের কল্পনা ইহার অকাট্য প্রমাণ যে রস-সিদ্ধান্ত সর্বথা 'অদ্বন্দ্ব'-এর উপর আশ্রিত নয়। এই অভিযোগের তাত্ত্বিক সমাধান এই যে রোমান্টিসিজ্‌মেও উদ্বেলন ও উচ্ছলন সর্জনা ও চর্বনার প্রক্রিয়ার লক্ষণগুলিই বর্তমান এবং উহা পরিণতির লক্ষণ নয়; এবং ইহার প্রমাণ এই যে রোমান্টি-সিজ্‌ম আনন্দবাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্, কোলরিজ—

এমন কি রুগ্ন কীট্‌স ও আস্থাবিহীন বায়রনেও—আনন্দের স্বর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে মুখরিত; শেলির মানবতার মুক্তিতে অটুট বিশ্বাস, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্যান্‌থিজ্‌ম্‌, কোলরিজের আত্মবাদ, কীট্‌সের সৌন্দর্যের প্রতি উল্লাসপূর্ণ আস্থা এবং বায়রনের জীবনের প্রতি অবাধ উৎসাহ আনন্দবাদেরই বিভিন্ন রূপ-বিশেষ। আনন্দবাদকে স্বীকার করিয়া লইলে পরে উল্লিখিত অভিযোগ বা সন্দেহটি কেবল শাব্দিকই থাকিয়া যায়, কারণ আনন্দের কেবলমাত্র একটি স্বরূপই হইতে পারে—বিশ্রান্তিময়; প্রক্রিয়ায় বা স্বরূপের নির্মাণে অন্বয়-ব্যতিরেক শৈলীর ভিত্তিতে উহাতে অবশ্যই দ্বন্দ্বের সত্তা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় উহার কেবল একটি রূপই হয়—বিশ্রান্তিময়। অতএব প্রভেদ কেবল নির্বাচনে, তত্ত্বে নয়; রোমান্টিসিজ্‌মের বিবেচকেরা যখন ইহা ঘোষণা করেন যে রোমান্টিসিজ্‌ম্ অন্তর্মন্থন বা আধ্যাত্মিক উদ্বেলনের কাব্য তখন তাঁহারা নিজেদের নির্বাচনে শেষ সীমানায় না পৌঁছাইয়া কিছু পূর্বেই থামিয়া গিয়া এই কথাটি বলেন—শুক্লজীর ভাষায় তাঁহারা আনন্দের সিদ্ধাবস্থা পর্যন্ত না পৌঁছাইয়া সাধনাবস্থাতেই থামিয়া যান।

এইরূপে ক্লাসিসিজ্‌ম ও রোমান্টিসিজ্‌ম—উভয়ের সহিত রস-সিদ্ধান্তের পূর্ণ সদ্ভাব আছে। প্রকৃতপক্ষে উহার আশ্রয়ে উভয়ের অন্তর্বিরোধ মিটিয়া যায় এবং যে কোন ক্লাসিকল বা রোমান্টিক রচনার সহিত ঔচিত্য স্থাপন করা সম্ভবপর হয়। সংস্কৃতে 'রামায়ণ' ও 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত' ও 'অমরুক', 'শাকুন্তলম্' ও 'উত্তররামচরিত'—হিন্দীতে 'রামচরিতমানস' ও 'পদ্মাবত', 'বিহারীসতসঈ' ও 'ঘনানন্দ-কবিত্ত', 'প্রিয়প্রবাস' ও 'কামায়নী'তে কাব্যের-স্বর বা কবি-দৃষ্টি অত্যন্ত বৈবিধ্যময়; কিন্তু রস-সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উহাদের সব বিরোধ মিটিয়া যায়। এবং এই সিদ্ধান্ত সকলের সহিতই ন্যায় ব্যবহার করে। রসবাদের ভিত্তিতেই আচার্য শুক্ল জায়সী ও তুলসী, বিহারী ও ঘনানন্দের সহিত ন্যায় করিতে পারিয়াছেন—যেখানে তিনি ন্যায় করিতে পারেন নাই সেখানে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার লোকমঙ্গল-সিদ্ধান্তটি বাধা দিয়াছে, রসবাদ নয়; এবং ইহার প্রমাণ 'ভ্রমরগীত-সারের ভূমিকা'; যখন পর্যন্ত তিনি রস-সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে থাকেন তাঁহার সহৃদয়তা সুরদাসের কাব্যামৃতের অতি সহজে আস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যেই লোকমঙ্গলের বিচারধারাটি তাঁহার চিন্তায় আসিয়া উপস্থিত হয়, শুক্লজি মথুরা ও ব্রজের মধ্যবর্তী দূরত্বের ভিত্তিতে বিরহের ঔচিত্যের নির্ণয় করিতে শুরু করিয়া দেন। পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে মিল্টন ও কীট্‌স, শেক্‌সপীয়র বা গেটে (গোইটে) এবং শেলির সম্যক্ মূল্যাংকনের জন্য রস-সিদ্ধান্তের অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক মানদণ্ড আর অন্য কিছু হইতে পারে না ঃ মেথ্যু আর্নল্ডেরও শৈলির প্রতি অবিচারের কারণ এই যে তিনিও শুক্লজির অনুরূপ রসের সহজ ভূমিকা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন।

মূল চেতনার দৃষ্টিতে কাব্যগত রহস্যবাদও রোমান্টিসিজ্‌মের অত্যন্ত নিকটই। ইহাকে আমরা রোমান্টিসিজ্‌মের আধ্যাত্মিক রূপও বলিতে পারি। ইহার ঐতিহাসিক

প্রমাণ এই যে যদিও পূর্ব এবং পশ্চিমে রহস্যবাদ একটি আদিম কাব্য প্রবৃত্তিরূপে প্রারম্ভ হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তবুও সাহিত্যিক বাদ হিসাবে ইহার আবির্ভাব রোমান্টিসিজ্‌মের সঙ্গেই হইয়াছে। এইজন্য ছায়াবাদের প্রথম চরণেও ছায়াবাদ ও রহস্যবাদের মধ্যে বিভ্রান্তি থাকিয়াছে। আধুনিক যুগে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রসবাদী আলোচক শুক্লজি রস-সিদ্ধান্তের সহিত রহস্যবাদের প্রকৃত সম্বন্ধের বিষয়ে সংশয় প্রকট করিয়াছেন। রস-সিদ্ধান্তের প্রমুখ অঙ্গ অভিব্যক্তিবাদের ভিত্তিতে শুক্লজী রসের প্রকৃত সম্বন্ধ সগুণ ভাবধারার সহিতই স্বীকার করিয়াছেন এবং নির্গুণ কল্পনার উপর আশ্রিত রহস্যানুভূতিকে সহজরূপে রসানুকূল স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ করিয়াছেন। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্তক এবং রস-সিদ্ধান্তের শাস্ত্র-মান্য রূপের প্রতিষ্ঠাপক অভিনব-গুপ্তের সম্পূর্ণ বিবেচনা শুক্লজির এই বিচারধারার বিপরীতে গিয়া পড়ে—এবং, অপর দিকে জয়শঙ্কর প্রসাদ শুক্লজির জীবিত-দশাতেই এই সংশয়ের সমাধান চূড়ান্তরূপে করিয়াছিলেন। অতএব সিদ্ধের সাধনার এখানে আবার কোন দরকার বোধ করিতেছি না।

আদর্শবাদ এবং বাস্তববাদেরও (রিয়ালিজ্‌ম) ধারণাগুলিকে প্রায়ঃ যুগ্মরূপেই উপস্থিত করা হয়। প্রথমে ইহাদের মধ্যেও বিরোধিতা ছিল এবং পরিশেষে এক-অপরের পূরক রূপে আলোচনার ক্ষেত্রে ইহাদের স্থান নির্ধারিত হয়। আদর্শবাদ প্রকৃত পক্ষে আইডিয়ালিজ্‌ম-এর হিন্দী-সমার্থক যাহা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হইলেও সম্প্রতি প্রচলিত। ইংরাজিতে 'আইডিয়াল' এর অর্থ, এই সন্দর্ভে, 'বিচারগত' বা 'ভাবগত' বা 'আত্মগত' কিন্তু আদর্শ নহে এবং 'আইডিয়ালিজ্‌ম'-এর অর্থ কেবল মাত্র শুদ্ধ আদর্শবাদী দৃষ্টিকোণ না হইয়া অধিক ব্যাপক রূপে ভাবনিষ্ঠ বা আত্মনিষ্ঠ বা প্রত্যয়বাদী দৃষ্টিকোণই। ব্যাপক অর্থে 'আদর্শবাদ'-এর অনুসরণে কাব্য বা কলা অনিবার্যতঃ আত্মনিষ্ঠই। কয়েকজন কলাবিদ্ কাব্য জীবনের বাস্তব চিত্রাঙ্কনের দাবী করেন এবং কতিপয় আলোচকেরা ইহার সমর্থনও করেন, কিন্তু কাব্য-কলায় জীবনের বাস্তবানুগ চিত্রাঙ্কন প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপরই নয়। ইহা সত্য যে কাব্য-কলার দৃষ্টি জীবনের উপর ন্যস্ত, জীবনই উহার বিষয় এবং জীবনের চিত্রাঙ্কনই উহার উদ্দেশ্য কিন্তু কলা জীবনকে চর্ম-চক্ষুর দ্বারা নয়, মনের চোখে দেখে এবং কলার ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কনের অর্থ আখ্যান বা পুনঃসৃজনই। কলাকে অনুকরণ এই অর্থেই বলা হইয়াছে। এরিস্টটল স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে কবি ইতিহাসকার হইতে ভিন্ন কারণ তিনি বস্তুর চিত্র ঠিক সেইরূপে করেন না যেরূপে উহা দৃষ্ট হয়, বরং সেইরূপে করেন যেরূপ উহা হইতে পারে বা হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে এরিস্টটলের এই কথায় শুদ্ধ আদর্শবাদের প্রকল্পনার বীজ নিহিত আছে। একদিকে কলাকে অনুকরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি উহাকে জীবনের শক্ত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং অপর দিকে যেরূপ উহা হইতে পারে এবং 'যেরূপ উহার হওয়া উচিত,'—এই পরস্পর ভিন্ন কিন্তু সম্বন্ধ বাক্যাংশের দ্বারা কলার মধ্যে আত্মতত্ত্বের স্বীকৃতি প্রদান করিয়া, উহার উপর আশ্রিত আদর্শবাদী কলা-দর্শনের বিভিন্ন রূপগুলিকে নির্দ্বিধায় প্রকাশিত করিয়াছেন।

আত্মনিষ্ঠ চিত্রাঙ্কন নানা প্রকারের হইতে পারে—পদার্থের সেইরূপ চিত্রণ যেরূপ (১) কলাকার অনুভব করেন, (২) যেমন উহা হইতে পারে, (৩) যেরূপ উহার কলাকারের বিচার বা দৃষ্টিকোণ অনুসরণে হওয়া উচিত। প্রথম বিকল্পটিতে কলাকারের স্বভাব, অপরটিতে কল্পনা এবং তৃতীয়টিতে তাহার ইচ্ছা বা ভাবধারা এবং নৈতিক বিচারের স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। অভিপ্রায় এই যে আদর্শবাদের রূপ মূলতঃ নৈতিকই নয়, উহাতে ভাব ও কল্পনার প্রাচুর্যও লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা সত্য যে ধীরে-ধীরে ইহাতে নৈতিক তত্ত্বটি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দর্শনের ক্ষেত্রে কান্ট ও হেগেল আদর্শবাদের গম্ভীর দার্শনিক নিরূপণ করিয়াছেন। এই সকল দার্শনিকদের মত এই যে মানব-চেতনায় একটি সহজ আদর্শ-বৃত্তিও বর্তমান থাকে যাহা মানুষকে উচিত কর্মের প্রতি প্রেরিত করে—অর্থাৎ এই বৃত্তি নৈতিক রূপবিশেষযুক্ত। কান্ট ইহাকে সহানুভূতি ও হেগেল বিবেক বলিয়াছেন। এইরূপে আদর্শবাদের ধারণা আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ হইয়া পরিশেষে প্রমুখ ভাবে নৈতিকরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভাব ও কল্পনার তত্ত্ব ক্রমশঃ নীতির পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছে—যে সকল আদর্শভাব (দিবাস্বপ্ন বা কল্পনা) যাহাতে কল্যাণ তত্ত্বের অভাব দৃষ্ট হয় 'আদর্শবাদ'-এর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর নহে। অতএব সামান্য রূপে কল্যাণনিষ্ঠ মূল্যের উপর আশ্রিত সদর্থক কলাদর্শনেরই অপর নাম আদর্শবাদ। —ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য বিশেষ কোন তর্কের প্রয়োজন নাই যে রসবাদের সহিত আদর্শবাদের পূর্ণ সৌহার্দ্য বর্তমান। মূল রূপে আত্মবাদ উভয়েরই আধাররূপ। রসবাদও মূলতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং সদর্থক কাব্যদর্শন এবং ভাব, কল্পনা ও ঔচিত্য সকলেরই স্বীকৃতি ইহাতে যথাযথরূপে বিদ্যমান। বিভাবাদির সাধারণীকরণ প্রকৃতি বা জীবনের মানসিক অথবা ভাবনাত্মক চিত্রণেরই একটি প্রকার।[১] —রিয়ালিজ্‌মের কল্পনা আদর্শবাদ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন; একান্ত বিরুদ্ধ না হইলেও উভয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত বিরোধ বর্তমান। বাস্তববাদ মূলতঃ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ—কলার ক্ষেত্রে উহা জীবন ও জগতের যথাযথ চিত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাস্তববাদী নিজস্ব ভাব, কল্পনা ও বিচারকে প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া বস্তুর উপরই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে; সে নিজেকে জীবনের তটস্থ দ্রষ্টা ও চিত্রকার রূপে স্বীকার করিয়া চলে। তাহার বিশ্বাস এই যে তথ্যের শুদ্ধরূপে পরিগ্রহণই চিন্তন ও কলার বাস্তবিক সিদ্ধি—নিজস্ব ভাবধারা ও বিচারের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া আদর্শবাদী কলাকার বস্তুর স্বরূপকে বিকৃত করিয়া দেয়। ভৌতিক জীবনের প্রতি চরম আস্থা যথার্থবাদের মূলাধার—সে জীবনকে উহার প্রকৃতরূপে স্বীকার করিয়া চলে এবং উহাকে যথাতথ্য রূপে প্রকাশিত করাই তাহার উদ্দেশ্য হয়। কোন কাল্পনিক আদর্শ বা রঙ্গীন স্বপ্নকে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস তথ্যকে বিকৃত করিয়া দেয়; উচিত অনুচিতের কল্পনাপ্রসূত নিয়মের দ্বারা তথ্যকে বাঁধিয়া ফেলা প্রবঞ্চনা মাত্র। বাস্তব-

১. Idealization of Nature

বাদের উপর বিজ্ঞানের গভীর প্রভাব বিদ্যমান আছে, আলোচকেরা উহাকে বিজ্ঞানের কলাত্মক প্রতিরূপ বলিয়াছেন। ভৌতিক-বিজ্ঞান এবং জীব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নবীন ও বিচিত্র তথ্যাবলীর উদ্‌ঘাটন হইয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা মনে হয় যে কল্পনার তুলনায় তথ্য অনেক অধিক বৈচিত্র্যময়। অতএব কলা ও সাহিত্যও, যাহা প্রারম্ভ হইতে প্রকৃতির অনুকরণের দাবি করিয়া আসিয়াছে, এই নবীন সত্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জীবনের বাস্তব-তথ্যাত্মক রূপের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বিচার ব্যতীত, নিরূপণের ক্ষেত্রেও, বিজ্ঞানের বিধি ও প্রণালীর প্রভাব দৃষ্ট হয়ঃ প্রকৃতির যন্ত্রালেখন কলার আদর্শ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেঃ তথ্যের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা বিবরণের পরিশুদ্ধতা,প্রলেখনের সতর্কতা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলিকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা হয়। যদিও বাস্তববাদের মূল ধারণাগুলি অনুকরণ-সিদ্ধান্তের অনুরূপই প্রাচীন, তবুও ঊনবিংশ শতকে ইহা সম্পূর্ণ ইউরোপে একটি আন্দোলনের রূপে প্রসার লাভ করে এবং যদিও উহার প্রধান ক্ষেত্র উপন্যাসই ছিল, তবুও অন্য কলা-রূপগুলি এই সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। শতাব্দীর উত্তরার্ধে বাস্তববাদ হইতে প্রকৃতবাদের (Naturalism) জন্ম লাভ হয় যাহা এক প্রকারে উহার অতিরঞ্জিত রূপই ছিল। বাস্তববাদ যেখানে জীবনের ভৌতিক বিশেষতঃ সামাজিক জীবনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল সেখানে প্রকৃতবাদ মানব-প্রকৃতির সহজবৃত্তি—বাসনার চিত্রাঙ্কনকে যথার্থ এবং বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিল। এই সহজবৃত্তিগুলির মধ্যে স্বভাবতঃ কামেরই প্রাধান্য ছিল এবং ফলে প্রকৃতবাদ নগ্ন বাস্তববাদেরই সমার্থক হইয়া পড়িল যাহাতে যৌনজীবনের নগ্ন বাস্তবের বিবৃতি প্রধান হইয়া পড়িল। আন্দোলন-রূপে আদর্শবাদ, বাস্তববাদ ও প্রকৃতবাদের বিশেষ দেশ এবং বিশেষ কালের সহিত সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু জীবন-দর্শন বা কলা-দর্শনের বিশিষ্ট সিদ্ধান্তরূপে এগুলি দেশ-কাল-নিরপেক্ষ—এবং আমরা সেই অর্থেই এই সকল বাদের প্রয়োগ করিতেছি। এখন প্রশ্ন ওঠে, বাস্তববাদের সঙ্গেও কি রসবাদের সৌহার্দ্য আছে? আমাদের স্পষ্ট উত্তর, সম্মতি-জ্ঞাপক। ইহাই রসবাদের মহত্ব যে উহা পরস্পর-বিরোধী ধারণাগুলির ও নিজস্ব স্বরূপের মধ্যে অন্তর্ভাব করিতে পারে। অনন্তপক্ষে বাস্তববাদী কলাতেও নিজস্ব একটি আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, উহাও তো সহৃদয়ের চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে। এই আকর্ষণের রহস্য কি? অমিশ্র জীবন-রসই তো। আদর্শবাদ ও রোমান্টিসিজ্‌ম হইতে ভিন্ন বাস্তব-বাদ জীবনের বস্তু-রূপের চিত্রণ এইজন্যই তো করে যাহাতে উহার দ্বারা প্রমাতা বিচার ও কল্পনায় রস হইতে অমিশ্রিত, যথাসম্ভব শুদ্ধ জীবন-রসের অনুভূতি করিতে যেন সমর্থ হয়। বাস্তববাদী কলার ইহাই সার্থকতা যে এই রসের ভিত্তিতেই ইহা কলা বা কাব্য-পদের অধিকারিণী হয়। রস-বিরোধীরা বলিতে পারেন যে ইহা বুদ্ধির রস, ভাবানুগত রস নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তববাদী সাহিত্য—চসার, থ্যাকারে, ফ্লাবেয়র, বালজাক, তুর্গেনিভ, দোস্তোবাস্কী, গোর্কী, অপরদিকে প্রকৃতবাদী জোলা এবং মোপাসাঁর কথা-সাহিত্যের কলাত্মক আস্বাদের বিশ্লেষণ করিলে এই কথাটি অনায়াসেই

মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং সঙ্গে ইহা সিদ্ধ হয় যে বাস্তবানুগ কলাত্মক আস্বাদ ভাবাত্মক অনুভূতিরূপই, বৌদ্ধিক অনুভূতি নয়। এই আস্বাদ কল্পনারঞ্জিত ভাবেরই আস্বাদ অর্থাৎ রসানুভূতি হইতে সর্বথা অভিন্ন। বাস্তববাদী কলার আস্বাদের মূলেও, প্রকৃত-পক্ষে, জীবনের প্রতি সূক্ষ্ম অনুরাগ ও জড়-জঙ্গম প্রকৃতির প্রতি সূক্ষ্ম সহানুভূতির ভাবই বিদ্যমান থাকে, যাহাকে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বাস্তববাদী উপন্যাস-লেখিকা জর্জ ইলিয়ট 'মিষ্টি সহানুভূতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জীবনের প্রতি এই সূক্ষ্ম অনুরাগ, এই মিষ্টি সহানুভূতিই তো জীবন-রস এবং ইহার আস্বাদন রসানুভূতিই। বাস্তববাদের কল্পনা ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে স্বভাবোক্তির অন্তর্গত পাওয়া যায়।[১] ভোজ কাব্যর তিনটি ভেদ করিয়াছেন: স্বভাবোক্তি, বক্রোক্তি এবং রসোক্তি; এইগুলির মধ্যে স্বভাবোক্তিতে বাস্তববাদী কলা এবং বক্রোক্তিতে কল্পনাপ্রধান রোমাণ্টিক কলার ধারণা নিহিত এবং যেরূপে স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি রসোক্তির পরিপুষ্টি করে ঠিক সেইরূপ বাস্তববাদ ও রোমাণ্টিসিজ্‌মও রসবাদের পোষকতা করে। বলার অভিপ্রায় এই যে ব্যাপকরূপে মানবতাবাদই রসবাদের ভিত্তিস্থানীয়; যেরূপে মানববাদে আদর্শবাদ ও যথার্থবাদ উভয়ের জন্য স্থান আছে, সেইরূপে রসবাদেরও উভয়ের প্রতি সৌহার্দ্য আছে। এবং, ইহা কোন নূতন কল্পনা নয়। মহাভারতের অপেক্ষা অন্য কোন বাস্তববাদী কলার উদাহরণ বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্ল‌ভ, অপর দিকে রামায়ণ আদর্শবাদী কাব্যের ভব্যতম নিদর্শন: ইতিহাস সাক্ষী যে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র, উভয়ের মধ্যে ক্রমশঃ শান্ত ও করুণ রসের অঙ্গীত্বের কল্পনা করিয়া, প্রারম্ভ হইতে ইহাদের রসনিষ্ঠ মূল্যা-ঙ্কনের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে—যথা মহাভারতে শান্তঃ, রামায়ণে করুণঃ। (সা০ দ০, বিমলা টীকা পৃ০, ১৪০)

পরবর্তী কালে মার্ক্স-দর্শনের ক্রম বর্ধমান প্রভাবের ফলস্বরূপ বাস্তববাদে সামাজিক তত্ত্বের ঐকান্তিক প্রাধান্য দেখা দিল যাহা পরিণতি লাভ করিল সামাজিক বাস্তববাদের প্রসারে। হিন্দীতে এবং স্বদেশ-বিদেশের নানা ভাষায় ইহাকে প্রগতিবাদ নামে অথবা ইহারই কোন তুল্যার্থবোধক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে কলা ও সাহিত্যের প্রতি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণেরই প্রতিরূপ। মার্ক্সবাদের আধারভূত সিদ্ধান্ত দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকবাদ যাহার অনুসরণে সংসারে কেবল পদার্থেরই সত্তা বিদ্যমান; মস্তিষ্ক, চেতনা প্রভৃতির স্বরূপও অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুরূপ ভৌতিকই। কিন্তু এই পদার্থ জড় এবং নিষ্ক্রিয় না হইয়া সহজ গতিশীল এবং এই গতির প্রেরণা হইতেছে পদার্থে নিহিত দুইটি পরস্পর বিরোধী মূলতত্ত্ব যাহার মধ্যে একটি বিকাশের দিকে উন্মুখ এবং অপরটি বিনাশের দিকে—বিকাশোন্মুখ প্রবৃত্তি × বিনাশোন্মুখ প্রবৃত্তি =গতি। গতির প্রেরক এই পরস্পর-বিরোধী শক্তির যাহা স্বয়ং বস্তুতে বিদ্যমান থাকে, সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের অধ্যয়ন করিয়া জীবন-বিকাশের অধ্যয়ন করাই দ্বন্দ্বাত্মক

---

১. বাস্তবমিতি তজ্‌জ্ঞেয়ং ক্রিয়তে বস্তু-স্বরূপ-কথনং যৎ। রুদ্রট—কাব্যালঙ্কার, ৮/১০

প্রণালী।—এবং, দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকবাদ সেই দর্শন যাহা জীবনকে একটি এমন প্রগতিশীল ভৌতিক বাস্তবতা বলিয়া স্বীকার করে যাহার মূলে দুইটি বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলিতেছে—একটি বিনাশের পথে এবং অপরটি বিকাশের পথে। চৈতন্য মস্তিষ্ক এই তথ্যটির অনুধাবন করিয়া প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সহায়তা প্রদান করে এবং বিনাশোন্মুখ শক্তিগুলিকে বলপূর্বক ধ্বংস করে। এইরূপে সংসারের একমাত্র সত্য ভৌতিক জীবন যাহার প্রতিনিধি সমাজ এবং সমাজের আধার অর্থ ও উহার উৎপাদন প্রণালী। কলা ও সাহিত্য সমাজেরই প্রতিফলক—সামাজিক পরিস্থিতি সকল এবং উহার আধারভূত আর্থিক প্রণালীগুলি জীবনের অন্যান্য রূপের অনুরূপ সাহিত্য এবং কলার উৎপত্তি ও বিকাশকেও নিয়ন্ত্রিত করে এবং ইহাদের সার্থকতা তখনি প্রমাণিত হয় যখন সাহিত্য ও কলা সমাজ এবং উহাকে যে গতি প্রদান করে সেই বর্গ-সংঘর্ষময় জন-জীবনের বিকাশে সহযোগিতা করে। সংক্ষেপে, মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণের অনুসরণে, যথার্থ বা প্রগতিশীল সাহিত্য—

(১) জনতার জন্য রচিত।

(২) ইহা সংঘর্ষের সাহিত্য। এই সংঘর্ষের উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, জনতন্ত্রের স্থাপনা, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের সংস্কৃতির উন্মূলন ও শান্তি (যাহার জন্য পূর্বোক্ত পরিস্থিতিগুলি অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়) স্থাপন।

(৩) ইহার দৃষ্টিকোণ বৈজ্ঞানিক।

(৪) এইরূপে এই সাহিত্য 'উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা' জনতার সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিকাশ সাধন করে। (ডঃ রামবিলাস শর্মা)।

প্রগতিশীল সাহিত্য 'জাতি-দ্বেষ, ভাগ্যবাদ, নিরাশাবাদ, অনৈতিকতা ও শোষণের প্রচারক প্রতিক্রিয়াবাদী হীন সাহিত্য হইতে ভিন্ন সেই শ্রেষ্ঠ প্রাচীন-অর্বাচীন সাহিত্য যাহা মানুষের হৃদয়ে মানবীয় সংবেদনা, সৌন্দর্য-বোধ, কর্ম-চেতনা ও তর্ক-বুদ্ধি জাগ্রত করে, আশার সঞ্চার করে এবং স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্রতা হইতে উপরে তুলিয়া আমাদের উন্নত ও নৈতিক মানব তৈরী করে।" × × × "ইহা আনন্দময়ী মূল্যের উপর নির্ভরশীল না হইয়া চেতনা-বিকাশী নৈতিক মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (—শিবদানসিংহ চৌহান)।

এরূপ মনে হয় যে প্রস্তাবিত সাহিত্য-বিচারের সহিত রস-সিদ্ধান্তের মৌলিক প্রভেদ বিদ্যমান আছে, কিন্তু এই উপলব্ধি অনেকটা ভ্রান্তিজন্য। প্রত্যেক নবীন আন্দোলনের অনুরূপ প্রগতিবাদ[১] ও পরম্পরার বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্রোহের অনুরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে এবং যেহেতু ভারতীয় সাহিত্যে রসবাদের পরম্পরা প্রায় অক্ষুণ্ণ ধারায় প্রবাহমান ছিল, এইজন্য প্রগতিবাদের ভারতীয় ব্যাখ্যাতারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রস-সিদ্ধান্তের বিরোধ করিয়াছেন। এই বিরোধের মূলে দুইটি ধারণা ক্রিয়াশীল

---

১. হিন্দীতে 'প্রগতিবাদ' নামই প্রচলিত, অতএব আমরা উহারই প্রয়োগ করিতেছি

ছিল—প্রথম ধারণা এই যে রসবাদের আধার কেবল আহ্লাদ, মানব-চেতনার বিকাশ ও মানব-জীবনের কল্যাণের প্রতি উহা উদাসীন এবং দ্বিতীয়টি এই যে রস একটি আধ্যাত্মিক বা অর্ধ আধ্যাত্মিক কল্পনা বিশেষ যাহা ক্লাসিকল অথবা সামন্তবাদী যুগের অনেক প্রবঞ্চক ধারণার অনুরূপ মিথ্যা এবং জন-কল্যাণ বিরোধিতাযুক্ত। এইজন্য হিন্দীর কতিপয় স্থূলদ্রষ্টা লেখক 'ব্রহ্মানন্দসহোদর' শব্দটিকে লইয়া নানারূপভাবে বিবাদাত্মক কথার প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি ধারণাই অশুদ্ধ : রসকে 'প্লেজর' 'আমোদ-প্রমোদ' বা বিনোদের তুল্যবোধক কখনই স্বীকার করা হয় নাই, উহা আনন্দের সমার্থক যাহা ব্যষ্টি এবং সমষ্টির কল্যাণের অন্তিম পরিণতি। অতএব প্রথম ধারণাটি আনন্দ ও কল্যাণের মিথ্যা ভেদ-কল্পনার উপর আশ্রিত এবং দ্বিতীয় ধারণাটির আধার রসের আধ্যাত্মিক কল্পনা-বিষয়ক ভ্রান্তি যাহার নিরাকরণ আমরা প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই করিয়াছি।

এই সকল ভ্রান্তির নিরাকরণ হইলে পরে রসবাদের প্রতি মার্ক্সবাদ কাব্য-দর্শনের বিরোধ—অনন্তপক্ষে উহার উগ্রতা অনেকটা শান্ত হইয়া যায়। প্রগতিবাদের প্রমুখ যুক্তি – সমষ্টিগত কাব্য চেতনার সহিত সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ সমভাব তো বিদ্যমান আছেই, অন্য ধারণাগুলির জন্যও রসের পরিধির মধ্যে স্থানাভাব নাই। সংঘর্ষ অথবা দ্বন্দ্ব-ভাবনাও রসের অন্তর্গত ঠিক সেইরূপই স্বীকার্য যেরূপ প্রেম ও শান্তি; সংঘর্ষের বিভিন্ন তত্ত্ব—উৎসাহ, ক্রোধ অথবা মন্যু, করুণা প্রভৃতির রস-চক্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান বর্তমান। জনতার সাহিত্যও তো অবশেষে জনতার সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংঘর্ষ ও সিদ্ধিরই অনুলেখ হইবে এবং ইহাই রসের আধারভূত সামগ্রী। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী সংস্কৃতির উন্মূলন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার রক্ষা, জনতন্ত্রের নির্মাণ, শান্তির স্থাপনা প্রভৃতি জনকল্যাণবাদী উদ্দেশ্যগুলির সহিত রস-সিদ্ধান্তের বিরোধ কীরূপে হইতে পারে? মানবীয় সংবেদনা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ রসবাদেরও লক্ষ্য; নৈতিক মূল্যগুলিকেও উহা পূর্ণ আগ্রহের সহিত স্বীকার করে; আশার সঞ্চার, কর্মচেতনার স্ফূর্তি, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তি, নিরাশা এবং কুণ্ঠার উচ্ছেদ রসবাদেরও আধারভূত লক্ষণ বিশেষ। অতএব ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের প্রগতিশীল ধারণাগুলি রসবাদের পূর্ণ সমর্থনপ্রাপ্ত। মুশকিল সেখানে হয় যেখানে মার্ক্সবাদী বিচারকরা জনকল্যাণের বর্গ-সীমিত এবং একদেশদর্শী বিবেচনা করেন; কিন্তু ইহা তো রস-সিদ্ধান্তের দোষ নহে।

সাহিত্যে পরবর্তী যুগে বাস্তববাদ ও উহার বিভিন্ন বিবৃতিগুলিকে যথাবৎ গ্রহণ করা হয় নাই—উহাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও হইয়াছিল এবং কলার ক্ষেত্রে এমন নানা বাদ জন্মলাভ করিল যাহাদের আধার আত্মবাদ বা আদর্শবাদ ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক তীব্র ছিল প্রতীকবাদ। যদিও এই সিদ্ধান্তের বীজ প্লোটিনাস ও তাঁহারও পূর্বে প্লেটোর দর্শনে পাওয়া যায়, তবুও সাহিত্যিক আন্দোলনের রূপে ইহার জন্ম বিজ্ঞান ও উহার দ্বারা প্রেরিত বস্তুবাদী জীবন-দর্শন ও কলা-দর্শনের বিরুদ্ধে, উনবিংশ

শতকের শেষ ভাগে ফরাসী দেশে ঘটিয়াছিল এবং সেখান হইতে ইহা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড ও জার্মানীতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ফরাসী দেশে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন বোদলেয়ার ও মেলার্মে ও ইংলণ্ডে ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন কবি ইয়েট্‌স। প্রতীকবাদ স্বীকৃতরূপে আত্মবাদী দর্শন। এই দর্শন ইহা স্বীকার করে যে পদার্থের নিজস্ব কোন গুরুত্ব নাই, বরং জীবনের চিরন্তন সত্যের প্রতীকরূপেই উহার যথার্থ মূল্য। এইরূপে প্রতীকবাদ এক প্রকারের রহস্যবাদী জীবন-দর্শন। কিন্তু ধার্মিক রহস্যবাদ ও প্রতীকবাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে এখানে পরমতত্ত্বের কল্পনা আদর্শ বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যরূপে করা হয়—ইহা বস্তুতঃ সৌন্দর্যের দর্শন। অধ্যাপক বাওরার মতানুসারে "প্রতীকবাদের সারতত্ত্ব হইতেছে আদর্শ বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যময় সংসারের প্রতি আগ্রহ এবং এই বিশ্বাস যে কলার মাধ্যমে ইহার সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর। ধার্মিক বিশ্বাসানুসরণে, সাধক সাধনার দ্বারা বা ভক্ত প্রার্থনার দ্বারা যে আনন্দের অনুভব করেন, প্রতীকবাদের অনুসরণে সে আনন্দের সিদ্ধি কবির নিজস্ব কলা-সাধনার দ্বারা হইয়া যায়। কারণ সমাধিস্থ সাধকের ধ্যানাবস্থিতি এবং কালাতীত আত্মবিশ্রান্তি মূলত: সৌন্দর্যানুভূতি হইতে ভিন্ন নহে যাহাতে দেশ ও কাল, আত্মা ও অনাত্মা এবং সুখ ও দুঃখের প্রভেদ অনুভূত হয় না।"[১] এরূপ কাব্যের অভিব্যক্তির মাধ্যম সামান্য ভাষার স্থানে প্রতীকাত্মক ভাষাই হইতে পারে। এখানে শব্দের সামান্য বা অভিধার্থের কোন মূল্য নাই, এখানে তো প্রতীকার্থেরই গুরুত্ব। কাব্যে প্রযুক্ত শব্দ এখানে অর্থ-বোধে অক্ষম বরং শব্দগুলি কেবল পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে সৌন্দর্যের বিম্ব উৎপন্ন করে এবং ইহাতেই এগুলির সার্থকতা। যদিও প্রত্যেকটি শব্দই আপন হইতে এক-একটি প্রতীক বিশেষ, কিন্তু প্রতীকবাদী কাব্যে প্রতীকের এই রূঢ় অর্থ পর্যাপ্ত নয়—এখানে শব্দ নিজস্ব রূঢ় অর্থকে ভেদ করিয়া কোন একটি সূক্ষ্ম-গম্ভীর আন্তরিক অর্থের ব্যঞ্জনা করে। এইরূপ প্রতীকবাদ একটি শুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ কাব্যদর্শন যাহা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যকে কাব্যের প্রাণ-তত্ত্ব এবং প্রতীক অথবা প্রতীকী ভাষাকে উহার অভিব্যক্তির মূল মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করে। ইহা সৌন্দর্যের ধর্ম-সংহিতা।[২]

এরূপ কাব্য-সিদ্ধান্তের সহিত স্পষ্টতঃ রসবাদের কোন বিরোধিতা হইতে পারে না এবং আদর্শবাদ ও রোমাণ্টিসিজ্‌মের অনুরূপ ইহাও রস-সিদ্ধান্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। উভয়ের দৃষ্টি মূলতঃ আত্মনিষ্ঠ, উভয়েই আনন্দ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী এবং রস-সিদ্ধান্তের অনুরূপ প্রতীকবাদেরও আনন্দ-কল্পনা দেশকালাতীত। প্রতীকবাদে রস-সিদ্ধান্তের তুলনায় রহস্য-তত্ত্বের মাত্রা অধিক; কিন্তু শুক্লজির সকল বিরুদ্ধ যুক্তি-তর্ক থাকা সত্ত্বেও রহস্যবাদের রসবাদের সহিত কোন

---

১. C. M. Bowra—The Heritage of Symbolism—1st Chapter.

২. Testament of Beauty.

বিরোধ নাই। এইরূপে অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও উভয়ের মাধ্যম ব্যঞ্জনাই। তবুও আমার বক্তব্য এই নহে যে প্রতীকবাদ ও রস-সিদ্ধান্ত পূর্ণ অভেদরূপে বিদ্যমান—কয়েকটি ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে রসে ভাবাত্মক অনুভূতির প্রাধান্য সেখানে প্রতীকবাদের আধারভূত সৌন্দর্যানুভূতিতে ভাবের অপেক্ষা কল্পনা এবং তত্ত্বের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে। এইরূপে প্রতীকবাদ যে প্রতীকাত্মক মাধ্যমকে বিচার অনিবার্য বলিয়া স্বীকার করে তাহা ব্যঞ্জনারই একটি বিশিষ্ট ও অতিরঞ্জিত রূপ এবং ইহার বিপরীতে রসাভিব্যক্তির আধারভূত ব্যঞ্জনার স্বরূপ সামান্য ও ব্যাপক হয়। কিন্তু এই সকল ভেদ প্রকৃতিগত নয়, কেবল মাত্রাগত।

প্রায় ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে, ইউরোপে কলা ও কাব্যের আর কয়েকটি সিদ্ধান্তের জন্ম হয়—ইহাদের মধ্যে প্রভাববাদ[১] একটি বিশিষ্ট বাদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। প্রভাববাদ মূলতঃ চিত্রকলার ক্ষেত্রে জন্ম লাভ করে এবং খুব শীঘ্রই কাব্য ও আলোচনার ক্ষেত্রে ইহার প্রসার লাভ হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপে উদ্যোগ-বিজ্ঞানের প্রসার-লাভ হওয়াতে জীবন ও জীবন-দর্শনে একটি অভূতপূর্ব গতিশীলতা দেখা দেয়। বেগ ও পরিবর্তনের এই বিচার-ধারার কলাত্মক অভিব্যক্তি প্রভাববাদে হইয়াছে।[২] এই সিদ্ধান্তটি কালের প্রতি একটি নূতন দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করে। অনুভূতির মুহূর্তটিকে ধরিয়া কলার মাধ্যমে উহাকে স্থায়ী রূপ প্রদান করা—ইহাই প্রভাববাদের লক্ষ্য। রোজেটী নিজের গীতি-কবিতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলি অনুভূতির কয়েকটি মুহূর্ত্ত যাহাকে আমি চিরন্তন রূপ দিয়াছি। আর্নল্ড হাসারের মতানুসারে প্রভাববাদের মূল সূত্রগুলি এইরূপ—স্থায়িত্ব এবং নৈরন্তর্যের উপর ক্ষণের বিজয় লাভ। দ্বিতীয় সূত্র এই যে প্রত্যেকটি অবস্থা ক্ষণিক যাহার পুনরাবৃত্তি আর কখনই হইতে পারে না, ইহা সময়ের প্রবাহে বিলীন হইয়া যায় এইরূপ একটি স্রোত—এমন প্রবাহে যাহার মধ্যে কেহ দ্বিতীয়বার প্রবেশ করিতে পারে না। এই সকল বিচার-সূত্রের মূল যদিও কয়েকজন গ্রীক দার্শনিক—হেরেক্লিটস প্রভৃতির জীবন-দর্শনে পাওয়া যায়, তবুও প্রত্যক্ষরূপে ইহার উপর নীৎশে এবং বর্গসাঁর প্রভাব বিদ্যমান। ইঁহাদের মতানুসারে সত্য বস্তু-রূপ না হইয়া প্রতিক্রিয়ারূপ হয়—উহা স্থিতি-রূপ নহে, গতি-রূপই। সাধারণতঃ এই ধরণের রূপ দর্শনের অতি বৈয়ক্তিক হয়—ক্ষণ ও পরিবর্তনকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করার জন্য ইহাতে এক প্রকারের নিরাশাবাদও স্বাভাবিক। এই দর্শন অনুসরণে মানুষ একাকী এবং দেশ ও কালের লয়মান, উপস্থিত ক্ষণবিন্দুই জীবন ও জগতের সারতত্ত্ব। এই সকল সিদ্ধান্তগুলি যখন আলোচনার ক্ষেত্রে আরোপিত হইল তখন স্বভাবতঃ আলোচনায় তাৎকালিক প্রভাব মুখ্য এবং কলার

১. Impressionism.

২. Hasar—A Social History of Art, Part 2, P. 870-71

নিয়ম ও শাশ্বত মূল্য সর্বথা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িল। তাৎকালিক প্রভাবই কলার লক্ষ্যরূপে স্বীকার্য হইল; নৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ, স্থায়ী প্রেরণা, চারিত্র্য অথবা শীলের নির্মাণ প্রভৃতি পরম্পরাগত কাব্য-প্রয়োজন অসঙ্গত প্রমাণিত হইল; ব্যক্তি-মনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এই ক্ষণিক প্রভাবই কলা অথবা কাব্যের মূল্যাঙ্কনের মানদণ্ড নির্ধারিত হইল। ইহাতে সন্দেহ নাই যে সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে প্রভাববাদ ও রস-সিদ্ধান্তের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ বিদ্যমান আছে। প্রভাববাদের আধার যেখানে ক্ষণিক অনুভূতি সেখানে রসের আধার স্থায়ীভাব; প্রভাববাদের বিপরীতে রস-সিদ্ধান্ত জীবন ও কলার শাশ্বত মূল্যে চিরনির্ভর এবং সদ্যঃপরনির্বৃতির সাথে-সাথে স্থায়ী প্রেরণা ও শীলের উৎকর্ষ প্রভৃতিকে সর্বথা প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করে। তবুও, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে অবিরোধ দৃষ্ট হয়। প্রভাববাদ যে তাৎকালিক প্রভাবকে কলার একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করে তাহা মূলতঃ রাগাত্মকই—এই জন্যই তো প্রভাববাদের সম্বন্ধে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে ইহা সাধারণতঃ সকল মূল্যের নিষেধ করিয়াও প্রকারান্তরে অতিরঞ্জিত রাগাত্মকতাকে মূল্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এই রাগাত্মকতাই প্রভাববাদ ও রস-সিদ্ধান্তের মিলন-বিন্দু; এখানে আসিয়া ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। ব্যবহারে প্রভাববাদ যে সদ্যঃঅনুভূতিকে লইয়া চলে, তাহা রসের পরিধির মধ্যেই অন্তর্ভূত। উহাদের আধারভূত সিদ্ধান্তের মধ্যে অবশ্যই প্রভেদ আছে এবং স্বরূপের দৃষ্টিতেও প্রভেদ থাকিতে পারে কারণ প্রভাববাদ সহৃদয়ের এই সদ্যঃঅনুভূতিকে প্রত্যেক স্থিতিতে আনন্দময় বলিয়া স্বীকার করে না; তবুও রস-সিদ্ধান্তের অনুসরণে প্রভাববাদী কাব্য-সৌন্দর্যের সম্যক্ মূল্যাঙ্কনে কোন প্রকারের বাধার সম্ভাবনা নাই, কারণ উভয়ে অস্বাদ্য বা সংবেদ্য তত্ত্ব ভাবই থাকে—প্রভাববাদী কাব্য অনিবার্যতঃ সরসই হয়।

উল্লিখিত বাদগুলি প্রায় কাব্য অথবা কলার বিষয়বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই-গুলি ছাড়াও পাশ্চাত্য কাব্যশাস্ত্রে কয়েকটি বাদ এরূপ আছে যাহা অভিব্যক্তির সহিত একসূত্রযুক্ত। এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রমুখ হইতেছে অভিব্যঞ্জনাবাদ। ক্রোচের মতানুসরণে অভিব্যঞ্জনাবাদের মূলভূত ধারণাগুলি নিম্নরূপ: (১) আত্মার দুইটি ক্রিয়া বর্তমান—বিচারাত্মক এবং ব্যবহারাত্মক। বিচারাত্মক ক্রিয়া অথবা জ্ঞানের আবার দুইটি প্রভেদ আছে—স্বয়ংপ্রকাশ্য জ্ঞান (সহজানুভূতি) এবং প্রমেয় জ্ঞান। কলা স্বয়ংপ্রকাশ্য জ্ঞান বা সহজানুভূতিরই সহিত সম্বদ্ধ। কলা সহজানুভূতিই। এই সহজানুভূতি একদিকে পদার্থবোধ এবং অপর দিকে সংবেদন বা সংবেদন-পুঞ্জ হইতে ভিন্ন হয়। পদার্থ-বোধের জন্য পদার্থের স্থিতি অনিবার্য, কিন্তু সহজানুভূতি উহার অভাবেও সম্ভবপর—উহার পক্ষে বাস্তব ও সম্ভাব্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সংবেদন এবং ধরণের অরূপ স্পন্দন, আত্মা উহার অনুভূতি করে কিন্তু উহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না, অতএব উহা জড় ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু সহজানুভূতি

অভিব্যঞ্জনা রূপই হয়, অতএব উহা অভিব্যঞ্জনা হইতে অভিন্ন। অতএব সহজানুভূতির অর্থ অভিব্যঞ্জনা, কেবল অভিব্যঞ্জনা—না-কম না-অধিক। ইহাই কলা।

(২) তত্ত্ব ও রূপ অথবা বস্তু এবং অভিব্যঞ্জনার বিষয়ে ক্রোচের মত কাব্যশাস্ত্রের পারম্পরিক ধারা হইতে ভিন্ন। সৌন্দর্য বস্তুতে নিহিত অথবা অভিব্যঞ্জনায়, অথবা উভয়ে? যদি বস্তু বলিতে অভিপ্রায় অনভিজ্ঞ ভাবতত্ত্ব অথবা অন্তঃসংস্কার হয় এবং অভিব্যঞ্জনার তাৎপর্য ব্যক্তিকরণের ক্রিয়া হয় তাহা হইলে সৌন্দর্য বস্তুতে নিহিত নহে এবং বস্তু ও অভিব্যঞ্জনার সংযোগেও নহে। সৌন্দর্যের সৃজনে অভিব্যক্তিকে ভাবতত্ত্বের সহিত সংযুক্ত করা হয় না, বরং ভাবতত্ত্বই অভিব্যক্তি দ্বারা মূর্তরূপ ধারণ করে, অর্থাৎ এই ভাবতত্ত্বই অভিব্যঞ্জনারূপে প্রকট হয় যাহা অভিন্ন হইলেও ভিন্ন অনুভূত হয়। অতএব সৌন্দর্য অভিব্যঞ্জনারই অপর নাম—ইহা ভিন্ন আর কিছু নয়।

(৩) কলা মূলতঃ একটি আধ্যাত্মিক ক্রিয়া, কলাকৃতি উহার মূর্ত ভৌতিকরূপ যাহা সদা অনিবার্য বলিয়া গৃহীত হয় না। কলা সৃজনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে পাঁচটি চরণে বিভক্ত করা যাইতে পারে— (অ) অরূপ সংবেদনা; (আ) অভিব্যঞ্জনা অর্থাৎ অরূপ-সংবেদনার আন্তরিক সমন্বিতি—সহজানুভূতি, (ই) আনন্দানুভূতি (সফল অভিব্যঞ্জনার আনন্দের অনুভূতি), (ঈ) আন্তরিক অভিব্যঞ্জনা অথবা সহজানুভূতির শব্দ, ধ্বনি, রঙ, রেখা প্রভৃতি ভৌতিক তত্ত্বের সাহায্যে মূর্তীকরণ অর্থাৎ স্বরূপ-প্রদান, এবং (উ) কাব্য, চিত্র প্রভৃতি—কলা-কৃতির ভৌতিক মূর্তরূপ-বিশেষ। এই পাঁচটির মধ্যে মুখ্য ক্রিয়া (অর্থাৎ বাস্তবিক কলা-সৃজনের ক্রিয়া) দ্বিতীয়টি।

(৪) অভিব্যঞ্জনার উদ্দেশ্য অভিব্যঞ্জনাই—অভিব্যক্তি ব্যতীত উহার অন্য কোন উদ্দেশ্য হয় না। তদনুসারে কলার কলা হইতে ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই: শিক্ষা, প্রসাদন, কীর্তি, ধন প্রভৃতি কিছু নয়। কলা কলার জন্যই। অবশ্য আনন্দ উহার সহচারী, কিন্তু লক্ষ্য নয়। কলার কেবল একটি কার্য—আত্মাকে বিশদতা প্রদান করা। সঙ্কুল ভাবনাগুলিকে অভিব্যক্ত করিলে আত্মা মুক্তিলাভ করে, যেমন মেঘ হইতে বৃষ্টি হইলে আকাশ নির্মল হইয়া যায়। কলায় ইহাই চরম সিদ্ধি। এইজন্য কলা মূলরূপে নৈতিকতা, উপযোগিতা প্রভৃতি বন্ধন হইতেও মুক্ত। কিন্তু, ইহা কলার (আন্তরিক) রূপেরই লক্ষণ-বিশেষ—কারণ শিল্পী যখন কলাকে মূর্তরূপ প্রদান করেন তখন তাহা সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় তাঁর কেবল সেই সকল স্বীয় সহজানুভূতিকে মূর্তরূপ প্রদান করিবার অধিকার অবশেষ থাকে যাহা সমাজের পক্ষে হিতকারী। ক্রোচের পরে অভিব্যঞ্জনাবাদ যখন বিচার হইতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবতরিত হইল, তখন তার মূল স্বরূপটিও পরিবর্তিত হইল। সৃজনাত্মক সাহিত্যের অন্তর্গত নাটকের উপর অভিব্যঞ্জনাবাদী আন্দোলনের সর্বাধিক প্রভাব পড়িল; ইতালীর নাট্যকার পিরান্দেলো 'অভিব্যঞ্জনাবাদী নাটক'এর সূত্রপাত করিলেন এবং জার্মানীতে ইহা বিকাশ লাভ করিল। আলোচনার ক্ষেত্রে অভিব্যঞ্জনাবাদের প্রতিফলন রূপবাদী আলোচনায় দেখা দিল। এই রূপবাদী আলোচনা কলায় বিষয় তত্ত্বকে সর্বথা নগণ্য

ও অপ্রাসঙ্গিক এবং রূপকেই সর্বস্ব বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি আন্দোলনের সহিত ক্রোচের অভিব্যঞ্জনাবাদের কোন সম্বন্ধ আছে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। ক্রোচের সিদ্ধান্ত হইতেছে কলার দর্শন যাহা সার্বভৌম। কোন বিশিষ্ট কলা-প্রবৃত্তির সহিত সংযুক্ত করার অর্থই উহার সহিত অন্যায় করা। অতএব অভিব্যঞ্জনাবাদের শুদ্ধরূপ তাহাই যাহার বিবেচনা ক্রোচে করিয়াছেন। ক্রোচের বিবেচনা হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে অভিব্যঞ্জনাবাদ ও রস-সিদ্ধান্তের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান আছে। আমাদের বিচারে রস-সিদ্ধান্ত যেখানে ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অভিব্যঞ্জনাবাদ অভিব্যক্তি ভিন্ন আর অন্য কোন তত্ত্বের সত্তা স্বীকার করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রভেদ ভাব ও অভিব্যক্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব পর্যন্তই সীমিত। অভিব্যঞ্জনাবাদ ভাবের গুরুত্বকে অস্বীকার করে না, বরং ইহা স্বীকার করে যে অভিব্যক্তির পূর্বে উহার (ভাবের) কোন যথার্থরূপ গঠিত হয় না। প্রেম, ক্রোধ প্রভৃতির মূল সংবেদনাত্মক রূপ প্রেম বা ক্রোধ নয়—কয়েকটি বিশিষ্ট সংবেদনা অন্বিতির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইয়া 'প্রেম' বা 'ক্রোধ'এর রূপ ধারণ করে। আমার ধারণা যে রস-সিদ্ধান্তের এই বিচারের সহিত কোন বিরোধ নাই—সেখানেও ভাবের অনুভূতির নাম রস নয় ভাবের অভিব্যক্তিই রস। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল অভিব্যক্তি শব্দের অর্থকে লইয়া; অভিব্যঞ্জনাবাদে অভিধা এবং ব্যঞ্জনা উভয়েই অভিব্যক্তির রূপ বলিয়া স্বীকার্য কিন্তু রসবাদে ব্যঞ্জনাই অভিব্যক্তি বলিয়া গৃহীত, অভিধা বা 'কথন' নহে। উভয়ের মধ্যে ইহাই মূল প্রভেদ—ইহাই ধ্বনিবাদ এবং অভিব্যঞ্জনাবাদের মধ্যেকার প্রকৃত পার্থক্য। ধ্বনিবাদের অনুরূপ অভিব্যঞ্জনাবাদও ইহা স্বীকার করে যে কলা অনিবার্যতঃ অভিব্যঞ্জনা রূপই হয়, উভয়ের মূলাধার কল্পনা : কল্পনা = সৌন্দর্য (চারুত্ব) = ধ্বনি বা অভিব্যঞ্জনা। কিন্তু ধ্বনির আধারভূত অভিব্যঞ্জনার অর্থ কেবল মাত্র ব্যঞ্জনা। অপরদিকে অভিব্যঞ্জনাবাদের অভিব্যঞ্জনাতে অবিধাও যথাযথরূপে অন্তর্ভুক্ত; এবং সত্য কথা এই যে সেখানে অভিধা ও ব্যঞ্জনার মধ্যে কোন প্রভেদই নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রাগুক্ত ভিন্ন ধারণাগুলির বিষয়ে আপেক্ষিক সত্যাসত্যের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাহি না—প্রকৃতপক্ষে ইহা দার্শনিকের তাত্ত্বিক দৃষ্টি ও আলোচকের ব্যবহারিক দৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী প্রভেদ। আমাদের প্রয়োজন কেবল এই কথাতেই সিদ্ধ হইয়া যায় যে অভিব্যঞ্জনাবাদ ও রস বা রসধ্বনিবাদে কোন বিরোধ নাই। এক প্রকারে অভিব্যঞ্জনাবাদ ধ্বনিবাদের ব্যাপক, প্রকৃতপক্ষে অতিব্যাপ্ত রূপ এবং যে মাত্রায় উহাতে 'অতিব্যাপ্তি' অন্তর্নিহিত ঠিক সেই মাত্রায় কাব্যশাস্ত্রের দৃষ্টিতে উহাতে দোষও অন্তর্নিবিষ্ট। এই দৃষ্টিভেদের জন্য উভয়ের মধ্যে আর কিছু সামান্য পার্থক্য দেখা দিয়াছে। অভিব্যঞ্জনা-সিদ্ধান্তে আন্তরিক বা আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিই মুখ্য এবং শব্দ-অর্থ প্রভৃতির দ্বারা উহার মূর্ত অভিব্যক্তি গৌণ এবং বৈকল্পিক। রস-কল্পনাতেও এই আন্তরিক অভিব্যক্তি অগ্রাহ্য নয়, কিন্তু সেখানে শব্দার্থময়ী অভিব্যক্তিকে গৌণ এবং বৈকল্পিক বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। রস-সিদ্ধান্তে যেখানে আনন্দ রসের লক্ষণ এবং কাব্যের

মৌলিভূত প্রয়োজন, সেখানে অভিব্যঞ্জনাবাদে উহা আনুষঙ্গিক সিদ্ধিমাত্র। অভিব্যঞ্জনাবাদের অনুসরণে কলা কলার জন্যই। শিল্পী কলার সৃজন আনন্দের জন্য করেন না, তবুও এই সৃজনের দ্বারা অনিবার্যতভাবে আনন্দের সিদ্ধি হয়। রসবাদও ইহা স্বীকার করে যে কলার সৃজন অনিবার্যতভাবে আনন্দময় হয়, কিন্তু রসবাদী ইহাকে আনুষঙ্গিক সিদ্ধিরূপে স্বীকার না করিয়া মূল সিদ্ধি বলিয়া স্বীকার করেন। তাৎপর্য এই যে এই প্রভেদ কেবল দৃষ্টি-ভেদের কারণে, তত্ত্ব-ভেদের কারণে নহে। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব-ভেদের জন্য অধিক কোন সুযোগও নাই, কারণ এই দুইটি সিদ্ধান্তই আত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়েরই সূত্রপাত এই ধারণার অনুসরণে হইয়াছে যে সমস্ত সৃষ্টি-প্রপঞ্চের আধাররূপ আত্মা যাহা নিরন্তর অভিব্যক্তি = সৃষ্টি = আনন্দে অন্তর্লীন।

অভিব্যঞ্জনাবাদ ব্যতীত আধুনিক যুগের আরও কয়েকটি বাদ আছে যেগুলি ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে কবিতার রূপের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, যেমন বিম্ববাদ, ঘনবাদ প্রভৃতি। বিম্ববাদের আবির্ভাব মার্কিন দেশে হইয়াছিল, কিন্তু পরে ইংলণ্ডের কাব্যক্ষেত্রে ইহার প্রবেশ ঘটিয়াছিল। বিম্ববাদ স্বাকৃতরূপে রোমান্টিসিজ্‌মের বিরোধী কাব্য-সিদ্ধান্ত। ইহার লক্ষ্য ভাব ও বিচার হইতে স্বতন্ত্র 'বস্তু'তে কবিত্বের অনুসন্ধান করা। ইহা বিশুদ্ধ বস্তু বা পদার্থের কবিতা, এবং বস্তুর গোচররূপ কেবলবিম্ব'এ দৃষ্ট হয়, অতএব ইহা বিম্বের কবিতা। বস্তু স্বভাবতঃ মূর্ত, কঠিন, সঘন ও শুদ্ধ হয়, ভাবের-আর্দ্রতা হইতে উহা মুক্ত থাকে—এবং এই সকল বৈশিষ্ট্য বিম্বেও পাওয়া যায়, অতএব শব্দের দ্বারা বস্তুর এই সকল গুণের যথাযথ ভাবে প্রতিফলন বিম্ববাদী কবিতার মূল উদ্দেশ্য। রাগের মাত্র আর্দ্রতারও বিরোধী এই সিদ্ধান্ত রসবাদের অনুকূল কেমন করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে কাব্যের এই পরিভাষাই সহজে গ্রাহ্য নয়—পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই মতবাদের উগ্র বিরোধ হইয়াছে; সেখানেও বিবেকশীল আলোচকেরা এই ধরণের রচনাকে নির্জীব, যান্ত্রিক, বৈশিষ্ট্য-বিহীন পদ্য বলিয়াছেন যাহা বিম্বের ধারণাটিকে রূপরেখা ও আকারের মধ্যেই সীমিত রাখিয়া কবিতাকে ভাবের আর্দ্রতা হইতে সর্বথা মুক্ত করিবার প্রয়াসে উহাকে নিষ্প্রাণ করিয়া দেয়। বিম্ববাদী কবি স্বয়ং নিজের ব্যবহারে সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন—তাহার সহজ প্রতিভা কঠিন পরিশ্রমে নির্মিত শুষ্ক বিম্বকে ভাবের দ্বারা অনুবাসিত করিয়া এই ধরণের প্রযত্নের ব্যর্থতাকে অপ্রমাণ করিয়া দেয় এবং যেখানে এই কৃত্রিম প্রযত্ন সফল হয়, সেখানে ভাবের গন্ধের সহিত কবিতার প্রাণও উড়িয়া যায়। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রেও এই প্রশ্নটি তোলা হইয়াছে। অলঙ্কারবাদীরা যখন রসের তীব্র বিরোধিতা করিলেন তখন উভয়ের সমন্বয়ের জন্য আনন্দবর্ধন ধ্বনি-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং রস-বিরোধীদের পরিতুষ্টির জন্য রসধ্বনি ব্যতীত বস্তু-ধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনিরও উদ্ভাবনা করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে ধ্বনি-প্রসঙ্গে আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে বস্তু-ধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনি

কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় কল্পনাই থাকিয়া গিয়াছে—ব্যবহারে কাব্যের একটি উদাহরণও এমন দেওয়া যাইতে পারে নাই বা আজও দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই যাহা ভাবের গন্ধ হইতে সর্বথা মুক্ত। বিম্ববাদীরা অতিরঞ্জিত ভাবে এই প্রয়োগটির কথা আবার উল্লেখ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের প্রয়ত্নের ঠিক সেই পরিণতিই ঘটিল। যেরূপ ধ্বনিবাদী বস্তু-ধ্বনির স্বতন্ত্র সত্তা স্থির করিতে গিয়া অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভাব-সৌন্দর্যের উল্লেখ করিয়া ফেলেন ঠিক সেইরূপ বিম্ববাদীও, দৃঢ়-কঠোর, শুষ্ক কবিতার যুগের আহ্বান করিতে গিয়া বিশুদ্ধ চিন্তনের ক্ষণে, যখন তাঁহার চেতনা পূর্ব হইতে নির্ধারিত ধারণা হইতে মুক্ত থাকে, সহসা বলিয়া বসেন : "·········(বিম্ববাদী কাব্যের রচনাকালে) কবি বাধ্য হইয়া পড়েন নূতন সাদৃশ্য-যোজনা প্রয়োগ করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া পদার্থের মূর্ত কঠোর প্ররূপ রচনার জন্য যাহার দ্বারা তিনি বস্তু দর্শন হইতে উদ্‌বুদ্ধ নিজস্ব ভাব—স্বীয় বিস্ময় ও আনন্দকে রূপায়িত করিতে পারেন" (হ্যুম ; স্পেক্যুলেশন্‌স)। রসবাদের বিজয় এখানেই।

এই সকল মতবাদ-প্রসঙ্গে স্বদেশ-বিদেশের কবিতার কথা সহজেই মনে আসে। যদিও আধুনিক কবি প্রায় সর্বত্রই নিজের প্রেরক ও ব্যবহারিক কাব্য-সিদ্ধান্তগুলিকে কোন বাদের অন্তর্ভুক্ত করা পছন্দ করেন না, তবুও এই স্বতঃস্পষ্ট তথ্যটির নিষেধ সম্ভবপর নয় যে কাব্যের প্রতি এই সকল কবিদের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি-কোণ রহিয়াছে এবং ব্যক্তি-রুচি ও তাহার ফলে যে অবান্তর ভেদ ইঁহাদের কবিতায় দৃষ্ট হয় তাহা থাকা সত্ত্বেও এই বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণে একটি নিশ্চিত সমভাব বর্তমান আছে। এই দৃষ্টিকোণের নির্মাণ ইহাতে সন্দেহ নাই, কোন একটি বিশিষ্ট কাব্যবাদের ভিত্তিতে হয় নাই, ইহাতে নানা আধুনিক ধারণার সংঘাত বিদ্যমান—এবং ইহা সত্য যে ইহার স্বরূপ নিরন্তর বিকশনশীল। প্রারম্ভে বিম্ববাদ এবং উহার কিছুকাল পরে বা প্রায় উহার সমসময়ে প্রভাববাদের গভীর প্রভাবে ইহা প্রভাবান্বিত হয়। ইহার পরে সার্তের অনাস্থাবাদী জীবন-দর্শন 'অস্তিত্ববাদ' হইতে আধুনিক কবিতা নিজ মতধারা এবং সংবেদনার জন্য দার্শনিক সমর্থন লাভ করে এবং পরিশেষে বর্তমান যুগের বিঘটনশীল সমাজ ইহাকে বাস্তবানুগ আধার প্রদান করে। এই সকল বা এই ধরণের প্রভাবের ফলস্বরূপ 'নবসাহিত্য'-চেতনার বিকাশ ঘটে।

সংক্ষেপে আধুনিক কবিতার মুখ্য প্রবৃত্তিগুলি নিম্নরূপ :

(১) এই কবিতা সম্পূর্ণরূপে বর্তমানের উপর কেন্দ্রীভূত। অতীতের জন্য ইহার কোন স্পৃহা নাই এবং ভবিষ্যতের নিকট কোন আশা নাই। কালের নিরন্তর প্রচার হইতে বর্তমানক্ষণের সম্পূর্ণ অনুভূতিকে সমস্ত প্রাণবন্ত সম্ভাবনাগুলির সহিত শব্দ-বদ্ধ করাই ইহার লক্ষ্য।

(২) এইরূপে আধুনিক ভাব-বোধ এবং উহার যথার্থ অভিব্যক্তির আগ্রহ এই কবিতার প্রাণতত্ত্ব। আধুনিকতার বাস্তবিক অর্থ লইয়া নূতন বিচারকদের মধ্যে মত-ভেদ দেখা যায়। একটি মত এই যে আধুনিকতার সোজাসুজি অর্থ সমসাময়িকতা,

কিন্তু দ্বিতীয় মতানুসারে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান আছে এবং "আধুনিকতা অধিক আন্তরিক এবং মূল্যগত ভাব-বিশিষ্ট"। সাধারণতঃ "আধুনিকতা পরিবর্তিত ভাব-বোধের সেই স্থিতিরূপ যাহার প্রাদুর্ভাব যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক বিকাশ-ক্রমের বর্তমান পর্যায়ে হইয়াছে", যখন "সংসারের সামূহিক আত্ম-হত্যার ভয় দেখা দিয়াছে।" "বিশ্বব্যাপী এই সমস্যা মানবীয় ভাব-বোধে গভীর আঘাত হানিয়াছে এবং সমস্ত পরম্পরাগত ধারণাগুলি ভাসিয়া গিয়াছে। সুদৃঢ় বিশ্বাসের স্থানে আকণ্ঠ অবসাদ, ভয়, আশঙ্কা, সংশয়, অনিশ্চয়তা, ক্ষোভ, আক্রোশ, বিড়ম্বনায় মানব-মন আক্রান্ত। সে নিজের বাহ্য জীবনে নিজেকে আগন্তুক এবং আন্তরিক জীবনে বিস্থাপিত অনুভব করিতে লাগিয়াছে। বস্তুর স্বরূপ আমূল পরিবর্তিত হওয়ার জন্য দুই দিক হইতেই উহার সম্বন্ধ-সূত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ তাহার জীবন-পদ্ধতি ও বিচারে বিস্ময়কর মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অশান্তি, বিঘটন ও 'স্থায়ী সংক্রান্তি'র পরিবেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। × × × বৃত্তিগুলি অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছে, আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টি বিকাশ লাভ করিয়াছে। × × × বাহ্য পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য না থাকার ফলে এক ধরণের অসম্বদ্ধতা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মমত্বহীনতার ফলে বৌদ্ধিক নিঃসঙ্গতার প্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করিয়াছে। বিশ্বাসহীনতার শূন্য পরিণতি সমস্ত বস্তুগুলিকে মিথ্যা ও সারহীন করিয়া তুলিয়াছে।" (হিন্দী বার্ষিকী, ১৯৬১, গিরিজাকুমার মাথুর)।

(৩) বিশ্বাস ও তজ্জন্য আন্তরিক সমাহিতির অভাবে এই কবিতা নিরানন্দ রূপ এবং নিরানন্দ রূপ হওয়ার দাবীও করে। অতএব দর্শনের দিক দিয়া এই কবিতা একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু 'বর্ণনা'য় ঠিক সেইরূপই বস্তুনিষ্ঠ। ইহা ভাবের কবিতা নয়—বস্তুর কবিতা। অনুভূতিকে এখানে তরল ভাব রূপে গ্রহণ করা হয় না বরং 'বস্তু'রূপে হয় এবং বিম্ববাদের অনুরূপ অনুভূতির এই সংবেদনাও যথাসম্ভব ভাবের আর্দ্রতা হইতে মুক্ত, শুষ্ক ও সঘনতাযুক্ত।

(৪) স্বভাবতঃ এই ধরণের অনুভূতিকে ব্যক্ত করিবার জন্য শব্দ-অর্থের পরম্পরাগত সম্বন্ধই যথেষ্ট নয়, এই জন্য আধুনিক কবি আধুনিক ভাব-বোধকে রূপায়িত করিবার জন্য শব্দ-অর্থের নূতন সম্বন্ধগুলির উদ্‌ভাবনা বা স্থাপনার বিষয়ে নিজেকে উত্তরদায়ী মনে করে এবং নূতন অর্থ, নবীন প্রতীক, নূতন লয় এবং ইহাদের উপর আশ্রিত নূতন বিম্ব-যোজনার নিরন্তর উদ্‌ভাবনা করিতে থাকে।

মার্কিন দেশে ও ইংলণ্ডে আধুনিক কবিরা যেরূপে রোমান্টিসিজ্‌মের উগ্র বিরোধিতা করিয়াছেন সেরূপে ভারতীয় ভাষাগুলিতে (হিন্দী, মারাঠী, বাংলা প্রভৃতিতে) রোমান্টিসিজ্‌মের সঙ্গে-সঙ্গে উহার সমগোত্রীয় রসবাদেরও যোজনাবদ্ধ ভাবে বিরোধিতা হইয়াছে। নূতন কবিতা রসের কবিতা নয়—এই কথা বলিয়া বিরোধের প্রসার এবং নিম্নলিখিত যুক্তিতর্কের উল্লেখ করা হইতেছে :

(ক) রসের আধার—সমাহিতি, অম্বন্ধ, কিন্তু আধুনিক কবিতা সংঘাত ও

অসামঞ্জস্যের কবিতা।[১]

(খ) আধুনিক কবিতা বর্তমানের উপর কেন্দ্রীভূত। ইহার বিপরীতে রসের দৃষ্টি অতীতোন্মুখী—নূতন কবিতার বিষয়বস্তু ক্ষণকালের অনুভূতি, অপরদিকে (জন্মান্তর্গত ?) বাসনা ও স্থায়ী ভাব রসের আধারস্বরূপ।[২]

(গ) রস-সিদ্ধান্তে কবির ব্যক্তিত্বটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত—অতএব রসানুভূতিতে কেবল অব্যক্তিগত ভাবেরই আস্বাদন সম্ভবপর হয়; কিন্তু বর্তমান কালের কবিতার সংবেদ্য অত্যন্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভূতি-বিশেষ 'যাহাকে রসানুভূতির সমপর্যায়ে সহ-অনুভূতির সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে।' রসানুভূতিতে ব্যক্তিত্ব ও বিবেক অত্যাবশ্যক রূপে পরিহার্য, কিন্তু সহ-অনুভূতির আস্বাদন ব্যক্তি-চেতনার সহিত সজ্ঞবদ্ধরূপে সম্ভবপর। আত্ম-বিলুপ্তির আনন্দ ও ভাবাবেগের পরিপাকের দৃষ্টিতে রসানুভূতি অবশ্যই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া কথিত হইবে, কিন্তু মানবীয়তার বিচারে সহ-অনুভূতিকে উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া স্বীকার করাই বিবেক-সঙ্গত হইবে।[৩]

(ঘ) ইহার ফলে আধুনিক কবিতার অনুভূতি নিরানন্দময়ী হইয়া পড়ে। আধুনিক কবিতা......কেবল আকর্ষণের প্রতিই নয়, বিকর্ষণের প্রতিও আস্থাবান। ব্যঙ্গ করা, আঘাত করা, সজোরে নাড়া দেওয়া, ধ্যানমগ্নকে চমকাইয়া দেওয়া এবং কিছু চিন্তা করিবার জন্য বাধ্য করা, ইহাই আধুনিক কবিতার স্বভাব। ইহা আনন্দ দেয় কম ও দুঃখ দেয় অধিক। —কখনও-কখনও ইহা জীবনের ভয়ঙ্কর তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া আমাদের অভিভূত করে।[৪]

(ঙ) আধুনিক কবিতার মূল স্বর বৌদ্ধিক, রাগাত্মক নয়। 'উহাতে একটি অন্তর্নিহিত আলোচনাত্মকতার রূপ বিদ্যমান থাকে। যথার্থ-চিত্রাঙ্কনের প্রতি আগ্রহ, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও শৈলীগত বৈচিত্র এবং নব-নূতন অর্থের অভিব্যঞ্জনাকারী অভিনব প্রতীক-বিধান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক কবিতার প্রমুখ তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার্য। এই সকল তত্ত্বগুলির পশ্চাতে প্রেরণারূপে বুদ্ধির প্রভাব স্পষ্ট।[৫]

(চ) রসবাদী কবিতার প্রায় সমস্ত প্রমুখ লক্ষণগুলি আধুনিক কবিতায় পাওয়া যায় না, এমন কি ভাবুকতার অভাবও লক্ষিত হয়। মিত্রাক্ষর ছন্দ, গেয়তা ও পুনরাবৃত্তি প্রভৃতির অভাব বা উহার প্রতি উদাসীনতাও বৌদ্ধিকতারই সহজ পরিণাম। × × × অমসৃণতায়েই উহার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। অলংকরণে, মাজিলে-ঘষিলে উহার সহজ সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়।[৬]

---

১. শ্রীবাৎস্যায়নের অভিভাষণ

২. ঐ

৩. ডঃ জগদীশ গুপ্ত : 'নই কবিতা' ও 'আলোচনা'র কয়েকটি অঙ্ক হইতে উদ্ধৃত

৪. ঐ

৫. ঐ

৬. ঐ

উল্লিখিত বিবেচনায় ইহা স্পষ্ট যে আধুনিক কবিতাকে আধুনিক প্রমাণিত করিবার জন্য যুক্তি-তর্কের বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে এবং ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে রস-সিদ্ধান্তের বিষয়ে নানা মিথ্যা কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা আরম্ভেই ইহা স্পষ্ট বলিয়াছি যে রস ব্যাপক অর্থে মানসিক অনুভূতিরূপই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে অভিনবগুপ্ত-প্রতিপাদিত রসের ধারণা অদ্বন্দ্ব বা অদ্বৈতের উপর আশ্রিত এবং ইহাও সত্য যে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে প্রায় এই মতটি স্বীকৃতি পাইয়াছে, কিন্তু শৈব-দর্শন বা অদ্বৈত-দর্শনে কেবল কাব্যানন্দের বেলাতেই নয় আনন্দ মাত্রের কল্পনাও এই রূপেই করা হইয়াছে—রস আনন্দময়ী অনুভূতি-বিশেষ এবং আনন্দের প্রত্যেকটি রূপের প্রতীতি আত্মবিশ্রান্তি অথবা আত্মার অদ্বন্দ্বময়ী স্থিতিরই প্রতীতি রূপ। অতএব অদ্বৈত বা অদ্বন্দ্ব মূলতঃ রসের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নয় বরং শৈব-দর্শনের আনন্দ-কল্পনার সহিত ইহার সম্বন্ধকে স্বীকার করা উচিত। এবং, ইহার প্রমাণ এই যে রসের গুরুত্বের প্রতিপাদন কেবল অদ্বৈতবাদী আস্তিক আচার্যরাই করেন নাই, জৈন আচার্যরাও ঠিক সেইরূপ আগ্রহের সহিত করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল 'সুখদুঃখাত্মকো রসঃ'। এইরূপে বাৎস্যায়ন অজ্ঞেয়র অভিযোগের উত্তর স্পষ্ট। রসের মূলাধার অনুভূতি, শুদ্ধ মানবীয় অনুভূতিই যাহার উপর তাঁহারও (অজ্ঞেয়রও) সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই অনুভূতির স্বরূপের বিষয়ে দুই প্রকার বিচার হইয়াছে—ইহাকে একান্তভাবে আনন্দময়ীও স্বীকার করা হইয়াছে ও সুখদুঃখাত্মকও। আধুনিক কবিতাও আনন্দবর্জিত নয়, নানা কবিতায় ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং কয়েকজন চরমপন্থী লেখক ব্যতীত অধিকাংশ কবিরা আনন্দ-তত্ত্বকে স্বীকারই করিয়াছেন—কেবল ইহার অনিবার্যতাকে লইয়া বিরোধ দেখা দিয়াছে। এই বিরোধিতা সার্থক কি না, সফল কবিতার অনুভূতি অর্থাৎ কোনও অমিশ্র অনুভূতির অমিশ্র অভিব্যক্তি নিরানন্দময়ী বা দুঃখরূপও হইতে পারে কি না—ইহা একটি পুরাতন বিবাদ যাহার নিজস্ব বিচারানুসারে সমাধান আমরা প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে করিয়াছি। অতএব উহার পুনরাবৃত্তি এখানে অপ্রয়োজনীয়। তাৎপর্য এই যে আধুনিক কবিতা যদি অনুভূতিকে আধাররূপে গ্রহণ করিয়া চলে তাহা হইলে রস হইতে তাহার মুক্তি নাই; আমাদের অনুভূতি শুদ্ধ মানব-অনুভূতি আনন্দানুভূতি নয় ইহা বলিলেও রসের পাশ হইতে তাহার মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেকটি অমিশ্র অনুভূতির কলাত্মক অভিব্যক্তি বা প্রত্যেকটি কলাত্মক অনুভূতি—তীব্র হইতে তীব্রতর দ্বন্দ্বের কলাত্মক অনুভূতিও—সুষম অর্থাৎ অদ্বন্দ্বময়ীই হয়; প্রক্রিয়াতে দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে, পরিণতিতে নয়, অন্যথা 'অমিশ্রতা' এবং 'বিশুদ্ধতা' বা 'অভিব্যক্তির সফলতা'র কথা বলাই ব্যর্থ। এইরূপে মিত্রাক্ষর ছন্দ, গেয়তা, অলঙ্করণ, পরিষ্করণ প্রভৃতির সহিত রসের অনিবার্য সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া এবং আধুনিক কবিতায় এই সকল বৈশিষ্ট্যের অভাবের ভিত্তিতে উহাকে রসবিহীন কবিতারূপে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে কোন যুক্তি নাই, কেবল যুক্তির আভাস আছে। আধুনিক কবিতায় এই সকল তত্ত্বের অভাবে কবিত্বের

কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, ইহার বিচার এই প্রসঙ্গে সম্ভব নয়; কিন্তু কালিদাস ও নিরালার অমিত্রাক্ষর কাব্যকে বা বাণ ও জয়শঙ্কর প্রসাদের গদ্যকাব্যকে রস হইতে বঞ্চিত করা অসঙ্গত হইবে। রসশাস্ত্রে এই সকল তত্ত্ব রসের উপকারক মাত্র, 'লক্ষণ' নয়। এইরূপে রসের অতীতোন্মুখতাও কোন প্রমাণ নয়—উহা বাক্ ছল মাত্র, যুক্তির চতুর কল্পনা মাত্র, কারণ এমন কথা তো কোন রসাচার্য বলেন নাই। আপনি বলিতে পারেন যে ইহা অনুগমাত্মক উপপত্তি, কিন্তু তাহাও ঠিক নয় কারণ এই ধরণের কল্পনা বড় জোর প্রবন্ধের বিষয়ে করা যাইতে পারে, কিন্তু মুক্তককে অতীতের সহিত আবদ্ধ করা কেমন করিয়া সম্ভবপর ? এবং প্রবন্ধের বিষয়ে কি এইরূপ অন্যায় কথা বলা ঠিক হইবে ?—একই প্রসিদ্ধ কথায় বিভিন্ন যুগের কবিদের দ্বারা স্ব-স্ব যুগ-চেতনা ও ব্যক্তি চেতনার অনুসরণে নবীন রস ও নবীন রূপের সমাবেশ বর্তমানের আগ্রহের ফলেই হয়। প্রত্যেকটি সমর্থ কবি অতীত কথাকে বর্তমানে উপলব্ধি করিয়া কাব্যে পরিণত করেন এবং এই ভাবন-প্রক্রিয়ায় 'অনুভূতি'র —অর্থাৎ অতীত-কথার সহিত তাৎকালিক একাত্মময় সম্পর্কের—যে মুহূর্তটি উদ্ভূত হয়, তাহাই উহার নবীনতা বা মৌলিকতার নির্ণয় করে; শাস্ত্রীয় শব্দাবলীতে সেখানেই এই নবীন কাব্যের অঙ্গী রসেরও সিদ্ধি হইয়া যায়। আমাদের মূল বক্তব্য এই যে একই কথার উপর আশ্রিত বিভিন্ন যুগের নানা কাব্যগ্রন্থের 'মধ্যবর্তী পার্থক্যের আধার' হইতেছে অঙ্গীরস, এই অঙ্গীরস প্রায় অতীত কথার বিষয়ে প্রত্যেক কবির স্বীয় যুগ-চেতনার প্রতীক রূপ। কবির এই যুগ-চেতনার অর্থ কি ?—অতীত কথার সহিত কবির তাৎকালিক তাদাত্ম্যের অনুভূতি, ইহা ব্যতীত আর কিছু নয়। আধুনিক কবিদের মত বোধ হয় এই যে রসসিদ্ধ কবি অতীতের অতীত কথার প্রয়োগ অতীতের অনুরূপই করিত—সে স্বয়ং অতীতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার অনুভূতি করিত কিন্তু ইহা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; রসসিদ্ধ কবিও প্রায় নিজের বর্তমানে অতীতের জীবন্ত অনুভূতি করে। বাল্মীকি রামকথার সাময়িক অনুভূতি নিজস্ব 'বর্তমান' এই করিয়াছিলেন, তুলসী মধ্যযুগে এবং মাইকেল মধুসূদন আধুনিক যুগে—প্রত্যেকে অতীতের কেবল সাময়িক অনুভূতি করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনজনেরই কাব্যের আধার-চেতনা ভিন্ন; তিনটিই রসাত্মক কাব্য, কিন্তু প্রত্যেক কবির স্বীয় সাময়িক অনুভূতির অনুসরণে তিনটি কাব্যেরই আধারভূত রসে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দ্বিবেদী যুগের[১] সংস্কারী কবিরা মহাভারতের অতীত কথাবস্তুতে নিজেদের বর্তমান অনুভূতির অনুসরণে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের বিজয় উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আধুনিক কবির[২] পক্ষে মহাভারতের যুগটি 'অন্ধ' যুগ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন কবিদের দৃষ্টিভেদের

১. বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের কাব্য যুগ

২. ধর্মবীর ভারতীর কাব্যগ্রন্থ "অন্ধাযুগ"

কথা—সহৃদয়ের দৃষ্টিতেও রস তৎকাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, উহাকে শাস্ত্রে 'সদ্যঃপরনির্বৃ'ত্তি' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

ইহার পর রসে আত্ম-বিলয়ের সমস্যাটি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ইহা ঠিক যে রসানুভূতির স্থিতিতে আত্ম-বিলয়কে আবশ্যক বলিয়া ধরা হইয়াছে কিন্তু এই বিষয়েও দুইটি তথ্য জ্ঞাতব্য—প্রথমতঃ আত্ম-বিলয় রসের কেবল পরিপাক অবস্থারই লক্ষণ প্রত্যেক অবস্থার নয় এবং দ্বিতীয়তঃ আত্ম-বিলোপ কেবল রস দশারই ক্ষেত্রে নয় একাত্মতা এবং আনন্দের প্রত্যেক অবস্থারই লক্ষণ; সহ-অনুভূতিতে তীব্রতার সঞ্চার হওয়া মাত্র বিবেক ও ব্যক্তি-চেতনার লোপ হইয়া যায়; যেখানে ইহা হয় না সেখানে অনুভূতির ক্ষীণতা বাধারূপে দেখা দেয়, কিন্তু রস-চক্রে ইহার জন্যও একটি স্থান আছে। এইজন্য রসানুভূতি এবং সহ-অনুভূতিতে কোন ভেদ নাই. কেবলমাত্র ভেদের আভাস আছে এবং সহ-অনুভূতি রসানুভূতি হইতে ভিন্ন নয় বরং প্রায় উহার পূর্বদশা রূপই। প্রথমে পাঠক কবির সঙ্গে সহ-অনুভূতিই করে; ইহার পরে, যেহেতু কবির অনুভূতি প্রায় পাঠকের অনুভূতি হইতে প্রবলতর হয়, অতএব পাঠকের অনুভূতি উহাতে বিলীন হইয়া যায়।

রস-সিদ্ধান্তের সঙ্গে আধুনিক কবিতার বিরোধিতার সর্বাধিক প্রবল আধার উহার বৌদ্ধিকতা। আধুনিক কবিদের দাবি এই যে এই যুগটি চরম বৌদ্ধিকতার যুগ। নিজেদের পূর্ববর্তী বিম্ববাদী কবিদের অনুরূপ অধুনিক কবি ভাবকে ঘৃণা করে না কিন্তু তার দৃষ্টিতে ভাবের তরলতা ও আর্দ্রতার বিশেষ কোন মূল্য নাই। সে বোধ হয় ইহা স্বীকার করে যে ইচ্ছা ও উহার বিবিধ রঞ্জিত রূপগুলির সহিত বহুবর্ণ বিশিষ্ট রোমাণ্টিসিজ্‌মের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক কবিতার দৃষ্টিকোণ মূলতঃ রোমাণ্টিসিজ্‌ম বিরোধী। ইহা এমন একটি যুগের কথা যেখানে ইচ্ছার মৃত্যু ঘটিয়াছে, অতএব ভাবানুভূতি ও স্বপ্নের সহিত উহার আর কোন সম্বন্ধ নাই; উহার দৃষ্টিকোণ বর্তমান পরিস্থিতির অনুরূপ আলোচনাত্মক, বস্তুনিষ্ঠ এবং ব্যঙ্গপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে রস-সিদ্ধান্তের সহিত বুদ্ধি-তত্ত্বের বিরোধ ঠিক ততখানি নয় যতখানি আধুনিক কবিতার সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন। ইতিপূর্বে আমরা অন্যত্র স্পষ্ট করিয়াছি যে যথার্থ-চিত্রণেও রস বর্তমান থাকে এবং ব্যঙ্গের সহিত রসের আবার বিরোধ কি? উহাতে করুণা, হাস্য, অমর্ষ প্রভৃতি ভাবের সত্তা নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান আছে, যাহা মূলতঃ মানবীয় সংবেদনার উপর আশ্রিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, হৃদয়তত্ত্বের অপেক্ষা বুদ্ধি তত্ত্বের প্রাধান্যও আধুনিক কবিতার সর্বস্বীকৃত লক্ষণ নয়। বিদেশে রিচার্ড্‌স ভাবকেই ইলিয়াটের কবিতার মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এজরা পাউণ্ডের কবিতার ব্যাখ্যাকারেরাও ভাব-তত্ত্বের গুরুত্বের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—"কবিতা এক প্রকারের সম্প্রেরিত গণিত-বিদ্যা যাহাতে আমাদের অমূর্ত অঙ্ক, ত্রিভুজ ও বৃত্ত প্রভৃতির নয় বরং

মানব-ভাবনার সম্বন্ধ সূত্র লাভ হয়।[১]" সাম্প্রতিক কালে এই সকল আধুনিক কবি (ইলিয়াট ও এজরা পাউণ্ড) প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আধুনিক কবিতার প্রবর্তনের ব্যাপারে ইহাঁদের অবদান অব্যাহত আছে ও থাকিবে। হিন্দীতে 'অজ্ঞেয়' আধুনিক কবিতায় মানবীয় অনুভূতি বা ভাববন্ধের সর্বাধিক প্রবল সমর্থক, এবং অপর দিকে প্রমুখ কবি গিরিজা কুমার মাথুরের কবিতার সমৃদ্ধির আধারই রাগাত্মকতা। বুদ্ধি-তত্ত্বকে উচ্চপদ দিলেও জগদীশগুপ্ত স্বয়ং কবিতার প্রসঙ্গে বুদ্ধি-তত্ত্বের অপেক্ষা মানবীয় সহ-অনুভূতি, সংবেদনা প্রভৃতিরই উল্লেখ বারংবার করিয়াছেন। এইরূপে রসের বন্ধন হইতে আধুনিক কবিতার মুক্তি পাওয়ার প্রায় সকল প্রয়াসই বিফল হইয়াছে। যদি কোথাও কোন কবি সাফল্য লাভ করেন সেখানে কবির বৌদ্ধিক সাফল্যের সহিত একটি অঘটনও ঘটিয়া যায় এবং কবির কবিতা অকবিতায় পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে নূতন কবিতার কল্যাণ তখনই হইবে যখন সে এই রসময়তার বন্ধন স্বীকার করিয়া লইবে। এই ব্যাপারে তাহার ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। চল্লিশ বর্ষ পূর্বে ছায়াবাদও রসের বিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু আজ রসই উহার প্রাণ-সর্বস্ব; ইহার প্রায় দুই দশক পরে প্রগতিবাদ উহার উপর প্রহার হানিল, কিন্তু আজ উহার যতটুকু অংশ অবশিষ্ট আছে তাহা রসের আধারেই জীবিত।

রস ও বিভিন্ন কাব্য-মূল্য

বিশ্বের কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসে, যদিও প্রত্যেকটি কাব্য-সিদ্ধান্ত বা কাব্যবাদের সহিত ভাগফলের অনুরূপ একটি করিয়া নূতন কাব্যমূল্যের জন্ম হইয়াছে, তবুও এখন পর্য্যন্ত যতগুলি কাব্যমূল্যের জন্ম ঘটিয়াছে সেগুলিকে দুইটি ব্যাপক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) আনন্দবাদী মূল্য; (২) কল্যাণবাদী মূল্য। আনন্দবাদী মূল্যের মূলাধার এই যে কাব্যের চরম প্রয়োজন আনন্দ। ইহার অন্তর্গত আনন্দ-বিষয়ক ধারণাগুলির অনুসরণে কয়েকটি সূক্ষ্ম ভেদ পাওয়া যায়। কাব্য-বিচারকেদের একটি শ্রেণী আনন্দকে আত্মবিশ্রান্তির সমার্থক বলিয়া স্বীকার করেন—ইহাঁরা আত্মার সত্তায় আস্থাবান্ এবং ইহা স্বীকার করেন যে কাব্যের প্রয়োজনভূত আনন্দ আত্মানন্দেরই একটি প্রকার। ভারতবর্ষে অভিনবগুপ্ত ও জগন্নাথ প্রভৃতি আচার্যগণ এবং ইউরোপের প্রাচীন বিদ্বান্ প্লোটিনাস প্রভৃতি এবং নবীনদের মধ্যে কান্ট, হীগেল এবং অপরদিকে প্রতীকবাদী কবি-বিচারকেরা প্রায় এই মতেরই সমর্থক। আনন্দবাদীদের আর-একটি শ্রেণী আছে যাহা কাব্যানন্দকে আত্মাস্বাদরূপে স্বীকার না করিয়া মানসিক ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শ্রেণীর বিদ্বানদের মতানুসারে কাব্যানন্দ নিশ্চিতরূপে একটি

১. Poetry of Ezra Pound—ক্যানার, পৃ০৭৭

পার্থিব অনুভূতি, কিন্তু এই অনুভূতি সামান্য পার্থিব আনন্দরূপ ও বিষয়ানন্দের বিভিন্ন রূপগুলির অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম-গম্ভীর এবং পরিষ্কৃত কারণ ইহাতে স্বার্থ-চেতনার সম্পূর্ণ অভাব থাকে এবং এইজন্য ইহার রূপ এই সকল পার্থিব রূপের অপেক্ষা অধিক উদাত্ত এবং অবদাত হয়। আমাদের ধারণা এই যে প্রাচীন আর্যদের মধ্যে ভরত ও লোল্লট এবং বোধ হয় ভামহ, উদ্‌ভট ও বামন ও জৈন আচার্য রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র প্রভৃতি ও অপরদিকে পাশ্চাত্য বিদ্বানদের মধ্যে এরিষ্টটলেরও এই মতই ছিল; আধুনিক যুগের সকল আনন্দবাদীরাও এই মতেই আস্থাবান্। আনন্দবাদীদের একটি তৃতীয় শ্রেণী আরও আছে যাহা কাব্যানন্দকে অলৌকিক—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও ইন্দ্রিয় উভয় প্রকারের অনুভূতি হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন। ভারতীয় আচার্যদের মধ্যে দণ্ডী, কুন্তক এবং অধিকাংশ রসবাদী এবং পশ্চিম দেশের লুঙ্গেনস, শিলার, শেলি প্রভৃতিরও এই মত।

উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিচারধারার অন্তর্গত আলোচকেদের আর একটি শ্রেণী জন্ম লাভ করিল যাহাদের মতানুসারে কলার প্রয়োজন কলাই—এইরূপে সামান্য লৌকিক প্রয়োজন ব্যতীত আনন্দকেও এই শ্রেণীর বিদ্বানেরা প্রয়োজন রূপে স্বীকার করেন নাই। কলা ও সৌন্দর্য এই সকল আলোচকেদের মতে তুল্যরূপ, অতএব ইঁহাদের সাহিত্য-চেতনার আধার হইতেছে সৌন্দর্য— যে সৌন্দর্য সকল প্রকারের নৈতিক পরিভাষা হইতে মুক্ত স্বতঃপূর্ণ এবং স্বায়ত্ত। কাব্যের একমাত্র প্রয়োজন ইহাই। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি যে সৌন্দর্য প্রকৃত-পক্ষে আনন্দেই অন্তর্ভূত হইয়া যায়, সৌন্দর্য প্রয়োজন হইতে পারে না বা অনন্তপক্ষে অন্তিম প্রয়োজন হইতে পারে না, কারণ স্বয়ং সৌন্দর্যের প্রয়োজনও আনন্দই। —কলার এই সকল আনন্দবাদী মূল্য ও ইহার বিভিন্নরূপ রস-সিদ্ধান্তে সহজেই স্বীকৃত। রসের আধারভূত আনন্দের ব্যাখ্যা বিভিন্নরূপে করা হইয়াছে, কিন্তু এই সকল ভেদ কেবল দৃষ্টিকোণের ভেদের উপর আশ্রিত এবং এই বৈবিধ্য উহার স্বরূপের ব্যাপকতারই প্রমাণরূপ।

কল্যাণবাদী মূল্যের আধার এই তর্কহীন বিশ্বাস যে কাব্য ও কলার প্রয়োজন মানবকল্যাণে। এখানেও মানব-কল্যাণের বিভিন্ন পরিভাষাগুলির ভেদের ভিত্তিতে কল্যাণবাদী মূল্যের নানা ভেদ করা যায়। কল্যাণের একটি রূঢ় ও স্পষ্ট অর্থ নীতিগত বা ধর্মগত : যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। যাহার দ্বারা মানবের পার্থিব ও পারমার্থিক কল্যাণ হয় তাহাই ধর্ম। কলাবিদ্‌গণের একটি শ্রেণী ইহাকেই কলার মূল্যের মানদণ্ডরূপে স্বীকার করেন : প্লেটো, হোরেস, মিল্‌টন, রাসকিন প্রভৃতিরও এই মত যাহা সমষ্টিবাদী নৈতিক মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় অর্থটি অপেক্ষা-কৃত ব্যাপক—ইহা মানবের সুখ-দুঃখ, শক্তি ও দুর্বলতার উপর আশ্রিত করুণামূলক মানবীয় মূল্যের ভিত্তিতে কল্যাণের স্বরূপ স্থির করে। এই শ্রেণীর প্রতিনিধি হইতে-

ছেন টলস্টয়। কল্যাণের তৃতীয় অর্থ, ভৌতিক উৎকর্ষ যাহা সামাজিক মূল্যের উপর অধিষ্ঠিত। ইহা কল্যাণের মার্ক্সবাদী পরিভাষা। ইহা ব্যতীত কল্যাণের আরও দুইটি অর্থ আছে— একটি সাংস্কৃতিক এবং অপরটি মনোবৈজ্ঞানিক। নৈতিক মূল্যই সাংস্কৃতিক অর্থের মূলাধার, কিন্তু এই মতবাদীরা ব্যবহারিক উপযোগিতা পর্যন্ত নিজেদের সীমিত না রাখিয়া চেতনার ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বৃত্তির সংযমনও দমনের অপেক্ষা সাংস্কৃতিক মূল্যের লক্ষ্য উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রতিই অধিক কেন্দ্রীভূত। বিধিনিষেধের অপেক্ষা সহজ অভিব্যক্তি এবং বিকাশে উহার আস্থা অধিক। ইংরাজি আলোচক মেথ্যু আর্নল্ড এবং হিন্দীর আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল কাব্যের সাংস্কৃতিক মূল্যের প্রতিষ্ঠাপক। মনোবৈজ্ঞানিক অর্থ মূলতঃ ব্যক্তিপ্রসঙ্গে এবং ব্যাপকরূপে সামাজিক সন্দর্ভে উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রানুসারে 'মূল্য'-এর আধার অন্তবৃত্তির পরিতোষ এবং কলার যথার্থ মানদণ্ড, অন্তর্বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন : রিচার্ড্‌স এই সিদ্ধান্তের উদ্‌ভাবক—বলা বাহুল্য রস-সিদ্ধান্তের এই সকল কল্যাণবাদী মূল্যের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে। উহাতেও যে আনন্দের কল্পনা করা হইয়াছে তাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। রসাভাস প্রসঙ্গে আমরা ইহা স্পষ্ট করিয়াছি যে রস-কল্পনা লোক ও শাস্ত্রের মর্যাদার দ্বারা পূর্ণতঃ আবদ্ধ, প্রকৃতি ও আচারগত নিয়মের দ্বারা আনন্দের স্বরূপ নির্মাণ হয়—উহা ব্যতীত আনন্দের কোন অন্য সত্তাকে স্বীকার করা হয় নাই। এইরূপে রস-কল্পনা নৈতিক কল্পনাই, লোক ও শাস্ত্রের ঔচিত্যই উহার উপনিষদ্। 'রামাদির অনুরূপ ব্যবহার করা উচিত, রাবণাদির অনুরূপ নয়'—ধর্মাধর্মের এই বিবেক কাব্যের স্বীকৃত ফলবিশেষ যাহা বিধিনিষেধ রূপে নয়—প্রীতির মাধ্যমে উপলব্ধ হয় এবং অবশেষে যাহার দ্বারা কাব্যরসের পোষণ ও সিদ্ধি হয়। জীবনের পরমার্থগুলির সিদ্ধি কাব্যে রসের মাধ্যমেই হয়, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ-ভাবনা অন্তর্হিত। এইরূপে মানব সংবেদনা ও অন্তর্বৃত্তির সামঞ্জস্যের উপর অধিষ্ঠিত কল্যাণের ধারণাগুলিও রস-কল্পনায় সহজে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় : ভাবময়ী বৃত্তি রসের মূলাধার, সমষ্টি ভাবনা বা সাধারণীকৃতি উহার পরিপাকের সাধন-বিশেষ এবং চিত্তের সমাহিতিই উহার পরিণতি রূপ। অতএব রস-সিদ্ধান্তে আনন্দবাদী মূল্য ও কল্যাণবাদী মূল্যের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। নিজের সহজরূপে ইহা সকল প্রকারের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত : একদিকে ইহা সকল আনন্দের হীনতর অবস্থা—মনোরঞ্জন, আমোদ-প্রমোদ, ইন্দ্রিয়-সুখ প্রভৃতি হইতে উর্দ্ধে তেমনি অপরদিকে কল্যাণের ক্ষুদ্রতর রূপ, উপযোগিতাবাদী ও নৈতিকতার বিধিনিষেধ মূলক সীমা হইতে অনেক দূরে। এই সিদ্ধান্তটি, প্রকৃতপক্ষে, সাংস্কৃতিক ভূমিকার উপর বা উহার অপেক্ষা গভীর বিশুদ্ধ মানবীয় ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা আনন্দ ও কল্যাণের মিলন-তীর্থ, যেখানে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক, বৈয়ক্তিক ও সামাজিক, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যের মধ্যবর্তী বিরোধ মিটিয়া যায় ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

রস-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাহার উত্তর

রস-সিদ্ধান্তের বিকাশ ও প্রসার নির্বিঘ্নরূপে হয় নাই। প্রায় প্রারম্ভ হইতেই সময়ে-সময়ে উহার বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অভিযোগ করা হইয়াছে। এই সকল অভিযোগের সার-সংগ্রহ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(১) রসকে সাংসারিক অনুভূতি হইতে সর্বথা বিলক্ষণ অলৌকিক ও ব্রহ্মাস্বাদ সহোদররূপে স্বীকার করা হইয়াছে। মধ্যযুগে এই ধরণের কল্পনার বিলাসিতা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু বর্তমান কালের মনোবৈজ্ঞানিক যুগে ইহা কেমন করিয়া স্বীকার্য হইতে পারে? মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রত্যেক অনুভূতির নির্বচন সম্ভবপর—তাহা হইলে রস অনির্বচনীয় কেমন করিয়া থাকিতে পারে?

(২) রস-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ গুরুত্ব ভাবের উপরই আরোপিত থাকে; পরিণামতঃ কাব্যের অন্য রূপগুলির প্রতি ন্যায় সম্ভবপর হয় না যাহা পাঠকের কল্পনাকে চমৎকৃত বা উহার বিচারধারাকে উদ্দীপ্ত করে অথবা শব্দ-অর্থে কলাত্মক চমৎকারিতা উৎপন্ন করিয়া যে রূপগুলি আপন-আপন সার্থকতা প্রমাণ করে। প্রাচীন যুগে অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি ও বক্রোক্তি প্রভৃতি সিদ্ধান্তগুলি এই যুক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং বর্তমান যুগের অনেক আলোচকেরাও নবীন শব্দাবলীতে এই অভিযোগের আবৃত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে কাব্যের নানা প্রয়োজনের মধ্যে ভাবের উদ্‌বোধের অপেক্ষা পাঠকের হৃদয়ে সুন্দর বিম্বের উদ্‌বুদ্ধি বা নবীন শব্দার্থ-বোধ প্রভৃতিরও গুরুত্ব কম নয়। বর্তমানকালের বুদ্ধি-প্রধান জীবনে আমাদের অনুভূতিগুলি আর বিশুদ্ধ ভাবাত্মক নাই, উহাতে বিচারসূত্র অনিবার্যভাবে গ্রথিত থাকে। অতএব কাব্যেও বর্তমানকালে বৌদ্ধিক অনুভূতিরই প্রসার ঘটিয়াছে। রস-সিদ্ধান্তে সৌন্দর্য বোধের এই নবীন রূপগুলির উচিত মূল্যাঙ্কনের কোন ব্যবস্থা নাই।

(৩) রস-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ভাবের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট যাহার ফলে কাব্যবস্তুর পরিধি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। মানব-হৃদয় অথাহ সাগরের সমতুল্য যেখানে অসংখ্য তরঙ্গ নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে। উহাকে নয়টি বা এগারটি স্থায়ীভাব ও তেত্রিশটি সংচারীভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সর্বথা অসঙ্গত হইবে। যুগ-যুগান্তর হইতে কাব্যে মানব-চেতনার অসংখ্য তরল-চটুল গুরু-গম্ভীর ও পরস্পর সংকীর্ণ বৃত্তিগুলি ব্যক্ত হইয়াছে এবং উহাদের রসের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নয় এবং ন্যায়সঙ্গতও নয়। বিশ্বকাব্যে, স্বয়ং ভারতীয় ভাষার আধুনিক কাব্যে, যাহা রস-সিদ্ধান্তের পৃষ্ঠ ভূমিতে রচিত নয় এমন পর্যাপ্ত অংশ বর্তমান আছে যাহার রস-নির্ণয় অসম্ভবপর। 'হ্যামলেট', 'গোদান', 'কুরুক্ষেত্র' বা 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'এর অঙ্গীরস নিশ্চয় করিয়া কাহারও পক্ষে বলা দুঃসাধ্য। ইহার কারণ এই যে আদিম বাসনাগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য রস-সিদ্ধান্ত অপর্যাপ্ত রহিয়াছে। অবচেতন মনের রহস্য-লোকের উদ্‌ঘাটন হইয়া যাওয়াতে উহার অপর্যাপ্ততা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। নিরন্তর

বিকাশশীল মানব-চেতনা ও উহার বর্ধমান জটিলতার অভিব্যক্তির জন্য উহাতে কোন ব্যবস্থা নাই।

(৪) রসের সিদ্ধির জন্য একটি পরিপূর্ণ কাব্য বিধানের প্রয়োজন যাহা কাব্যের প্রবন্ধ রূপ ব্যতীত অন্যত্র প্রায় দুর্লভ। ভারতীয় মুক্তকের কল্পনাও প্রবন্ধের লঘুতম রূপেই করা হইয়াছে, অতএব সেখানেও এই বিধানই প্রযোজ্য। কিন্তু এমনও কত ছন্দ বা সূক্তি পাওয়া যায় যেখানে কোন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাব-গন্ধ বা অত্যন্ত তরল অনুভূতি-চিত্রই কবিত্বের সার-সর্বস্ব হয়। সেখানে রসের সিদ্ধি কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে?

(৫) রসের বিরোধিতা বা অবিরোধিতার ধারণাকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করার জন্য রসের ক্ষেত্র আরও অধিক পরিসীমিত হইয়া পড়িয়াছে। মানব চেতনা বা উহার সকল অভিব্যক্তি অন্তর্বিরোধিতার পুঞ্জরূপ। জীবনের চিত্র যত অধিক প্রবল ও পরিপূর্ণ হয় তাহাতে অন্তর্বিরোধিতাও সেইরূপ প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে—এবং,কবি ও কাব্যের ব্যাপারে ইহাই সত্য। ভারতীয় বাঙ্‌ময়ে মহাভারত ও পাশ্চাত্য বাঙ্‌-ময়ে শেক্সপীয়ারের নাট্যসাহিত্য ব্যাপক পরিধিতে জীবনের অনন্ত অন্তর্বিরোধকে আবদ্ধ রাখিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কাব্যের গৌরব এই সকল অন্তর্বিরোধের জন্য বিকাশ লাভ করিতেছে। রস-সিদ্ধান্তের মানদণ্ডানুসরণে এই গৌরব দোষ ভিন্ন আর কিছু নয়।

(৬) রস-সিদ্ধান্তের একটি বড় অসামর্থ্যতা এই যে ইহা রসকে কেবল সহৃদয়-নিষ্ঠ রূপে স্বীকার করিয়া চলে যাহার ফলে কবিগত রস ও কাব্যগত রস সর্বথা উপেক্ষিত হইয়া পড়ে। পরিণামস্বরূপ যেখানে কোন প্রকারের পূর্বনির্ধারিত বিচার প্রভৃতির জন্য সহৃদয়ের গ্রহণ শক্তি বাধা প্রাপ্ত হয় সেখানে সরস কাব্যের উচিত মূল্যাঙ্কন সম্ভবপর হয় না। এতদ্ব্যতীত কাব্য বা নাট্যগত স্থায়ী ভাব এবং সহৃদয়ের স্থায়ীভাবের মধ্যে সর্বত্র সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয়। কখন-কখন এই দুইটির মধ্যে কেবল অসঙ্গতিই নয় বিরোধ পর্যন্ত দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ এমন একটি দৃশ্য লওয়া যাক্ যেখানে নায়ক নায়িকা কোন নিবিড় জঙ্গলে নর-মাংস ভক্ষণের দৃশ্য দেখিতে পান। এই পরিস্থিতিতে নায়কের হৃদয়ে (যদি সে বীর পুরুষ) ক্রোধ, নায়িকার হৃদয়ে ভয় ও প্রেক্ষক বা পাঠকের হৃদয়ে জুগুপ্সারই উদয় হইবে।[১] এই-রূপে কাব্যে বর্ণিত স্থায়ী ভাবের সহিত সহৃদয়ের স্থায়ী ভাবের তাদাত্ম্যের অভাবে রসের পরিপাক কেমন করিয়া সম্ভব? রস-সিদ্ধান্তের ইহা একটি অত্যন্ত স্পষ্ট অসঙ্গতি।

(৭) রসের অভিব্যক্তি হয়—ইহা স্বীকার করা সঙ্গত নয়। রসের অর্থ যদি

১. শ্রী মার্ডেকারের মত দ্রষ্টব্য: আধুনিক হিন্দী তথা মারাঠী মেঁ কাব্যশাস্ত্রীয় অধ্যয়ন, পৃ· ২৮৪

কাব্যাস্বাদ তাহা হইলে উহার প্রায় নির্মিতই হয়। রস বা কাব্যাস্বাদ কোন একটি ভাবের বিশুদ্ধ এবং অমিশ্র অনুভূতি নহে বরং অনুভূতির একটি বিধান-রূপই যাহার উদ্‌বোধের স্থানে নির্মাণই সম্ভবপর। অতএব রস-সিদ্ধান্ত, যাহার অনুসরণে বাসনা-রূপে স্থিত কোন একটি স্থায়ী ভাবের অভিব্যক্ত রূপেরই নাম রস, কাব্যাস্বাদের যথার্থ স্বরূপের নিরূপণে অসমর্থ।

(৮) আত্মবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রস-সিদ্ধান্ত স্থায়ী মূল্যগুলিকেই আধাররূপে গ্রহণ করিয়া চলে। কিন্তু, বর্তমান জীবনে স্থায়ীত্বের ধারণারই পূর্ণতঃ বিঘটন ঘটিয়াছে। আজ পরিবর্তনই সত্য এবং কেবল ক্ষণকালের সত্তাই স্বীকার্য। অতএব আজকের কবিতা কেবল অনুভূয়মান ক্ষণ-মুহূর্তেরই অভিব্যক্তি করিতে পারে। ইহার বিপরীতে রসের সিদ্ধির জন্য স্থায়ী ভাবের সংস্কার অনিবার্য-ভাবের সদ্যঃ অনুভূতি অথবা অনুভূয়মান রূপের নিরূপণের আস্বাদ রস হইতে পারে না। অতএব সমসাময়িক কবিতার যথার্থ মূল্যাঙ্কনের জন্য রস-সিদ্ধান্ত উপযুক্ত নয়।

(৯) রস-সিদ্ধান্তে আনন্দের উপর, বিশেষ করিয়া আনন্দের সিদ্ধাবস্থার উপর, অনাবশ্যক ভাবে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কাব্যের অন্য ভব্যতর প্রয়োজন-গুলি, যেমন চারিত্র্যের নির্মাণ, সৎকর্ম প্রবৃত্তি, চেতনার উৎকর্ষ প্রভৃতি, উপেক্ষিত হইয়া পড়ে এবং প্রীতিদায়ক পক্ষটি প্রমুখ হইয়া যায়। এইরূপে একটি প্রয়োজনের উপর অধিক বল ও অপরটির উপর অল্প গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিপর্যয় আসিয়া কাব্য ও জীবনের ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন করিতে পারে ও করিতেছেও।

রস-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রায় এই সকল বা এই ধরণের অভিযোগ করা হইয়াছে এবং করা হইতেছে। মধ্যে অনেকগুলির উত্তর আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গের বিবেচনায় পূর্বেই দিয়াছি; তবুও এই সকল অভিযোগগুলির মধ্যে কোনটি সত্য বা কোনটা অসত্য ইহা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করিবার জন্য পরিশেষে, এই সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

প্রথম অভিযোগটি রসের ব্রহ্মানন্দসহোদরতার বিষয়ে করা হয় ইহা সর্বাধিক সরল ও বহুচর্চিত অভিযোগ যার উল্লেখ রস-ধারণার বিরুদ্ধে যে কেউ কোন সময়ে করিতে পারেন। ইহার উত্তর আমরা এই পরিচ্ছেদে পূর্বেই দিয়াছি। ব্রহ্মানন্দসহোদর বিশেষণ কেবল এই তথ্যটির উপর আলোকপাত করে যে রসানুভূতি সামান্য ইন্দ্রিয় অনুভূতি নহে, উহা ভাবের সাধারণ সুখ-দুঃখাত্মক অনুভব হইতে ভিন্ন। রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য উহার স্বরূপ সামান্য বিষয়ানুভূতির অপেক্ষা অত্যন্ত উদাত্ত ও অবদাত্ত। অদ্বৈতবাদী আচার্যরা কেবল রসেরই নয় আনন্দের প্রত্যেকটি রূপের কল্পনাই আত্মানন্দের সন্দর্ভে করিয়াছেন, কারণ আনন্দ অদ্বৈত দর্শনের অনুসরণে কেবল আত্মারই 'স্ব-রূপ', মন বা অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। অত্যন্ত সূক্ষ্মপরি-ষ্কৃত রূপ হওয়ার জন্য কাব্যের আনন্দ বিষয়ানন্দ হইতে দূর এবং আত্মানন্দের নিকট-বর্তী বলিয়া স্বীকৃত —কেবল ইহাই ব্রহ্মানন্দসহোদরের অর্থ। যদি আপনার আস্থা

আত্মায় নাই তাহা হইলে আপনি চেতনা শব্দটির প্রয়োগ করিতে পারেন এবং রসকে চেতনার সমাহিতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। তাৎপর্য এই যে 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদর' বিশেষণ একটি বিশিষ্ট চিন্তন প্রণালীর পারিভাষিক শব্দ-বিশেষ—উহাকে কেবল ঐতিহাসিক সন্দর্ভেই গ্রহণ করা উচিত এবং বর্তমান কালের প্রমাতা যদি ব্রহ্ম অথবা আত্মার ধারণাকে গ্রহণ বা স্বীকার করিতে না পারেন তাহা হইলে এই শব্দটির আধুনিক আলোচনাশাস্ত্রের শব্দাবলীতে ব্যাখ্যান করিয়া লওয়া প্রয়োজনীয়। আমি স্বয়ং রসকে আত্মানন্দ বলিয়া স্বীকার করি না; এইজন্য নয় যে আত্মার অনস্তিত্বের ব্যাপারে আমি সর্বদা আশ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছি, বরং এইজন্য যে আত্মানন্দের ধারণাটি অস্পষ্ট ও বিবাদগ্রস্ত যদিও রসের বিষয়ে আমার বা প্রত্যেক সহৃদয়ের অনুভূতি সর্বথা অসন্দিগ্ধ। অতএব আমি রসশাস্ত্রে প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দাবলী সত্ত্বোদ্রেক, আত্ম-বিশ্রান্তি, ব্রহ্মানন্দসহোদর প্রভৃতির—বিবেক-সম্মত অর্থই গ্রহণ করি এবং করা আবশ্যক মনে করি। জীবনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণাগুলি দেশকাল-পরিবদ্ধ এবং ব্যক্তি-সীমিত না হইয়া বিকাশশীলই, এইরূপেই উহারা সার্বভৌম ও শাশ্বতরূপ ধারণ করিতে পারে। কেবল রস-সিদ্ধান্তেই নহে, সম্পূর্ণ ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ইহাই দুর্ভাগ্য যে যিনি এই শাস্ত্র পড়িয়াছেন বা বুঝিয়াছেন, তিনি প্রাচীন ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় ভাবিতেছেন এবং যিনি ইহা পড়িবার বা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই তিনি এদিক-ওদিক হইতে কিছু কথা শুনিয়া অনর্গল আলোচনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর রস-সিদ্ধান্ত ধ্বনি ও অলংকারের সহিত নিজের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আজ হইতে এক সহস্রাব্দ বৎসর পূর্বেই দিয়া দিয়াছে। কাব্যে ধ্বনির প্রতিষ্ঠা বস্তুতঃ কল্পনা-তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা এবং অলঙ্কারও বিম্ব-বিধানেরই তুল্যরূপ। এইগুলির মধ্যে ধ্বনি রসের অনিবার্য মাধ্যমই, অলংকারও উপেক্ষার বস্তু নহে—এবং ইহার প্রমাণ এই যে শ্রেষ্ঠ রসবাদী আচার্যরা পর্যন্তও স্বীয় শাস্ত্রগ্রন্থে অলঙ্কারের সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল আচার্যরা রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের গুরুত্বকে স্বীকার করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। এইরূপে রসের বিধান হইতে বুদ্ধিতত্ত্বও অপসৃত হয় নাই: উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সরস কাব্যের জন্য ভাব-বৈভবের সাথে-সাথে অর্থ-গৌরবের প্রয়োজনীয়তাও অনিবার্য বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। অতএব কল্পনা ও বিচার রস-সিদ্ধান্তে অস্বীকৃত হয় নাই; শর্ত কেবল ইহাই যে উভয়েরই অনুভূতির বিষয় রূপে কাব্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ প্রয়োজনীয়। অনুভূত কল্পনা ও অনুভূত বিচার রসের অঙ্গরূপে পরিণত হয় এবং কেবল কল্পনা বা কেবল বিচার অর্থাৎ অননুভূত কল্পনা ও বিচার কাব্যের বিষয়বস্তুই হইতে পারে না। রস-সিদ্ধান্তে যদিবা ইহাদের জন্য কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই, তাহা হইলে উহার কি দোষ? প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক অর্থে রস সৌন্দর্যেরই সমার্থক, তত্ত্বরূপে সৌন্দর্যের অপর নাম রমণীয় অর্থ-বোধ এবং রমণীয় তাহাই যাহাতে সহৃদয়ের চিত্ত রমণ করে অর্থাৎ যাহা উহার আনন্দ চেতনার বিষয়-রূপ। এইরূপে সৌন্দর্য কল্পনা রস ব্যতীত সম্ভব নয়

—সুন্দর ও সরসের মধ্যে প্রভেদ করা যাইতে পারে না।

রস-সংখ্যানের সহিত সম্বন্ধ অভিযোগটি বিষয়ের অল্পবোধের উপরই আশ্রিত। আমরা প্রারম্ভেই স্পষ্ট বলিয়াছি যে সংখ্যার প্রশ্নটি রস-সিদ্ধান্তের একটি অত্যন্ত গৌণ বিষয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে অধিকাংশ আচার্যগণ রস-ভাবাদির নিশ্চিত সংখ্যাটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত বিবাদাস্পদই থাকিয়া গিয়াছে এবং এখনও সংখ্যায় বৃদ্ধি বা হ্রস্বীকরণের প্রয়ত্ন নিরন্তর চলিতেছে। ইহার সঙ্গে এই কথাও বার-বার বলা হইতেছে যে রস ও ভাবের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করাও অধিক সঙ্গত নয়—প্রত্যেকটি ভাব এমন কি সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারাও রসের সিদ্ধি সম্ভবপর। অপর দিকে রসাভাস, ভাব, ভাবাভাস, ভাবোদয়, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশবলতা প্রভৃতিও রসে অন্তর্ভূ'ত এবং এই কারণে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় যে রস-সিদ্ধান্তে রস ও ভাবের 'নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা'র কোন গুরুত্ব নাই। সামান্য সিদ্ধান্ত-কথা ও বিষয়-তত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণ প্রত্যেকটি শাস্ত্রের কর্তব্য কর্ম এবং তার জন্য বর্গীকরণ-প্রণালী, নাম-রূপ-সংখ্যা প্রভৃতির আশ্রয় লওয়া অনিবার্য হইয়া পড়ে। কখনও কোন শাস্ত্রকার ভেদ-প্রস্তার বা গণনাকে একান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট বা অন্তিম রূপ বলিয়া স্বীকার করেন নাই—যখনই ভেদ-বর্ণনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সংস্কৃত আচার্যগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে এই সকল ভেদ উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ ঈদৃক্প্রকারই দ্যোতক, সীমার নহে। এমন পরিস্থিতিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া ও প্রাচীনপন্থী বলিয়া বার-বার দোষারোপ করা হয় দুরাগ্রহ নতুবা অল্প-বোধ। অতএব হ্যামলেট বা গোদানের রস কি, এই প্রশ্নটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদিও পরম্পরানিষ্ঠ রসবাদীর পক্ষে হ্যামলেট বা ওয়েস্টল্যাণ্ড, গোদান বা শেখর—কোনটিতেই নিয়মের অনুসরণে রস-নির্ণয় দুঃসাধ্য নহে, তবুও অভিযোগের উত্তর হিসাবে আমরা এই কথা বলিতে চাহি না। শেখরের রস কি, এই প্রশ্নটিই প্রাচীনপন্থী দৃষ্টিকোণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং ইহার উত্তরও এই দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন এবং উত্তর দুইটিকেই গুরুত্বহীন বলিয়া স্বীকার করি এই সকল গ্রন্থের অঙ্গীরস কি কেবল ইহার প্রমাণ দিলেই রস-সিদ্ধান্তের গৌরব প্রকাশ পায় না বরং ইহা প্রমাণ করিলে যে এই সকল গ্রন্থের আস্বাদ্যতার মূলাধার রস অথবা একটি বিশেষ ভাবাত্মক প্রভাব বা অনুভূতির সমৃদ্ধি তখনই রসের বাস্তবিক গৌরবরূপ উদ্‌ভাসিত হয়।

উল্লিখিত উত্তরটিতে ইহার পরের অভিযোগেরও উত্তর রহিয়াছে। রস কেবল পরিপাক-অবস্থারই অপর নাম নহে। এই কথাটি কোথাও বলা হয় নাই যে রসময়তার জন্য সর্বত্র রসের সম্পূর্ণ অবয়বগুলির প্রয়োজন হয়ঃ ব্যভিচারী ভাব ব্যতীত কেবল অনুভাবের চিত্রণের দ্বারাও রসের সিদ্ধি হইয়া যায়ঃ যে অবয়বগুলির বর্ণনা হয় নাই সেগুলিও প্রচ্ছন্নরূপে বিদ্যমান থাকে। রসশাস্ত্রে বিভাবাদির বিধানের উপর গুরুত্বের আরোপ এইজন্য করা হইয়াছে যে উহাদের প্রচ্ছন্ন বা প্রকট

সত্তার আশ্রয় ব্যতীত ভাবের কল্পনা সম্ভবপর নহে, অনুভূতির কথা তো অনেক দূরে। ভাবের নিরাধার বা নিরপেক্ষ সত্তা কেবল রসশাস্ত্রেই নয়, মনোস্তত্ত্বেও সর্বথা অস্বীকার্য এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান ভাবের স্বতন্ত্র কল্পনার বিষয়ে আরও সন্দেহাকুল হইয়া পড়িতেছে। মারাঠীর রসবাদী আলোচকগণ এই অভিবেগের প্রতিবাদে ভাব হইতে সূক্ষ্মতর 'ভাব-গন্ধ' এর কল্পনা করিয়াছেন। রস-সিদ্ধান্তে আরও অগ্রসর হইবার সুযোগ আছে : রসের স্থায়ী ধর্ম গুণ যাহা চিত্তের দ্রুতি, দীপ্তি ও ব্যাপ্তি প্রভৃতি অবস্থার বাচক। অতএব এই ধরণের কবিতায় যেখানে ভাবের স্বরূপ অস্পষ্ট, যাহা কেবল চিত্তকেই স্পর্শ করে সেই সব কবিতাও সিংহ দ্বারে দণ্ডায়মান বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব প্রভৃতির দৃষ্টি বাঁচাইয়া অনুভূতির মন্ত্রবলে রসচক্রে সহজেই প্রবেশ লাভ করে। একটি উদাহরণের দ্বারা আমি নিজের বক্তব্যটিকে স্পষ্ট করিতে চাই—

সোন-মছলী

হম নিহারতে রূপ,
কাঁচ কে পীছে
হাঁপ রহী হৈ মছলী।
রূপ-তৃষা ভী
(ঔর কাঁচ কে পীছে)
হৈ জিজীবিষা।

'অজ্ঞেয়'এর এই কবিতাটি একটি আধুনিক কবিতা এবং সুন্দরও বটে। ইহার আকর্ষণের রহস্য কি? সুন্দর বিম্ব? হ্যাঁ, এই কবিতার দ্বারা প্রমাতার কল্পনায় যে বিম্ব উদ্‌বুদ্ধ হয় তাহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আকর্ষক ও জীবন্ত। কাঁচের পিছনে নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্য জলে ভাসমান সোন-মাছের ঘন-ঘন নিশ্বাস লওয়ার চিত্রটি একেবারে চোখের-সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইয়া পড়ে—উজ্জ্বলরূপ সমন্বিত মাছের তরঙ্গিত আকৃতি যেন 'জিজীবিষা' শব্দের বলয়বেষ্টিত উচ্চারণের সঙ্গে শব্দ-মূর্ত হইয়া পড়িয়াছে। এত কম শব্দের সাহায্যে এইরূপ একটি জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করা নিশ্চিতরূপে নিপুণ শিল্পীর পরিচয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে এই শব্দ-চিত্রটিই কি এই কবিতার অন্তিম সিদ্ধি? প্রস্তাবিত শব্দ-চিত্রটিকে যে সংবেদনা রসসিক্ত করে, যাহা কেবল মানব-চেতনাতেই আশীর্বাদরূপে অবস্থিত থাকে তাহা কি ইহার চরম সিদ্ধি নয়? বিম্ব নিশ্চয়ই কলার একটি সিদ্ধি কিন্তু এই বিম্বকে যে তত্ত্ব জীবন্ত রূপ প্রদান করে তাহা মানব চেতনারই স্পর্শ-বিশেষ এবং উহারই নাম রস।

আর একটি অভিযোগ রসের পারস্পরিক বিরোধাবিরোধের বিষয়ে করা হয়। ইহার মূল কথা এই যে রস-সিদ্ধান্তে বিভিন্ন ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধ-সূত্রগুলি সর্বথা নিশ্চিত স্বীকার করা হয়; ফলে এই রীতি-নিয়মে আবদ্ধ রস-প্রক্রিয়া এতই সরল ও

সহজ-বোধ্য হইয়া পড়ে যে অন্তশ্চেতনার নানা সংশয় ও গ্রন্থির প্রকাশ উহার দ্বারা সম্ভবপর হয় না। আমাদের বক্তব্যানুসারে এই অভিযোগটি অল্পজ্ঞানেরই প্রমাণ। ইতিপূর্বে যথাপ্রসঙ্গে আমরা স্পষ্ট করিয়াছি যে রস-সিদ্ধান্তে রসের পারস্পরিক বিরোধিতার নানারূপের বিবেচনার সাথে-সাথে ইহার পরিশমনের নানা উপায়েরও অত্যন্ত বিস্তারের সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং ইহাদের সংখ্যা এত অধিক ও বৈবিধ্যময় যে মানসিক জীবনের সকল প্রকারের অন্তর্বিরোধ এই সকল উপায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কেবল একটি রসকে লইয়াই যদি বিচার করা হয় তাহা হইলেও রস-প্রক্রিয়ার উপর সরলতার দোষারোপ সঙ্গত নহে, কারণ শৃঙ্গারের অনুরূপ রসের পরিধিতে পরস্পর হইতে সর্বথা ভিন্ন এবং পরস্পর বিরুদ্ধ প্রায় সকল ভাবের মুক্ত সঞ্চরণ শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। শেক্সপীয়ারের যে নাটকগুলির উল্লেখ করিয়া ইংরাজি ভাষার বিদ্বান্ রস-সিদ্ধান্তের বিষয়ে এই অভিযোগটি করিয়াছেন সেই সকল নাটকে এমন কোন প্রসঙ্গ সম্ভবতঃ নাই যেখানে রসশাস্ত্রীয় নিয়মানুসরণে ভাবের বিরোধিতার পরিহার সম্ভবপর নহে। এবং স্থানবিশেষে এই নিয়মগুলি কার্য-করী না হইলেও কোন কিছু হানি ঘটে না—কারণ প্রথমতঃ বিরোধ-কল্পনা রস-সিদ্ধা-ন্তের মৌলিক অঙ্গ নয় এবং দ্বিতীয়তঃ রস-বিরোধের তত্ত্বগুলি স্থির নয় বরং কাব্যের বিকাশের সহিত বিকাশ লাভ করিয়াছে অর্থাৎ এইগুলির মধ্যে সময়ে-সময়ে আবশ্যক সংশোধন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ রস-সংখ্যানের অনুরূপ রস-বিরোধের কল্পনাও রস-সিদ্ধান্তের একটি আনুষঙ্গিক সিদ্ধিমাত্র, যদিও প্রথমটির অনুরূপ ইহারও যথেষ্ট পুষ্ট মনস্তাত্ত্বিক আধার বিদ্যমান আছে।

রসকে কেবল সহৃদয়নিষ্ঠ রূপে স্বীকার করিবার ফলে রস-কল্পনাতে কাব্যগত রস ও কবিগত রস-চেতনা উপেক্ষিত হইয়াছে—এই অভিযোগটির উপর নানা স্তরে বিচার করা যাইতে পারে। যদি রসের অর্থ মূলতঃ কাব্যাস্বাদ হয়, তাহা হইলে উহার স্থিতি সহৃদয়নিষ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ আস্বাদনের চেতনা-ক্রিয়া ব্যক্তির হৃদয়েই সম্ভবপর, বস্তুতে নয়। কবি, কাব্য ও সহৃদয়, এই ত্রৈত স্থিতির মধ্যে কাব্য জড়পদার্থ রূপ অতএব আস্বাদের ক্ষমতা উহাতে নাই? ইহা ঠিক যে উহা আস্বাদের নিমিত্ত রূপ। কবিও ব্যক্তিরূপে রসেরই স্রষ্টা—শাস্ত্রীয় শব্দাবলীতে রসের অভিব্যঞ্জক কাব্যের কর্তা। অতএব রস অর্থাৎ কাব্যাস্বাদের ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে সহৃদয়ই. অনন্তপক্ষে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই কথাকে অমান্য করা যাইতে পারে না তত্ত্বদৃষ্টিতেও, প্রমাতা ব্যতীত পদার্থে রসের স্থিতি প্রমাণিত করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন অবশ্যই। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের সমস্ত বিচার-বিবেচনা এখন পর্য্যন্ত অদ্বৈতের অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক তত্ত্বের কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু এই বিবাদের মধ্যে আমরা পড়িতে চাহি না কারণ কাব্যের সত্যকে আমরা দর্শন ও তর্ক-শাস্ত্রের উপকল্পনা হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উহার অর্থ বুঝিতে চাই। কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন ওঠে যে এই রসের সহিত কাব্যের

সম্বন্ধ কি ? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে কাব্য এই রসের প্রেরক বা নিমিত্ত কারণ। স্বয়ং অভিনবগুপ্ত গুণালঙ্কারময় শব্দার্থ—কাব্যের গুরুত্বের উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিচার করিয়াছেন; এই গুণালঙ্কারময় শব্দার্থই বিভাবাদির সাধারণীকরণ—আধুনিক শব্দাবলীতে ভাবাত্মকরূপে উপস্থাপন-দ্বারা সহৃদয়ের স্থায়ীভাবকে দেশকালের সীমা এবং ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত করিয়া, রসে পরিণত করে। অভিনবগুপ্তের অনুসরণে স্থায়ী ভাবের নির্বিঘ্ন প্রতীতিই রস—এই প্রতীতির ভোক্তা নিশ্চিতরূপে সহৃদয়ই, কিন্তু প্রস্তাবিত সন্দর্ভে গুণালঙ্কারময় শব্দার্থ বা কাব্যই এই নির্বিঘ্নের একমাত্র সাধনরূপ। অতএব কাব্যের গুরুত্ব রস-সিদ্ধান্তে গৌণ নয়, হওয়া সম্ভবপরও নয়, কারণ কাব্যই রসের জন্মভূমি বা আধারভূমি, যাহার অভাবে উহার অস্তিত্বই কাল্পনিক হইয়া পড়ে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে রসের সর্বাধিক বড় বিঘ্ন সহৃদয়ের গ্রহণ শক্তির বিফলতা, কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে ইহার জন্য কাব্য-সৌন্দর্যের অস্তিত্বই নষ্ট হইয়া যায়। রসবিঘ্নের প্রকরণে এই সন্দেহের নিবারণ করা হইয়াছে; এমন পরিস্থিতিতে কবি বা কাব্যের দোষ হয় না, এখানে তো সহৃদয়তাই দুষ্ট হইয়া পড়ে। এখন পর্যন্ত প্রমাতৃগত রসের কথা বলা হইল, বস্তুগত রস-কল্পনারও ভারতীয় রসশাস্ত্রে অভাব নাই। লোল্লট ও শঙ্কুকের দ্বারা প্রতিপাদিত রস নিশ্চিতরূপে ব্যক্তিগত—কাব্য-কৌশল ও নাট্য-কৌশলের ভিত্তিতে রঙ্গমঞ্চে উহার সৃষ্টি হয় এবং ইহা আস্বাদরূপ না হইয়া আস্বাদ্যই হয়। অপরদিকে জৈন আচার্যগণও রসের স্থিতি কাব্যগত ভাব-সামগ্রীতেই স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে কবিগত রসের কল্পনাও নূতন নয়, ভরত, আনন্দবর্ধন, ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি সকল প্রমুখ রসাচার্যগণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইহা স্বীকার করিয়াছেন :

কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে। অর্থাৎ যাহা কবির অনুভূতির ভাবন করায়, শাস্ত্রে উহার নামই রস।

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥

নাট্যশাস্ত্র ৬,৭

—অর্থাৎ যেরূপ বীজ হইতে বৃক্ষ হয় এবং বৃক্ষ হইতে পুষ্প ও ফল জন্মলাভ করে, সেইরূপ (কবিগত) রসই মূল এবং ইহার দ্বারা ভাবের স্থায়িত্ব লাভ হয়।

ভরত কর্তৃক উদ্ধৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া, অভিনবগুপ্ত, আনন্দবর্ধনের প্রমাণের ভিত্তিতে, কবিগত রসের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সেই কবিগত সাধারণী ভূত রসসংবিতমূলক কাব্যের দ্বারা নটের ব্যাপার প্রযোজিত হয়। এবং সেই (কবিগত) সংবিত প্রকৃতপক্ষে (মূলভূত) রসই। উহার প্রতীতির বশীভূত সেই (কবিগত রসের দ্বারা প্রভাবিত) সামাজিকের অপোদ্ধার-বুদ্ধি অর্থাৎ অন্বয়-ব্যতিরেক প্রভৃতির ভিত্তিতে পরে বিভাবাদির প্রতীতি হয়। এইরূপে মূল বীজের স্থানে কবিগত রস (ভাবাদির মূল কারণ)। কবি সামাজিকের অনুরূপই।

এইজন্য ধ্বন্যালোককার শ্রীআনন্দবর্ধনাচার্য বলিয়াছেন যে 'যদি কবি শৃঙ্গারী কবি হন তাহা হইলে সম্পূর্ণ জগৎ রসময় হইয়া যায় এবং তিনি যদি বীতরাগ হন তাহা হইলে সম্পূর্ণ কাব্য নীরস হইয়া যায়' ইত্যাদি। এই রস (বীজস্থানীয় কবিগত রস) হইতে বৃক্ষস্থানীয় কাব্য (উৎপন্ন) হয়। উহাতে পুষ্প-স্থানীয় অভিনয়াদিরূপ নটের ব্যাপার প্রযোজিত হয়। উহাতে ফলস্থানীয় সামাজিকের রসাস্বাদ হয়। এইজন্য (সামাজিকের জন্য সম্পূর্ণ কাব্য)—জগৎ রসময় হইয়া যায়।

(হিন্দী অভিনবভারতী, পৃ০ ৫১৫)

কবিগত রসের এই ব্যাখ্যার পর শ্রীমর্ডেকারের প্রস্তাবিত অভিযোগের সহজেই নিরাকরণ হইয়া যায়ঃ মাংসভক্ষণের উল্লিখিত প্রসঙ্গে কবির অনুভূতিই মূল রস এবং সহৃদয়ের অনুভূতি—রসের নির্ণয় ইহারই অনুসারে করা হয়। কাব্যগত স্থায়ীভাব বলিবার অভিপ্রায় প্রত্যেক পাত্রের স্থায়ী ভাব নয় বরং কবিগত স্থায়ী ভাবই। কবির ভাব যদি জুগুপ্সারূপ হয় তাহা হইলে সহৃদয়েরও জুগুপ্সার (বীভৎস রস) অনুভূতি হইবে, কবির ভাব যদি ক্রোধরূপ হয় তাহা হইলে ক্রোধের (রৌদ্ররস) এবং যদি ভয়রূপ হয় তাহা হইলে ভয়ের (ভয়ানক-রস) অনুভূতি হইবে।

রসের অভিব্যক্তিতত্ত্বের বিরোধিতাও ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের পক্ষে কোন নূতন বিষয় নয়। ধ্বনির স্থাপনার পূর্বে লোল্লট ও শঙ্কুক এবং ইহার পরেও ভট্টনায়ক, মহিমভট্ট, ধনঞ্জয় প্রভৃতিরাও রসের অভিব্যক্তির প্রত্যেক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রূপে নিষেধ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভরতের মতই ইহার বিরুদ্ধে। ভরতের মতানুসারে নিষ্পত্তির অর্থ বস্তুতঃ নির্মিতিই। নিষ্পত্তির অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য তিনি ষাড়বাদি রসের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার ফলে আর এই সন্দেহ থাকে না যে তাঁহাদের মতে রসাস্বাদ একটি মিশ্র অনুভূতি যাহার মধ্যে আধারভূত স্থায়িভাবের সহিত কাব্য এবং নাট্য সৌন্দর্যের বিভিন্ন অনুভূতিগুলিও সংমিশ্রিত থাকে, যেরূপ ষাড়বাদি রসের আস্বাদের মধ্যে অন্নের আস্বদ ও দ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ঔষধি প্রভৃতির স্বাদ সংমিশ্রিত থাকে। লোল্লটও উপচিতির প্রকল্পনার ভিত্তিতে এই মতেরই পরিপালন করিয়াছেন এবং ভট্টনায়ক অভিব্যক্তি তত্ত্বটি খণ্ডন করিয়া এই মতেরই আশ্রয়ে ভুক্তির কল্পনা করিয়াছেন—ভট্টনায়কের মতানুসারেও সহৃদয় রস রূপে যে স্থায়ী ভাব ভোগ করে তাহা অমিশ্র রত্যাদি না হইয়া গুণালংকার অর্থাৎ কাব্য-সৌন্দর্য ও চতুর্বিধ অভিনয় অর্থাৎ নাট্য-সৌন্দর্যের অনুভূতি-যুক্ত হয়ঃ উহা পাশ্চাত্য কাব্য-শাস্ত্রে নিরূপিত 'কলাত্মক ভাব'এরই সমার্থক। অতএব 'নির্মিতি'র ধারণা রস-শাস্ত্রে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু, সঙ্গে ইহা বলাও সঙ্গত নয় যে রসাভিব্যক্তির সিদ্ধান্তটি সর্বথা স্বীকার্য। যে আধুনিক বিবেচক নির্দ্বিধায় কাব্যাস্বাদকে শুদ্ধ অনুভূতি রূপে স্বীকার না করিয়া বিভিন্ন অনুভূতির বিধান রূপে স্বীকার করিয়াছেন তাহারই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 'অভিব্যক্তি' রও সিদ্ধি হইয়া যায়। ডঃ রিচার্ড্‌স কাব্যাস্বাদ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিয়া উহার ছয়টি অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন ঃ চাষ সংবেদনক্ষু

(বিম্ব-বিধান); সম্বন্ধ বিম্ব-বিধান; স্বতন্ত্র বিম্ব-বিধান; বিচার; ভাবোদ্বোধন ও দৃষ্টি-কোণের নির্মাণ। এই বিশ্লেষণের অনুসরণে—কোন মুদ্রিত বা লিখিত কবিতা পড়িলে পরে পাঠকের হৃদয়ে প্রথমে অক্ষরের নানা চিত্র-বিম্ব তৈরি হয়, তাহার পরে উহাদের রূপাকৃতি ও নাদের সহিত সম্বন্ধ বিম্ব উদ্‌ভাসিত হয়, তখন এই সকল অক্ষ.-গুলির দ্বারা নির্মিত শব্দের প্রচলিত বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ বিম্ব উপস্থিত হয় যেগুলি অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্ররূপ হয়; ইহার পরে এই শব্দসমূহের বাচ্যার্থের সমন্বিত রূপের আশ্রয়ে পাঠকের কল্পনা ও বিচার সজাগ হইয়া ওঠে যাহার ফলে তাহার ভাব উদ্‌বুদ্ধ হয়—এবং অবশেষে এই প্রক্রিয়ার সংযুক্ত পরিণামস্বরূপ একটি বিশেষ মনোদশার নির্মাণ হয়। এইরূপে কবিতার দ্বারা প্রমাতার ভাবের উদ্‌বোধ মনোবৈজ্ঞানিকের পক্ষেও স্বীকার্য: মনোবিজ্ঞানও ভাবের উদ্‌বুদ্ধির নিষেধ করে না, কারণ সেখানেও মানব চেতনার কিছু প্রবৃত্তির 'স্থির বৃত্তি' রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কবিতার দ্বারা প্রমাতার চেতনায় যে ভাব বা ভাবশবলতার উদ্‌বোধ হয় তাহা নিশ্চিত তাহার নিজস্ব ভাব অনুভব হয়, কবির ভাব বা অনুভব অবশ্যই উহার প্রেরক বা নিমিত্ত কারণ কিন্তু কবি-ভাবের যথাবৎ সঞ্চরণ বা স্থানান্তরণ প্রমাতার চিত্তে হয় না—হইতেও পারে না। এখানে আসিয়া আমরা অভিব্যক্তি ও সমাযোজন বা সঞ্চার-সিদ্ধান্তগুলির বিবাদের পরিধির মধ্যে প্রবেশ করি এবং আমাদের সম্মুখে পুনরায় রসের সঞ্চার বা অভি-ব্যক্তির[১] গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি দেখা দেয়। এই প্রশ্নের উত্তরও আমরা যথাপ্রসঙ্গে দিয়াছি। এখানে কেবল ইহাই বলিতে চাই যে অভিব্যক্তি-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত প্রমাতার চিত্তে যে অনুভূতির উদয়ের কল্পনা নিহিত থাকে তাহা কবির অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন হয় না; কবিগত অনুভূতিই উহার মূলে বিদ্যমান থাকে অতএব উহা কবিগত অনুভূতিরই অনেকটা অনুরূপ হয়। এইরূপে সমাযোজনেরও অর্থ এই নয় যে প্রমাতার চিত্তে কবি-অনুভূতিরই যথাবৎ সঞ্চার বা স্থানান্তরণ হয় এবং প্রমাতা নিজস্ব অনুভূতির স্থানে কবি অনুভূতিরই আস্বাদন করে। আই. এ. রিচার্ড্‌স অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে এই ধরণের অনর্গল কল্পনার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সঞ্চার-সিদ্ধান্তেরও মূল বিবেচ্য বিষয় ইহাই যে কোন কবিতা পড়িয়া প্রমাতার চিত্তে ওই কবিতায় ব্যক্ত কবির মূল ভাবেরই অনুরূপ অনুভূতির উদয় হয়—ঠিক সেই অনুভূতি প্রমাতার চিত্তে সঞ্চার লাভ করে না—করিতে পারে না। অতএব সঞ্চার এবং অভিব্যক্তির বিরোধ কেবল শাস্ত্রীয়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই, কারণ উভয়ের মধ্যে 'সমান অনুভূতি'র কল্পনাই অন্তর্নিহিত: সঞ্চার-সিদ্ধান্ত এই দাবী করে না যে কাব্যের আস্বাদন ব্যাপারে প্রমাতা কেবল কবি অনুভূতিরই আস্বাদন করে—উহাতে প্রমাতার নিজস্ব অনুভূতির কোন যোগদান নাই এবং অভি-ব্যক্তিবাদেরও এই ধরণের কোন প্রস্তাব নাই যে প্রমাতা কবি-অনুভূতি হইতে সর্বথা

১. Communication

স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ স্বানুভূতিরই আস্বাদন করে। তাৎপর্য এই যে 'নির্মিতি' ও 'সংস্কার'এর ধারণার ভিত্তিতে 'অভিব্যক্তি'র খণ্ডন করিলে রস-সিদ্ধান্তের ব্যর্থতা সিদ্ধ হয় না, কারণ প্রথমতঃ রসের অভিব্যক্তির একান্তরূপে নিষেধ কোনমতেই সম্ভবপর নয়, দ্বিতীয়তঃ অভিব্যক্তির বিচারের সহিত 'নির্মিতি' বা 'সংস্কার'এর বিচারধারারও অমিল নাই।

এখন কেবল দুইটি অভিযোগ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। প্রথমটি এই যে রস-সিদ্ধান্তের সহিত বর্তমান যুগের সাহিত্যের মূল চেতনার কোন সঙ্গতি নাই। রস-সিদ্ধান্ত জীবনের স্থায়ী মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার বিপরীতে আজ স্থায়িত্বের ধারণাই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান জীবনে আস্থার সম্পূর্ণরূপে বিঘটন ঘটিয়াছে, অতএব বর্তমান যুগের কবিতার পক্ষে আনন্দবাদী মূল্যের উপর অধিষ্ঠিত রস-সিদ্ধান্ত নিরর্থক আস্থার প্রশ্নটি একটি ব্যাপক প্রশ্ন যাহার কেবল কাব্যের সহিতই নহে সম্পূর্ণ জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে আজ জীবনে যত বিপদ্ আসিয়া দেখা দিয়াছে তাহা ইতিহাসের কোন যুগে ছিল না এবং যখন মানবতার অস্তিত্ব সব সময়েই বিপদাপন্ন তখন বিশ্বাসের জন্য অবলম্বনই বা কি থাকিবে? এইজন্য অনাস্থা এবং সেই কারণে বিষাদ আজকের যুগের অনুভূত তথ্য বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে যেগুলি হইতে কোন সত্যিকার শিল্পী নিজেকে বঞ্চিত রাখিতে পারিতেছে না। তবুও আমার প্রশ্ন এই যে আজ বাস্তবিকই কি আস্থার বিঘটন ঘটিয়াছে? যদি ইহা ঠিক তাহা হইলে প্রভাব-বিস্তার, শক্তি-সংগঠন, শান্তি ও সুরক্ষার বিশ্বব্যাপী প্রয়ত্নগুলির আধার-ভিত্তি কি? সর্বনাশের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি কি আমাদের জিজীবিষাকে তীব্রতা প্রদান করিতেছে না? এবং জিজীবিষার এই তীব্রতা কি আস্থার অনিবার্যতাকে সপ্রমাণ করিতেছে না? আজকের সম্ভাবনাগুলির মধ্যে কি কেবল প্রলয়ের সম্ভাবনাই কাম্য? সর্বনাশের ভয়ে একত্র মানব-সমাজের সার্বভৌম সংগঠনের সম্ভাবনার কি কোন মূল্য নাই? দুইটি সম্ভাবনাই হইতে পারে: এখন ইহা আপনার উপর নির্ভর করে যে কোনটি গ্রহণ করিবেন? যদি আপনি কেবল ইহাই স্বীকার করিতে চান যে প্রলয়ের সংকটই বর্তমান যুগের একমাত্র সত্য এবং উহার অভিব্যক্তিই সত্যকার শিল্প, তাহা হইলে ইহাতে রস-সিদ্ধান্তের দোষ কি? —যদিও এই আত্মঘাতী নিরাশাও রসের পরিধিরই অন্তর্ভুক্ত এবং যদি সত্যই আপনার এই নিরাশাকে সুন্দররূপ প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে রস-সিদ্ধান্তই বস্তুতঃ আপনার শিল্পকলার মূল্যাঙ্কন করিতে পারিবে। তবুও, ব্যাপক দৃষ্টিতে, এই বিষয়ে আমার বক্তব্য কেবল এই যে যাঁহাদের চেতনা অধিক অনাবিল এবং চিন্তাধারা অধিক সুস্থ তাঁহারা এই অভিযোগের ব্যাপারে একমত হইবেন না। যতদিন জীবন আছে, ততদিন আস্থাও থাকিবে এবং যদি জীবনেই বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে কলার প্রতি আস্থাবান থাকিলেও লাভ কি হইবে? এই অভিযোগেরই আর একটি দিক এই যে রসের পরিপাকের জন্য স্থায়ী ভাবের সদ্যঃ অনুভূতির নয় বরং অতীত অনুভূতির সংস্কার বা বাসনার প্রয়োজন হয়। ইহার বিপরীতে বর্তমান জীবনে কেবল ক্ষণকালটিই সত্য

এবং বর্তমান কালের কবিতা সদ্যঃ অনুভূতিরই নয় বরং অনুভূয়মান ক্ষণকালেরই কবিতা। কিন্তু ইহা কেবল মাত্র বাক্‌বিলাস ঃ যথার্থ সিদ্ধান্ত নয় বরং সিদ্ধান্তের কল্পনাত্মক প্রতিপাদন যাহা তথ্য হইতে ভিন্ন। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অনুভূতি ও কর্ম, ভোগ ও সৃজনের যুগপৎ অবস্থান সম্ভবপর নয়—ইহা প্রকৃতির নিয়ম। অতএব কাব্য-সৃষ্টিও অনুভূতির আস্বাদন কালে অসম্ভব। যখন অনুভূত ক্ষণ-কালটিকে শব্দ-বদ্ধ করাই এত কঠিন তাহা হইলে অনুভূয়মান ক্ষণ কালকে আপনি কেমন করিয়া শব্দে আবদ্ধ করিবেন ? অনুভূয়মান ভাব সংবেদনা ব্যতীত আর অন্য কিছু নাই—ইহাতে সন্দেহ নাই যে যে সূক্ষ্মচেতা শিল্পীর কল্পনা এই সকল অরূপ সংবেদনগুলিকে স্বরূপ প্রদান করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু যখনই এই সংবেদনগুলি রূপায়িত হয় তখনই অনুভূতও হইয়া পড়েঃ অনুভূয়মানের রূপায়িতিই অনুভূতি যেখানে 'ক্ষণ' কাল 'অতীত' হইয়া যায়। ক্রোচে ইহাকেই সহজানুভূতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ক্রোচের মতানুসারে এই সহজানুভূতিই কলা। কিন্তু কলার তিনি দুইটি রূপ স্বীকার করেন—একটি আন্তরিক রূপ, অপরটি ব্যবহারিক রূপ। সহজানুভূতি কলার আন্তরিক রূপ যাহা অবশ ভাবে শিল্পীর চেতনায় প্রসারিত হয়—ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহা কলা নয় বরং কলার 'প্রকল্পনা'; ব্যবহারে আমরা যাহাকে কলা বলি, যাহা বিবেচনার বিষয়, তাহা এই সহজানুভূতির মূর্ত উপকরণের দ্বারা প্রস্তুতিরই অপর নাম। শিল্পী স্বেচ্ছায় স্বীয় অতীত সহজানুভূতির ভিত্তিতেই ইহাকে সিদ্ধ করে। অতএব অনুভূয়মান ক্ষণকালের অভিব্যক্তির কল্পনা অস্বীকার্য; অনুভূত ভাবের সৃজন বা পুনঃসৃজন সম্ভবপর। এই-রূপে প্রথমে অসম্ভবের কল্পনা করিয়া এবং ইহার পরে যাহা অনাদি কাল হইতে মানব-জীবনের অভিব্যক্তির সর্বাপেক্ষা সমর্থ সাধন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে সেই শব্দকে সর্বাধিক বেধ্য উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া, অসাধ্য-সাধনের শ্রেয়াংশের ভাগী হওয়াকে বুদ্ধির চমৎকারিত্ব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু কাব্য-সত্য রূপে তাহার পক্ষে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভবপর নয়।

রস-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্তিম অভিযোগটি এই যে রসের জন্য কাব্যে আনন্দে-রই উপরে সম্পূর্ণ গুরুত্বটা আসিয়া পড়ে—যাহার ফলে ভোগবৃদ্ধি প্রোৎসাহন পায় ও উদাত্তবৃত্তিগুলি উপেক্ষিত হইয়া পড়ে। এই অভিযোগ বস্তুতঃ নৈতিক অভিযোগ এবং ভিন্ন-ভিন্ন যুগে নানা প্রকারের রূপ ধারণ করিয়া জীবন ও কাব্যে আনন্দবাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। ইহার একটি উত্তর এই যে ভারতীয় দর্শন ও কাব্যশাস্ত্রে আনন্দের যে রূপের কল্পনা করা হইয়াছে তাহা মানব-চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশের তুল্যরূপ—মানব ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গ উৎকর্ষের ভাবাত্মক রূপ বা আস্বাদই আনন্দ। ইহা বিষয়-ভোগ, সুখ, মনোরঞ্জন, প্লেজর বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সমার্থক নয়। আনন্দের এই সর্বাঙ্গপূর্ণ কল্পনার উপর অবস্থিত থাকার জন্য রসের পরিধিতে মানব-চেতনার মধুর ও কটু, সুখময় ও দুঃখময় সকল প্রকারের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সহজভাবে অন্তর্ভূত হইয়াছে। উহাতে কেবল আনন্দের সিদ্ধাবস্থাই নয়, সাধন ব্যবস্থারও পূর্ণ স্বীকৃতি

বর্ত্তমান। অতএব রসের বাস্তবিক স্বরূপের সহিত পরিচয় হওয়ার পরে এই ধরণের দোষারোপ করা যাইতে পারে না এবং ইহার প্রমাণ আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের রস-বিবেচনা। এই বিবেচনায় তিনি আনন্দের বিরোধিতা করিয়াও রসবাদকেই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, আনন্দ কি কল্যাণকারী নয়? কল্যাণেরও চরম সিদ্ধি কি আনন্দ নয়?

উল্লিখিত প্রশ্নগুলির সমাধানের পরে রস-সিদ্ধান্তের গুরুত্বের প্রতিষ্ঠা সহজেই হইয়া যায়। শাস্ত্রগত রূঢ় নিয়ম হইতে মুক্ত রস-সিদ্ধান্ত নিজের ব্যাপক এবং বিকাশ-শীল রূপে কাব্যের একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্ত যাহার ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক কালের সৃজনাত্মক সাহিত্যের, সৃজনাত্মক সাহিত্যের প্রত্যেকটির রূপের, সম্যক্ মূল্যাঙ্কন করা যাইতে পারে। ইহার পরিকল্পনা এমনই সর্বাঙ্গীণ যে মানব-চেতনার মূলবৃত্তি—ভাব—কে মূলশক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ইহা অন্য সকল প্রমুখ তত্ত্বগুলিকে যথাযথরূপে স্বীকার করিয়া চলে। অতএব জীবনের সমস্ত রূপ এবং বিবিধ মূল্যের সহিত রস-সিদ্ধান্তের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে যাহাতে বিভিন্ন বাদগুলির অন্তর্বিরোধ মিটিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহার কারণ এই যে রস-সিদ্ধান্ত মানববাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থিত ঃ ইহা মানবকে তাহার দেহ ও আত্মা, শক্তি ও সীমা ও সমস্ত রাগদ্বেষ ইত্যাদি সহ স্বীকার করে; এইজন্য মানবের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সহিত ইহা অভিন্নভাবে সম্বন্ধযুক্ত। যেরূপে মানববাদ মানবকে অন্তিম সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া জীবনের বিকাশের সহিত নিরন্তর বিকাশশীল রহিয়াছে সেইরূপ মানব-সংবেদনাকে চরমসত্যরূপে গ্রহণ করিয়া রস-সিদ্ধান্তও নিরন্তর বিকাশ লাভ করি-তেছে। জীবনের গতিবিধিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে সেইরূপ মানববাদের পরিকল্পনা-তেও সংশোধন করা হয়; ঠিক এই প্রকারে সাহিত্যের গতিবিধিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে সেইরূপ রসের স্বরূপও ব্যাপকরূপ ধারণ করে। জীবনের নিরন্তর বিকাশশীল ধারণা এবং প্রয়োজনগুলির সংযোজনা যেরূপে মানববাদের মধ্যেই হইতে পারে, সেইরূপ সাহিত্যের বিকাশশীল চেতনার পরিতুষ্টিও রস-সিদ্ধান্তের দ্বারা সম্ভবপর। যতদিন পর্যন্ত মানব জীবনে মানবতা অপেক্ষা মহত্তর সত্যের এবং সাহিত্যে মানব সংবেদনার অপেক্ষা রমণীয় সত্যের উদ্‌ভাবনা না হয়, ততদিন পর্যন্ত রস-সিদ্ধান্তের অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক সিদ্ধান্তের কল্পনা আর সম্ভবপর নয়।

■ ■ ■

নির্ঘণ্ট

(বিষয়সূচী, গ্রন্থনাম ও ব্যক্তিনামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা)

বিষয়-সূচী

গ্রন্থনাম

ব্যক্তি নাম

■ ■ ■